



ଆଦର୍ଶ ସମୟ ଆଶ୍ରୟ

BanglaBook.org



আবুল মনসুর আহমদ

সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি—তিন
ক্ষেত্রেই আবুল মনসুর আহমদ
(১৮৯৮-১৯৭৯) কৃতিত্বের পরিচয়
দিয়েছেন। দেশ বিভাগের আগেই সাহিত্য
ও সাংবাদিকতায় তাঁর সাফল্য সবার দৃষ্টি
আকর্ষণ করে। ব্যঙ্গরচনায় তাঁর কুশলতাকে
এ দেশে আজও কেউ অতিক্রম করতে
পারেননি। রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক
আন্দোলনেও ছিলেন সক্রিয়। পাকিস্তানে
গণতান্ত্রিক রাজনীতির সূচনা থেকে প্রায়
এক দশককাল সামনের সারিতে থেকে
তাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রথমে প্রাদেশিক
এবং পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।
ব্যঙ্গধর্মী রচনায় যেভাবে তিনি সামাজিক
কুসংস্কার ও গোঁড়ামি, রাজনৈতিক ভণ্ডামি
ইত্যাদিকে কশাঘাত করেছেন, তা আজও
আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর অন্যান্য বইয়ের
মধ্যে রয়েছে—ছোটগল্প : ফুড কনফারেন্স,
আসমানী পর্দা; উপন্যাস : সত্যমিথ্যা, আবে
হায়াত; প্রবন্ধ-স্মৃতিকথা : আমার দেখা
রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, বেশী দামে কেনা
কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা।

আবে হায়াত

আবুল মনসুর আহমদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক

মেহবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ই-মেইল : info@ahmedph.com

প্রকাশকাল

এপ্রিল ১৯৬৮/বৈশাখ ১৩৭৬

তৃতীয় মুদ্রণ

জুন ২০১৫/জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

প্রচ্ছদ

অশোক কর্মকার

বর্ণবিন্যাস

ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

বেলাল অফসেট প্রেস
৪ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য

তিনশত টাকা মাত্র

ISBN 978 984 11 0761 1

ABE HAYAT : by Abul Monsur Ahmed
Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100.
First Edition : April 1968 & Third Edition : June 2015
Price : Tk. 300.00 & US \$ 15 Only.
www.ahmedph.com

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ইসরাফিলের বেটা

১

গুরু গুরু র-কড়-কড়-কড়াৎ-দ্রুম।

বিজলি চমকায়। চোখ ঝলসায়।

বাজ পড়ে। আসমান-ফাটা আওয়াজ। কানে তালা লাগে। চাপা পড়ে ফতেপুর শরিফের পীর বাড়ির সদ্য-ভূমিষ্ঠ এক শিশুর প্রথম কান্না। কেউ তা শোনে না।

সে বছর বর্ষা নামে খুব দেহিতে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বৃষ্টি হয় নাই। পাট ও আউশ ধান গারৎ। আষাঢ় মাসেও তাই। আমন লাগান গেছে খুব কম। যুদ্ধের বাজারে এমনতেই আগুন। দেশরক্ষক সেনাবাহিনীর খোরাক আগে। আগের বছরের জমা ধান-চাউল তাই গৃহস্থের গোলা খালি করিয়া উঠিয়াছে সরকারী গুদামে। এবারের অনাবৃষ্টিতে তাই এত ভাবনা সকলের। দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি হা করিয়া গোটা দেশটাই গিলিবার উপক্রম। সরকার ও নেতৃবৃন্দ আসন্ন আকালের ভয়ে সন্ত্রস্ত। নিরন্ন ক্ষুধার্ত জনগণ আজরাইলের যন্ত্রস্থ।

মাটি ত মাটি, নদীর তলা তক্ ফাটিয়া চৌচির। সারা দুনিয়া গরিব তাতিয়া-উঠা তন্দুরের মতো। এমনি অবস্থায় শ্রাবণের শেষ দিকে শুরু হইয়াছে বৃষ্টি। শুরু হইয়াছে ত হইয়াছেই। থামিবার নামটি নাই। দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টায় নাই এক মিনিট বিরাম। মেঘরাজ মিকাইল ফেরেশতার কুন্ডকর্ণের ঘুম ভাংগিয়াছে। হঠাৎ জাগিয়া বাঁধের স্লুইসগেট খুলিয়া দিয়া যেন আবার পাশ ফিরিয়া হইয়াছেন। ওদিকে ঝড়-তুফানের ফেরেশতা ইসরাফিল সাহেব বড় ভাই মিকাইলের সঙ্গে দিলেন পাল্লা। তুফান-ঠাঠার সিংগা ফুকিয়া। দুই ভাই-এর নজরে দুনিয়ার মাটি এক দলা ময়দা মাত্র। বড় ভাই ভিজাইলেন, ছোট ভাই কাই করিবেন না কেন?

কৃষকরা মাসের পর মাস আসমানের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে মেঘের আশায়। মাঠে-মাঠে ইস্তেস্কার নমাজ। ‘মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই আল্লা’র করুণ আর্তনাদ। গরিবের কান্না কেউ শোনে না, আল্লাও না। শেষ পর্যন্ত বল বল আপনা বল; জল জল কুয়ার জল। কৃষকেরা কুয়া খোঁদে, খাল কাটে, পানি সৈঁচে, নামিলা আবাদ করে। সামান্য জমিতে। শুধু খোরাকির ধানের আশায়। তাও আজ ধুইয়া-মুছিয়া গেল এই অকাল ঝড়-বৃষ্টিতে।

মড়ার উপর খাড়ার ঘা। ঝড়-তুফানে বাড়ি-ঘর পড়িয়াছে হাজার হাজার। গাছ-বৃক্ষ উপড়াইয়াছে অনেক। হাঁস-মুরগি গরু-মহিষ মরিয়াছে বেগুমার। কোথাও-কোথাও ঠাঠা পড়িয়া মানুষও মারা গেছে কয়েকজন। এক আর্তনাদ না থামিতেই দেশময় আরেক আর্তনাদ। সরকারী-বেসরকারী রিলিফের কাতর আবেদনের হৈ-হল্লা। রিলিফ ফাওও খোলা হইয়াছে বেশ-কিছু। দরায় হস্তে চাঁদা দিবার জন্য দেশ-প্রেমিক নেতারা হৃদয়-

বিদারক বিবৃতিও দিতেছেন প্রতিদিন। চাঁদাও উঠিয়াছে প্রচুর। কিন্তু এই অবিরাম ঝড়-বৃষ্টিতে রিলিফের টাকা বা কর্মী পাড়া-গায়ে পৌছিতে পারিতেছে না। জনগণের দুর্দশার শেষ নাই। পনের দিন ধরিয়া সুরুজের মুখ না দেখায় মানুষের মনও হইয়াছে বাহিরের মতোই অন্ধকার।

এমনি দিনের ভাদ্র মাস। গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঠিক যেন অমাবস্যা। অথচ চাঁদের হিসাবে শুরুপক্ষের একাদশী। এমনি ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টি চলিতেছে অবিরাম। থাকিয়া-থাকিয়া বিজলি চমকাইতেছে। বাজ গর্জাইতেছে। এর ফাঁকে-ফাঁকে প্রকৃতির নিস্তন্ধতা অস্বাভাবিক ও ভয়াবহ। জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই। মানুষ-গরু পোকপাখালি যে যেখানে পারিয়াছে মাথা গুঁজিয়াছে। ভয়ে নিঃশব্দে ও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করিতেছে। কিয়ামতের দিনের হাশরের ময়দানের মতোই সকলে 'নাফসি-নাফসি' করিতেছে। এক বাড়ির খবর আরেক বাড়ির লওয়া ত দূরের কথা, একই বাড়ির এক ঘর হইতে আরেক ঘরের খবর লওয়া যাইতেছে না।

এমনি দুর্দিনে এমন দুর্যোগের সময়ে ফতেপুর শরিফের পীর সাহেব-কেবলার বড় বিবি সাহেবার প্রসব বেদনা। কি বিপদ!

২

ফতেপুরের বর্তমান সাজ্জাদা-নশিন পীর হযরত মওলানা মুর্শেদেনা শেখল-মুশায়েখ শামসুল-আরেফিন সৈয়দুৎ-তালেবিন কুতুবে-দাওরান হাদিয়েয়মান পীর দস্তগীর শাহ সূফী সৈয়দ আবদুল আউয়াল সিদ্দিকী-আল্ কোরায়শী মাদ-যিল্লাহুল-আলী সাহেবের চার বিবি। খোদার ফযলে চার বিবিই বাঁচিয়া আছেন। চার বিয়া করা সুনতে-রসুলুল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও পীর সাহেব শখ করিয়া চার বিয়া করেন নাই। যে আল্লাতালার বিনা হুকুমে গাছের পাতাটি নড়ে না, সেই আল্লারই মুজিতে পীর সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চার বিয়া করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শুধু একটি পুত্র-সন্তানের আশাতেই।

বড় বিবি সাহেবকে ইনি বিয়া করেন ত্রিশ বছর আগে। বিয়ার পর পাঁচ বছরে দুইটি কন্যার জন্ম দিয়াই বড় বিবি অবসর লেন। তার পরে আরও দু-চার বছর অপেক্ষা করিয়া পীর সাহেব অগত্যা মাজেলা বিবিকে ঘরে আনেন। তক্দিরে কি আছে, কেউ জানে না। কিন্তু তক্দিরের সাথে তদ্বিরও হওয়া দরকার। তাই পীর সাহেব পরম ধৈর্যের সাথে আল্লার প্রতি অটুট তাওয়াক্কুল রাখিয়াও দ্বিতীয় কাজ করেন। কারণ ফতেপুর শরিফের বুনিয়াদী পীর-খান্দানকে ত আর নির্বংশ হইতে দেওয়া যায় না। তাছাড়া, এটা ত শুধু খান্দানের প্রশ্ন নয়। লক্ষ-লক্ষ লোকের আখের-আকবতের প্রশ্নও এটা। সারা বাংলা আসাম বিহার ও বর্মায় পীর সাহেবের সত্তুর লক্ষ মুরিদ-মোতেকাদ আছে। এত-সব মোমিন-মুসলমানের ইমান-আমান-আখেরাত ফতেপুরের পীর বংশের সাথে অবিস্ছেদ্যভাবে জড়িত। ফতেপুর নির্বংশ হইলে এই সব ঈমানদার মুসলমানের কি হইবে? আজকাল হঠাৎ-গজানো ভূইফোঁড় যে সব নকল পীরের উৎপাত বাড়িয়াছে, এদেরই কারো পাল্লায় পড়িয়া ফতেপুর শরিফের মুরিদ-মোতেকাদরা যদি ঈমান-আমান খোওয়ায় তবে তার জন্য খোদার দরগায় জবাবদেহি করিতে হইবে ত পীর সাহেবকেই। এই এক কথা।

দুসরা কথাটাও এমনি জরুরী। ফতেপুরের সম্পত্তির আয় নগণ্য নয়। পীরালি করিয়া বর্তমান পীর সাহেব তাঁর নিজের জীবনেই এক শ একরের উপর খামার জমি, দুইখানি তালুকের ষোল আনা ও একটি জমিদারির এক আনা অংশ খরিদ করিয়াছেন। শহরে পাঁচখানা ইমারৎ করিয়াছেন। তার তিনটি বাজারের মধ্যে। দোকান-ঘররূপে ভাড়া হয়। ভাড়া আসে মাসে তিন শ টাকা। বাকি দুইটি রেসিডেন্সিয়াল এলাকায়। সরকারী কর্মচারীরাই ভাড়া নেন। ভাড়া দুইটিতে মাসে এক শ। প্রতি বছর রজবের চাঁদের এগারই শরিফে ফতেপুরে যে উরসে-কূল হয়, তাতে লাখে-লাখে লোক জমায়েত হয়। পীর সাহেবের সত্তুর লক্ষ মুরিদ-মোতেকাদের মধ্যে কম্বে-কম দু-চার লাখ ত আসেই। তাছাড়া পীর সাহেবের মুরিদ নন, শুধু ভক্ত গুণগ্রাহী মাত্র, এমন-সব উযির-নাযির ও বিদেশী সাহেব-সুবা তামেশগিরের আগমন হয় হাজার-হাজার। এঁদেরে অবশ্য হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। শুধু মুরিদ-মোতেকাদের সংখ্যাই দু-তিন লাখ। কিন্তু মুবালিগা-দোষে গোনাহু করিয়া না বসেন, সেই জন্য সাবধানতা হিসাবে পীর সাহেব খবরের কাগজে 'এক লাখের বেশি' শুধু এইটুকু রিপোর্ট ছাপিবার অনুমতি দিয়া থাকেন। কারণ পীর সাহেবের জানা মতেই এবং সম্ভবত অনুমোদনক্রমেই, মুরিদ-মোতেকাদের বিশ্বাস এই যে এক লাখ হাজী না হইলে আরাফাতের ময়দানে যেমন হজ হয় না, এক লাখ মুরিদ-মোতেকাদ জমায়েত না হইলে তেমনি ফতেপুর শরিফের উরস হয় না। হজের সময় যেমন, এই উরসের সময়ও তেমনি, যদি ঘটনাক্রমে কোন বছর এক লাখের কম লোক জমায়েত হয়, তবে আল্লার হুকুমে ফেরেশত আসিয়া সেই সংখ্যা পূরণ করিয়া থাকেন।

উরসে-কূলে সমবেত এই মুরিদ-মোতেকাদরা অবশ্যই সোওয়া পাঁচআনা হইতে সোওয়া এগার টাকা নয়রানা দিয়া থাকেন। এই নয়রানা না দেওয়া পর্যন্ত কেউ উরসে शामिल হওয়ার সওয়াবে অধিকারী হন না। শহর-পর এক নাগাড়ে তিন বছর ফতেপুর শরিফের উরস শরিফে যোগদান করিলে একটি হজের সওয়াব পাওয়া যায়। এক নাগাড়ে এগারটি উরসে-কূলে যোগ দিলে হজে-আকবরীর সওয়াব হাসিল হয়। তিনবারে সোওয়া পাঁচআনা করিয়া মোট এক-পয়সা -কম এক টাকা পীর সাহেবকে নয়র দিয়া হজের সওয়াব পাওয়ার এমন সুবিধা ছাড়িয়া দিবে হিসাবী মুসলমানদের মধ্যে এমন বেহুদ বোকা কেউ নাই। কাজেই তাঁরা সকলে তিনবার ত আসেনই, অনেকে এগার বার উরসে আসিয়া পীর সাহেবকে মোট তিন টাকা পৌনে দশ আনা নয়র দিয়া হজে-আকবরীর সওয়াবও কিনিয়া রাখেন। এই হিসাবে ফতেপুরের উরসের আমদানি অন্যান্য সকল পীরের উরসের আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। এর একটা বিশেষ কারণও আছে। নয়রানার পরিমাণ ও উরসের মরতবা পীর সাহেব অনেক দেখিয়া-শুনিয়া ও ভাবিয়া-চিন্তিয়াই ধার্য করিয়াছেন। অনেক পীর অতিলোভে নয়রানার সর্ব-নিম্ন হার এক টাকা বাঁধিয়াছেন। আর উরসের মরতবা সম্বন্ধে তাঁদের দাবি আরও বেশি। এক দল দাবি করেন এক উরসেই এক হজের সওয়াব হয়। আর এক দল বলেন তাঁদের উরসে একবার যোগদান করিলে পাঁচটা বা দশটা হজের সওয়াব পাওয়া যায়। আমাদের পীর সাহেব-কেবলার মতে ও-সব পীরই অতিলোভী নির্বোধ। কারণ হজ করার চেয়ে পীরের উরসে शामिल হওয়ার সওয়াব বেশি, একথা বেশি লোককে বেশিদিন বুঝান যাইবে না। ঠিক তেমনি নয়রানার পরিমাণ একটাকা বাঁধিলে তা আমাদের গরিব

দেশের গরিব জনসাধারণের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়। সেজন্য নয়রানার পরিমাণ সোওয়া পাঁচ আনা ধার্য করিয়া পীর সাহেব উহা গরিব জনসাধারণের আর্থিক সংগতির নাগালের মধ্যে এবং তিন উরসে এক হজ সাব্যস্ত করিয়া উরসের মরতবাকে তিনি আমাদের ঈমানের নাগালের মধ্যে রাখিয়াছেন। এইদিক দিয়া পীর সাহেবের নির্দেশ বিজ্ঞান-ভিত্তিক হওয়ার দরুনই বাংলা-আসাম-বর্মার সমস্ত পীরের মধ্যে ফতেপুরের পীরসাহেবের উরসে বেশি লোক জমায়েত হইয়া থাকে। নয়র-দাতার সংখ্যার আধিক্য নয়রানার স্বল্পতা পোষাইয়া আরও বেশি হয়। কম মুনাফার দোকানদার পরিণামে অধিক লাভ করিয়া থাকে, অর্থনীতির এই সাধারণ নিয়ম হইতে আমাদের পীরসাহেব হক-হালালী ফায়দা উঠাইতেছেন। 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট' ও 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই দুইটা মহাবাক্যই সত্য প্রমাণ করিয়াছেন আমাদের পীর সাহেব।

৩

এই উরস হইতে পীর সাহেবের বছরে মোটা আয় হইলেও সেটা ঠিক কত তা পীর সাহেব নিজে এবং পাঁচজন খলিফা ছাড়া আর কেউ জানেন না। পীরালি আয়ের উপর ইনকাম ট্যাক্স ধরিবার কোন আইন না থাকায় সেদিক দিয়াও কোনও তথ্য জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া তেমন আইন যদি থাকিতও তবু তাতে সরকারের বিশেষ ক্ষতি হইত না। পীর সাহেবের বড় জামাই উকিল। তাঁর মধ্যস্থতায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসিটশনাবের মুসাবিদা-মতো পীর সাহেব কৃষি-আয়, তালুক জমিদারির এবং ভাড়াটিয়া বাড়ির আয়ের অর্থাৎ লোকসানের যে রিটার্ন প্রতি-বছর ইনকাম ট্যাক্স অফিসে দাখিল করেন, তাতে সরকার নামে বস্তুটির যদি হৃদয় বলিয়া কোনও জিনিস থাকিত, তবে পীর সাহেবকে সরকার বরঞ্চ কিছু ক্ষতিপূরণ দিতেন। জমজমাট বাড়ি-ঘর ও তালুক-মুল্লুকেরই আয়ের যখন এই অবস্থা, তখন উরসের হিসাব লোকের দেওয়া-না-দেওয়া বেগায়রে হিসাবের নয়রানার কি হিসাব ইনকাম ট্যাক্স অফিসাররা করিতেন, বলুন?

সুতরাং এই আয় সম্বন্ধে পীর সাহেবের দোস্ত-দুশমনরা সম্পূর্ণ বিপরীত দুই রকম উক্তি করিতেন। সে স্বাধীনতা তাঁদের ছিলও। পীর সাহেবের মুরিদরা বলিতেন: লাখ-দুই লাখের কম হইবে না। প্রতিদ্বন্দ্বী পীরের মুরিদরা বলিতেন: আরে রাখ রাখ, পাঁচ-ছয় হাজারের এক পয়সাও বেশি হইবে না। সব সত্যের মতোই এই ব্যাপারেও আসল সত্য মাঝখানে। পীর সাহেব নিজে অনেক হিসাব-পত্র ও যোগ-বিয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন খরচ-খরচাবাদে হরে-দরে-গড়ে-পড়তায় শেষ পর্যন্ত পীর সাহেবের হাতে পৌছায় হাজার চল্লিশেক টাকা। ঠিকমতো আসিলে পঞ্চাশ হাজারের উপরই পীর সাহেবের হাতে পৌছিত। বিনা-রশিদে বিনা জমাখরচে আদায়-তহসিলের ব্যাপার ত! কাঁচা টাকা-পয়সার হাতফেরি ত! হলদি বাটিলেই যেমন হাতে রং লাগে এই ধরনের টাকা-পয়সার হাত-ফেরিতেও তেমনি সকলের হাতেই কিছু লাগিয়া যায়। পীর সাহেব সর্বদাই ধর্ম-কর্ম ও আল্লার চিন্তায় মশগুল থাকিলেও টাকা-পয়সার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটা তাঁর জানা আছে। তিনি সব জানিয়া-শুনিয়াই খলিফাদের হাতে-পাওয়া এই চল্লিশ হাজার টাকাই মানিয়া নেন। তারপর এই চল্লিশ হাজারেও খলিফাদের অংশ আছে। সেটা শরিয়ত-মতো উশর বা এক-দশমাংশ হওয়াই উচিত। কিন্তু খলিফাদের

সর্বসম্মত দাবিতে বেশ কিছুকাল হইতে চৌথ বা এক-চতুর্থাংশ, ইংরাজীতে যাকৈ বলা হয় টুয়েন্টি-ফাইভ পার্সেন্ট, দিতে হয়। খলিফাদের এ দাবি যে যুক্তি-সংগত, পীর সাহেবকে তা মানিয়া নিতে হইয়াছে। প্রচার-ক্যানভাস করিয়া লোকজন তাঁরাই আনিয়া থাকেন; সমবেত লোকজনের সুখ-সুবিধা তাঁরাই দেখিয়া থাকেন; আদায়-তহসিলের ফন্দি-ফিকির তাঁরাই করিয়া থাকেন; রোজকার আদায়-তহসিলের হিসাব-নিকাশ মিলাইতে অধিক রাত্র পর্যন্ত অঘুমে তাঁরাই কাটান; সর্বোপরি অসংখ্য ক্যানভাসার সাব-এজেন্ট ও উপ-খলিফার হুক পাওনাকড়ি খলিফাদের ঐ চৌথ হইতেই মিটাইতে হয়। কাজেই চল্লিশ হাজার টাকা হাতে পাইয়া সেই পাওয়া টাকা হইতে নগদ কড়কড়া দশ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিতে হয়। খুব বড় টাকাওয়ালার পক্ষেও এটা কঠিন কাজ, পীর সাহেবদের মতো ধার্মিক লোকদের পক্ষে ত বটেই। অন্য পীর সাহেব হইলে হার্টফেল করিয়াই মারা যাইতেন। কিন্তু ফতেপুর শরিফের পীর সাহেব-কেবলারা বুনিয়াদী পীর। তার উপর বর্তমান সাজ্জাদানশিন কেবলা দরায়দিল অভিজ্ঞ ও হুঁশিয়ার লোক বলিয়াই তিনি এই ত্যাগ বরদাশত করিয়া আসিতেছেন।

নগদ আদায় ছাড়া গরু-ছাগল হাঁস-মুরগী আটা-চাউল দুধ-চা-চিনি ও লবণ-মরিচ ইত্যাদি যা আদায় হয়, লক্ষ লক্ষ লোক খাওয়াইয়াও তার অনেক উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত অংশ হিস্যা-মতো ভাগ-বন্টন ও বিক্রিসিক্রি হইয়া থাকে। তাতে নগদে-জিনিসে পীর সাহেবের ভাগে যা আসে, তার পরিমাণও কম নয়। ফতেপুরের ছাগল-মুরগীর বরকতেই পীর সাহেবের বাড়িতে বার মাস খানাপিনার খুশখুশ থাকে। তাছাড়া জবেহ-করা গরু-ছাগলের চামড়া বিক্রির সব টাকাই পীর বাড়ির মসজিদ ও মাদ্রাসার তহবিলে সদকায়ে-জারিয়া রূপে জমা হয় এবং খোদ পীর সাহেব-কেবলার হাত দিয়াই তা খরচ হয়।

৪

পীর সাহেব খুব হিসাবী লোক। তিনি এইসব আয়ের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। বাপের আমলের একগুন্সজের মসজিদটি তিন গুন্সজের করিয়াছেন। বারান্দা ও সেহান বাড়াইয়া চারগুণ কুশাদা করিয়াছেন। আগে সেহানের এক কোণে দাঁড়াইয়া মুয়ায্মিন আযান দিতেন। এখন আযান-দিবার জন্য সেহানের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি উচ্চ মিনার করা হইয়াছে। মিনারে উঠিবার জন্য প্যাচের সিঁড়ি করা হইয়াছে। বাপের আমলের পুকুরটি বাড়াইয়া-খুদাইয়া বিশাল দীঘি করিয়াছেন। বাড়ির দিকে উত্তর পাড়ে ও মসজিদের দিকে পূর্ব পাড়ে তার দুইটা ঘাটলা পাকা করিয়াছেন। মসজিদের পূর্ব দিকে ছোট্ট একটি মাঠ। এই মাঠের দক্ষিণে পূবে-পশ্চিমে ষাট হাত লম্বা ও আঠার হাত পাশে বারান্দাওয়ালা পাকাভিটির ও মলিবাঁশের বেড়ার একটি টিনের ঘর। এটিই ফতেহপুরের বিখ্যাত দারুল উলুম মাদ্রাসা। মাদ্রাসাটি পুরান নেসাভের হইলেও স্বয়ং পীরসাহেব-কেবলার হুকুমে কিছুকাল হইতে এই মাদ্রাসায় নিচের দিককার কয়েক ক্লাসে বাংলা ইংরেজি ও অঙ্ক পড়ান হয়। তাতে শিক্ষা বিভাগের কারিকুলাম মত প্রাইমারি শিক্ষার কাজটা এই মাদ্রাসাতেই হইয়া যায়। এই ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা বিভাগের অফিসাররা এবং কয়েকজন মন্ত্রী পীর সাহেবের দরবারে হাজির হইয়া তাঁর

বুদ্ধিমত্তার তারিফ করিয়া গিয়াছেন। মদ্রাসার লাগ দক্ষিণে বড় মাঠ। এটি যুগপৎভাবে ঈদগাহ ও ছেলেদের খেলার ফিল্ড।

পীর সাহেব বাড়ি-ঘরেরও অনেক উন্নতি বিধান করিয়াছেন। বাপের আমলের টিন-ছনের ঘর-দরজার জায়গায় তিনি বিশাল ইমারৎ তৈয়ার করিয়াছেন। মলি বাঁশের পর্দা-বেড়ার জায়গায় পাঁচ একর জায়গা ঘেরিয়া জেলখানার প্রাচীরের মতো উচা সারদেওয়াল খাড়া করিয়াছেন। এই সারদেওয়ালের ভিতরে অন্দর বাড়ির পূব সারিতে পঞ্চাশ হাত লম্বা ষোল হাত পাশের দালান। সে দালানের ঠিক মাঝখান দিয়া সাত হাত পাশের পেটকাটা সিংহদরজা। এই সিংহদরজা সোজা সারদেওয়ালের বিশাল গেট। এর দুই পাশে ছোট গুম্বজওয়ালা দুইটি মিনার। গেটের কপালিতে আরবী হরফে আল্লাহ্ আকবর লেখা। দালানের পেট-কাটা সিংহদরজার দুই পাশে দশ হাত ষোল হাতের দুইটি করিয়া চারটি কামরা। ভিতরের দিকে সবগুলি কামরার সামনে পাঁচ হাত পাশের কুশাদা বারান্দা। উত্তর ভিটিতে একটি স্বতন্ত্র দালান ও দক্ষিণ ভিটিতে পাকা ভিটির একটি বড় টিনের ঘর। পশ্চিমের সারিতে ছোট বড় চারটি টিনের ঘর। উত্তরের ভিটির দালানে থাকেন বড় বিবি। পূব সারির চার কামরার তিনটিতে তিন বিবি। একটিতে থাকেন স্বয়ং পীর সাহেব। পশ্চিম সারির ঘরগুলির একটি পাকঘর, একটি গুদাম ঘর, একটি লাকড়ির ঘর ও একটিতে চাকরানীরা থাকে। পশ্চিম সারির পিছন দিকেই আম কাঁঠল সুপারি নারিকেল ও অন্যান্য ফলের বিশাল বাগিচা। এই বাগিচার মাঝখানে একটি ছোট গভীর পুকুর। এটিরও ঘাটলা পাকা। বিবি সাহেবাদের ও চাকরানীদের এটাই গোসলের জায়গা। পাক ঘরের ধোওয়া-পাকলার পানিও এই পুকুর হইতেই নেওয়া হয়।

পীর বাড়ির সারদেওয়ালের বাহিরে দুইটি উঠান: একটি উত্তরে, অপরটি পূবে। উত্তরের উঠানটি চাকর মহল। এর তিন দিকে তিনটি বড় টিনের ঘর। একটি ধানের গোলা, একটি পাটের গুদাম। অপরটিতে চাকরদের ঘর থাকে।

পূবের উঠানটিই পীর বাড়ির মুখপাত। এই উঠানের উত্তর দিকে পীর সাহেব-কেবলার বৈঠকখানা। এটি পূবে-পশ্চিমে লম্বা একটি ছনের আট-চালা। ছনের হইলেও সারা বাড়িতে এটি একটি দেখিবার মতো ঘর। আধ হাতের বেশি পুরু ছাউনি। ছাপরবন্দী নকশী করা শীতল পাটির বেড়া ও সিলিং। ভিটি পাকা। সারা ঘরটিতে সতরঞ্জির উপর একটানা সাদা ফরাস পাতা। ফরাসের ঠিক মাঝামাঝি উত্তর দিক ঘেঁষিয়া একটি মখমলের ছোট গালিচা। গালিচার তিনদিকে তিনটা একই রংগের তাকিয়া। পীর সাহেব-কেবলার এটাই দরবারী আসন। এই আসনের উপরে একটি লাল সালুর ঝালরওয়ালা টানা পাখা ঝুলিতেছে। বারান্দায় বসিয়া একজন চাকরের এটি টানিবার কথা। কিন্তু পীর সাহেবকে হাওয়া করার মতো সওয়াবের কাজ চাকরকে করিতে দেয় নাই মুরিদরা।

এই উঠানের পূব সারিতে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি বিশাল টিনের ঘর। এরও ভিটি পাকা। এই ঘরটি পাঁচটি কামরায় ভাগ করা। প্রতি কামরায় একটি চৌকি। কোনও কামরায় চৌকি ছাড়া দু-একখানা টেবিল চেয়ারও আছে। এইটি পীর বাড়ির মেহমানখানা। পীর সাহেবের খলিফারা, মাতব্বর মুরিদরা এবং অন্যান্য সম্মানিত মেহমানরা এই ঘরে থাকেন।

এছাড়া পীর সাহেবের বাড়িতে মেহমানদের জন্য ছয়টা পাকা পায়খানা ও পাঁচটি টিউবঅয়েল। উৎসের সময় এতেও কুলায় না। অস্থায়ী টাট্টি ও পানির ব্যবস্থা করিতে হয়। খলিফা ও মুরিদ মোতেকাদদের চেষ্টায় করাও হয় সকলের সন্তোষজনকরূপে। এক কথায়, পীর সাহেবের বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধানের ব্যবস্থার ক্রটি ধরিবার উপায় নাই।

পীর সাহেব-কেবলা নিজে আমির লোক। তিনি সংসারত্যাগী ফকির-দরবেশ নন। আয়েশে-আরামে ভোগ-বিলাসে তিনি যথেষ্ট টাকা খরচ করেন। তাঁকে কিছুতেই কৃপণ বলা চলে না। কিন্তু তিনি একটি পয়সাও নাজায়েজ কাজে ইসরাফিল করেন না এবং কাউকেও করিতে দেন না। আল্লার-দেওয়া এই সম্পদ তিনি হালাল কাজেই ব্যয় করেন।

খোদা-না-খাস্তা ফতেপুর খান্দান যদি নির্বংশ হয়, তবে এই বিরাট সম্পত্তি, হালাল-পথে-রুজি-করা এই টাকা-পয়সা কোন্ বেদ্বীন-বেশরা ওয়ারিসের হাতে পড়িবে, কে জানে? পীর সাহেবের যে ধন-দওলত আল্লার কাজে ব্যয় হইতেছে, এই দওলত তখন শয়তানের কাজে ইসরাফিল হইবে। সেজন্য আল্লার কাছে পীর সাহেবেরই জবাবদেহি করিতে হইবে।

৫

তাই পীর সাহেব ফতেপুর শরিফের খান্দান রক্ষার সাধু উদ্দেশ্যেই ক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শাদি করেন। এই চারি বিবি সকলে মিলিয়া এই ত্রিশ বছরে নব্বইটি মেয়ে পীর সাহেবকে উপহার দিয়াছেন। তার মধ্যে পাঁচটি জন্মের সময়ে বা দু'চার দিনের মধ্যে মারা গিয়াছে। চারটি বাঁচিয়া থাকিয়া বিবাহ-যোগ্য হইয়াছে। বিধিও হইয়াছে। তাদের পুত্র-কন্যা-সন্তানও হইয়াছে। কিন্তু হায় তক্দির, পীর সাহেবের এত নাতি-নাতনী হইয়াছে, কিন্তু একটি পুত্র-সন্তানও হয় নাই।

পীর সাহেব আর কি করেন? শরিয়ত-মোতাম্মক যা করা যায় সাধ্যমতো তা করিয়াছেন। শরিয়তে চার বিবির বেশি জায়েজ থাকিলে পীর সাহেব তাও করিতেন। পীর সাহেবের অনেক সময় মনে হইয়াছে, চার বিবিতে পুত্র-সন্তান না হইলে চারের বেশি শাদি করা জায়েয থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা যখন শরিয়তে নাই, তখন সে বিধান লংঘন করাও যায় না; ঐ বিধানের নিন্দাও প্রকাশ্যভাবে করা চলে না।

এ অবস্থায় শরিয়ত লংঘন না করিয়া দুইটি কাজ করা যায়। তার একটি পীর সাহেবের হাতে; দ্বিতীয়টি আল্লার হাতে। বর্তমান বিবিদের সবাইকে তালাক দিবার অধিকার শরিয়ত তাঁকে দিয়াছে। সবাইকে তালাক না দিয়া একজনকে তালাক দিলেই কাজ চলিতে পারে। সেটা অবশ্য পীর সাহেবের হাতে। কালই সেটা তিনি করিতে পারেন। কিন্তু পীর সাহেব মনের দিক দিয়া ভদ্র ও শালীন। স্ত্রী তালাক দেওয়া কাজটাই তাঁর না-পছন্দ। তাছাড়া ফতেপুর শরিফের পীর বংশে কেউ বিবি তালাক দেন নাই। পীর সাহেব জানেন, যদি তিনি না হইয়া একটা চাষা-ভূষা হইত, এমন কি ফতেপুর না হইয়া কোনও ভূইফোড়পীর হইতেন, তবে কবে চার বিবির একটা তালাক দিয়া নষ্ট

শাদি করিয়া চার ঠিক রাখিতেন। কিন্তু তিনি নিজে তা পারেন না। ফতেপুর খান্দানের বদনাম হইবে। দুশমনরা প্রচারের হাতিয়ার পাইবে। মুরিদ মোতেকাদদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিবে। কাজেই এদিকে যাওয়ায় মুশকিল আছে। অন্য উপায়টি আল্লার হাতে। আল্লার মর্জি হইলে চার বিবির যে-কোন একজনকে তিনি উঠাইয়া। পীর সাহেবের শরিফ মন এর বেশি চিন্তা করিতে পারে না। হায়াত-মওত আল্লার হাতে। কারু মৃত্যু কামনা করা গোনাহ। নিজের বিবি সম্বন্ধে সেটা আরও শক্ত গোনাহ। কাজেই অমন চিন্তার জন্য পীর সাহেব লজ্জা পান। তওবা-আস্তাগফার পড়েন। কিন্তু মন বড় বেয়াড়া জিনিস। পীর সাহেবের মনের গহীনে ঐ ধরনের একটা আশা সময় পাইলেই উঁকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে। ঐ কুচিন্তাকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া পীর সাহেব ধৈর্য ধরিয়া থাকেন।

কিন্তু মানুষের ধৈর্যের সীমা আছে। পীর সাহেবও মানুষ। তাঁর ধৈর্যও কাজেই অসীম নয়। পীর সাহেবের খলিফার প্রায় সবাই অন্তরদর্শী বুদ্ধিমান লোক। পীর সাহেবের অন্তরের কথাও তাঁদের চোখ এড়ায় না। একদিন কথায়-কথায় তাঁরা বলিয়াই ফেলেন: হায়াত-মওতের চেয়ে তালকের ব্যাপারটা শরিয়ত-মোতাবেক জায়েজ, সুতরাং গ্রহণযোগ্য। তাঁরা একথাও বলিতে ভুলেন না যে পীর সাহেব-কেবলা স্বীয় অসাধারণ উদারতা ও মহত্বের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া এ কাজকে অপ্রিয় মনে করিতে পারেন। কিন্তু যতই অপ্রিয় হোক, সন্তুর লাখ মুরিদের আকবর আখেরাতের দিকে চাহিয়া ফতেপুর খান্দানের চেরাগ জ্বলাইয়া রাখার ব্যবস্থা একটা করিতেই হইবে। অতএব পীর সাহেবের আঁড়ালেই তাঁরা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটা বেআদবি করিয়া ফেলিয়াছেন। তা এই: পীর সাহেব-কেবলার পছন্দমতো যে-কোনও বিবি-সাহেবাকে টাকা-পয়সা ও জমি-জিরাত দিয়া বিদায় করিবে অর্থাৎ তালাক দিবে। তাতে ঐ বিবি সাহেবারও তকলিফ হইবে না। পীর বংশেরও চেরাগ জ্বলাইবার ব্যবস্থা হইবে।

পীর সাহেব কেবলার গোপন মনে খলিফাদের এই বেআদবি খুবই পছন্দ হইয়াছে। কিন্তু খলিফাদেরে তা জানিতে দেন নাই। বলা মাত্র রাজি হইলে অশোভন আশ্রয় দেখান হইবে। তাছাড়া কোন্ বিবিকে বিদায় দিবেন সেটা ঠিক করাও সহজ নয়। কাউকে তালাক দিলে উপরের দিক হইতেই গুরু করিতে হয়। কিন্তু ঐ বিবিদের মেয়ে-জামাইরা সকলেই এক-এক আতরাফের প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় লোক। বড় বিবির জামাই ত ডাক-সাইটা উকিল। অন্য দুই বিবির মেয়ের জামাইরা বড় বড় আলেম ও পীর এবং ফতেপুরের খলিফা। এঁদের কাউকে অসন্তুষ্ট করা চলে না। ব্যাপারটা সম্বন্ধে আরও চিন্তা করা দরকার। কাজেই পীর সাহেব কেবলা খলিফাদের কথায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া সেদিনকার মতো তাদের বিদায় করেন।

৬

যায় আরও বছরখানেক। কিন্তু খলিফারা বসিয়া থাকেন নাই। খলিফাদের সাথে মাতব্বর মুরিদরা যোগ দেন। এঁদের সমবেত পুনঃপুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ কাকুতি-মিনতি শেষ পর্যন্ত পীর সাহেব কেবলার মন নরম করিতে সক্ষম হয়। বিশেষত: সন্তুর

লাখ মুরিদের এবং তাদের ভবিষ্যৎ আল-আওলাদের ঈমান-আমানের আবেদনটা হযরত কেবলার দিলে রহম পয়দা করে। তিনি শেষ পর্যন্ত এক বিবিকে তালাক দিয়া নয়া শাদি করিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁর রেযামন্দি জানান। কিন্তু কোন্ বিবি সাহেবার গলায় এই কোরবানির ছুরি চালাইবেন, সে কথা প্রকাশ করেন না। বরঞ্চ কথাটা তিন কান না হয়, সে বিষয়ে প্রায় এক কুড়ি খলিফা ও ধনী মুরিদকে উপদেশ ও কড়া নির্দেশ দেন।

কিন্তু বড় বিবিকেই তালাক দেওয়া পীর সাহেব আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলের বড় বলিয়া তাঁকেই তালাক দেওয়ার মধ্যে যেমন একটা যুক্তি আছে, তেমনি একাজটাই সবচেয়ে কম বিপজ্জনক। বড় জামাই উকিল। পীরগিরির সাথে তাঁর সংশ্রব কম। তিনি ইচ্ছা করিলেও ফতেপুরের পীরগিরির তেমন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। অন্যান্য জামাইদের সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। তবু একটা বছর তিনি এই গোপন সিদ্ধান্তটি নিয়া মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়াছেন। করিবেন না? ত্রিশ-ত্রিশটা বছর এই বিবিকে নিয়া তিনি ঘর করিয়াছেন। এটিই তাঁর প্রথম বিয়া। ভরা যৌবনে তিনি এই বিয়া করিয়াছিলেন। যৌবনে বিবি সাহেবও ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। উভয়ের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা জমিয়াও ছিল প্রচুর। সে সব কথা মনে পড়ায় পীর সাহেবের মন মাঝে-মাঝেই খুব নরম হইয়া গিয়াছে। খুব সাবধানে সন্তর্পণে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া যথেষ্ট টাকা পয়সা ও জমি-জিরাত দিয়া তাঁকে রাজি করিয়াই একাজ করিবেন পীর সাহেব তা ঠিক করিয়াছেন। সেজন্য যথেষ্ট সময়ের দরকার। এক বছর ধরিয়া তিনি এই সময়ই নিলেন। মনে-মনে এই স্কীম করিয়া পীর সাহেব হঠাৎ বড় বিবির প্রতি বিশেষ মনোযোগি হইলেন। তাঁর প্রতি পীর সাহেবের দরদ ও মমতা বাড়িয়া গেল। অনেক দিন পরে তিনি নিয়মিতভাবে বড় বিবির ঘর করিতে লাগিলেন। তাঁকে অতিরিক্ত মাত্রায় আদর-যত্ন করিতে এবং প্রয়োজন-প্রয়োজনে এটা-ওটা দিতে লাগিলেন। মতলব এই যে কোনও দুর্বল মুহূর্তে বড় বিবির হাত ধরিয়া তাঁর কাছে কথাটা বলিবেন এবং তাঁর এজাযৎ লইয়া ফেলিবেন।

হাজার হোক, ভদ্রলোক ত! বলি-বলি করিয়াও কথাটা বলায় দেরি হইয়া যায়। দীর্ঘ এক বছরেও কথাটা বলা হয় না। ইতিমধ্যে বড় বিবি একদিন সলজ্জভাবে জানান: আল্লার কুদরত! তিনি হামেলা হইয়াছেন বলিয়া তাঁর সন্দেহ হইতেছে। বড় বিবির এটা ঋতু বন্ধের স্বাভাবিক বয়স। এ কথা পীর সাহেব তাঁকে স্বরণ করাইয়া দিলে বড় বিবি শরমে মরিয়া গিয়াও জানান যে আসল ব্যাপার তা নয়, হামেলেরই লক্ষণ। পীর সাহেব মনে-মনে আঁৎকিয়া উঠেন। ঘটনাচক্রে ঐ দিনই পীর সাহেব বড় বিবির কাছে তালাকের কথাটা পাড়িবেন, ঠিক করিয়াছিলেন। দুই এক মিনিট পরে কথাটা তিনি পাড়িয়াই ফেলিতেন। তার আগেই বড় বিবি ঐ সুখবর দেওয়ায় এর মধ্যে তিনি আল্লার কুদরতী হাতের খেলা দেখিতে পান। আল্লাকে ধন্যবাদ! আরও দু'এক মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। কৃত্রিম উল্লাস দেখাইয়া সেদিনকার মতো বিদায় হন। নিজের ঘরে আসিয়া জামার বোতাম খুলিয়া ফুঁ দিয়া বুকের ঘাম শুকাইতে লাগিলেন। হে খোদা! পীর সাহেবের উপর কত মেহেরবান তুমি! বড় বিবি ঐ সংবাদটা দিতে যদি আরেকটু দেরি করিতেন তবে কি বিশ্রী কেলেংকারিই না হইত! পীর সাহেব কথাটা দুহরাইয়া তথ্যবিস্তার করেন। দুবারা আল্লার দরগায় গুরিয়া জানান। তারপর, যদি সত্যি বড় বিবি এই বুড়া বয়সে হামেলা হইয়া থাকেন, তবে তাঁর পেটে পুত্র-সন্তানও হইতে পারে!

আল্লার কুদরতে কি না হইতে পারে! নিজের শক্তিতে তিনি সচেতন ছিলেন সত্য, কিন্তু বড় বিবির যে ঐ বয়সেও হয়েয বন্ধ হইয়া যায় নাই, সে খবরই তিনি রাখিতেন না। আল্লার কুদরতে এটা যখন সম্ভব হইল, তখন ওটাও ত হইতে পারে! হে মেহেরবান খোদা, তাই তুমি কর। হযরত পয়গম্বর সাহেব তালাক কাজটা বড়ই না-পছন্দ করিতেন, সহিবোখারী-মুসলিমে একাধিকবার তা রেওয়ায়েৎ হইয়াছে। হযরত রসুলের অপ্রিয় কাজ পীর সাহেবকে দিয়া না করাইয়াই ফতেপুর বংশের চেরাগ জ্বলাইয়া রাখ, হে খোদা!

৭

খোদার দরগায় পীর সাহেবের মোনাজাত কবুল হয়। যত দিন যায় বড় বিবির হামেলের তত সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। তিন মাসে বমি-বমি, পাঁচ মাসে পায় শোথ, সাত মাসে শাড়ির উপর দিয়া পেট ভাসিয়া উঠে।

পঁচিশ বছর আগ্জার পর পঞ্চাশ বছর বয়সের কোন মেয়ে লোককে হামেলা হইতে এ অঞ্চলের কেউ দেখেও নাই, শুনেও নাই। কাজেই এটাকেও পীর সাহেব-কেবলার একটা কেরামত বলিয়া মুরিদ-মোতেকাদরা প্রচার করে। জনসাধারণ তা বিশ্বাসও করে। পীর সাহেবের বিশ্বাস এটা তাঁর প্রতি আল্লার মেহেরবানি। ফলে পুত্র-সন্তান হওয়ার আশা তাঁর দিন-দিন অধিকতর মজবুত হয়। তিনি প্রতি একটু নমাজের পরে ছাড়াও কালামুল্লাহ তেলাও করিয়া আল্লার দরগায় আগাম তুকরিয়া জানাইতে থাকেন। বড় বিবিকে তিনি এমন খাতির-যত্ন করিতে লাগেন যা বড় বিবি বা অন্য কোনও বিবি কোনও কালে পান নাই। বড় বিবির খাওয়া-পাওয়া ও অজু-গোসলের জন্য একাধিক চাকরানী মোতায়েন হয়। তাবিয় পানি-পড়া ও হাকিমী ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা হয়। হাকিম মুরিদ ছাড়াও পীর সাহেবের শত শত ডাক্তার-মুরিদও আছেন। এঁদের প্রায় সকলেই বিনা-ফিসে উপদেশ ও বিনা-মূল্যে ঔষধ দিতে রাজি ও ব্যাকুল। কিন্তু ডাক্তারী ঔষধ-পত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে পীর সাহেবের বিশেষত বড় বিবির ঘোরতর সন্দেহ থাকায় ডাক্তারদের কারও অফার গৃহীত হয় না। তবে জনৈক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার-মুরিদের-দেওয়া নিরাপদ সহজ প্রসবের জন্য এক শিশি ‘পালসেটিলা’ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধে শরাব মিশান হয়, অন্য ডাক্তারের মুখে এই খবর পাইয়া চাকরানীকে দিয়া সে ঔষধ দূরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বড় বিবির জন্য, বিশেষ করিয়া তাঁর পেটের ছেলেটির জন্য; পীর সাহেব কেবলা সব-কিছু করিতে রাজি আছেন। কিন্তু তাই বলিয়া বিবি সাহেবকে, তার মানে পেটের ছেলেটিকে, তিনি শরাব খাওয়াইতে পারেন না। বড় বিবির বড় মেয়ে তাঁর উকিল-স্বামীসহ মাত্র কিছুদিন আগে মাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় তাঁরা শহর হইতে ডাক্তার নিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সে ডাক্তার ফেরত গিয়াছেন। ফতেপুর শরিফের পীর বংশের মেয়েদের গায় কোনও বেগানা পুরুষ হাত দিবে এ ধরনের চিন্তাও যারা মনে স্থান দিতে পারে, তাদেরে আল্লা হেদায়েত করুন। তারা পীর সাহেবের মেয়ে-জামাই হইলেই কি? শেষ পর্যন্ত তাঁরা বড় বিবির পেশাবটা পরীক্ষার জন্য নিতে চাহেন। কথাটা শুনিয়া পীর সাহেব-কেবলা ‘আস্তাগ্ফেরুল্লাহ’ বলিয়া এমন মুখ-ভার করেন যে মেয়ে জামাই এক

নয়র বিবি সাহেবকে দেখিয়াই ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে ফেরতা গাড়িতে চড়িয়া শহরে ফিরিয়া যান। আর এ বাড়িমুখী হন নাই।

তবু হাজার হোক মেয়ের পরান ত! বুড়া বয়সে হামেলা মার কি বিপদ, মেয়ে সে কথা ভুলিতে পারে নাই। বুদ্ধি করিয়া শহর হইতে একটি অভিজ্ঞ দাই পাঠাইয়া দিয়াছে। সেই কিছুদিন ধরিয়া বড় বিবিকে দেখা-শুনা করিতেছে। রাত্রে সে বড় বিবির কামরায়ই শোয়। দাইটিকে বড় বিবির খুবই পছন্দ হইয়াছে। ভালয়-ভালয় শেষ পর্যন্ত সব পার হইলে তাকে মোটা হাতে পুরস্কার দিতে হইবে, এ কথায় তিনি পীর সাহেবকে রাজি করিয়াছেন।

৮

এমনি অবস্থায় আজ ভাদ্র মাসের এক শুক্রবার দিবাগত রাত্রে অবিরাম ঝড়বৃষ্টি ও বাজ পড়ার মধ্যে বড় বিবির প্রসব বেদনা উঠিয়াছে। তিনি বেদনার চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘন-ঘন চিৎকার দিয়া উঠিতেছেন। ঘরের দাই ছাড়া তাঁর চিৎকার আর কেউ শুনিতেন না। কারণ বাইরে ঝড়-তুফান দাপাদাপি করিয়া প্রকৃতি ওলট-পালট ও ঘর-বাড়ি গাছ-বৃক্ষ তছনছ করিতেছে। অন্ধকারের বুক চিরিয়া মুহূর্তে বিজলি চমকাইতেছে। আস্মান চৌচির করিয়া মাটি ফাটাইয়া ঠাঠা পড়িতেছে।

দাই বড় বিবির পাশে বসিয়া তাঁর পেট টিপিয়া সাধ্যমতো দুইগিরির হেকমত দেখাইতেছে। বিবি সাহেবের আত্ননাদে অভিজ্ঞ দাইর হাজার দেখা পুরান চোখেও পানি আসে। আহা! বুড়া মানুষ, কষ্ট ত কিছু হইবেই। সে উপড় হইয়া বিবি সাহেবের মুখের কাছে মুখ নিয়া দরদী কণ্ঠে বলে: বেদনাটা কি খুব বেশি বাড়ছে বিবি সাব? খুব কষ্ট হৈতেছে, না? একটু কোঁৎ দেন বিবি সাব। হৈয়া গেল প্রায়।

ধনুর মতো পিঠ বেঁকাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া বিবি সাহেব কি বলেন, দেওয়ার গুর-গুরানিতে দাই-এর কানেও তা প্রবেশ করে না। কিন্তু দাই অভিজ্ঞ মানুষ। সে সব বুঝে। সে পালং হইতে নামিয়া দরজার কাছে যায়। কপাটের খিল খুলিয়া দরজা একটু ফাঁক করে। গলার জোরে চিৎকার করিয়া বলে: ডেলিভারি প্রায় হয়-হয়, আপনারা দুই-চারজন শিগগির আসেন।

পীর সাহেব আজ সারা রাত বিছানার সাথে পিঠ লাগান নাই। সন্ধ্যা হইতেই বড় বিবির বেদনা। দাই বলিয়াছে, আজ রাতটা পার হইবে না। কতকটা সেই কারণে, আর কতকটা ঝড়-তুফানের জন্য, পীর সাহেব সারা রাত দোওয়া-কালাম ও তকবির পড়িয়া কাটাইয়াছেন। তুফানের বেগ যখন বাড়িয়াছে, বাড়ির টিনের ঘরগুলি যখন মচ্-মচাইয়া উঠিয়াছে, তখন পীর সাহেব গলা ফাটাইয়া আযান দিয়াছেন। তুফানের সাথে শয়তান থাকে; আযান শুনিলে শয়তান ভাগে; কাজেই তুফানের জোর কমে। পীর সাহেবের এটা চোখের-দেখা কথা। তাই তিনি ঘন-ঘন আযান দিতেছেন। এই সময় দাইর চিৎকার শুনিয়া তিনি বারান্দায় আসেন। গলার জোরে চিৎকার করিয়া তিনি বাড়ির সকলকে জাগান।

সকলেই বড় বিবির কামরায় জমায়েত হন। কিন্তু কারো কিছু করিবার নাই। ব্যাকুল আগ্রহে সবাই দাইর হাত ও বড় বিবির মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। দাই

‘এই পানি ভাংল’ ‘এই অস্ ডাইলেট হৈল’ ‘এই ফিটাসের মাথা দেখা যায়’ এইসব আধা-ইংরাজী আধা-বাংলা কথা বলিয়া বাড়ির কর্তৃপক্ষ বিশেষ করিয়া পীর সাহেবের নিকট নিজের বিদ্যা জাহির করিতে থাকে। দাইর এ সব কথা কেউ বুঝিলেন, কেউ বুঝিলেন না। কিন্তু সকলে যা বুঝিলেন, তা হইল এই যে প্রসবের আর দেরি নাই।

দেরি সত্যই ছিল না। রাত পোহাইতেও আর বাকি ছিল না। এমনি সময়ে বড় বিবি ‘আল্লাগো মাগো’ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। আবার সঙ্গে-সঙ্গেই চুপ করিয়া যান। দাই সময় বুঝিয়া কি যেন করে। অমনি তার হাতে একটি সন্তান দেখা যায়। সে নিশ্চয় ওয়া-ওয়া রবে কান্দিয়া উঠে। কিন্তু সে কান্না কেউ শোভে না। খুব কাছে-নিতেই কোথাও আসমান-ফাটা আওয়াযে একটা ঠাঠা পড়ে। ঠাঠার আওয়াজ শেষ হইলে শোনা গেল দাই বলিতেছে: মরদ সন্তান।

মরদ সন্তান আবার কাঁদিয়া উঠে: ওয়া-ওয়া।

পীর সাহেব সন্তানের কানের কাছে মুখ নিয়া তকবির পড়েন। তকবিরের পর মোনাজাত। মোনাজাত শেষ হইবার আগেই দাই-এর চিৎকার: হায় হায় কি হৈল গো! বিবি সাবের কি হৈল গো!

সকলে বড় বিবির উপর ঝুকিয়া পড়েন। স্বয়ং পীর সাহেবকেবলাও। বড় বিবির দম নাই। পীর সাহেব প্রথমে বড় বিবির নাকের সামনে হাত রাখেন; পরে নাড়ি ধরেন। অবশেষে আস্তে-আস্তে হাতটি রাখিয়া একদৃষ্টে বড় বিবির মুখের দিকে চাহিয়া রহেন। তাঁর চোখ হইতে দুই ফোটা পানি গড়াইয়া গাল বাহিয়া দাঁড়িতে মিলাইয়া যায়। এই বিবির সাথে ত্রিশ বছর তিনি ঘর করিয়াছেন। একটি পুত্রের মুখ দেখিবার আশায় ঐকেই তিনি তালাক দিতে যাইতেছিলেন। পীর সাহেবের মনের কথা কি তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন? তাই কি পীর সাহেবকে একটি পুত্র-সন্তান উপহার দিয়া নিজে সরিয়া পড়িলেন? অভিমান করিয়া? পীর সাহেবের উপর রাগ করিয়া? না, না। পীর সাহেবের উপর তিনি রাগ করেন নাই। স্বামীকে তিনি নিশ্চয় মাফ করিয়াছেন। ঐ যে তাঁর মুখ হাসি-হাসি। পীর সাহেবের দু’চোখ ঠেলিয়া আবার পানি আসে।

ততক্ষণে বাহিরে ঝড়-তুফান-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ফজরের ওয়াক্ত হইয়াছে। পীর বাড়ির মসজিদের মিনার হইতে মোয়াযযিন আযান ফুকারে ‘আল্লাহু আকবর’।

মা-মারা সন্তান

১

ফতেপুর পীর বাড়িতে বহু-আকাঙ্ক্ষিত পুত্র-সন্তান হইয়াছে। পীর বংশে বাতি দিবার লোক আল্লাহ দান করিয়াছেন। এই খবরে মুরিদ মোতেকাদ আত্মীয়-স্বজন সকলেই খুশী। অনেকেই বলিতে থাকেন: এত বড় বুয়ুর্গ পীর-খানদান নির্মূল হইতে পারে না, এটা তাঁরা আগেই জানিতেন। পীর বাড়িতে প্রতিদিন লোক সমাগম হইতে থাকে। দূর দূর্যাপি হইতে খলিফা-মুরিদ-মোতেকাদ ও আত্মীয়-স্বজন ভেট-নজরানা লইয়া আসিতে থাকেন। পীর বাড়িতে আনন্দের ঢেউ বহিতে থাকে। এত আনন্দ-উৎসবের মধ্যে বড় বিবির জন্য এক ফোটা চোখের পানি ফেলিবার ফুরসৎ কারোর মিলে না। মামুলী রেওয়াজ-মোতাবেক বিনা আড়ম্বরে তাঁর দাফন-কাফন কোথা দিয়া হইয়া গেল অনেকে তা জানিতেই পারিল না। যারা জানিল তাদেরও তা মনে থাকিল না। অত বড় আনন্দে এমন ক্ষুদ্র শোক চাপা পড়িয়া গেল।

এই আনন্দ-উল্লাসের মধ্যেও নব-জাত পীরজাদা লইয়া আলোচনা-সমালোচনার কর্মতি হইল না। এক দল বলিতে লাগিল: হাঁ ছেলে হইয়াছে বটে পীর সাহেব-কেবলার ঘরে। দেখ না, ছেলেটা মাটিতে পড়িয়াই ঝড়-বৃষ্টি থামাইয়া দিয়াছে। ফসলের দিকে চাহিয়া দেখ, ক্ষেতে ক্ষেতে তারা যেন হাসিতে শুরু করিয়াছে। এক মাস ধরিয়া আসমানে চান-সুরুঙের মত দেখা যায় নাই। আর পীর সাহেব-কেবলার ছেলে হওয়ার সময় হইতে সেই যে আসমান পরিষ্কার হইয়া গেল, তারপর আর মেঘ-সাজ কেউ দেখিয়াছে কোনদিন? এই ছেলে ফতেপুর শরিফের পীর বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে তাতে সন্দেহ নাই। আরেক দল বলিল: বাপের মত, হজুর-কেবলার ঘরে এটা ছেলে পয়দা হইয়াছে, না দয়্যাল পয়দা হইয়াছে? ঝড়-তুফানে দুনিয়া ওলট-পালট করিয়া ঘর-বাড়ি তছনছ করিয়া গাছ-বৃক্ষ উপড়াইয়া এবং শেষ পর্যন্ত মা-জননীকে হত্যা করিয়া তারপর সে দুনিয়াতে নামিয়াছে। মাটিতে পড়িয়াই গর্ভধারিণী জননীকে যে খুন করিতে পারে একটু বড় হইয়াই বাপকেও সে গলা টিপিয়া মারিবে না, তার ভরশা কি? এই খারে-দয়্যাল ফতেপুর পীর বংশ ফউত না করিয়া ছাড়িবে না। আর জান? এই শিশু মাটিতে পড়িয়া নাকি কাঁদে নাই। এটা দয়্যাল ছাড়া আর কি?

তবে সার্বজনীন আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে এই ঠোঁট-পাতলা চোগলখোরদের কথায় কেউ কান দেয় না। ফলে অল্পদিনেই এই নিন্দুকদের কথা চাপা পড়িয়া যায়। কারণ শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নামিলা বাইন হইলেও এবং ঝড়-তুফানে বে-এন্তেহা ক্ষয়-ক্ষতি হইলেও, সে বছর যা ফসল হইয়াছে, অনেক সুবছরেও তেমন ফসল হয় না। গৃহস্থদের গোলা ধান-পাটে ভরিয়া উঠে। সকলেই স্বীকার করে, এমনটা আর কোনও দিন হয় নাই। এবার যে এতটা হইল, তা পীর সাহেব-কেবলার এই সন্তানের ওসিলাতেই। এ ছেলের রাজ-ভাগ্য না হইয়া যায় না।

৩

ছেলে পাইয়া ছোট বিবি যে-সব কাণ্ডকারখানা শুরু করেন, তাতে সকলেই, স্বয়ং পীর সাহেবও, অবাক হইয়া যান। অমন মোটা শরীর লইয়া ছোট বিবি চৌদ্দ বছরের ছুকুরির মতো এ-ঘর ও-ঘর ছুটাছুটি করিতে লাগেন। ছেলে তাঁকে একদম নিশার মতো পাইয়া বসে। দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টাই কাটান তিনি ছেলে লইয়া। গোসল-খাওয়া নমাজ-বন্দেগির কথাও তিনি ভুলিয়া যান।

অন্য বিবিরা এবং চাকরানীদের কেউ-কেউ বোধ হয় ঈর্ষা-কাতর হইয়াছিলেন। নইলে সন্তান পালনে এমন সাফল্যে তাঁরা খুশী না হইয়া মুখ ভারি করিবেন কেন? চাকরানীদের দুই-একজন তাদের কোনও কোনও আত্মীয়াকে পীরজাদার দুধ-মা করিবার প্রস্তাব দিয়াছিল। সেটা ফাঁসিয়া যাওয়ায় তাদের দুঃখিত হওয়ার কথা। কিন্তু মাজেলা ও সাজেলা বিবির ত দুঃখিত হওয়ার কথা নয়। পীর সাহেব যখন ছোট বিবির হাতে সন্তান পালনের ভার দেন, তখন ত উভয় বিবিই খুশী হইয়া পীর সাহেবের কাজ সমর্থন করিয়াছিলেন।

দু চারদিন না যাইতেই এখন বোঝা গেল, তাঁরা আশা করিয়াছিলেন ছোট বিবি সন্তান পালনে ব্যর্থ হইয়া পীর সাহেবের অসন্তোষভাজন হইবেন। দুই কারণে এটা হইতে বাধ্য: প্রথমত তাঁর মতো মোটা মানুষ নড়িতে-চড়িতে পারিবেন না; একদিনেই হাঁপাইয়া পড়িবেন। দ্বিতীয়ত তিনি কোনও দিন সন্তান পালন করেন নাই। তাঁর পেটের দুইটা মেয়েই অসৌচ-ঘরে মারা গিয়াছে।

কিন্তু একদিন ত দূরের কথা তিন-চার দিনেও ছোট বিবি হাঁপাইয়া পড়িলেন না। দেখা গেল, ঐ মোটা দেহ লইয়া তিনি চৌদ্দ বছরের ছুকুরির মতো ছুটাছুটি করিতেছেন। দেখা গেল, শিক্ষিতা অভিজ্ঞ নার্সের মতোই ছোট বিবি শিশুর সকল প্রকার যত্ন নিতেছেন। বহু সন্তানের অভিজ্ঞ এই মায়েরা কোথাও কোনও ব্যাপারে ঐ আনাড়ী ছোট বিবির একটু ত্রুটিও ধরিতে পারিলেন না। তখন তাঁরা উল্টা সুর ধরিলেন। চাকরানীদের সহযোগিতায় উভয় বিবি বলিতে লাগিলেন: ছোট বিবি যত্নের বাড়াবাড়ি করিয়া ছেলেটার গলা টিপিয়াই মারিয়া ফেলিবেন। সব সময় আদরের নামে ত্যাগ করিলে ছেলে ঘুমাইবে কখন? অঘুমে-অনাহারে ছেলেটা সাত দিনের বেশি যদি বাঁচে, তবে পীর সাহেব-কেবলা যেন তাঁদের নাম ফিরাইয়া রাখেন। অনবরত বিভিন্ন সূত্র হইতে একই ধরনের অভিযোগ শুনিয়া-শুনিয়া পীর সাহেব আর নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। নিজ চোখে ছেলেকে দেখিবার জন্য পীর সাহেব একদিন বিনা-খবরে ছোট বিবির ঘরে হাজির হন।

৪

ছেলে পাওয়ার পর হইতে ছোট বিবি পীর সাহেবকে তেমন আমল দেন না। পীর সাহেবও দিনের বেলা ছোট বিবির ঘরে যাওয়া ছাড়িয়াই দিয়াছেন। নবজাত কাঁচা শিশু দেখিতে পীর সাহেবের কোনও দিন ভাল লাগে না। অত-অত মেয়ে হইল পীর

সাহেবের, কয়েক মাস না যাওয়া পর্যন্ত একটিকেও তিনি কোঁলে করেন নাই। তিনি বলেন, নবজাত শিশুর আকৃতি তাঁর ভাল লাগে না। দেখিতে একটা বিশ্রী কুৎসিৎ গোশতের টুকরার মতো লাগে। কয়েক মাস না গেলে মানুষের চেহারা ই হয় না। তাহাড়া কখন যে পেশাব-পায়খানা করিয়া কাপড়-জামা নাপাক করিয়া দিবে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই।

এ সব কথাই ছোট বিবি জানেন। কাজেই তিনি দিনের বেলা পীর সাহেব-কেবলাকে নিজের ঘরে দেখিতে আশা করেন না। আজ হঠাৎ পীর সাহেবকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি যেমন অবাক হন, তেমনি খুশীও হন। চোখে-মুখে একগাল নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া ঠোঁটে শাহাদৎ আংগুল তুলিয়া পীর সাহেবকে কথা না বলিতে ইশারা করেন। ঠোঁট হইতে আংগুল নামাইয়া তা ঘুমন্ত ছেলের দিকে ফিরান। পীর সাহেব বিবি সাহেবের ইশারা বুঝেন। দূর হইতে উঁকি মারিয়া ছেলের দিকে চাহিয়া থাকেন। বিবি সাহেব ইশারায় পীর সাহেবকে কাছে ডাকেন। তিনি নিঃশব্দে এক পা দুই পা করিয়া কাছে আসিলে বিবি সাহেব তাঁর হাত ধরিয়া পাশে বসান।

পীর সাহেব কাছে হইতে শিশু দেখিয়া ত অবাক। ন-নটা সন্তানের বাপ তিনি। তার মধ্যে সাতটার লালন-পালন তিনি চোখে দেখিয়াছেন। চারটি বড়-ডাংগর ই হইয়াছে। নিজের সন্তান ছাড়াও মুরিদ-মোতেকাদ ও আত্মীয়-স্বজনের অনেক সন্তান তিনি দেখিয়াছেন। এতগুলি সন্তান দেখিবার অভিজ্ঞতা পীর সাহেবের আছে। কিন্তু এমনটি ত তিনি কখনও দেখেন নাই। ছেলের গায় রংগিন জামা। মাথার বালর-ওয়ালা টুপি পা হইতে বুক পর্যন্ত রায়ার ফ্যাশানে সিলাই-করা কয়েক রংগিন কাপড়ের কাঁথা। মাথার নিচে একটা ও দুই পাশে দুইটা রংগিন ওয়াড়ের বালিশ। নিচে ছোট্ট তোষক। তোষকের উপর সাদা চাদর। পীর সাহেব কুণ্ঠিত ফেলেন, এ সবই ছোট বিবির নিজ হাতের কথা। নিজের পুরাতন শাড়ি-জামার টুকরা ও পুরান বালিশের রুই-তুলা দিয়াই তিনি এ সব করিয়াছেন। সবই বুঝেন পীর সাহেব; কিন্তু এটা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না যে মাত্র তিন চার দিনে একটা মেয়ে মানুষ একা নিজ হাতে এসব তৈয়ার করিলেন কেমন করিয়া? বুঝিলেন না মানে বুঝিলেন এবং গর্বিত হইলেন। প্রশংসমান দৃষ্টিতে ছোট বিবির দিকে চাহিয়া খুব আশ্চর্য্য অনাবশ্যক প্রশ্ন করিলেন: সবই আপনার নিজ হাতের তৈয়ার ত?

জবাবে বিবি সাহেব কোনও কথা বলেন না। শুধু চোখে-মুখে উজ্জ্বল হাসি হাসেন। পীর সাহেব-কেবলা ছোট বিবির গুণে মুগ্ধ ছিলেন। এবার আরও বেশি মুগ্ধ হন। তাঁর চোখে-মুখে সন্তোষ ফাটিয়া পড়িতে থাকে। ছোট বিবি খুশি হন।

এতক্ষণে পীর সাহেবের চোখে পড়ে ঘুমন্ত শিশুর মুখে একটা বাঁকা বোতলের মুখ ঢুকিয়া আছে। লেপ-তোষক-বালিশের ভিড়ে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় এতক্ষণ এটা তাঁর নজরে পড়ে নাই। ওটার দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়া পীর সাহেব ফিস-ফিস করিয়া ব্যস্ততা প্রকাশ করেন। বলেন: ওটা কি বিবি সাব? ওটা ছেলের মুখে কেন? ওতে ছেলের দম আটকাইয়া যাইব না?

ছোটবিবি পীর সাহেবের দিকে ফিরিয়া চোখে-মুখে আর এক বলক হাসি হাসিয়া বলেন: অত জোরে কথা কইবেন না। ছেলের ঘুম ভাইংগা যাব। ওটার নাম ফিডিং বটল। চুপ কৈরা চাইয়া দেখেন, বাবজান আমার কেমন কঁৎ-কঁৎ কৈরা দুখ খায়!

পীর সাহেব দেখেন, সত্যিই এ ঘুমন্ত শিশু কঁৎ-কঁৎ করিয়া দুধ খাইতেছে। পীর সাহেব ফিডিং বটল দেখিলেন জীবনে এই প্রথম। ছেলের দুধ খাওয়া দেখিয়া খুশি হন। এক ধ্যানে তিনি সে দিকে চাইয়া থাকেন। মায়ের স্তনের বদলে শিশু-সন্তানদের ফাঁকি দিয়া এইভাবে দুধ খাওয়ানোর ফন্দি যে ব্যক্তি আবিষ্কার করিয়াছিল, অন্য সময় হইলে তাকে ফাঁকিবাজ বলিয়া পীর সাহেব ফতোয়া দিতেন। কিন্তু আজ তিনি তাকে মনে-মনে ধন্যবাদ দেন।

শিশুর দুধ খাওয়া দেখিতে-দেখিতে তার গায়ের রং নাক-চোখ-মুখ কপাল খুতির আকৃতি আজই পীর সাহেব প্রথম ভাল করিয়া দেখিতে পান। তাঁর মনটা খারাপ হইয়া যায়। তাঁর মনে হয় ছেলের রং ত ফর্সা নয়ই, শ্যামলাও নয়। বরঞ্চ কালই বলা চলে। শরীরের তুলনায় মাথাটা খুবই বেমানান বড়। চোখ ছোট-ছোট, নাকটা এত ছোট ও চ্যাপটা যে ওটা এক রকম না থাকারই শামিল। ঠোঁটের নিচে খুতি একরূপ নাই বলিলেই চলে। ফলে চোখ-নাক মুখও খুতিতে মিলিয়া সারা মুখ-মণ্ডলের মাত্র চারি আনা দখল করিয়াছে; বাকি বার আনাই দখল করিয়াছে কপালটা। এত ছোট মুখে এত বড় বেমানান কপাল পীর সাহেব জীবনে আর দেখেন নাই। সব মিলাইয়া এই শিশু তাঁর কাছে নিতান্ত কুৎসিৎ কদর্য বলিয়াই মনে হয়। চেহারা-ছবির দিক দিয়া এ ছেলে ফতেপুরের উপযুক্ত বংশধর কিছুতেই হয় নাই।

ফতেপুরের পীর সাহেবরা খাস কোরায়েশ খান্দানের লোক এবং পৃথিবীর সাহেবের শ্বশুর ও প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিকের বংশধর। যদিও পীর সাহেব-কেবলার গায়ের রং কাল এবং মরহুম দাদা পীর সাহেবের রংও এইরূপই ছিল তবু সে কারণে এঁদের কোরায়েশীত্ব কেউ আপত্তি করিতে পারে নাই। বহু পুরুষ আগে পীর সাহেবরা পাথর-পোড়া রোদের দেশ এই হিন্দুস্থানে আসিয়াছেন। পুরুষানুক্রমে এই গরম ও ঘামের দেশে তাঁরা বাস করিতেছেন। তাতে মূল আধিক্য দুধে-আলতা রং প্রথমে কটা, পরে তামাটিয়া এবং অবশেষে কাল হইয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কাজেই চামড়ার রংটা এখানে বিবেচ্য নয়। এখানে বিবেচ্য শরীরের গড়ন। ফতেপুর পীর বংশের তিন পুস্তের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, লম্বা বাহু, আগা বাঁকা উঁচা নাক, চাপ দাড়ি, লম্বা খাড়া কান একব্যাক্যে সাক্ষ্য দেয় যে তাঁরা কোরায়েশ বংশের লোক। দুশ্মনদের কেউ-কেউ কোরায়েশীত্ব সন্দেহ প্রকাশ করিলেও তাঁরা যে আরবের লোক, এটা স্বীকার না করিয়া পারে না। তাছাড়া বংশ-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে বর্তমান পীর সাহেব বাছিয়া-বাছিয়া গৌরাংগী সুন্দরী বিয়া করিয়াছেন। এঁদের মধ্যে বড় বিবিই ছিলেন সবচেয়ে গোরা। তাঁর গায়ের রং ছিল একদম সাদা। সেজন্য গাঁয়ের মেয়েরা তাঁকে ‘মেম সাব’ বলিয়া ডাকিত। বড় বিবির মেয়ে এবং পীর সাহেবের সব মেয়েরাই সুন্দরী ও গৌরাংগী।

এ অবস্থায় বড় বিবির পেটের এই ছেলে গোরা না হইবার কোনও কারণ নাই। তবু আল্লার কি কুদরত! পীর সাহেবের এত সাধনা, এত দোওয়া-মোনাজাতের পরে তিনি ফতেপুর খান্দান রক্ষার জন্য যে ছেলে পাঠাইলেন, তার রং হইল কি না কাল! পীর সাহেবের এইসব চিন্তা নিশ্চয়ই তাঁর মুখভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। নইলে ছোট বিবি পীর সাহেবের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন কিরূপে? ছোট বিবির কথায় পীর সাহেবের ধ্যান ভংগ হয়। তিনি পীর সাহেবের মুখের উপর মিষ্টি হাড়ির একটি ঝলক

ফেলিয়া বলেন: এটাও আল্লার কুদরত। পয়দায়েশের সময় সব ছেলেমেয়েই তামাটিয়া রং হয়। যতই দিন যায়, আস্তে আস্তে ততই ফর্সা হয়। আমার বাবাজী দেখতে এখন কিছুটা তামা রং ঠিক, কিন্তু ক'দিন পরে দেখবেন কত ফর্সা হইয়া গেছে।

পীর সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। ছোট বিবি তাঁর মনের কথা বুঝিলেন কেমনে? তিনি আড়চোক্ষে বিবি সাহেবের মুখ-ভাব বুঝিবার চেষ্টা করেন। তিনি ঠাট্টা করিতেছেন? না, পীর সাহেবকে তসল্লি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন?

মুহূর্তে আত্ম-সংবরণ করিয়া পীর সাহেব স্বাভাবিক সুরে বলেন: তাই নাকি? পয়দায়েশের সময় সব ছেলে-মেয়েই ময়লা হয় নাকি? পরে তারা সাফ হয়! ঠিক কথা কৈতেছেন?

পীর সাহেবের গলায় ব্যাকুল আগ্রহের ভাব ফুটিয়া উঠে। বিবি সাহেবা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া পুরা আত্ম-বিশ্বাসের সুরে বলেন: নিশ্চয়ই ঠিক। কত দেখলাম। অন্যের কথা কি? আমার বাবাজীর রংটাই দুইদিন আগে কত ময়লা আছিল। আর আজ দেখেন ত কত সাফ। সাতদিন পরে দেখবেন আমার বাবাজী আমারই গায়ের রং পাব। এক মাস পরে দেখবেন, বড় বুবুজীর রং পাব।

পীর সাহেবের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। তিনি বলেন: দোওয়া করি ছোট বিবি আপনার কথাই সত্য হোক।

সমান জোরে ছোটবিবি বলেন: দেইখা নিবেন আমার কথা সত্য হইল কি না।

পীর সাহেব ছোটবিবির ঘর হইতে খুশী মনে বিদায় হন। তাঁর মনে কোন সন্দেহ থাকে না যে ছোটবিবি ছেলের খুবই যত্ন নিতেছেন। যে সব খবর তিনি পাইতেছিলেন, সে সবই তবে মিথ্যা। পীর সাহেবের এতক্ষণে মনে পড়েছে ছেলের অযত্ন হইতেছে এ কথা কেউ বলেন নাই। বরঞ্চ বেশি মাত্রায় যত্ন হইতেছে। ছোটবিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ এইটাই। পীর সাহেব মুচকি হাসেন। অতিরিক্ত দোষে আবার ছেলে মারা যায়? কি পাগলের কথা! সে সব কথায় আবার পীর সাহেব বিশ্বাসও করিয়াছিলেন! ছিঃ!

৫

যথাসময়ে বিপুল ধূম-ধামের সাথে পীরজাদার আকিকা হইয়া যায়। পীর সাহেবের সাত-আট পুরুষের আগেকার, এত দিন কেউ নাম শুনে নাই এমন, এক পরদাদার নাম অনুসারে পীরজাদার নাম রাখা হয় আবদুল হামিদ। আকিকার মতামতে পীর সাহেব এই সর্ব প্রথম ঘোষণা করেন যে দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাহ পীর সাহেব-কেবলার এই পরদাদাকে দিল্লীর কাযী উল-কুযযাত পদ দিয়াছিলেন। কিন্তু আকবর বাদশাহ বেদ্বিনী চাল-চলনের প্রতিবাদে পরদাদা সাহেব আকবর বাদশাহর চাকুরি করিতে অস্বীকার করেন। তাতে সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়া তিনি প্রথমে গোরখপুরে পরে বর্ধমান শহরে বসতি স্থাপন করেন। সেখান হইতে পরবর্তীকালে আরেক পরদাদা ফতেপুরে আসেন।

আকিকার যিয়াফতে যে সব মুরিদ-মোতেকাদ যোগদান করেন, তাঁরা এত সব নযরানা লইয়া আসেন যে যিয়াফতের সব খরচ কুলাইয়াও পীর সাহেবের যথেষ্ট লাভ থাকে।

ছোট বিবি হামিদকে লইয়া এমনি মাতিয়া উঠেন যে পীর সাহেবের সাথে তাঁর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একদম কাটা যায়। পীর সাহেব প্রথম-প্রথম এই অসুবিধার জন্য ছোট বিবির উপর রাগ-অভিমান করেন। পরে ছেলের খাতিরে ছোট বিবির এই ব্যবহার সহ্য করিয়া যান। গাফত্যা তিনি অন্য দুই বিবির সাথে নয়া ভাব করেন। ক্রমে ছোট বিবির কথা একরূপ ভুলিয়াই যান। যে ছোট বিবিকে এক নাগাড়ে এক ঘন্টা না দেখিলে পীর সাহেব দম-ফুটা হইয়া যািতেন, ইদানিং পীর সাহেব তাঁর কথা মনেও করেন না। মানুষের মনের কত যে ভাবান্তর হইতে পারে, সে কথা ভাবিয়া পীর সাহেব নিজেই অবাক হন। মনকে এই বলিয়া তসল্লি দেন যে এটা হইয়াছে শুধু ছেলের জন্য। ছেলের জন্য ত নিশ্চয়ই। কিন্তু অবস্থা শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে পীর সাহেব ছোট বিবিকে ছেলের মাইনা-করা আয়া বা নার্সরূপে দেখিতে শুরু করেন। দেখাদেখি অন্য দুই বিবিও ছোট বিবিকে সতীনের আসন হইতে নামাইয়া আয়ার জায়গায় দাঁড় করান। কথাবার্তা ও ব্যবহারাদিও ক্রমে-ক্রমে সকলের অজ্ঞাতেই আয়া-মনিবের মতোই চলিতে থাকে। ছেলের আদর-যত্ন অসুখে-বিসুখে সেবা-শুশ্রূষায় বিন্দুমাত্র ক্রটি হইলে বা হইয়াছে মনে করিলে পীর সাহেব হইতে দুই বিবি পর্যন্ত সকলে, এমন কি চাকরানীরাও, ছোট বিবিকে এমন ভাবে এমন সুরে ধমক দেন যা আয়া-চাকরানীকেই দেওয়া চলে, কোনও বিবিকে দেওয়া চলে না। অথচ এর বিসদৃশতা কারও নজরেই পড়ে না। কারণ এই বিসদৃশতার যিনি পাত্র সেই ছোট বিবিই এসব গায় মাখেন না; হাসি মুখে সবই মানিয়া চলেন।

ছোট বিবির এত আদর-যত্ন ও সাবধানতা সত্ত্বেও খোকার পেটের পীড়া দেখা দেয়। ঘন-ঘনই এটা হয়। পায়খানাটা অতিশয় তরল। বদবুঁ প্রায় অসহ্য। রোগ যত বাড়ে ছোট বিবি তত সাবধান হন। তিনি যত সাবধান হন, রোগ তত বাড়ে। দুধটা ঠিক খাঁটি কি না তা যাচাই করিয়া দেখেন। পানির পরিমাণ বাড়াইয়া দুধটা আরও একটু পাতলা করেন। দুধে মিশাইবার পানিটা পর্যন্ত ফুটিত গরম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লন। ফিডিং বটলে দুধ ভরিবার আগে ওটা, বিশেষতঃ ওর নিপলটা, ঠিকমতো গরম পানি দিয়া ধোওয়া হইয়াছে কি না এপাশ-ওপাশে ও উপর-নিচ করিয়া পরীক্ষা করেন। চাকর-চাকরানীদের জেরা করেন এবং বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইলে নিজ হাতে ফুটিত গরম পানি দিয়া আবার ধুইয়া সাফ করেন। কিন্তু এত করিয়াও কোনও ফল হয় না। খোকার পেটের অসুখ সুরে না। যত দিন যায়, খোকার পায়খানা তত বদ-বৎ ও বদ-বুঁ হইয়া যায়। সে অসাড়ে পায়খানা ফিরে। বিরাম নাই। অবশেষে হাগা-বমি একসঙ্গে হওয়া শুরু করে। পেটে দুধ আর থাকেই না। খাওয়ার পরক্ষণেই চাকা-চাকা ছানা হইয়া বাহির হইয়া আসে। শেষ পর্যন্ত ছেলের দুধ খাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। ফিডিং বটল আর মুখেই লয় না।

এর জন্য বাড়ির সকলে ছোট বিবিকেই দোষ দেন। কেউ কোনওরূপ সাহায্য করেন না। স্বয়ং পীর সাহেব দোওয়া-তাবিয ও পানি-পড়া দেন। ডাক্তার-কবিরাজ-হাকিম ডাকাইয়া দেন না। কারণ এত কচি ছেলের পেটে অমুখ-পত্র লাগিবেই বা কেন? পীর সাহেবের একটা নোওয়া তাবিয বা পানি পড়ায় কত মরা মানুষ উঠিয়া হাটা দিয়াছে, সে খবর কে না জানে? খোকার বেলা সেই পীর সাহেব-কেবলার দোওয়া-তাবিযে আসর করিতেছে না? এর নিশ্চয়ই গূঢ় কারণ আছে। ছেলের চিকিৎসার চেয়ে সেই কারণ বাহির করিতেই সকলে লাগিয়া গেলেন। প্রায় সকলেরই মনে হইল, ছোট বিবি ছাড়া এর আর কি কারণ হইতে পারে? শেষ পর্যন্ত সকলেই এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ছোটবিবির দোষেই খোকার রোগ সারিতেছে না।

৬

ছোটবিবি সব শুনে। আর কাঁদেন। কারও উপর তিনি রাগ করেন না। কার উপর রাগ করিবেন? ছেলের অসুখ যে সারিতেছে না এটা ত ঠিক? তার অবস্থা যে দিন-দিনই খারাপ হইতেছে, কথাটা ত মিথ্যা নয়? এভাবে না খাইয়া ছেলে আর কতদিন বাঁচিবে? দোষ তাঁর না ত কার? তিনি ছাড়া খোকার গায় কেউ হাত দেয় না। তিনি ছাড়া খোকার মুখে দুধ কেউ দেয় না। চাকরানীদের কাজে আস্তা হারাইয়া সব কাজ তিনি এখন নিজের হাতে িয়াছেন। একটা কাজের জন্যও তিনি এখন চাকরানীদের উপর নির্ভর করেন না। তবে ছেলের অসুখের জন্য তিনি ছাড়া আর কে দায়ী? হে খোদা, তুমি এই মাসুম বাচ্চার এ কি যোগ দিলে? কেন দিলে? মাসুম বাচ্চার ত কোনও দোষ নাই! তবে ত হে খোদা ছোটবিবির উপর রাগ করিয়াই তুমি খোকার অসুখ দিয়াছ। ছোটবিবির উপর তুমি কেন রাগ করিয়াছ খোদা? ছোটবিবি তোমার পায়ে কি অপরাধ করিয়াছে? হাঁ, ইদানিং নমাজটা ঠিক ওয়াক্তমতো পড়িতে পারিতেছেন না সত্য, কিন্তু হে খোদা তুমি ত জান, এটা ছোটবিবির ইচ্ছাকৃত অবহেলা নয়। ছেলেকে একদণ্ড ফেলিয়া তিনি অজু করিতে যাইতেও পারেন না। কোন রকমে অজু সারিয়া জায়নমাজে বসামাত্র আবার বমি করিয়া বা সশব্দে পায়খানা করিয়া দেয়। এর পরে ত ছোট বিবি নমাজ ছাড়িয়া না উঠিয়া পারেন না। পায়খানার মধ্যে গড়াগড়ি দিলে খোকার অসুখ আরও বাড়িয়া যাইবে। এটা ত খোদা তুমি জান। হে খোদা, তুমি ত এটাও জান যে খোকার অসুখ সারিয়া গেলে ছোটবিবি এক-এক রাকাত নমাজের বদলা ষাট রাকাত নমাজ পড়িবে বলিয়া তোমার কাছে ওয়াদা করিয়াছেন। তুমি কি খোদা ছোটবিবির ওয়াদায় বিশ্বাস করিতেছ না? বলিতে পার খোদা, ছোটবিবি কোনও দিন ওয়াদা খেলাফ করিয়াছে? হে খোদা, ছোটবিবির বিশ্বাস কর, তাঁর বাপজানকে ভাল করিয়া দাও।

ছেলে কোলে লইয়া চোখের পানিতে বুক ভাসান ছোটবিবি। দুই-এক ফোটা চোখের পানি পড়ে ছেলের গায়। এটাকে অশুভ মনে করিয়া আল্লার দরগায় আরও কাঁদেন ছোটবিবি। তাঁর কাছে পান্য চান।

শেষ পর্যন্ত ছোটবিবির উপর বোধ হয় খোদা মুখ তুলিয়া চান। তাঁর মাথায় হঠাৎ একটা ফন্দি আসে। তিনি জামার বোতাম খুলিয়া নিজের বড়-বড় আট-সাত স্তন দুইটার একটা খোকার মুখে তুলিয়া ধরেন। খোকাও যেন এইটাই চাহিতেছিল। প্রবল আগ্রহে সে স্তনের বোঁটা গায়ের জোরে টানিতে শুরু করে। কিন্তু কিছুক্ষণ টানিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং কাঁদিতে লাগে। ছোট বিবি বুঝিতে পারেন, তাঁর স্তনে দুধ আসে না বলিয়াই ছেলে স্তন ছাড়িয়া দেয়। তিনি নিজের স্তনের উপর রাগ করেন। গোস্বায় নিজের স্তন টিপেন। ব্যথা পান। বোঁটা উচা করিয়া দেখেন এক ফোটা দুধ, অন্তত একটু পানি, বাহির হইয়াছে কি না। না, পোড়া স্তন হইতে কিছু বাহির হয় নাই। নিজের উপর ছোটবিবির ধিক্কার আসে। এত বড়-বড় স্তনগুলি, অথচ তাতে এক ফোটা পানিও নাই। ফন্দিতে ফন্দি বাড়ে। অভাবে বৃদ্ধি বাড়ে। হাতের কাছেই দুধ-ভরা ফিডার ছিল। তার নিপলটা খুলিয়া ছোট বিবি নিজের স্তনে খানিকটা দুধ লাগান এবং দুধ-মাখা

স্তন ছেলের মুখে গুঁজিয়া দেন। ছেলে এবার কঁৎ কঁৎ করিয়া স্তন টানিতে থাকে। খানিকক্ষণ টানিয়া সে আবার স্তন ছাড়িয়া দেয়। ছোট বিবি আবার স্তনে দুধ মাখাইয়া ছেলের মুখে দেন। ছেলে আবার খানিকক্ষণ টানে, আবার ছাড়িয়া দেয়। ছোটবিবি এরপর ফিডার আর নামান না। ওটা উঁচা করিয়া ফোটা ফোটা দুধ স্তনে ঢালিতেই থাকেন। ছেলেও আর স্তন ছাড়ে না। অনেকক্ষণ স্তন চুষিয়া ছেলে কোলেই ঘুমাইয়া পড়ে।

এতক্ষণে এবং আজই প্রথম ছোট বিবি বুঝিতে পারেন, সন্তান বুকে করায় এবং তার মুখে স্তন দেওয়ায় কি অনির্বচনীয় পুলক! ছোট বিবি দুইটি সন্তান প্রসব করিয়াও তাদের বুকে করিবার অথবা তাদের মুখে স্তন দিবার আনন্দ কোনও দিন পান নাই। অসৌচ ঘরেই তারা মারা যায়। সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোতে সুখ আছে, লোকের মুখে শুনিয়া শুনিয়া তা তিনি অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আনন্দ যে এমন তীব্র আনন্দ, সে পুলকে সর্বাংগে যে এমন শিহরণ জাগে, তা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। আজ তাঁর মনে হয়, এই পুলকের শিহরণই মাতৃত্বের বিশেষ অধিকার। এই শিহরণ আছে বলিয়াই মেয়েরা এত কষ্ট এত যন্ত্রণা জীবনের এতবড় আশঙ্কা ঘাড়ে লইয়াও পেটে সন্তান ধারণ করিয়া থাকে। খোকার প্রতি তাঁর অব্যক্ত আকর্ষণ দুর্বীর হইয়া উঠে। এ ছেলে তাঁর পেটের নয় সে কথা তাঁর মনেও পড়ে না। কিন্তু শিশুকে সবলে বুকে চাপিয়া ধরেন। এটা শুধু তাঁর পেটের সন্তানই নয়। এ তাঁর দেহের অংশ। কাজেই আরো চাপেন। আরও। সে চাপে ছেলে কঁকোঁ করিয়া উঠে। ত্র্যস্ত-ব্যস্ত ছোটবিবি চাপ টিলা করেন। ভাগ্যিস ছেলের ঘুম ভাঙে না। কিন্তু ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছিল ত! ছেলেকে একটু দোলাইয়া তার ঘুম গাঢ় করেন। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেকে আস্তে-আস্তে কোল হইতে নামাইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দেন এবং তার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ঘুমন্ত শিশুর ঘুমের স্বপ্ন দেখিতে থাকেন।

৭

পীরজাদা হামিদের বয়স এখন দুই বছর। কিন্তু এখনো সে দাঁড়াইতেই পারে না। ছেলে-মেয়েরা সাধারণত পাঁচ মাসে বসে, সাত মাসে হামা দেয়, দশ মাসে দাঁড়ায়। বছর শেষ হইতে-না-হইতেই তারা হাটি-হাটি পা পা। কিন্তু দুই বছর বয়সে হামিদ এখন বসে মাত্র। ঐ বসা পর্যন্তই। যেখানে তাকে বসাইয়া রাখ, সেখানেই বসিয়া থাকে। নড়াচড়া করে না একটুও। হাত-পা তার সরু-সরু কাঠিমাত্র। গায়ের চামড়া টিলা ও খসখসা। সারা দেহের মধ্যে শুধু পেটটা, আর মাথাটা। দুটাই বেমানান বড়। দেখিতে এমন বিস্ত্রী যে তাকে আদর করিতে ইচ্ছা হয় না। বরঞ্চ ঘৃণা ও নফরৎ হয়। হঠাৎ তাকে মানব-শিশু বলিয়াই মনে হয় না। চেহারা লহমির লেশমাত্র নাই। কেমন যেন রোগা জন্তুর মতো দেখায়। একই জায়গায় বসিয়া সে অনবরত হাগা-মুতা করে। মিনিটে মিনিটে অমন হাগা-মুতা করিলে কার সাধ্য সাফ রাখে? একবারের গু মুৎ সাফ করিতে না করিতে আবার। সেটা না সরাতেই ফের আবার। এমন চলে চক্ৰিশ ঘন্টা। ছোটবিবির মতো দানবীয় কঠোর পরিশ্রমী মেয়েও হামিদকে আর সাফ-সুৎরা রাখিতে পারেন না। অন্য কেউ ত ছেলের ধারে-কাছেই আসেন না। আসেন না মানে ছেলে

নিজেই আসিতে দেয় না। হাগা-মুতা করিতে করিতেই ছেলে ‘আম্মা-আম্মা’ বলিয়া ডাকিতে শুরু করে। অত রোগা আধ-মরা দুর্বল ঐটুকু শিশুর গলার আওয়াজ শুনিয়া সকলে অবাক হন। সে ডাক বাড়ির সকলে ত শুনিতে পানই, বাহির বাড়ি হইতেও স্পষ্ট শোনা যায়। একবারের নষ্ট জামা-জাংগিয়া সাবান দিয়া ধুইতে হয় ত ছোটবিবি ঘরের পিছনে গিয়াছেন। অমনি ছেলে আবার নষ্ট করে; ডাকাডাকিও শুরু করে। এই অবস্থায় স্বভাব তই অন্য কেউ তার কাছে আসেন। তাতে ছেলে ক্ষিপ্ত বাঘের বাচ্চার মতো গর্জন করিয়া উঠে। তাঁকে তাড়াইয়া দেয় এবং আম্মা-আম্মা বলিয়া বাড়ি-ঘর মাথায় তোলে। এরপর অন্য বিবির ত দূরের কথা, চাকরানীরাও হামিদের হাজার ডাকাডাকিতে সাড়া দেয় না। যতক্ষণ ছোট বিবি না আসেন ততক্ষণ সে গু-মুতে লুটুর-পুটুর হইয়া গলার জোরে কাঁদিতে থাকে।

এমন ছেলেকে কেউ কোলে নেন না। স্বয়ং পীর সাহেব-কেবলাও না। ছেলের এমন কান্না দেখিয়া তিনি এক বছর আগেই তার বাঁচিবার আশা ত্যাগ করিয়াছেন। নিজের রুগিরির মর্যাদা রক্ষা করিয়া তিনি এই এক বছর ধরিয়াই অন্দর-বাহিরে বলা শুরু করিয়াছেন: ইল্মে-লাদুন্নি বলে তিনি জানিতে পারিয়াছেন, এই ছেলেকে দিয়া আল্লাহ পীর সাহেব-কেবলার ঈমান পরীক্ষা করিবেন। সকলেই পীর সাহেব-কেবলার এই কথার অর্থ করিয়াছেন: এ ছেলে আর বাঁচিবে না।

কিন্তু এক বছরেও ছেলে মরিল না দেখিয়া সকলেই ত্যক্ত হইয়া উঠেন। তবে স্বয়ং পীর-সাহেব কেবলার মনে পরিবর্তন আসে অন্য রকমের। তাঁর মনে আশার সঞ্চার হয়। ফতেপুর বংশের এই চেরাগ অত ঝড়-তুফানেও নিভে নাই কেন? নিশ্চয় এর কারণ আছে। কুদ্রতী ভেদ আছে। খোদা নিশ্চয় হামিদকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। পুত্র-বাসনা তাঁর আবার প্রবল হয়। তিনি আবার রোজ ছেলের খোঁজ নিতে এবং ছোটবির উপর রাগ করিতে শুরু করেন। দুই বিবিও চাকরানীদের মনের তাপ স্বভাবতই পীর সাহেবের তাপের সাথে উঠা-নামা করে। পীর সাহেব স্বয়ং যখন ছেলের খোঁজ নিতে এবং ছোটবিকে বকাবকি করিতে থাকেন, তখন বাড়ির আর-আর সকলেও ছেলের আদর-যত্ন সম্পর্কে ছোটবির অবহেলায় হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠেন। ছেলের অসুখের জন্য সকলে আবার আহা-উহ ও ছোটবির নিন্দা শুরু করেন। ছোটবির নিন্দায় আবার পীর বাড়ি ও সারা গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠে। সকলের মুখের রাগ সমষ্টিবদ্ধ হইয়া পীর সাহেবের মুখে এবং হাতে-পায়ে প্রকাশ পাইতে শুরু করে। যে ঘটনা ফতেপুরের পীর বাড়িতে কোনও দিন ঘটে নাই, তাই ঘটিতে শুরু করে। পীর সাহেব-কেবলা ছোট বিবিকে মার-ধর ও গালি-গালাজ করিতে থাকেন। ফতেপুরের পীর সাহেব-কেবলারা কোনওদিন স্ত্রীর গায় হাত উঠান নাই। তুই-তুমি করিয়া যবান করেন নাই। বর্তমান পীর সাহেবও বংশের সুনাম রাখিয়াছেন। কারও উপর হাত তুলেন নাই। হাজার রাগ-তিরস্কার করিতে গিয়াও ‘আপনি আপনি’ বলিয়াছেন। সেই পীর সাহেবই আজকাল তাঁর সবচেয়ে আদরের ছোট বিবিকে তুই-তুংকার করিয়া গাল দিতে ও চড়-থাপড় কিল-ঘুষি মারিতে শুরু করিয়াছেন। দুই-একবার লাঠির আঘাতে ছোট বিবিকে ধরাশায়ী করিয়াও দিয়াছেন।

৮

বাড়ির মেয়েরা এতে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। গ্রামের লোক অবাকতাজ্জব হইয়াছে। মুরিদ-মোতেকাদরা গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়াছে। এটা হইল কি? এমন অলিআল্লাহ, ধৈর্য ও ভদ্রতার এমন প্রতিমূর্তি, জ্ঞান-বিদ্যার এমন সমুদ্র, তিনি এমন হইলেন কেন? নিশ্চয়ই এর কারণ আছে।

শে কারণ পাইতেও দেরি হয় না। পীর সাহেব-কেবলা যত বুয়ুর্গ লোকই হউন তিনি মানস ত। তাঁর মধ্যেও বাপের প্রাণ আছে ত? বুড়া বয়সে অত সাধনা-আরাধনার ফলে একটিমাত্র পুত্রধন পাইলেন। পয়দা হইবার সময় ছেলে এমন সুস্থ সবল হইল। দুই বছরে সেই ছেলেই শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। না শিখিল সে হাঁটিতে, না পালক সে দাঁড়াইতে। কেন এমন হইল? পীর সাহেব-কেবলা বলিতেছেন: ছোটবিবি আসলে মেয়েলোক নন, তিনি ডাইনী-পেতনী রাক্ষসী। কথাটা সত্য না হইয়া যায় না। পীর সাহেব-কেবলার মতো বুয়ুর্গ লোক গায়েবের খবর না পাইয়া নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অমন কথা বলিতেই পারেন না। প্রথম-প্রথম মুরিদ মোতেকাদরা পীর সাহেবের এই সব গাল-মন্দকে আদরের গাল, অথবা নিতান্ত রাগের মাথার কথা মনে করিয়া উড়াইয়া দিতেন। এতদিনে তাঁরা বুঝিলেন, পীর সাহেব-কেবলা রসিকতা বা রাগ করিয়া নিজের বিবির বিরুদ্ধে এ সব কথা বলিতে পারেন না। মার-ধর ত করিতেই পারেন না। অতএব ছোটবিবি যে আসলে ডাইনী, তাতে তার সন্দেহ নাই।

আর যায় কোথায়? প্রথমে পীর বাড়ির মধ্যে পরে বাইরে পাড়া প্রতিবেশী ও ক্রমে মুরিদ-মোতেকাদদের মধ্যে এই সাংঘাতিক গোপন ঝগড়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে ছোটবিবি আসলে আওরত নন, সুন্দরী নারীর মতো তিনি একটা লছখোর রাক্ষসী। গাঁয়ের কুটনী বুড়ীর দৌলতে এসব তথ্য গ্রামময় ছড়াইয়া পড়ে। অনেক চাক্ষুষ সাক্ষীও খাড়া হইয়া যায়। দিনের বেলায় অমন সুন্দরী ছোটবিবি রাতে কেমন অশরীরী পেতনী হইয়া যান, কেমন করিয়া তাঁর পা উল্টা দিকে যায়, কেমন করিয়া তাঁর দশ হাত লম্বা জিভটা আগুনের হল্কার মতো লকলক করিতে থাকে, এ সব সত্য ঘটনা সম্পর্কে দিন-দিন চাক্ষুষ সাক্ষীর সংখ্যা বাড়িয়া চলে।

স্বয়ং পীর সাহেব-কেবলাও এসব কথা বেশি দিন অবিশ্বাস করিয়া চলিতে পারেন না। ডাইনী-পেতনীতে তিনি বিশ্বাস করেন না; ও সব শরিয়ত-বিরোধী কথা। ছোট বিবিকে পীর সাহেব যখন ডাইনী-পেতনী বলিয়া গাল দিতেন, তখন সত্যি-সত্যি ডাইনী-পেতনীতে বিশ্বাস করিয়া তা করেন নাই। রাগের মাথায়ই ও সব গাল দিয়াছেন। ছেলের রোগের অন্য কোন কারণ যখন দেখা যায় না, তখন এমনি কিছু একটা হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তাই বলিয়া ডাইনী-পেতনী হইতে যাইবে কেন? ডাইনী-পেতনী না হইলেও জিন-পরী-দেও ইত্যাদিতে পীর সাহেব-কেবলা বিশ্বাস করেন। এ সব জানোয়ারের নাম দীনী কেতাবে আছে। সুতরাং সাবধান হওয়া ভাল। ছোট বিবি ডাইনী না হইয়া যদি দুষ্ট জিন-পরী বা দেও হইয়াও থাকেন, তবু ছেলের দিক দিয়া ওটা একই কথা।

কাজেই পীর সাহেব-কেবলা মনস্তির করিয়া ফেলেন। পরদিন সকালে আওয়াল ওয়াকতে ফজরের নমাজ পড়িয়া তিনি প্রথম যে কাজটি করেন সেটি হইতেছে ছোট বিবির ঘর হইতে হামিদকে সরাইয়া মাজেলা বিবি অর্থাৎ বর্তমানের বড় বিবির ঘরে আনা। পুরা কর্তৃত্বের সাথে এই কাজটি করিয়া তিনি ছেলে লালন-পালনের দায়িত্ব এই দিন হইতে মাজেলা বিবির হাতে তুলিয়া দেন। ছেলের ধারে-কাছে আসিতে ছোট বিবিকে মানা করিয়া দেন।

৯

হামিদকে ছোট বিবির ঘর হইতে সরাইবার সময় একদিকে যেমন হৃদয়হীন কঠোরতা অপরদিকে তেমনি ছিদ্রহীন সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। স্বয়ং পীর সাহেব-কেবলা হাজির থাকিয়া এ সব করাইয়াছেন। ছোট বিবির হৃদয়-বিদারী আত্ননাদে কান দেওয়া হয় নাই। 'শেষবারের মতো বাপজানকে একটিবারের জন্য' কোলে তুলিতে দেওয়া হয় নাই। ছেলের কাছে পর্যন্ত যাইতে দেওয়া হয় নাই। কারণ ছোট বিবির নাকের নিশ্বাসে পর্যন্ত হামিদের অমংগল হয়। এ ছাড়া সাবধানতার বেলায় পীর সাহেবের বুদ্ধির সাথে অন্য বিবি সাহেবদের এমন কি কোনও-কোনও চাকরানীর, বুদ্ধিরও মেশ হইয়াছে। হামিদের কাপড়-চোপড় কাঁথা-বালিশের একটা সুতাও ছোট বিবির ঘরে ফেলিয়া আসা হয় নাই। তন্ন-তন্ন করিয়া তালাশ করিয়া সব জিনিস বাহির করা হইয়াছে। জনে-জনে পৃথক পৃথক তালাশ করিয়াছে। তিন-চারজনের তালাশের পরে আবার 'চূড়ান্ত তালাশ' এবং তারও পরে 'শেষ তালাশ' করা হইয়াছে। চূড়ান্ত তালাশের সময় ছোট বিবির বালিশের নিচে হামিদের খেলার টুনটুনিটি লুকানো পাওয়া গিয়াছিল। ডাইনীরা কি বিচিত্র খেলা! এই ক্ষুদ্র টুনটুনি দিয়াই ছোট বিবি নিজের ঘরে বসিয়া মাজেলা-বিবির-ঘরে-শোওয়া পীরজাদার রক্ত শোষিয়া খাইতেন। কি সাংঘাতিক কথা! ভাগ্যিস পাঁচ-ছয়বার তালাশের পরেও চূড়ান্ত তালাশ করা হইয়াছিল। কোনও চূড়ান্ত তালাশই আসলে চূড়ান্ত তালাশ নয়। কাজেই শেষবারের মতো আবার তালাশ কর। জ্ঞানী লোকের কথা।

সারা সকালটা এইভাবে কাটিয়াছে। সেদিন পীর বাড়ির সকালের নাশতা খাওয়া খুব দেরিতে হইয়াছে। ছোটবিবির নাশতা খাওয়াই হয় নাই। নাশতা খাইবেন কি? তাঁর বুক ফাটিয়া গিয়াছে। যতক্ষণ এঁরা তাঁর ঘরে খানা-তালাশ করেন, ততক্ষণ তিনি এক কোণে পাথরের মতো বসিয়া থাকেন। সকলে মিলিয়া তাঁর উদ্দেশ্যে যে গালাগালি করেন, তাও তাঁর কানে গিয়াছে কিনা বুঝা যায় না। অবশেষে সকলে যখন তাঁর দেহতালাশ করেন, তখন তিনি প্রাণহীন কলের পুতুলের মতো ওদের কথায় উঠেন বসেন দাঁড়ান ও পাশ ফিরেন। একটি কথাও বলেন না। তাঁর চোখের পানি অনেক আগে শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁর হয়তো আর কাঁদিবার শক্তিও নাই। প্রতিবাদ করিবার স্পৃহাও নাই। কিসের প্রতিবাদ করিবেন? এঁরা যখন তাঁর কলিজাটাই ছিঁড়িয়া নিলেন, তখন অন্য কোন্ জিনিসটার জন্য তিনি প্রতিবাদ করিবেন? তাঁর ছিঁড়া কলিজাটা যখন ওঁরা সকলে ধুম-ধরক্কি করিয়া মাজেলা বিবির ঘরের দিকে নিয়া গেলেন, তখন ছোট

বিবিকে একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া থাকিতে দেখা গেল। কিন্তু সত্য-সত্যই তিনি দেখিলেন কি না বোঝা গেল না।

হামিদকে এঘর হইতে নেওয়ার পর্ব শেষ হইবার পর ছোট বিবি উঠেন। ঘরের দরজা বন্ধ করেন। কপাটে খিল মারেন। এইবার নিজেকে একা পাইয়া আর বরদাশত করিতে পারেন না। যেন এতক্ষণের রুদ্ধ কান্নার দরিয়া তাঁর ভাংগিয়া আসে। গলা ফাটাইয়া হাতে ছাতি পিটাইয়া কাঁদিতে তাঁর ইচ্ছা হয়। কিন্তু ফতেপুরের পীর বাড়ির কোনও মেয়েলোকের কান্না বাহিরের লোক আজও শোনে নাই। এত দুঃখেও ছোট বিবির এই বংশ-মর্যাদার ট্রেনিং জয়ী হয়। তিনি দুই হাতে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে থাকেন। খাটের যে অংশে খোকার বিছানা ছিল, সেই অংশে উপুড় হইয়া নাক ঘষিতে থাকেন। তাঁর চোখের পানি আর থামে না।

১০

এই ঘটনার পর যায় আরও তিন মাস। মাজেলা বিবির ঘরে হামিদের সকল প্রকার যত্ন চলে। দুই বিবিই হামিদের দেখাশোনা করেন। চাকরানীরাও সকলেই এক পায় খাড়া। পীর সাহেবও দিনের মধ্যে দশবার খোকার খবর নেন। সময় পাইলেই দেখিতে আসেন।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও খোকার স্বাস্থ্যের কোনই উন্নতি হয় না। এটা পীর বাড়ির সকলের পরাজয়। কাজেই সকলের মাথা একত্রীত হয়। সকল দিক বিবেচিত হয়। এই বিবেচনার ফলে স্পষ্টই ধরা পড়ে যে পীরজাদাকে ডাইনীর ঘর হইতে সরান হইয়াছে বটে, কিন্তু তার নয়র হইতে সরান হয় নাই। ছোট ছেলে-পিলের লহ খাইতে ডাইনীর ধরা ছোঁওয়া লাগে না। তার নজরই যথেষ্ট।

অতএব পীরজাদাকে বারান্দায় আনা বন্ধ হয়। ছোট বিবি যাতে দূর হইতেও কোনমতেই খোকাকে দেখিতে না পান, তার সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত হয়। দালানের এবং উঠানের এই অংশে ছোট বিবির আসা কড়া রকমে নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

আসল কথা এই যে ছোট বিবি সত্য-সত্যই খোকাকে সারা দিনে দুই একবার এক নজর দেখিতে পাইতেন। নিজের কামরার বারান্দায় চেয়ার টুল বা মোড়ায় বসিয়া সত্যই সারা দিন মাজেলা বিবির কামরার বারান্দার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। হয় গোসল করাইতে নয় পায়খানা পেশাব করাইতে অথবা একটু হাওয়া খাওয়াইতে মাজেলা বিবি বা চাকরানীদের কেউ সারা দিনে দু-একবার খোকাকে বারান্দায় আনিতেনই। ছোট বিবি ঐটুকুর জন্য সারা দিন চাহিয়া থাকিতেন।

এখন সেটাও বন্ধ হইয়াছে। বাপজানকে আর বারান্দায় আনা হয় না। দুই-তিন দিন ছেলেকে না দেখিতে পাইয়া ছোট বিবির দম বন্ধ হইয়া আসে। কি ভাবে কি উপায়ে সারা দিনে অন্তত একটিবার ছেলেকে এক নয়র দেখা যায়, ছোট বিবি সে চেষ্টা করিতে থাকেন। চাকরানীদের মধ্যে তসিরনকে তিনি সবচেয়ে বিশ্বাস করিতেন। তসিরনও ছোট বিবিকেই সবচেয়ে বেশি মান্য করে। বস্তুত ছোট বিবি পীর সাহেবের পিয়ারা বিবি থাকাকালে তসিরনই ছিল তাঁর খাস বান্দী। পীর সাহেবের নয়রে ছোট বিবির পতন হওয়ার পরেও তসিরন মনে-মনে ছোট বিবিকে ভালবাসে। একমাত্র সে-ই

ছোট বিবির বদনামে বিশ্বাস করে না। একমাত্র সে-ই গোপনে-গোপনে ছোট বিবির এক-আধটা ফরমায়েশ করিয়া থাকে। তসিরনকেই ছোট বিবি মনের কথা বলেন এবং তার হাতে একটা টাকা গুঁজিয়া দেন। কোনও কৌশলে সে খোকাকে কোলে করিয়া একটি বারের জন্য বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবে। ব্যস, আর কিছু না। এইটুকু করিলেই ছোট বিবি তসিরনের কাছে চিরদিনের জন্য কিনা হইয়া থাকিবেন।

তসিরন সাধ্যমতো চেষ্টা করে। সে খুব হুশিয়ার মেয়ে। সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই সে কাজটা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু ধরা পড়িয়া যায়। পীর সাহেবের বিচারে সে অপরাধী সাব্যস্ত না হইলেও তার উপর সকলের সন্দেহ হয়। পীরজাদার কাছে তার যাতায়াত নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

১১

অগত্যা ছোট বিবি অন্য উপায় চিন্তা করিতে শুরু করেন। শেষে ঠিক করেন, রাতের বেলা সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে তিনি জানালার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া ছেলেকে দেখিয়া আসিবেন। ছেলেকে মাজেলা বিবির ঘরে নেওয়ার পর হইতে সে ঘরেও সারা রাত্রি হারিকেন জ্বালান থাকে। এ ব্যবস্থা ছোট বিবির ঘরেও ছিল। মাজেলা বিবির ঘরেও চালু রাখা হইয়াছে। হারিকেনটা টেবিলের উপর থাকে। তাতে খাটের উপর শোওয়া ছেলেকে স্পষ্ট দেখা যায়। ছেলের শোওয়ার জায়গা, জানালা হইতে তাঁর দূরত্ব সবই ছোট বিবির জানা। কাজেই এই ব্যবস্থাই ঠিক।

উত্তরে-দক্ষিণে পঞ্চাশ হাত লম্বা দালানের অল্প দক্ষিণের কামরা ছোট বিবির। আর অল্প উত্তরের কামরা মাজেলা বিবির। ছোট বিবির কামরার লাগ কামরাতেই থাকেন স্বয়ং পীর সাহেব-কেবলা। মাজেলা বিবির কামরার লাগ দক্ষিণের কামরায় থাকেন মাজেলা বিবি। সুতরাং বারান্দা দিয়া ছেলে দেখিতে যাওয়ার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। উত্তরের ভিটির আল্গা দালানটিতে বড় বিবি থাকিতেন। হামিদকে প্রসব করিয়াই তিনি মারা যাওয়ার পর হইতে ঐ দালানে কেউ থাকে না। প্রায় সব সময়ে, বিশেষত রাতের বেলা, ওর দরজা বন্ধই থাকে। নিজের কামরা হইতে বাহির হইয়াই যদি ছোট বিবি উঠানে নামিয়া পড়েন এবং উঠানের মধ্যে দিয়া, বরঞ্চ পশ্চিম পাশ ঘেষিয়া, সোজা উত্তরের খালি দালানের বারান্দায় গিয়া উঠেন এবং সেখান হইতে উঁকি-ঝুঁকি দিয়া দেখিয়া-গুনিয়া টিপি-টিপি পা ফেলিয়া যদি তিনি মাজেলা বিবির কামরার বারান্দায় যান, তবে কেউ আহট পাইবে না। খোকাকে এক নজর দেখিয়াই তিনি চুপ-চাপ চলিয়া আসিবেন। কি হইল জানিতেও পারিবে না কেউ।

সেদিন গভীর রাত্রে মাজেলা বিবি ও তাঁর ঘরের চাকরানীর হৈ হুলায় পীর সাহেব-কেবলার এবং বাড়ির আর সকলের ঘুম ভাঙিয়া যায়। পীর সাহেব-কেবলা নিজের কামরার দরজা খুলিয়া বারান্দায় পা দিতেই উঠানে ছায়ার মতো একটা লোক দেখিতে পান। ছায়াটা উঠানের মাঝখান দিয়া দৌড়িয়া উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। পীর সাহেবকে সে বোধ হয় দেখিয়া ফেলে। তাঁকে এড়াইবার জন্যই বোধ হয় সে দক্ষিণ-ভিটির ঘরের অন্ধকার ছায়ায় লুকাইয়া পড়ে। পীর সাহেব ‘কে’ ‘কেটা’ বলিতে-বলিতে বারান্দা হইতে উঠানে নামেন। ছায়ামূর্তি তখন দক্ষিণ ভিটির ঘরের

অন্ধকার সাধুগল ঘেষিয়া ছোট বিবির কামরার সিঁড়ির সামনে আসে এবং সিঁড়ি বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। ততক্ষণে পীর সাহেব ছায়ামূর্তি চিনিয়া ফেলেন। ওটা ছোট বিবি। পীর সাহেব একটা অভদ্র গাল দিয়া তাঁকে ধরিতে ছুটিয়া যান। পীর সাহেবের সে গালির ধমকে বোধ হয় ছোট বিবি ঘাবড়াইয়া যান। তিনি এন্ত-ব্যস্ততার সংগে সিঁড়িতে উঠিতে গিয়া পড়িয়া যান। এই সুযোগে পীর সাহেব ছোট বিবির চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁকে টানিয়া খাড়া করেন এবং বেদেরেগ কিল-ঘুষি ও লাথি-গুড়ি মারিতে থাকেন। ইতিমধ্যে বাড়ির আর সকলে আসিয়া পড়েন। তার মধ্যে মাজেলা বিবির চাকরানীর হাতে হারিকেন। সেই হারিকেনের আলোতে সবাই ছোট বিবির আল-থালু বেশ দেখেন। ছোট বিবি কিভাবে জানালার মাঝে জিভ বাড়াইয়া পীরজাদার রক্তপান করিতেছিলেন, কিভাবে ধরা পড়িয়া ছুটিয়া পলাইলেন মাজেলা বিবি তাঁর চাকরানীদের সাক্ষ্যে সবিস্তারে তা বয়ান করেন। খোকার গায়ের লহু ডাইনীর ঠোটে-মুখে দেখাইয়া নিজেদের কথার সত্যতা প্রমাণ করেন। পীর সাহেবের ঘুষিতে ছোট বিবির গালটি বাইয়া সত্য লহু পড়িতেছে। সকলে বুঝিতে পারেন, পীর সাহেব-কেবলা এসব কথা আগেই গায়েবী জানিতে পারেন। তাই ছোট বিবিকে বেদম মার-ধর করিতেছিলেন। সকলে আসায় তিনি মারের বেগ কমাইয়াছিলেন। মাজেলা বিবিও তাঁর চাকরানীর বর্ণনা শুনিবার পর পীর সাহেব আবার দ্বিগুণ তেজে মার-ধর করেন। সে মারের চোটে ছোট বিবি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পীর সাহেবের হুকুমে বেহুশ ছোট বিবিকে টানিয়া-হেঁচড়াইয়া তাঁর কামরায় নিয়া বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দেওয়া হয়। তারপর বাড়িগুহা লোক খাতিরজমা হইয়া ছোট বিবির সমালোচনা শুরু করেন।

গভীর রাত্রের হৈ-হল্লায় পাড়া-প্রতিবেশীরও ঘুম ভাঙিয়াছিল। তারাও পীর বাড়িতে আসিয়া ভিড় করেন। পীর সাহেব-কেবলা বাহির হইয়া না। অত রাত্রে তিনি শুধু পাড়া-পড়শীর খাতিরে বাহির-বাড়ি আসিবেন, এটা কেউ আশাও করে না। চাকরানীদের কাছে-শোনা-কথা চাকরদের মুখে শুনিয়াই পাড়া-পড়শীরা সব বুঝিতে পারে। তারা একদম চাক্ষুষ সাক্ষীর মারফত জানিতে পারে যে ছোট বিবি মাজেলা বিবির কামরার জানালার শিকের ফাঁক দিয়া ভিতরে ঢুকেন এবং দুই হাত লম্বা লকলকা জিভ দিয়া পীরজাদার লহু পান করিতে থাকেন। পীরজাদার কান্নায় মাজেলা বিবির ঘুম ভাঙিয়া যায়। তিনি চিৎকার করেন। ছোট বিবি হাতে-নাতে ধরা পড়ায় ফুরুৎ করিয়া শিকের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়েন। কিন্তু যতই ভূত-পেতনী হউক পীর সাহেব-কেবলাকে ত আর ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাঁর হাতে ধরা পড়িয়া পেতনী সব অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। পীর সাহেব-কেবলা পেতনীটাকে জিজির দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

সব শুনিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পাড়া-পড়শীরা যার-যার বাড়ি ফিরিয়া যায়। যাইবে না? সকলের বাড়িতেই ত ছোট ছেলেমেয়ে আছে। জিজির দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেও ভূত-পেতনীর উপর ত বিশ্বাস নাই।

বাকি রাত্রিটা পীর বাড়ির কেউই বিছানায় পিঠি লাগান না। সকলে বসিয়া কাটান। পরদিন সকালে পীর সাহেবের হুকুমে একটা পালকি আসে। ছোট বিবিকে জোর করিয়া সেই পালকিতে তুলিয়া তাঁর ভাই-এর বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

এ এলাকায় ছোট বিবির সুনাম সুযশ ছিল অসাধারণ। ছোট-বড় ধনী-গরিব সকলেই, এমন কি যারা পীর সাহেবের মুরিদ নয় তারাও, ছোট বিবিকে খুব মান্য করিয়া চলিত। পুরুষরা কেউ ছোট বিবিকে দেখে নাই। কিন্তু এ অঞ্চলের মেয়েলোকদের অনেকেই পীর বাড়িতে আসিয়া ছোট বিবিকে দেখিয়া গিয়াছে। এই সব মেয়েলোকের এবং ফকির-মিসকিনদের মুখে মুখে চারদিকের পুরুষ-মহলেও ছোট বিবির যশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দান-খয়রাতে নমাজ-বন্দেগিতে মেযাজ-মর্জিতে হাসি-খুশিতে ছোট বিবির মতো মেয়েলোক তারা কেউ কোনদিন দেখে নাই। অত বড় লোকের পিয়ারা বিবি হইয়াও তাঁর মধ্যে এক বিন্দু দেমাগ গরিমা নাই। ছোটবড় সকল মেয়েলোকের সাথে কি ভাবে মিশেন! কত দরদ দিয়া গরিবের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে! পাড়ার মেয়েলোকদের লইয়া কি রকম মজলিশ করিয়া পুথি-কিতাব পড়িয়া শুনান! কেউ বুঝিতে না পারিলে কি সুন্দর-সুন্দর মেছাল দিয়া বুঝাইয়া দেন। পাড়ার অনেক মেয়েলোক তাদের প্রবাসী বা কয়েদী স্বামী-পুত্রের -লেখা চিঠি আনিয়া ছোট বিবিকে দিয়া পড়াইয়া নিয়াছে। তাদের মতে ছোট বিবি অনেক সরকার-মাস্টারের কাছে বেশি লেখা-পড়া জানেন। এই সব কারণে এবং ছোট বিবির চক্ৰিশ ঘনমুখ-হাসি মুখখানার দরুন এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে বলে পীর বাড়ির চেরাগ।

এমন জনপ্রিয় ছোট বিবিই শেষ পর্যন্ত ডাইনী সাব্যস্ত হওয়ায় প্রথম প্রথম সকলেই দুঃখিত হয়। অনেকেই এ কথাটায় অবিশ্বাসও করে। কিন্তু পীর সাহেব-কেবলাই এ অভিযোগ করিতেছেন বলিয়া অনেকে মুখ ফুটিয়া অবিশ্বাস জানাইতেও পারে না। পীর সাহেবের যারা অন্ধ ভক্ত তারা সকলে গোড়া হইতেই ছোট বিবিকে ডাইনী বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। ফলে ছোট বিবিকে কেন্দ্র করিয়া এ অঞ্চলে বছর খানেক ধরিয়া দুইটি দল দেখা দিয়াছিল।

কিন্তু পীর সাহেব যেদিন ছোট বিবিকে বাড়ির বাহির করিয়া দেন, সেদিন দল-নির্বিশেষে এ অঞ্চলের সকলেই আহা-আহা করিয়া উঠে। যতই হোক, যাই হোক, ছোটবিবিকে এভাবে বাহির করিয়া দেওয়া ঠিক হয় নাই। পীর সাহেব কত জিন-পরী দেও-দানব পালেন, একটা ডাইনীও তিনি নিশ্চয়ই দমন করিয়া রাখিতে পারিতেন। কিন্তু পীর সাহেব-কেবলার দোষ ধরা গোনা। কাজেই ছোট বিবির উপর অনুষ্ঠিত এই অবিচারের জন্য লোকজনের রাগ গিয়া পড়ে শিশু পীরজাদার উপর। অনেকে বলাবলি শুরু করে: ছোট বিবি ত রাক্ষসী নয়। আসল রাক্ষস ঐ ছেলেটা। তারা ত আগেই বলিয়াছিল পীর সাহেবের ঘরে এটা দয়্যাল পয়দা হইয়াছে। ঝড়-তুফানে ঠাঠা-বিজলিতে দুনিয়া ওলট-পালট করিয়া পয়দা হইল, মাটিতে পড়িয়াই মা-জননীকে খাইল। তারপর ফেরেশতার মতো যে মেয়ে লোকটি মা-মরা শিশুকে লালন-পালন করিতে শুরু করিলেন তাকেই কিনা শেষ পর্যন্ত ডাইনী প্রমাণ করিয়া ঘর-ছাড়া করিল এই দয়্যাল। আর কার যে কি করে, একমাত্র আলিমুল-গায়েবই জানে।

কিন্তু ছোটবিবির এই সব ভক্তের ভুল ভাংগিতে বেশি দিন লাগে না। পাড়া-পড়শী মুরিদ-মোতেকাদ সবাই অল্পদিনেই শুনিয়া ও দেখিয়া তাজ্জব হইয়া যায় যে ছোট বিবি

যাওয়ার পরদিন হইতেই পীরজাদার অসুখ সারিতে আরম্ভ করে। সাত দিনের মধ্যে ছেলের পেটের অসুখ একদম সারিয়া যায়। পনের দিনের মধ্যে ছেলে উঠিয়া দাঁড়ায়। এক মাসের মধ্যে হাঁটা শুরু করে। তিন মাসের মধ্যে ছেলে সারা উঠানে দৌড়াদৌড়ি করে। সর্বদাই সে খলখল করিয়া হাসে। চেহারা তরল লহমি দেখা দেয়। সর্বাংগে স্বাস্থ্যের লক্ষণ ফুটিয়া উঠে।

পাড়া-পড়শীর এই বিশ্বাসে পীর সাহেবের প্রতি তাদের ভক্তি বাড়ে। তাঁর বুয়ুর্গি ও কেরামতির যশ হয় দশ-গুণ। পীর সাহেবের গায়েবী ইলিম ও বাতেনী যত্নে এতদিন যাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল, তাদেরও ইমান এবার পাকা হয়। হইবারই কথা। পীর সাহেবের মতো গায়েবী ইলিমওয়ালা লোক না হইয়া সাধারণ লোক হইলে অবস্থাটা কি হইত? তারা ডাইনীর এই চালাকি কিছুতেই ধরিতে পারিত না। খুবসুরং আওরতের রূপ ধরিয়া তারা আউলিয়া-দরবেশের ঘরে পর্যন্ত প্রবেশ করিবার সাহস করিত। একথা তারা এই প্রথম জানিতে পারিয়াছে। এর আগে পুঁথি-পুস্তকেও তারা এমন তাজ্জবের কথা পড়ে নাই। অথচ চোখের সামনে আজ তাই ঘটিয়া গেল। এটা ত আর অবিশ্বাস করা যায় না। পীর সাহেব বলিয়াই রক্ষা। আর যা-তা পীর হইলেই বা কি হইত? হাসিনা-আওরতের চালাকি বোঝা যে-সে পীরের কাজ নয়। কতপূরের পীর বাড়িতে ঢুকিয়া ডাইনী একদিকে জনসাধারণের উপকারই করিয়াছে। পীর সাহেব কেবলার ঘরে না ঢুকিয়া যদি পাড়া-পড়শীর কারও ঘরে ঢুকিত তবে অবস্থাটা---। আর চিন্তা করা যায় না। সকলের গা কাঁটা দিয়া উঠে। চোখ বন্ধ হইয়া আসে।

পীর সাহেবের বুয়ুর্গি জাহির হওয়ার সংগে তাঁর মুরিদের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যায়। তাঁরা এবং পুরাতন মুরিদরাও ডাইনী-ধরার ভেদ জানিবার ও খলিফারা তা শিখিবার জন্য পীর সাহেবকে দিন-রাত খোশামুদ করিতে থাকেন। সকলে বা একাধিক লোক এজমালিতে জানিতে চাহিলে পীর সাহেব সে ভেদ-কথা বলিবেন না, এটা সহজ কথা। কাজেই সকলেই পীর সাহেব-কেবলার সাথে 'গোপনে একটা কথা' বলিবার আরজু পেশ করিতে থাকেন।

আম্ লোকেরা ডাইনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে যার-তার বাড়ি 'বন্ধ' করিবার জন্য পীর সাহেব-কেবলার নিকট হইতে তাবিজ-কবচ নিতে লাগে। এ বাবদ পীর সাহেবের বাড়িতে কিছুদিন খুব ভিড় হয়। ভিড় মানেই আয়।

বংশের চেরাগ জ্বলিল

১

পীরজাদা সৈয়দ আবুল ফয়েয মোহাম্মদ আবদুল হামিদ সিদ্দিকী আল-কোরায়েশীর বয়স এখন আট বছর। পীর বাড়ির মাদ্রাসায় জমাতে হাশ্‌তমে পড়ে। তেয যেহান, তীক্ষ্ণ মেধা তার। ভর্তি হওয়ার আগেই কায়দায় বগদাদী, মতন কোরআন, রাহে-নাজাত, মেফতাহুল জান্নাত পড়িয়া ফেলিয়াছিল। জমাতে নহমে ভর্তি হইয়া ছয় মাসে হাশ্‌তমে প্রমোশন পাইয়াছে। মিয়ানুস-সরফ মিয়ান মনশব প্রভৃতি নহ-সরফের কঠিন-কঠিন কিতাব পড়িয়া ফেলিয়াছে। উপরের জমাতে বিষয়সমূহ তালিম করিবার তার ক্ষমতা সকলকে বিস্মিত করিয়াছে। পীরজাদার তারিফে মুদাররেসরা পঞ্চমুখ। পীর সাহেব-কেবলার সামনে ত রীতিমতো প্রতিযোগিতা। সকলের মুখে এক কথা পীর বংশ উজ্জ্বল করিবার জন্যই আল্লাহ এই প্রতিভা নাযিল করিয়াছেন।

এ সম্পর্কে আর কোনই সন্দেহ থাকিল না যেদিন পাশের গ্রামের মদন ঠাকুর পীরজাদার হাত দেখিয়া জিভ কাটিয়া জোড় হাতে তাকে নমস্কার করিল। সকলের ধরাধরিতে ঠাকুর বলিল: রাজভাগ্য বিশ্বজোড়া যশ। আমার জীবনে এমন হাত আর একটিও দেখি নাই।

পীর সাহেব-কেবলা এসব কুফরী কালামে বিশ্বাস করেন না। তবু শুধু কৌতূহল-বশে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া দু'চারটা প্রশ্ন করেন।

উত্তরে ঠাকুর বলে: সিংহ রাশি, বৃহস্পতির শুভ দৃষ্টি, সাহসে বীরত্বে শত্রু-নিধনে আশ্রিত পালনে যশোগৌরবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিবেন।

পীর সাহেব-কেবলা হাসিতে থাকেন। নিশ্চয়ই উপেক্ষা-অবিশ্বাসের হাসি।

ঠাকুর বলিয়া চলে: তবে এই রাজপুত্রের রাজভাগ্যের মীন রেখায় কেতু মংগল ও রাহুর দৃষ্টি পড়ায় সামান্য বিপদ ও ফাঁড়া আছে।

পীর সাহেবের হাসি মুখ হঠাৎ অন্ধকার হইয়া যায়। ঠাকুরের কুফরী কালাম অসহ্য হওয়াতে নিশ্চয়ই।

কিন্তু ঠাকুর অভিজ্ঞ শেয়ানা লোক। সে বলিয়া চলে: শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিলেই সে ফাঁড়া কাটিয়া যাইবে।

পীর সাহেব-কেবলার অন্ধকার মুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে। নজ্জুমিতে বিশ্বাস করা ত বটেই কান পাতিয়া শোনাও গোনা। কাজেই পীর সাহেব-কেবলা ঠাকুরকে টিকিতে দেন না। তবে ঠাকুর গরিব মানুষ, ভিক্ষা করিয়া খায়, এই কারণে তাকে একটা টাকা দিয়া বিদায় করিতে বলিয়া দেন। অন্দর-মহল হইতে এক টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা আনিয়া চাকর ঠাকুরের হাতে গুঁজিয়া দেয়। ঠাকুর উঁচা গলায় 'রাজ-ভাগ্য' 'রাজ-ভাগ্য' বলিতে-বলিতে বিদায় হয়।

পীর বংশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রদীপ হামিদ। কিন্তু জ্বলে টিম্‌টিম্‌ করিয়া। শৈশবের পেটের পীড়া তার সারে না। হাত-পা তার সরু-সরু। পেটটা ঢোলের মতো। মাথাটা বেমানান বড়। সরু ঘাড় সে মাথার ভার যেন সহিতে পারে না। বুকটা মুরগীর সিনার মতো চিপা। পাঁজরের হাড়গুলি দূর হইতে গোনা যায়। মুরিদ-মোতেকাদদের মধ্যে হাকিম ডাক্তার কবিরাজের অভাব নাই। পীরজাদার চিকিৎসার জন্য তাঁদের মধ্যে দস্তর-মতো প্রতিযোগিতা। চলেও হরেক রকম চিকিৎসা। স্বয়ং পীর সাহেবের ভরসা খোদার উপর। এত ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যেও ছেলে মরে নাই। এর তাৎপর্য পীর সাহেব বুঝিয়াছেন। এই ছেলেকে দিয়াই আল্লাহ ফতেপুর পীর বংশের গৌরব বাড়াইবেন। কাজেই শত আপদবালার মধ্যেও খোদা তাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই। যার যা খুশী ঔষধ দিক। পীর সাহেব 'হাঁ'-তেও নাই, 'না'-তেও নাই। মুরিদরা বুঝে, আল্লার সাথে পীর সাহেব-কেবলার একটা বুঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে। তারাও নিশ্চিন্ত।

সুতরাং পীরজাদা হামিদের স্বাস্থ্যহীনতা চিন্তার কারণ নয়। চিন্তার কারণ অন্যটা। সেটা এই স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন আধ-মরা ছেলের পড়া-শোনায় যেমন তার প্রতিভা, দুষ্টামির প্রতিভা তার চেয়েও বেশি। এক মূহূর্ত সে শান্ত থাকে না। হয় পড়াশোনা লইয়া থাকিবে, নয় ত দুষ্টামি করিয়া বেড়াইবে। যতক্ষণ সে বই লইয়া থাকে, ততক্ষণ দুষ্টামি খেলাধুলা এমন কি খাওয়া-পরা ভুলিয়া যায়। পাঁচবার না ডাকিলে এবং ত্রয়োজোলা বিবি হাত ধরিয়া টানিয়া না আনিলে সে খাইতে আসে না।

কিন্তু বই ফেলিয়া উঠিলেই সর্বনাশ। একটা দা বা লাঠি হাতে সে বাহির হইয়া পড়িবে। দা হাতে থাকিলে সামনে চারা গাছ-পালা যা পাইবে কাটিয়া চলিবে। লাঠি হাতে থাকিলে সামনে মানুষ-গরু ছাগল-মুরগী যা পাইবে পিটাইয়া চলিবে। অবশেষে নিজের হাতে-পায় দাঁয়ের একটা জখম বা লাঠির আঘাত লইয়া গোপনে বাড়ি ফিরে। কাউকে কিছু বলে না। জখমের লহর নাগাড় দেখিয়া অথবা হাত-পায় ফোলা দাগ দেখিয়া বিবি সাহেবরা টের পান।

২

এমনি হয় প্রায়ই। এসব কুকাজের যা কৈফিয়ৎ সে দেয়, তা রেডিমেড ও চমৎকার। সে সব খণ্ডাইবার সাধ্য বিবি সাহেবদের নাই। অনেক সময় স্বয়ং পীর সাহেবের কাছেও অভিযোগ যায়। ছেলের কৈফিয়ৎ তাঁরও কাছে চটপট দ্বিধাহীন। তাঁর রাগও হয়, দুঃখও হয়, হাসিও পায়। হাসি তিনি চাপেন। দুঃখ গোপন করেন। রাগ জাহির করেন। কিন্তু ফল হয় না।

একদিন পীর সাহেবের কাছে নালিশ হয়, পাশের বাড়ির রেফাতুল্লার মতো মস্তবড় জোয়ানের পিঠে পীরজাদা লাঠির এমন ঘা মারিয়াছে যাতে রেফাতুল্লার পিঠ ফুলিয়া গিয়াছে, বেদনায় জ্বর উঠিয়াছে। পীর সাহেব বিচারে বসেন। আসামী পীরজাদা কৈফিয়ৎ দেয়: তার কোনও দোষ নাই। সব দোষ রেফাতুল্লার। রেফাতুল্লা গুজা হইয়া পিঠ পাতিয়া বসিয়াছিল। তার পিঠটা ছিল টানটান। হামিদের হাতে ছিল লাঠি। অমন পিঠ লাঠি বসাইবার কি সুন্দর জায়গা! এ অবস্থায় হামিদ লাঠি মারিবে না? রেফাতুল্লা

অমন সুন্দরভাবে পিঠ-টান করিয়া বসিয়া না থাকিলে হামিদ কখনও তার পিঠে লাঠি মারিত না। এখন বুঝুক সকলে দোষ কার?

রেফাতুল্লা জ্বর লইয়াই সেখানে হাযির ছিল। সে কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিল: সে চাটাই বুনিতেন। কাজেই পিঠ গুজা করিয়া না বসিয়া উপায় ছিল না। কিন্তু পীরজাদার বলিবার ভংগিতে উপস্থিত সকলের উচ্চ হাসিতে রেফাতুল্লার কৈফিয়ৎ তলাইয়া যায়। পীর সাহেব খোদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া পারেন না। পরে অবশ্য তওবা আস্তাগফার পড়েন। হাজিরান মজলিসের সর্বসম্মত রায় অনুসারে পীর সাহেব-কেবলা রেফাতুল্লাকে প্রবোধ দিয়া এবং ভবিষ্যতে খোলা জায়গায় ওভাবে পিঠ পাতিয়া না বসিতে উপদেশ দিয়া বিদায় করেন।

পুকুরের পাড়ে পীর সাহেব অনেকগুলি ফজলী আমের চারা লাগাইয়া ছিলেন। সেগুলি বেশখানিকটা বড়ও হইয়াছিল। একদিন দেখা গেল, হামিদ সে সব চারা কাটিয়া ফেলিয়াছে। ওগুলি ছিল পীর সাহেবের বড় আদরের চারা। কাজেই তিনি বিষম রাগিয়া গেলেন। হামিদের কৈফিয়ৎ তলব করা হইল। সে অসংকোচে জবাব দিল: দোষ তার নয়, দোষ ভুতা দাওটার অথবা যে তাকে ঐ ভুতা দাও দিয়াছিল তার। কারণ হামিদ প্রথমেই আমের চারা কাটিতে যায় নাই। বড় গাছই কাটিতে গিয়াছিল। কিন্তু ভুতা দাওয়ে তা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই সে অগত্যা চারা গাছগুলি কাটিয়াছে।

এ কৈফিয়তের কোনও জবাব নাই। কাজেই হামিদের কোনও শাস্তি হয় না। পীর সাহেব ছেলের কাছে পরাজিত হন। গজ-গজা রাগ গোপন করেন। কিন্তু প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। বিবিদের সাথে সলা-পরামর্শ করেন। উপায়ও একটা বাহির করেন। সে উপায় হামিদকে পড়া-শোনায় ডুবাইয়া রাখা। পীর সাহেবের কুতুবখানায় উর্দু-ফারসী আরবী-বাংলা কিতাব অনেক। বিবি সাহেবদের পুঁথি পড়ার শখ আছে। বিশেষত: ছোটবিবির খুবই ছিল। তাঁরই তত্ত্বাবধায় কেনাও হইয়াছিল অনেক পুঁথি। এই সব বই-পুস্তক মিলিয়া পীর বাড়ির কুতুবখানা মোটামুটি মন্দ বড় নয়। হামিদ আগে হইতেই গোপনে এই কুতুবখানায় ঢুকিয়া পড়াশোনা করিত। পড়াশোনা করিত মানে বই-পুস্তক ঘাটাঘাটি করিত। বড়-বড় বাঁধানো কিতাবের জিলদ ভাংগিয়া ফেলিবে ভয়ে পীর সাহেব ওতে আপত্তি করিতেন। কাজেই লাইব্রেরিতে ঢুকার কাজটা হামিদকে গোপনেই করিতে হইত।

বিবি সাহেবদের পরামর্শে পীর সাহেব এবার তাঁর আপত্তি প্রত্যাহার করেন। কুতুবখানায় হামিদের প্রবেশ মনজুর হয়। খবর পাইয়া হামিদ সেই যে কুতুবখানায় ঢুকে, আর বাহির হয় না। দা লাঠি ও খেলা-ধুলার কথা সে একদম ভুলিয়া যায়। হামিদের দুষ্টামি ও উৎপাত হইতে সকলে রক্ষা পায়।

৩

কিন্তু বিবি সাহেবরা পড়েন বিপদে। হামিদকে আর ডাকিয়াও গোসল-খাওয়া করান যায় না। সে দিন-রাত কুতুবখানায় পড়িয়া থাকে। বিবি সাহেবদের পাঁচটা ডাকের মাথায়ও সে বলে: এই আসতেছি। ঘন-ঘন ডাকিলে সে বিরক্তি প্রকাশ করে। হাত ধরিয়া টানিতে গেলে সে রাগ করে। যখন খুশী আসিয়া নাকে-মুখে দু-চার লুক্কা গুঁজিয়া

তাড়াতাড়ি ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া পানি খাইয়া উঠানে কুলি ফেলিয়া তোয়ালিয়ার অভাবে পরনের লুংগিতেই মুখ মুছিতে-মুছিতে আবার সে কুতুবখানায় ঢুকিয়া পড়ে।

পেটের পীড়ার রোগী। এভাবে গোসল-খাওয়ায় অনিয়ম করিলে কয়দিন বাঁচিবে? অগত্যা পীর সাহেবের কাছে নালিশ হয়। তিনি এক দিন চুপিচুপি আসিয়া কুতুবখানায় উঁকি দিয়া দেখেন। দেখিয়া অবাক হন। ছোট বড় এক রাশি কেতাব টেবিলের উপর খোলা। হামিদ ঐসব কেতাব হইতে কিং যেন নকল করিতেছে। চেয়ারে বসিয়া গলা বাড়াইয়া একবার এ-কেতাবে আবার ও-কেতাবে নজর বুলাইতেছে। আর লিখিতেছে। লিখিতেছে মানে কাগজের উপর পাখের কলম পং-পং আওয়াজ করিতেছে। হামিদের বেশিরভাগ বাহির-করা জিভটা বাঁকিয়া উপরের ঠোঁটে লাগিয়া আছে। কলমের পং-পং আওয়াজের সাথে-সাথে বাহির করা জিভের মাথাটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে যাইতেছে আসিতেছে। পীর সাহেব মনে-মনে হাসেন। ও লেখে কি? লেখা-পড়ার জানে কি সে? আর ঐসব বড়-বড় কিতাব দিয়াই বা সে কি করে? সব ত সে পড়িতেই জানে না, বুঝিবে কি? পীর সাহেব খুবই আন্তে-আন্তে পা ফেলিয়া পিছন দিক হইতে তার কাছে যান। উঁকি মারিয়া দেখেন, শাহনাম আলেফলায়লা কাসাসুল আখিয়া তায়কিরাতুল আউলিয়া নিয়ামতে-দুনিয়া ও আখেরাত বেহেশতী জেগুনাকশে-সোলেমানী তালেনামা খাবনামা কিমিয়ায় সা'দৎ গুনিয়াতুত্‌তালেবিন মিনুহফুল আবেদিন ফতহুল গায়েব তায়কিরাতুলআশেকিন ইত্যাদি বাংলা-উর্দু ও আরবী-ফারসী কেতাব টেবিলের উপর খোলা। হামিদ ওদেরই উপর চোখ বুলাইতেছে এবং যেন ও-সবই নকল করিতেছে।

পীর সাহেব যেমন চুপি-চুপি আসেন, তেমনি চুপি-চুপি ফিরিয়া যান। অপেক্ষমান বিবি-সাহেব ও চাকরানীদের তিন আঙুলের ইশারায়া চলিয়া যাইতে বলেন। নিজে নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়েন।

খুবই চিন্তাযুক্ত হন। ঐ সব কিতাবের সবগুলি স্বয়ং পীর সাহেবই আজো পড়িয়া দেখেন নাই। আর হামিদ পড়িবে কি? বাংলা-উর্দু কিতাবের কিছু-কিছু সে পড়িলে পড়িতেও পারে। কিন্তু আরবী-ফারসী কেতাবের জানে কি সে? তবে হামিদ ঐ সব কেতাব বাহির করিল কেমন করিয়া? কেতাবগুলির নামও ত তার পড়িতে পারার কথা নয়। সবগুলি ত তুগ্‌রা হরফে লেখ। ব্যাপারটার কোন মানে মতলব তিনি বুঝিতে পারেন না। চিন্তায় তাঁর ক্র কুণ্ঠিত হয়। হে খোদা, ছেলেটা কি পাগল হইয়া গেল?

এরপর মাদ্রাসার মুদাররেসদের সংগে পীর সাহেব সলা-পরামর্শ করেন। একদিন হামিদকে বাকায়দা মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। নিয়মিতভাবে গোসল খাওয়া সারিয়া ঘন্টা বাজার সংগে-সংগে ঠিক টাইমমতো মাদ্রাসায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। রীতিমতো মাদ্রাসায় হাজিরা না দিলে শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া ভয় দেখান হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই দরকার হয় না। হামিদ সবচাইতে নিয়মানুবর্তী ছাত্র বলিয়া নাম করে। পড়াশোনায় সহপাঠীদের ডিংগাইয়া যায়। ছয় মাসে নহম হইতে হাশতমে প্রমোশন পায়। পীর সাহেব কেবলা ও বিবি সাহেবদের সমস্ত চিন্তা দূর হয়।

৪

কিন্তু পীর সাহেব কেবলা ও তাঁর বিবি সাহেবদের বরাতে শান্তি ছিল না। ছেলের বাপ-মা হওয়া বড় কঠিন কাজ, বিশেষত: সে ছেলে যদি স্বাস্থ্যহীন ও প্রতিভাবান হয়। পীর সাহেব ও তাঁর বিবিদের কারও এ অভিজ্ঞতা ছিল না। বৃদ্ধা বয়সে এমন ছেলে পাইয়া তাঁদের অস্বস্তি একটার পর একটা লাগিয়াই আছে। অল্পদিন পরেই দুশ্চিন্তা দেখা দিল। দুই দিক হইতে। এক দিক, সে পীর সাহেবকে প্রকাশ্য দরবারে তরিকৎ-মারফত সম্বন্ধে অশোভন প্রশ্ন করিয়া তাঁকে বেকায়দার ফেলে। দ্বিতীয় দিক, দিনের বেলা নফল রোযা ও রাতের বেলা নফল এবাদতে মশ্গল হয়।

মুরিদ-মোতেকাদদের লইয়া দরবার করিবার সময় পীরজাদা হামিদকেও দরবারে বসান হয়। এটা নাকি ফতেপুর পীর বংশের হাজার বছরের রেওয়াজ। পীর সাহেব-কেবলার গদির অদূরে ডান দিকে একটি ছোট গদি। পীর সাহেবের গদির মতো সেটাও মখমলের। তার পিছন দিকেও, একটি ছোট তাকিয়া। পীরজাদা যখন-খুশী তখন আসিয়া ওতে বসে। মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পর হইতে দিনের বেলার দরবারে সে খুব কমই বসে। কিন্তু সন্ধ্যার পরে দরবারে বসে সে নিয়মিতভাবেই। এবং কান-মাগরেবের দরবারই হয় সবচেয়ে সরগরম।

এইসব দরবারে হামিদ শিশু-সুলভ কৌতূহলে চোখ বড় করিয়া বাপের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁর নসিহত শুনে। সে সব নসিহতে মুরিদদের মনে কি ভাব হয়, দেখিবার জন্য সে মাঝে-মাঝে মুরিদদের পানেও তাকায়। ফলে মুরিদরাও পীরজাদার দিকে তাকায়। তাঁরা দেখে, পীরজাদা একবার পীর সাহেবের দিকে আরেকবার মুরিদদের দিকে তাকাইয়া অনবরত ঘাড় ও মস্তক নাড়িতেছে। পীরজাদার এই মাথা নাড়া, অনেক মুরিদের কাছেই বড় ভাল লাগে। হামিদের চেহারা খুব-সুন্দর না হইলেও তার চোখ দুইটা বড় সুন্দর। সে চোখ হইতে জ্যোতি ফটিয়া বাহির হইতেছে মনে হয়। এই চোখের জন্যই তার দিকে না চাহিয়া পারা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য। হামিদ কারও দিকে চাহিলে সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া নিতে বাধ্য হয়। কারণ সে চোখের জ্যোতির ঝলসানো তেজ সহ্য করা যায় না।

এমনি এক দরবারে হামিদ হঠাৎ সওয়াল করিয়া বসে: আব্বাজান, আপনি আল্লার কথা কইতে গিয়া উপরের দিকে হাত ইশারা করেন কেন? আল্লাহ কি আসমানে থাকেন?

পীর সাহেব চমকিয়া উঠেন। কিন্তু মুহূর্তেকের জন্য। পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পুত্রের মুখের দিকে স্থিত হাস্যে চাহিয়া দরবারের দিকে মুখ ঘুরান। মুখে গর্বের হাসি। ভাবটা এই: দেখলা তোমরা? এমন সওয়াল শুধু আমার ছেলেই করতে পারে।

মাথাটা দুই-তিনবার ঝুকাইয়া ছেলের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলেন: বাবা, এটা বুঝবার বয়স তোমার এখনো হয় নাই।

হামিদ আবদারের সুরে জিদ করিয়া বলে: না আক্বা, বলতেই হবে, আল্লার আরশ কোথায়?

মুরিদ-মোতেকাদরা ঘাবড়াইয়া যান। পীর সাহেব-কেবলার মুখামুখি এমন তর্ক করিতে কাউকে তাঁরা কখনও দেখেন নাই। কিন্তু পীরজাদা ছ্যুর-কেবলাকে বেকায়দায় ফেলিয়াছে, কেউ কেউ এতে দুষ্ট আনন্দও অনুভব করেন।

পীর সাহেব ডান হাত বাড়াইয়া ছেলের পিঠে আদরের থাপ্পড় দিয়া বলেন: বাবা এটা বাতেনী কথা, মুরাতেবের সওয়াল। সকলের কাছে ও-সওয়ালের জবাব দেওয়া যায় না। তবে তুমি আমার নুৎফার ফরযন্দ, এই গদির ওয়ারিশ। তোমার সওয়ালের জবাব দিতেই হবে। শোন বাবা, মোমিনের কলবই আল্লার আরশ।

পীরজাদা হাসি মুখে তিনবার মাথা ঝুকাইয়া। ভাবটা এই, পীর সাহেবের জবাব ঠিক হইয়াছে।

গোটা দরবার বিষয়ে স্তম্ভিত। পীর সাহেব-কেবলার মুখে গর্বের হাসি। তিনি দরবারের এক মাথা হইতে অপর মাথা পর্যন্ত নয়রের যরিফ করিতে থাকেন।

আরেক দিনের কথা। পীরজাদা পীর সাহেবের ওয়াযের মাঝখানে হঠাৎ সওয়াল করিয়া বসে: আক্বাজান, আবে-হায়াতের কুয়া কোথায়?

পীর সাহেব সগৌরবে দরবারে উপর চোখ বুলাইয়া বলেন: কুয়া এসব মারফতী কথা তুমি বুঝতে পারবা না।

পীরজাদা দৃঢ়স্বরে বলে: আমি বুঝতে চাই না, আক্বাজান, আমি আবে-হায়াতের পানি খাবার চাই। আবে-হায়াতের পানি পিয়াই খাজে শেখের অমর হৈছেন, এটা ঠিক না আক্বা?

পীর সাহেব আড়চোখে দরবারের উপর চোখ বুলাইয়া ছেলের দিকে চাহিয়া বলেন: হাঁ বাবা, তোমার কথাই ঠিক।

পীরজাদা নিজের গদি ছাড়িয়া আসিয়া বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে: আপনে আবে-হায়াতের পানি খাইছেন আক্বা?

পীর সাহেব পুত্রের থুতি টিপিয়া আদর করিয়া বলেন: আবে-হায়াতের পানি খাওয়া কি সকলের কিসমতে জুটে বাবা?

পীরজাদা আবদারী গলায় বলে: আমি কিন্তু আক্বা আবে-হায়াতের পানি খাবই।

পীর সাহেব পুত্রের পিঠে হাত বুলাইয়া বলেন: সে কাজ বড় কঠিন বাবা।

পীরজাদা বুক টান করিয়া সোজা হইয়া বলে: আমি জানি আক্বাজান আবে-হায়াতের কুয়া আছে রাক্ষসের দেশে। সে কুয়ার ধারে যাবার লাগি রাক্ষস-দেও-পরীরা সাথে লড়াই করতে হয়। আমি লড়াই করমু। দেওরাক্ষস সবগুলি কতল করমু। পারমু না আক্বা?

পীর সাহেব-কেবলা উপস্থিত মুরিদানের দিকে নয়র ঘুরাইয়া মুচকি হাসিয়া পুত্রের মাথায় হাত বুলান। বলেন: হাঁ বাবা। দোওয়া করি, তুমি পারবা।

৫

এমন অনেকদিন ঘটিয়াছে। তাতে মুরিদ-মোতেকাদদের মধ্যে পীরজাদার মরতবা হু হু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। পীর সাহেব খুশী হইয়াছেন। কিন্তু অল্পদিনেই সে খুশি দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হইয়াছে।

কারণ পীরজাদা শুধু আবে-হায়াতের পানি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সে পানির তালাশে সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। ‘নক্শে সোলেমানী’ ‘নিয়ামতে দুনিয়া’ ইত্যাদি কেতাবের লেখা অনেক তরকিব হামিদের মুখস্থ।

ঐ সব তরকিবের কথা, পয়গম্বর সাহেব ও খাজে-খেয়েরকে খাবে দেয়া যায় কি না সে সব কথা, হামিদ প্রকাশ্য দরবারে বাপকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আবে-হায়াতের কুয়ার খোঁজ করিতে হইলে অন্তত খাবে খাজে-খেয়েরের মোলাকাত দরকার, একথা কেমনে যেন হামিদ বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

প্রকাশ্য দরবারে না হইয়া যদি অন্যত্র কিংবা বাড়ির ভিতর হইত, অথবা হামিদ যদি মাসুম অবোধ শিশু না হইয়া শাবালেগ হইত, তবে পীর সাহেব খোলাখুলি আসল কথা বলিয়া দিতেন। কিন্তু একদিকে নিজের ব্যবসা ও অপরদিকে মাসুমের ঈমান নষ্ট হইবার ভয়ে তিনি সত্য গোপন করিয়াছেন এবং অস্পষ্ট দুর্বোধ্য মৌরফতী কথা বলিয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু হামিদ বাপকে রেহাই দেয় না। সে নিজেই পয়গম্বর সাহেব ও খাজে-খেয়েরকে খাবে দেখার তরকিব গর-গর করিয়া বলিয়া যায়। জুমেরাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত্রে, সফর বা রজব চান্দের এগারই হওয়া চাই, এশার নমাজের বাদে ঐ জায়নমাজে বসিয়াই হাজার রাকাত নমাজ পড়িতে হইবে। প্রতি রাকাতে সুরা ফাতেহার পর এগার বার সুরা ইখলাস্ অর্থাৎ কুলহুআল্লাহ সুরা পড়িতে হইবে। পর-পর তিন দিন এই নমাজ পড়িতে হইবে। ঐ তিন দিনই রোযা রাখিতে হইবে। পয়লা রাতের হাজার রাকাত নমাজের পর তিন শ তেরিশ বার আয়াতুল-কুরসি, দূসরা রাত্রে হাজার রাকাত নমাজের পর একশ এগার বার দোওয়ায় গাঞ্জল আরশ ও তেসরা রাতের নমাজের পর সাত শ ছিয়াশি বার ‘কুম্-কুম্ ইয়া হাবিবী’ দোওয়া পড়িতে হইবে এবং এক টুকরা বুক লইয়া উত্তর শিয়রে কেবলা মুখে শুইতে হইবে। শুইয়া-শুইয়া নিরানব্বই বার দরুদ শরিফ পড়িতে হইবে। এই তেসরা রাত্রে নমাজেই ‘কুম্-কুম্ ইয়া হাবিবী’র বদলে কালামুল্লাহ পনের সিপারার শেষ দশটি আয়াত এগার বার পড়িলে হরিণের চামড়ার দরকার হয় না। তার বদলে জাফরান লাগে। ডান হাতের শাহাদৎ আংগুলে জাফরান লাগাইয়া সেই আংগুলে নিজের বুক ‘মিম্’ ‘হে’ ‘মিম্’ ‘দাল’ লিখিলে পয়গম্বর সাহেবকে আর ‘খে’ ‘যোয়াদ’ ‘রে’ লিখিলে খাজে-খেয়েরকে খাবে দেখা যাইবে।

হামিদ এমন সহজ সরল ও নিখুঁতভাবে ঐ সব তরকিব বয়ান করে যে হাজিরান মজলিস বিস্ময়ে অবাক হইয়া যায়। মনে হয় যেন হামিদ কতকাল ধরিয়া ঐ সব আসরার ও আমালিয়াৎ এস্তেমাল করিয়া আসিতেছে। পীরজাদার প্রতি তাদের ভক্তি আরও বাড়িয়া যায়। পীর সাহেব-কেবলাকে চোখের ভংগিতে মোবারকবাদ জানাইয়া খুশী করিবার আশায় তাঁরা পীর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

কিন্তু পীর সাহেব-কেবলার দৃষ্টি সেদিকে নাই। তিনি তখন অন্য কথা ভাবিতেছেন। তাঁর কামরার দেওয়ালে বহুদিনের পুরান একটি হরিণের চামড়া লটকানো ছিল। চামড়াটি পুরান হইলেও উহা সর্বাংশে অক্ষত ছিল। সম্প্রতি কিছুদিন আগে, বোধহয় সপ্তাহখানেক হইবে, হঠাৎ পীর সাহেবের নয়রে পড়ে ঐ চামড়ার ডান হাতের থাবা অংশটা কাটা। এর কোন কারণ তিনি ভাবিয়া পান নাই। বিবিদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন, চাকরানীদের তস্থিহ করিয়াছেন। কেউ কিছু বলিতে পারেন নাই। পুত্রের কথা তাঁর মনেও হয় নাই। তাকে জিজ্ঞাসা করার দরকারও বোধ করেন নাই। শেষে তিনি নিজেই এই বলিয়া প্রবোধ দেন, থাবাটা বোধ হয় আগে হইতেই ছিল না। পীর সাহেবের শোবার ঘরের টেবিলের কোণে একটা হাত-বাক্শ আছে। তার মধ্যে অনেকগুলি ছোট-ছোট খোপ আছে। এই সব খোপের কোনটায় আতরদান, কোনটায় সুরমাদান, কোনটায় মেশ্‌ক-জাফরানের শিশি, কোনটায় সুঁই-সূতার কৌটা থাকে। কিছুদিন আগে তিনি টেবিল ক্লথটার উপর জাফরানের কিছু গুড়া দেখিয়াছিলেন। এরও কারণ তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আজ তাঁর চোখের সামনে দুইটা ব্যাপার সম্বন্ধেই একটা নতুন সত্যের অস্পষ্ট রূপ ভাসিয়া উঠিল। তাঁর মনটা আরও খারাপ হইল। তিনি এতদিন অমন স্বাস্থ্যহীন ঐটুকু শিশুর এবাদত-প্রীতির পরিণাম চিন্তা করিয়া ভাবনা করিতেছিলেন। এখন তাঁর মনে আরও একটা আঘাত লাগিল। হামিদ চুরি করিয়া কোনও জিনিস নিতে পারে, তা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। আজ তাঁর সে ভুলও ভাংগিয়া গেল। আজ অন্দরে গিয়াই তিনি এর উপযুক্ত বিচার করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে মনের ভাব কথায় বা কাজে প্রকাশ করিলেন না।

একদিন বাদ-মাগরেব বসিলেনও পীর সাহেব বিচারে বিবিদের সামনেই তিনি হামিদের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। উত্তরে হামিদ অসংকোচে যে জবাব দিল তাতে পীর সাহেব তাকে শাস্তি দিবেন কি, নিজেই লজ্জা পাইলেন। হামিদ বলে: সে মনে করে পীর সাহেব যেমন এবাদতের জন্য মসজিদ বানাইয়াছেন, তেমনি পয়গম্বর সাহেব ও খাজে-খেয়েরকে খাবে দেখার আমালিয়াতের জন্যই হরিণের চামড়া ও জাফরান কিনিয়াছেন। মসজিদে এবাদত করিতে যাইবার জন্য যেমন পীর সাহেবের অনুমতির দরকার নাই, আমালিয়াতের কাজে হরিণের চামড়া ও জাফরান নিতেও তেমনি পীর সাহেবের অনুমতির দরকার নাই। এমন সোজা কথাটা হামিদ বুঝে না, তা মনে করিবার কি কারণ আছে?

বিবিরা হাসিয়া উঠেন। পীর সাহেবও অগত্যা সে হাসিতে যোগ দেন। তাঁর রাগ পানি হইয়া যায়।

৬

জিন-পরী সম্বন্ধে পীর সাহেব-কেবলা ছেলেকে কিছু বলেন না। অথচ পাড়া-পড়শী অনেক বয়স্ক মুরিদের মুখে হামিদ জানিতে পারিয়াছে তার বাবা অনেক জিন-পরী পালেন। কিন্তু ওটা পীর সাহেবের বাতেনী কথা। কারও কাছে তিনি তা বলেন না। হামিদ এ ব্যাপারে বাপকে ঘাটাঘাটি না করিয়া নিজের চেষ্টা নিজেই করিতে থাকে। বুড়া মুরিদদের দু-একজন হামিদকে এমন ভরসাও দিয়াছেন যে সময় আসিলে পীর সাহেবকেবলা নিজেই পীরজাদাকে জিনের মন্ত্র শিখাইবেন।

এমন বুড়া মুরিদদের মধ্যে ইব্রাহিম সর্দারই প্রধান। বয়সে যেমন তিনি এ অঞ্চলের সকলের বড়, লাছে-গাছেও তিনি সকলের চেয়ে উঁচালস্বা। ছয় ফুটের বেশি ছাড়া কম না। গায়ের রংটা পাকা আলকাতরা। তেলতেলা হওয়াতে ঐ কাল চামড়াতেই তাঁকে বেশ মানায়। তিনি যৌবনে জমিদারের পিয়াদা ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল ইবির পিয়াদা। গায় অসুরের বল ও বৃকে অসীম সাহস ছিল। বিপদের সামনে তিনি সকলের আগে কাঁপাইয়া পড়িতেন। তাঁর বীরত্বে খুশী হইয়া জমিদার তাঁকে পিয়াদা হইতে সর্দার করিয়া দেন। সেই হইতে পিয়াদা ইব্রাহিম সর্দার হইয়া যান। তারপর এক বিধবার বাড়ি দখলে গড়িমসি করার অপরাধে ইব্রাহিম সর্দারের চাকরি যায়। সেটা বহু বছর আগের কথা। চাকরি গেলেও তাঁর সর্দার খেতাব যায় নাই। আজও সকলে ইব্রাহিম সর্দার বলিয়াই ডাকে।

চাকরি ছাড়িয়া ইব্রাহিম সর্দার কাঠের ব্যাপারিগিরি করেন। বর্ষাকালে নদী পথে নৌকায় ভাওয়াল ও মধুপুর গড়ের কাঠ আনিয়া বাড়ির কাছে নদীর ধারে ফেলিয়া রাখিতেন। সারা বছর সে কাঠ দ্বিগুণ-তিনগুণ দামে বিক্রয় করিতেন। প্রচুর লাভ হইত। কয়েক বছরে ইব্রাহিম সর্দার সম্বল অবস্থার মাতব্বর গৃহস্থ হইয়া উঠেন। কাঠের দরজা-জানালাওয়ালা বড় বড় কয়েকটা ঘর তাঁর বাড়িতে। দরজা-জানালায় রং-দেওয়া বৈঠকখানা। এছাড়া স্থানীয় বাজারে দুইটা বড় গুদাম। প্রচুর টাকা ভাড়া আস্তিতাতে। বছর দুই আগে হজ করিয়া আসিয়া ছেলেদের হাতে সংসার ও ব্যবসার ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন কাজের মধ্যে পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়ান। সারা বিকালটা পীর বাড়িতেই কাটান। আসর মগরের ও এশার নমাজ পীর বাড়ির মসজিদেই পড়েন। এই সময়টা হয় পীর সাহেবের বৈকালিক দরবারে অথবা মাদ্রাসার মাঠে সীলবীদের সাথে অথবা মসজিদের সেহানে মুসল্লিদের সাথে গল্প করিয়া অতিবাহিত করেন এই সব গল্পের বৈঠকে ইব্রাহিম সর্দারই প্রধান, এমন কি একমাত্র কথক। শ্রোতাও জুটে তাতে অনেক। কারণ ইব্রাহিম সর্দার আদত গল্পী মনুষ্য গল্পের ভাণ্ডারও তাঁর অফুরন্ত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর। অধিকাংশ গল্পই তাঁর নিজের চোখে-দেখা ব্যাপার। তিনি হাত নাড়িয়া চোখ ঘুরাইয়া ভ্রু কুঁচকাইয়া ঠোট কামড়াইয়া যেভাবে গল্প বলেন, তাতে শ্রোতার মাতিয়া উঠে। একটু শুনিলে বাকিটা না শুনিয়া কেউ উঠিতে পারে না। গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে দুইটিই প্রধান। একটা সর্দার সাহেবের কাঠের ব্যবসা উপলক্ষে নদী ভ্রমণ, অপরটা পীর সাহেব-কেবলা ও দাদা পীর সাহেবের বুয়ুর্গির বিবরণ। পীর সাহেবদের বুয়ুর্গির চোখের-দেখা নজিরগুলি সর্দার এমনভাবে বলিতেন যে শ্রোতারা যেন চোখের সামনে সে সব ঘটনা দেখিতে পাইত। কাঠ আনিতে নৌকাযোগে নদীপথে যাইবার সময় ডাকাতির হাত হইতে কিভাবে মরিতে-মরিতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন, কিভাবে বাঘ ভাল্লুক ও বিশাল-বিশাল সাপের মুখ হইতে জানটা লইয়া ফিরিয়াছেন, সে সব কাহিনী সর্দার যে ভাষা ও ভংগিতে বয়ান করিতেন, তাতে শ্রোতাদের মধ্যে যারা পুঁথি-পড়া তাদের চোখের সামনে সিন্দবাদ জাহাজীর চেহারা ভাসিয়া উঠিত।

হামিদও ছিল এই শ্রোতাদের শামিল। প্রথম দিকে সে নিয়মিত শ্রোতা ছিল না। পরে খুবই নিয়মিত হয়। কারণ হামিদকে দেখিলে সর্দার সাহেব শুধু পীর সাহেব ও দাদাপীরের মাজেয়া বয়ান করিতেন। এ সব কথা হামিদের খুবই ভাল লাগিত। শেষ তক্ না শুনিয়া সে উঠিতে পারিত না।

ইব্রাহিম সর্দার বয়সে পীর সাহেব-কেবলার অনেক বড়। দাদা পীরের সমবয়সী বলিয়া তিনি দাবি করেন। দু-চার বছরের এদিক-ওদিক হইতে পারে। সর্দার সাহেবের সমবয়সী লোক এ অঞ্চলে আর না থাকায় তাঁর এ দাবির নসল্লা ধরিবার কেউ ছিল না।

দাদা পীর সাহেবের আমলে রেলগাড়ির চলন ছিল না। দাদা পীর পালকিতে চড়িয়া বেড়াইবার বিরোধী ছিলেন। তিনি পায়ে হাঁটিয়াই মুরিদান সফর করিতেন। এইসব সফরে তিনি দশ-বার জন বিশ্বাসী মুরিদ সংগে নিতেন। এঁদের মধ্যে ইব্রাহিম সর্দার সব সময়ে থাকিতেন এবং তিনিই ছিলেন দাদা পীর সাহেবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত। এইসব সফরে দাদা পীর সাহেব হরেক রকম মাজেয়া দেখাইতেন। ইব্রাহিম সর্দার নিজ চোখে দেখিয়াছেন সে সব। এই সব বৈঠকে তিনি নিখুঁতভাবে সে সবার বর্ণনা করিতেন। দাদা পীর বর্তমান পীর সাহেবকে ওসিয়ত করিয়া যান তিনি যেন সব সময়ে ইব্রাহিম সর্দারকে সংগে নিয়া যান। সে-ওসিয়ত মোতাবেক চলিতেনও বর্তমান পীর সাহেব-কেবলা। কিন্তু ইব্রাহিম সর্দার এখন বুড়া হইয়াছেন, শক্তি-সামর্থ্যও আগের মতো নাই। পীর সাহেব-কেবলাও বর্তমানে রেল-ইস্টিমারে দূর দেশে সফর করেন। এই সব কারণে ইব্রাহিম সর্দার নিজেই পীর সাহেব কেবলার কাছে মাফ চাহিয়া অবসর নিয়াছেন। এটা বছর দশেক আগের কথা। তখন পর্যন্ত ইব্রাহিম সর্দার বর্তমান পীর সাহেবের সকল সফরের সাথী ছিলেন। ঐ সময়েই বর্তমান পীর সাহেব কেবলার বহু বুয়ুর্গি ও কেরামতি নিজ চোখে দেখিয়াছেন।

৭

পীর সাহেব-কেবলার বহু বুয়ুর্গির একটা এইরূপ: একদিন পীর সাহেব কেবলা কুতুবপুরের সলিম সরকারের বাপের লিল্লার যিয়াফতে যান। ইব্রাহিম সর্দার এবং আরও দশ-বার জন লোক ছিলেন পীর সাহেব-কেবলার সাথে। তাদের কেউ আজ বাঁচিয়া নাই। কুতুবপুরের দাওয়াত খাইয়া ফিরিয়া রওয়ানা হইতে হইতে আসরের ওয়াক্ত হইয়া যায়। একরাত থাকিয়া যাইবার জন্য সলিম সরকার কুতুবপুরের অন্যান্য মাতব্বরের পীড়াপীড়ি অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পীর সাহেব-কেবলা আসরের নমাজ পড়িয়াই বাড়ি-মুখে রওয়ানা হন। পীর সাহেব-কেবলা তখন দ্রুত হাঁটিতে পারিতেন। ইব্রাহিম সর্দারের মতো লম্বা মানুষকেও তিনি ধাক্কা দিতেন। ফতেপুর ফিরিয়া মগরেব পড়ার জন্য সকলে দাইয়া চলিলেন। তবু পারা গেল না। নূরানীর কান্দার বটতলায় পৌঁছিতেই মগরেবের ওয়াক্ত হইয়া গেল। বটতলায় আসিয়াই পীর সাহেব-কেবলা হাতের ছাতিটা মাটিতে ফেলিয়া বলিলেন: যারার ওয়ু নাই, তারা ওয়ু কেরা আস। এখানেই মগরেব পৈড়া যাব।

পীর সাহেব-কেবলার ওয়ু ছিল। ইব্রাহিম সর্দাররা সকলে পাশের খাল হইতে ওয়ু করিয়া আসিলেন। নূরানীর কান্দার বটগাছটা শ্রোতাদের প্রায় সকলেই দেখিয়াছে। কিন্তু ওটার আসল রূপ কেউ দেখে নাই। ইব্রাহিম সর্দার যখনকার কথা বলিতেছেন, তখন ওটা এর চেয়ে দশ গুণ বড় ছিল। গাছের গুড়ি হইতে কম-সে-কম একশ হাত দূর পর্যন্ত চারদিকে উহার ডাল-পালা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই সব ছড়ানো ডাল হইতে হাতীর শুড়ের মতো বড়-বড় শিকড় নামিয়া মাটির ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল।

দেখিতে এক-একটি বড়-বড় খাস্তা। এইরূপ অগণিত খাস্তায় বট গাছের তলাটা খাস্তাওয়ালা দালানের মতো দেখা যাইত। ছাব্বিশ সনের তুফান সে সব বড়-বড় ডাল মুচড়াইয়া ভাংগিয়া ফেলে, ঐ সব বড় বড় খাস্তা উপড়াইয়া ফেলে। কাজেই শ্রোতার বুঝুক। এখনই তারা নূরানীর বট গাছের বিশালত্ব দেখিয়া দাঁতে আঙুল কাটে। আগের তুলনায় বর্তমানের গাছ একটা বেগুন গাছ মাত্র।

যাহোক ঐ গাছ সামনে লইয়া গাছের তলাতেই পীর সাহেব নমাজ পড়েন। নমাজ শেষ হইতে হইতে কালী-সন্ধ্যা লাগিয়া যায়। পীর সাহেব-কেবলা শেষ মোনাজাত আদায় করিয়া জায়-নমাজেই মুক্তাদিদের দিকে ফিরিয়া বসেন এবং ইব্রাহিম সর্দারের দিকে চাহিয়া বলেন: 'সর্দার, তোমরা একটা তামাশা দেখবা নাকি?'

সকলেই তামাশা দেখিবার আগ্রহ জানান। পীর সাহেব-কেবলা তখন বলেন: 'তোমরা সকলে এক-একটা বটপাতা এক টানে ছিঁইড়া আন। বিসমিল্লাহ বলতে ভুল কৈর না।'

হুকুম-মোতাবেক বটপাতা আনা হইলে পীর সাহেব-কেবলা নিজের জুব্বার জেব হইতে কাঠ-পেনসিল বাহির করিলেন, প্রত্যেকের পাতায় আরবী আয়াত লিখিলেন এবং যার পাতা ঠিক তারেই ফেরৎ দিলেন। নমাজের কাতারে যে-যেখানে বসিয়াছিলেন, ঠিক সেইখানেই কাতার করিয়া সবাইকে আবার বসান হইল। তারপর পীর সাহেব-কেবলা হুকুম করিলেন: 'যার তার পাতার দিকে এক ধ্যানে চাইয়া মনে-মনে 'সোবহানাল্লাহ সোবহানাল্লাহ' জপ করতে থাক। আমার হুকুম না পাল্টায় পর্যন্ত পাতা থাইকা কেউ চোখ তুইল না।'

সকলে তাই করেন। সোবহানাল্লাহ! ইব্রাহিম সর্দার দেখেন, শত-শত মশালের একটা মিছিল তাঁদের দিকেই আগ বাড়িতেছে। ইব্রাহিম সর্দারের মনে ডর পয়দা হইল। তাঁর মতো দুর্জয় সাহসী লোকেরও গা কাঁটা দিয়া উঠিল। কিন্তু পীর সাহেব-কেবলা সাথে আছেন মনে পড়ায় মুহূর্তেই ইব্রাহিম সর্দার ভয় ভাংগিয়া গেল। তিনি দেখিলেন সত্যিই বিরাট মিছিল। কোনও বড় লোকের বিয়ার মিছিলই হইবে। ইব্রাহিম সর্দার জমিদারের চাকরি করাকালে অনেক বিয়ার মিছিল দেখিয়াছেন। ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা গুণ্ডং গোরীপুর শেরপুর ইত্যাদি সব জায়গার মহারাজদের কুমারগণের বিয়ার মিছিলে ইব্রাহিম সর্দার রীতিমতো সর্দারি করিয়াছেন। সর্দারের মনে হইল, আজকার এই মিছিল সে-সব মিছিলকেও হারাইয়া দিয়াছে। কাজেই এটা কোনও মহারাজার বিয়ার মিছিল নয়। নিশ্চয়ই কোনও নবাব-বাদশার বিয়ার মিছিল। মিছিলের সামনাভাগে দুই কাতারে দুই-তিন কুড়ি ঘোড়া-সওয়ার। একটার পিছনে আরেকটা। কি বাহারের ঘোড়া! কি চমৎকার তাদের সাজ-পোশাক! ঘোড়ার গদি, গদির ঝালর, ময় লাগাম-বাগডোর পর্যন্ত সবই ঝলমল করিতেছে। কি সুন্দর পোশাক ও চেহারা ঘোড়া-সওয়ারদের! রূপার পেটি ও কান্দাবন্দ-ওয়ালা পোশাক তাদের পরনে। মাথায় তাদের সোনালী রং-এর পাঠানী পাগড়ি। এক দুই তিন চার পাঁচ, হাঁ এক-এক করিয়া গনিয়া দেখেন ইব্রাহিম সর্দার এক-এক কাতারে ত্রিশটা করিয়া ঘোড়া। ঘোড়ার কাতার শেষ হইতেই দেখা গেল একটা পাক্কি। কি সুন্দর সাজানো পাক্কি! ইব্রাহিম সর্দার জীবনে এমন সুন্দর এত বড় বিশাল পাক্কি দেখেন নাই। এক দুই তিন চার হাঁ এক-এক কাতারে চার জন করিয়া আটজন বেহারা সামনে, আর আটজন পিছনে, একুনে ষোলজন বেহারা পাক্কিটা

বহন করিতেছে। পাক্কিটার সামনে পিছনে, উপরে নিচে, ডাইনে বাঁয়ে সোনালী-রূপালী ঝালর ঝলমল করিতেছে। বেহারাদেরই বা কি পোশাক! মহারাজ বাড়ির আদালীরাও জীবনে এমন পোশাক দেখে নাই। পাক্কির পিছনে সুন্দর সুন্দর পোশাক-পরা হাজার-হাজার পায়-হাঁটা লোকের মিছিল চলিয়াছে। কত বড় মিছিল বলা যায় না। কারণ মিছিলের শেষ নযরে আসে না। মিছিলের তিন-চার হাত পরে-পরেই এক-একটা বিশাল উঁচা মশাল। সেই সব মশালের আলোতে আসমান-জমিন দিন-ময় হইয়া গিয়াছে। এত তেজের আলো যে লোক-ত লোক মাটির ঘাস-বন পর্যন্ত গণা যায়। পায় হাঁটা লোকদের এক দলের মাথায় বড়-বড় খাঞ্চ। ঝলমলা রংগিন কাগজ ও সোনালী-রূপালী ডোরাওয়ালা কাপড়ে সে সব খাঞ্চ ঢাকা। এ সব খাঞ্চয় বাতাসা-জিলাপি-মিঠাই-মণ্ডাই হইবে নিশ্চয়।

ইব্রাহিম সর্দাররা যেখানে কাতার করিয়া বসিয়া ছিলেন, সেখানে আসিয়া মিছিল থামিয়া গেল। পাক্কির ভিতর হইতে সুসজ্জিত এক নওজওয়ানের একটি সুন্দর মুখ বাহির হইল। তাঁর মাথায় ঝলমলা জরির পাগড়ি। পরনেও অমনি ঝলমলা জরির পোশাক তা আন্দাজ করা গেল। নওজওয়ান মুখ বাহির করিতেই দামী পোশাক-পরা একজন লোক দৌড়িয়া পাক্কির সামনে আসিয়া কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল। নওজওয়ান ইব্রাহিম সর্দারদের দিকে আংগুলের ইশারা করিয়া ঐ লোকটাকে কি যেন বলিলেন। লোকটা তখন একজন খাঞ্চওয়ালাকে সাথে লইয়া ইব্রাহিম সর্দারদের দিকে আসিল। কিন্তু ইব্রাহিম সর্দারের কাছে না আসিয়া খোদ পীর সাহেব কেবলার সামনে গিয়া কুর্নিশ করিয়া ফারসীতে কি যেন বলিল। পীর সাহেব-কেবলাও ফারসীতে তাঁর জবাব দিলেন। তখন ঐ লোক খাঞ্চ হইতে সবুজ কাগজের এক-একটি ঠোঙা লইয়া এক-এক জনের হাতে দিল এবং পীর সাহেবকে আর একবার কুর্নিশ করিয়া মিছিলের দিকে রওয়ানা হইল। পীর সাহেব-কেবলা ইব্রাহিম সর্দারদের ঠোঙা খুলিয়া মিঠাই খাইবার হুকুম দিলেন। ঠোঙার ভিতরে অল্প-স্বল্প মিঠাই না এক একটিতে দুইটা রসগোল্লা, একটা মণ্ডা, একটা চম্‌চম্‌, একটা আমির্তি ও একটা রসমালাই। ইব্রাহিম সর্দার টপাটপ মিঠাই খাইতে লাগিলেন। মিছিল আবার চলিল। পাক্কির ভিতর হইতে নওজওয়ান ঘন-ঘন হাত উঠা-নামা করিয়া পীর সাহেব-কেবলাকে সালাম করিতে থাকিলেন। ইব্রাহিম সর্দারদের মিঠাই খাওয়া চলিল। আহা কি মিষ্টি, কত খোশ'বু। একদম মধু ও আতর মিশানো আর কি! এক ধ্যানে মিছিলের দিকে চাহিয়া এক মনে মিঠাই খাইতেছিলেন, এমন সময় ইব্রাহিম সর্দার একটি হাততালি ও পীর সাহেবের গলার আওয়াজ শুনেন। পীর সাহেব-কেবলা বলেন: 'এলা তোমরা সকলে বটপাতা থনে চোখ ফিরাও; আমার দিকে চাও।'

ইব্রাহিম সর্দার তাই করিলেন। ও খোদা! এ কি! কোথায় মশাল, কোথায় আলো? ঘুটঘুটে অন্ধকারে পীর সাহেব-কেবলা জায়-নমাজে আগের মতোই বসিয়া আছেন। সর্দাররাও তাঁর সামনে আগের মতোই কাতারে। খালি একটা বটপাতা হাতে। পীর সাহেব এক-এক করিয়া সকলেরেই পুছ করিলেন: 'কি দেখলা তোমরা?' ইব্রাহিম সর্দারের যে কথা সকলের সেই এক কথা। মিঠাইর মিষ্টতা ও খোশ'বু তখনও সকলের নাকে-মুখে লাগিয়া আছে।

ইব্রাহিম সর্দার আবদার করিলেন। সকলে একবাক্যে তাঁর সমর্থন করিল: এটা কি দেখলাম হুয়ুর, কইতে হৈব।

পীর সাহেব-কেবলা বলিলেন: 'এ নিয়া তোমরা বেশি হৈ-চৈ কৈরো না। সাবধান, যেখানে-সেখানে কৈয়া বেড়াইও না। এটা এ অঞ্চলের জিনের সর্দারের ছেলের বিয়া। আমারও দাওয়াত ছিল। কিন্তু সলিম সরকারের বাপের লিল্লার জন্য আমি সে দাওয়াত রাখবার পারি নাই। তার লাগি জিনের সর্দারের তরফ থনে তার দেওয়ান বড় আফসোস কৈরা গেল। তোমরা ত জান আমি চেষ্টার ক্রটি করি নাই। কিন্তু সলিম সরকারের বাপ আলিম বেপারী আমার কত বড় অন্যায় হৈত! সে জন্য দেওয়ান সাহেব তোমাদের মিঠাই খাওয়াবার জিদ করল। কও দেখি মিঠাই তোমরার লাগল কেমন?'

ইব্রাহিম সর্দাররা সকলে এক বাক্যে মিঠাইর তারিফ করিলেন। সত্য কথা এই যে ইব্রাহিম সর্দার ও তার সংগীদের সকলের নাকে-মুখে সে মিঠাইর গন্ধ বহুদিন লাগিয়া ছিল।

শ্রোতারা দম বন্ধ করিয়া পীর সাহেব-কেবলার এই কেরামতির কথা শোনে। হামিদও। গল্প বলিবার সময় সর্দার বেশির ভাগ হামিদের দিকে চাহিয়াই বলেন।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে যুবক গোছের একজন শ্রোতা বলেন: 'এটা নিশ্চয়ই বহুকাল আগের কথা। কই, আজকাল ত পীর সাহেব-কেবলা আমরার কোনও কেরামতি দেখান না।'

ইব্রাহিম সর্দার সিনাটা টান ও মাথাটা উঁচু করিয়া বলেন: 'কই দেখলা তোমরা বহুদিন? হৈব বড় জোর পঁচিশ-ত্রিশ বছর। আর যে কইলা পীর সাহেব-কেবলা আজকাল কেরামতি দেখান না, তোমরাই কও কেরামতি দেখবার লোক আছে কয়টা? আর আমরার মতো হুজুরের সাথে চব্বিশ ঘন্টা থাকে কয়জন? শুধু মুখে-মুখে কইলেই ত সারব না?'

শ্রোতাদের জবাব নাই। কেউ-কেউ বড় জোর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। অবশেষে সকলে স্বীকার করে সর্দারের কথাই ঠিক।

খুশী হইয়া সর্দার কোমরের লুংগির প্যাচ হইতে ছেঁচা পানের বটুয়া বাহির করিয়া আংগুলের চিমটায় মুখে পান পুরেন এবং পরম তৃপ্তির সাথে দন্তহীন মাড়িতে পান চিবান। প্রত্যেক চিবানিতে গলার হল্কম উঠানামা ও দুই রগ নড়াচড়া করিতে থাকে।

অবশেষে সকলের নিস্তব্ধতা ভংগ করিয়া সর্দারই কথা বলেন: 'পীর সাহেব-কেবলার কেরামতির কথা শুইনাই তোমরা তাজ্জব বৈনা গেছ। দাদা-পীরের বুয়ুর্গির কথা শুনলে তোমরার তালুজিভ লাইগা যাব।'

সকলে ধরিয়া পড়িল, দাদা-পীরের বুয়ুর্গির কথা বলিতেই হইবে। রাত বেশি হইয়া গিয়াছে, আরেক দিন হইবে, বলিয়া সর্দার সকলের অনুরোধ এড়াইয়া যান। কিন্তু পরদিনই বলিবেন বলিয়া ওয়াদা করিতে বাধ্য হন।

পরের দিন এবং আরও কয়দিন সর্দার দাদাপীরের বুয়ুর্গি বয়ান করেন। অনেকগুলি চোখে-দেখা নজির দেন। তার একটি এইরূপ:

৮

একদিন দাদাপীর বরমপুত্রের ওপারে পিয়ারপুর মল্লিকবাড়ি দাওয়াত খাইতে যান। ইব্রাহিম সর্দার ও আরও আট-দশজন তাঁর সাথে যান। ইব্রাহিম সর্দার ঐ সাথীদের নাম-ধামও বলেন। কিন্তু তাঁরা বহুদিন আগেই মারা গিয়াছেন। পিয়ারপুর অনেক দূরের পথ। কাজেই ফিরিতে রাত হইয়া যায়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছিল ঠিকই, কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া উত্তরে বৃষ্টি হওয়ায় বরমপুত্রের পানি বাড়িতেছিল। দাওয়াতে যাইবার সময় যে বাঁশের সাঁকো দিয়া তাঁরা বরমপুত্র নদী পার হইয়াছিলেন, ফিরিবার পথে দেখিলেন স্রোতের সাথে কচুরিপানার দংগল আসিয়া সে সাঁকো ভাংগিয়া গিয়াছে। নদীর পানি এপার-উপার থম-থমা ভরা। কিন্তু মরা গাংগের তলা ছিল চটান। অনেক জায়গায় কোমর পানির বেশি হইবে না। ইব্রাহিম সর্দারদেলে লইয়া কোনও চিন্তার কারণ ছিল না। তাঁরা জুতা খুলিয়া লুংগি উঁচা করিয়া প্রয়োজন হইলে গামছা পিন্দিয়া পার হইতে পারেন। কিন্তু মশকিল হইল দাদা-পীরকে লইয়া। তিনি ত আর এভাবে পার হইতে পারেন না। তাঁর পরনে লম্বা জুব্বা, চুড়িদার পাজামা।

অগত্যা ইব্রাহিম সর্দার প্রস্তাব করিলেন, তিনি দাদাপীরকে কাঁধে তুলিয়া নদী পার করিবেন। ইব্রাহিম সর্দারের তাতে কোনই অসুবিধা হইবে না। দাদাপীরের মতো চারজনকে কাঁধে ও কোলে করিয়া ইব্রাহিম সর্দার দশ মাইল হাঁটিতে পারেন। এমনি গায়ের বল সর্দারের তখন। দাদাপীর ইব্রাহিম সর্দারের প্রস্তাবে 'সুন্দার' কিছু বলিলেন না। শুধু মুচকি হাসিয়া বলেন: 'আচ্ছা এক উপায় হৈব অথবা তোমরা সকলে কাপড়-জুতা খুইলা তৈয়ার হও ত আগে।'

পীরের সামনে কাপড়-বদলান বেআদবি। তাই ইব্রাহিম সর্দার সংগীদেলে লইয়া একটা ঝোপের আড়ালে গেলেন। সেখানে কাপড়-জুতা খুলিয়া গামছা পরিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন দাদাপীর নাই। সকলে ঘাবড়াইয়া 'হুজুর-কেবলা কই' 'হুজুর-কেবলা গেলেন কহানে?' বলিয়া এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করিতে থাকেন। হঠাৎ নদীর ওপার হইতে দাদাপীরের গলার আওয়াজ আসিল। তিনি বলিলেন: 'কই ইব্রাহিম, তোমরার আর দেরি কত? জলদি চৈলা আস। পানি কিন্তু খুব জোরে বাড়তেছে। এরপরে তোমরার সাংরায়া পার হওন লাগব।'

ইব্রাহিম সর্দাররা কেউ নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যা হোক অবশেষে নদী পার হইয়া তাঁরা সত্য-সত্যই দাদাপীরকে তীরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন। তিনি মুচকি-মুচকি হাসিতে ছিলেন। ইব্রাহিম সর্দাররা সকলে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন, দাদাপীরের কাপড় বদলানোর কোনও লক্ষণ নাই। তাঁর হাত-পায়ে একবিন্দু পানির বা জুতায় একবিন্দু কাদার দাগ নাই।

কেমন করিয়া এটা হইল? পথ চলিতে-চলিতে সর্দার ও তাঁর সংগীরা দাদাপীরকে চাপিয়া ধরিলেন: 'হুজুর-কেবলা, এর ভেদ বলতেই হৈব।' অনেক ওজর-আপত্তির পর দাদাপীর ইব্রাহিম সর্দারদেলে বলেন: 'ব্যাপার আর কিছু না। তোমরা ঝোপের আড়ালে যাওয়া মাত্র হযরত খাজে-খেয়ের নাজেল হন এবং আমার হাত ধৈরা চোখের নিমেষে এপারে নিয়া আসেন। আমারে এখানে রাইখাই তিনি গায়েব হৈয়া গেছেন।'

ইব্রাহিম সর্দার খাজে-খেয়েরের মাজেয়ার কথা আগেই জানিতেন। কাজেই কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া তাঁরা দাদাপীরকে জিজ্ঞাসা করেন: 'খোওয়াজ খেয়েরের সাথে কি আলাপ হৈল হজুর?'

দাদাপীর হাসিয়া জবাব দেন: 'আসবার সময় আস্সালামু আলায়কুম, আর যাবার সময় আরেকবার আস্সালামু আলায়কুম ছাড়া আর কোনও কথা তিনি কন নাই।'

ইব্রাহিম সর্দাররা সকলে বুঝেন, দাদাপীর ভেদ কথা অতলোকের কাছে বলিতে ইচ্ছুক নন। ইব্রাহিম সর্দার একা হইলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। কাজেই সর্দার দাদাপীরকে আর পীড়াপীড়ি করেন নাই!

হামিদ বাপ-দাদার এই সব কেলামতির কথা সর্দারকে খুঁটিয়া-খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করে। শুনিয়া আনন্দ পায়। একা-একা চিন্তা করে। একা পাইলে বাপকে জিজ্ঞাসা করে। কারণ ইব্রাহিম সর্দারের কাছে ও-সব বাতেনী ব্যাপারের হেকমত-তরকিব জানা সম্ভব না। ইব্রাহিম সর্দার উম্মি মানুষ। তিনি ও-সব কথার কি জানেন? সরল ভাবে হামিদের কাছে স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই হামিদ বাপকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হয়। পীর সাহেব সোজা সরল উত্তর না দিয়া হামিদকে পড়াশোনায় মন দিতে বলিয়াছেন। হামিদ নাকি লেখাপড়া করিয়া উপযুক্ত হইলে যথা সময়ে সব কথা জানিতে পারিবে। বাপের জবাবে হামিদ সন্তুষ্ট হয় নাই। ইব্রাহিম সর্দার উম্মি মানুষ হইলেও তাঁর একটা কথা হামিদের পছন্দ হইয়াছে। সর্দার হামিদকে একা পাইয়া একবার বলিয়াছেন: দাদাপীর সাহেব তাঁর সামনে একবার আরেকজন মওলানাকে বলিয়াছিলেন, ইস্মে-আযম জানা থাকিলে এ সব কাজের কোনটাই কঠিন নয়। এই খবর দিবার সময় ইব্রাহিম সর্দার হামিদকে কোলে নিয়া কানে কানে বলিয়াছিলেন: দাদাপীর যে ইস্মে-আযম জানিতেন সে সম্বন্ধে সর্দারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্দারের সন্দেহ এই যে পীর সাহেব-কেবলা ইস্মে-আযম জানেন না: জানা থাকিলেও পুরাপুরি তাতে আমল নাই।

এই শেষ কথাটাই হামিদের শিশু সরল মনে ঘুরপাক খাইতেছে। কথাটা যদি সত্য না-ই হইবে, তবে আক্ৰাজী নিজের ছেলেকে সেটা শিখাইবেন না কেন?

হামিদ আবার নতুন করিয়া স্থির করে, নিজের চেষ্টাতেই তাকে ইস্মে আযম শিখিতে এবং খাজে-খেয়েরের সাথে মোলাকাত করিতে হইবে।

৯

রমযান আলী শাহফকির পীর সাহেব-কেবলার চাচাশ্বশুর। মাজেলা বিবি, মানে বর্তমানের বড় বিবি সাহেবের চাচা। মাজেলা বিবির ভাই বাপ কেউ বাঁচিয়া নাই। এই চাচাই তাঁর একমাত্র নিকট আত্মীয়। কাজেই ভাতিজীকে দেখিবার জন্য তিনি মাঝে-মাঝে ফতেপুর আসিতেন। কিন্তু ভাতিজী-জামাই পীর সাহেব-কেবলা তাঁকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কারণ শাহ সাহেবের গেরুয়া পোশাক। মেয়েলোকের মতো লম্বা চুল। তস্বির বদলে রুদ্ৰাক্ষের মালা। হাতে চিমটা। বেশরা গান-বাজনা ও শরার বরখেলাফ আরও অনেক কাজ করেন তিনি। ভদ্রতার খাতিরে পীর সাহেব অবশ্য চাচা

শ্বশুরকে আসিতে বারণও করেন না। আসিলে তাড়াইয়াও দেন না। দেখা হইলে রুক্ষ মেজাজে কাটখোঁটা 'সেলামালেকুম' বলিয়াই পীর সাহেব মুখ ফিরাইয়া অন্যদিক চলিয়া যান। চাচা শ্বশুরকে প্রকারান্তরে বলিয়া দেন: এ বাড়িতে আপনি অনভিপ্রেত।

কিন্তু রমযান শাহ এসব গায় মাখেন না। রাগ করেন না। ভাতিজীকে দেখার দায়িত্ব তিনি মুখ বুজিয়া পালন করিয়া যান। আসল কথা এই যে ফতেপুর পীর বাড়ির মতো প্রভাবশালী শরিফ খান্দানের সাথে তাঁর আত্মীয়তা দেখানই শাহ সাহেবের মতলব। তাতে শাহ সাহেবের ব্যক্তিগত সম্মান ও প্রতিপত্তি যেমন বাড়ে ব্যবসারও সুবিধা হয়। কারণ শাহ সাহেবেরও নিজস্ব এক ধরনের পীরগিরি ব্যবসা আছে। এ অবস্থায় পীর সাহেব-কেবলা যতই না-পছন্দ করুন, শাহ সাহেবের ফতেপুর না আসিয়া উপায় নাই আসিতেনও মাসে-দু-মাসে দু-একবার। পীর সাহেব মুরিদান বা সফরে গেলে শাহ সাহেব ঘন-ঘন আসিতেন। তখন তিনি পীর বাড়ির দরবার-ঘর মুখর করিয়া তুলিতেন। পীর সাহেব বাড়ি থাকাকালে যখন শাহ সাহেব ফতেপুর আসিতেন, তখন তিনি পারতপক্ষে ভাতিজী-জামাইর সামনে পড়িতেন না। দিনের বেলা অন্দর মহলে ভাতিজীর ঘরেই কাটাইতেন। রাতের বেলা বাহির বাড়ির মেহমানখানায় আসিয়া শুইতেন।

পালক-মা মাজেলা বিবির কাছে হামিদ তার এই নানার অনেক তারিফ শুনে। মার মুখেই হামিদ জানিতে পারে তার এই নানা অনেক জিনপরী পালেন। ইসমে-আযম ও 'আলী-সাধনা' জানেন। এ সবার জোরে তার চাচা শাহ সাহেব একা একশ লোককে হারাইয়া দিতে পারেন। ইসমে-আযমের কথা শুনিয়া হামিদ তার এই নানাজীর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়। কিছুদিন তাঁর সাথে আলাপ করিয়া হামিদ তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়। ছয় মাসের মধ্যে হামিদ একদম নানা প্রাণ হইয়া যায়। নানাজী আসিলে সারাদিন এবং অনেক রাত পর্যন্ত নানাজীর সাথে-সাথে থাকে। সাদৃশ্য নানা-নাতিতে গুজুগুজু করিয়া কথা বলে। অল্পদিনেই হামিদ বুঝিতে পারে, বড়-আম্মার কাছে নানাজীর যে সব তারিফ শুনিয়াছে তার একটাও মিথ্যা নয়। বড়-আম্মা মানে মাজেলা বিবির কাছে সে শুনিয়াছিল, শাহ সাহেব লোকজনের সামনে মরা মানুষের রুহ হাজির করিয়া তাকে দিয়া কথা বলাইতে পারেন; জিন-পরী দিয়া চিকিৎসা করিয়া অনেক দুরারোগ্য রোগী তিনি ভাল করিয়াছেন; সাপে-কাটা মরা মানুষকে তিনি কবর হইতে তুলিয়া ঝাড়-ফুক দিয়া ভাল করিয়া হাঁটাইয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন। হামিদ নানাজীর সাথে মিশিয়া বুঝিল, এসব কথাই সত্য। শুধু যে নানাজীই এসব কথা বলিয়াছেন তা নয়। হামিদ অনেক দূরদূরাপির অচেনা লোকের মুখে নানাজীর এই সব বুয়ুর্গির বিবরণ শুনিয়াছে। হামিদ জানে, তার বাপজান নানাজীকে দেখিতে পারেন না। কিন্তু সে এও জানে, তার বাপের বড় বড় মুরিদের অনেকেই শাহ সাহেবকে কামেল লোক মনে করিয়া থাকেন। পীর সাহেব যে শাহ সাহেবকে বেশরা বেদ্আতী বলিয়া থাকেন এটাও পীর সাহেবের অনেক বড়-বড় মুরিদ পছন্দ করেন না।

এই নানাজীর নিকট হইতে হামিদ এমন-সব বাতেনী কথা জানিতে পারে, যা নিজের বাপের কাছেও জানিতে পারে নাই। জিন-পরীরা ত শাহ সাহেবের আংগুলের

ইশারায় চলে। শাহ সাহেবের এ কথায় হামিদের বিশ্বাস হইয়াছে। কারণ তিনি সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন, বহু সাধ্য-সাধনা করিয়াও তিনি আজো ইস্মে-আযম শিখিতে পারেন নাই। তবে তার বদলে তিনি 'আসমা-উল্-হাসানা' ও 'আলী-সাধনা' শিখিয়াছেন এবং হাতে-হাতে তার ফলও পাইয়াছেন। আলী-সাধনার মরতবা এই যে এই সাধনা যিকির করিয়া হায়দরী হাঁক মারিয়া তুমি শত-শত লোককে একাই হারাইয়া দিতে পার। কারণ এই সাধনাও হায়দরী হাঁকে তোমার শরীরটা আসমান-জমিন উঠা হইবে, পাহাড়ের মতো মোটা হইবে। এক-একটা আংগুল হইবে তোমার তাল গাছের মতো। তুমি তখন বড়-বড় বটগাছ তেঁতুল গাছ একটানে উপড়াইয়া হাজার গজ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারিবে এসব যেন এক-একটা মূলা গাছ। হিন্দুদের কালী-সাধনার চেয়ে মুসলমানদের আলী-সাধনার জোর অনেক বেশি। হযরত আলী এই সাধনা করিয়াই মদিনা হইতে অযোধ্যায় আসিয়া হিন্দুদের সবচেয়ে শক্তিশালী দেবী কালী মাইকে যুদ্ধে হারাইয়া ছিলেন। শত কালী-সাধনা করিয়াও হিন্দুদের কালী মাই হযরত আলীর মোকাবিলা করিতে পারে নাই। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষে আলী সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং আলী সাধনা শিখিবার উদ্দেশ্যে হযরত আলীর নিকট নিকাহ বসে। কিন্তু মুসলমান ধর্মে ঈমান না আনায় শেষ পর্যন্ত কালীদেবী আলী-সাধনা শিখিতে পারে নাই।

আসমাউল-হাসানার উপকারিতা এই যে এই এসেমের জোরে প্রথমে পয়গম্বর সাহেব ও পরে খাজে-খেয়েরের দিদার পাওয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত খোদার দিদার পাওয়া যায়। কিন্তু আসমাউল-হাসানার সাধনা বড় কঠিন কঠিন মানে চল্লিশ বছরের কমে এটা হাসিল করা যায় না। সে জন্য বড়-বড় আলী-সাধনার আসমাউল-হাসানার যে নির্যাস সেই ইস্মে-আযম বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সকলে তা পারেন নাই। শাহ সাহেবও পারেন নাই। তবে তিনি আজও চেষ্টা ছাড়েন নাই। ইস্মে আযম হাসিল করিতে পারেন নাই। বলিয়া তিনি আজও পয়গম্বর সাহেবের দিদার পান নাই। তবে খাজে-খেয়েরের দিদার তিনি দুই-তিন বার পাইয়াছেন। কিন্তু কথা হয় নাই। হইবেও না। হামিদের দাদা মরহুম ইস্মে-আযমের কিছুটা পাইয়াছিলেন। সে জন্য তিনি খাজে খেয়েরের সাথে কথা বলিয়াছেন বলিয়া শাহ সাহেবের বিশ্বাস। তবে তিনি তা স্বীকার করিতেন না। হামিদের বাপ সম্পর্কে শাহ সাহেব বলিতেন: দামাদ মিয়া খুব বড় আলেম তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ও-সবই যাহেরী এল্‌ম্। বাতেনী এল্‌ম্ তিনি বিশেষ হাসিল করিতে পারেন নাই।

এমন গম্ভীর নিরপেক্ষ সুরে শাহ সাহেব এসব কথা বলিতেন যে হামিদের সরল মন তাতে বিশ্বাস করিত।

শাহ সাহেবের প্রতি সে এমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে পীর সাহেবের দূর দেশে সফরে যাইবার সুযোগে কান্নাকাটি করিয়া আশ্রয় অনুমতি নিয়া সে দু-চার বার নানাজীর সাথে মুরিদানে গিয়াছে। এই উপলক্ষে হামিদ নিজ চোখে নানাজীর বুয়ুর্গি দেখিয়াছে। তার একটা এইরূপ:

১০

একটি মেয়েকে জিনে ধরে। শাহ সাহেব গেলেন জিন ছাড়াইতে। হামিদ গেল সংগে। আরও গেল শাহ সাহেবের চার জন শাগরিদ। সন্ধ্যার আগেই এদেরে নিয়া শাহ সাহেব রোগিনীর বাড়ি গেলেন।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ি। গৃহস্থের একমাত্র ছেলের নয়া-বিয়া-করা বৌকে ধরিয়াছে জিনে। এমনিতেই ভাল আয়োজন হইয়াছিল। তার উপর ফতেপুরের পীরজাদা আসিয়াছেন শুনিয়া গৃহস্থের বাড়িতে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে হৈ-হুল্লোড় পড়িয়া যায়। সাধ্যমতো খাতির-যত্ন ও খানাপিনা হয়।

এশার নমাজের পর বৈঠক বসে। ভিতরের উঠানই বৈঠকের স্থান। খুব বড় উঠান। তাও লোকে লোকারণ্য। শাহ সাহেবের কথামতোই খোলা উঠানে বৈঠক করা হইয়াছে। এ ধরনের জিন-ধরার বৈঠক সাধারণত ঘরের ভিতর হয়। তাতে অনেক চালাকি করা হয়। কিন্তু শাহ সাহেব চালাকির ধার ধারেন না। তিনি খোলা ময়দানে লোকজনের চোখের সামনেই জিন ধরিয়া আনেন। গ্রামময় এ কথা ছড়াইয়া পড়ে। তাই লোক আর ধরে না।

উঠানের উত্তরাংশ ঘেঁষিয়া শাহ সাহেবের বসিবার আসন করা হইয়াছে। শাহ সাহেবের আসনের ডান দিক ঘেঁষিয়া একটা কাল শাড়ি লটকাইয়া পর্দা করিয়া হইয়াছে। এই পর্দার আড়ালে বসান হইয়াছে বৌকে। শাহ সাহেবের ঠিক বাম পাশেই পীরজাদা হামিদের আসন পাতা হইয়াছিল। কিন্তু জিনে-আসর-করা 'বর্তি'র হাত-পা ছুড়াছুড়িতে পীরজাদার গায় চোট লাগিতে পারে এই যুক্তিতে শাহ সাহেবের আসন হইতে বেশ দূরে একটি চেয়ার পাতিয়া তাতেই হামিদকে বসিতে দেওয়া হইল। হামিদকে শাহ সাহেব বুঝাইলেন, উঁচা চেয়ারে বসিয়া দূর হইতে হামিদ সব ব্যাপার ভালরূপ দেখিতে পাইবে।

রোগিনীর কাল পর্দা ঘেঁষিয়া শাহ সাহেব বসিয়াছেন। শাহ সাহেবের বামে একটু সামনের দিকে বসিয়াছে চারজন শাগরিদ লাইনবন্দী হইয়া। শাহ সাহেবের ঠিক সামনে ডান কোণে 'বর্তি' বসিয়াছে শাহ সাহেবের দিকে মুখ করিয়া। 'বর্তি' মানে একজন লোক, যার উপর জিন আসিয়া আসর করিবে। জিন আসর করিবার পর ঐ ব্যক্তি আর সে থাকিবে না, সে হইবে তখন ঐ জিনটা। ঐ লোকটির মুখ দিয়া তখন ঐ জিনটাই কথা বলিবে।

'বর্তি'টি একটি হালকা-পাতলা যুবক। মোটা-সোটা স্বাস্থ্যবান লোক দিয়াও শাহ সাহেব 'বর্তি'র কাজ করাইতে পারেন। তবে তাতে তিনটা লোকসান হয়। এক. মোটা-সোটা লোকের কাছে সহজে জিন আসিতে চায় না। জোর করিয়া তাকে আনিতে হয়। তাতে জিন চটিয়া যায়। দুই. রাগত জিন রোগিনীর উপর বেশি জুলুম করে। তিন. বর্তি হাত পা ছুড়াছুড়ি করিয়া অনেক লোক জখম করে, জিনিস-পত্র নষ্ট করে।

শাহ সাহেবের এই মত সকলেরই পছন্দ হয়। তাই দুবলা-পাতলা অল্পবয়সের লোককেই 'বর্তি' বসাইতে সকলেই রাজি হয়। এই বাড়ির গৃহস্থও রাজি হইয়াছে।

শাহ সাহেবের আসন জনতার বসিবার জায়গা হইতে দূরে। শাহ সাহেবের ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে চারটা বড় বালিশ। সামনের বালিশটার উপর শাহ সাহেবের বস্তানি। বস্তানিটি লাল সালু। সেটিও সবুজ ও হলুদ রংগের নেকড়ায় পাকানো দড়ি দিয়া বাঁধা। এই বস্তানির মধ্যে মারফতী পুঁথি-কেতাব ও অশুধ-পত্র আছে। সামনের বালিশের লাগা শাহ সাহেবের ও 'বর্তির মাঝখানে একটি কাঠের চেরাগদান। চেরাগদানের মাথায় একটি মাটির মুছি। তাতে ঘি'র বাতি জ্বলিতেছে। সলতা বাড়াইবার জন্য একটি বাঁশের কাঠিও।

হাজিরানে মজলিসকে চুপ থাকিতে বলিয়া শাহ সাহেব কাজ শুরু করেন। কোরআন-তেলাওতের সুরে তিনি কিছু আরবী পড়িলেন। কি পড়িলেন, তা হামিদও বুঝিল না।

পড়া শেষ করিয়া শাহ সাহেব শাগরিদদের দিকে ইশারা করিলেন। তারা খোল-করতালসহযোগে সমবেত সংগীত জুড়িল। হামিদ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, এইবার দেখিল ওদের চাদরের নিচে ও পুটলার মধ্যে খোল-করতাল লুকান ছিল।

গানের কথাগুলি হামিদ প্রথমে বুঝিল না। কিন্তু তালটি তার ভাল লাগিল। শাহ সাহেব নিজে গানে যোগ দিলেন না বটে কিন্তু খোলকরতালের তালের সাথে-সাথে ডাইনে-বামে হেলিয়া-দুলিয়া তালি বাজাইতে লাগিলেন। তাঁর ইশারা দর্শকদের অনেকেও তেমনি করিয়া তালি বাজাইতে লাগিল। গান ও বাজনার তাল-তালে যেন গোটা জনতাই নাচিতে লাগিল। হামিদ নিজে অনুভব করিল প্রথমে তার দুই পা এবং অবশেষে তার সারা দেহ সে তালে শরিক হইয়া গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হামিদ গানের দুই-একটি কলি বুঝিতে পারিল। তার খুব ভাল লাগিল। সে শুনিল গায়করা অন্যান্য অস্পষ্ট কথার মধ্যে মধ্যে গাইতেছে: 'দমে-দমে কও আল্লা, মা ফি কালবি রব আল্লা, নূর মোহাম্মদ হুসন'। হামিদ বুঝিল ওরা আরবী শব্দগুলি ঠিকমতো উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না। সত্য কিন্তু অশুদ্ধ উচ্চারণের ক্রটি তারা গদ-গদ অন্তরের দরদ দিয়া শোধরাইয়া লইতেছে।

হামিদের শিশু মন গলিয়া গেল। নানাজীকে তবে বাপজান বেশরা ফকির বলেন কেন? তার কোনও যুক্তি হামিদ খুঁজিয়া পাইল না। নানাজীর প্রতি তার শ্রদ্ধা বাড়িল। গোটা জনতা যখন এইরূপে গানে-তালে বিমোহিত, তখন শাহ সাহেব হঠাৎ দুই হাত উঁচা করিয়া বলিলেন: খামুশ।

জনতার মধ্যে সুঁই-পড়া নিস্তব্ধতা আসিল। শাহ সাহেব ডান দিকে চাহিয়া 'বর্তি'কে বলিলেন: 'তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও। উহঁ হৈল না। ঠিক আমার চোখে-চোখে চাও। হাঁ, এইবার হৈছে। আমার চোখের দিকে এমনি এক ধ্যানে চাইয়া থাক। না না, চোখ নাইড় না। চোখের পাতা ফেইল না। হাঁ, এবার ঠিক হৈছে। আ হা হা, আবার নাড়িয়া ফেল্‌না? বেশ, তবে আমার নাকের উগায় নজর কর। বেশ, বেশ, এইবার ঠিক হৈছে। ঠিক এমনিভাবে থাক।'

বলিতে-বলিতে শাহ সাহেব সামনের দিকে হেলিয়া পড়েন। বর্তির কপাল ভুরু ও চোখের সামনে হাত নাড়িতে থাকেন। সংগে সংগে বিড়বিড় করিয়া দোওয়া পড়িতে থাকেন। অল্পক্ষণ এইভাবে পড়া এবং হাত নাড়ার পর শাহ সাহেব আচম্কা একটা

মুখভংগি করিয়া 'বর্তির' দুই ভুরু ও নাকের সংযোগ স্থলে নিজের শাহাদৎ আংগুল লাগাইলেন। সংগে-সংগে বর্তির সারা অংগ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শাহ সাহেব বস্তানিটি দুই হাতে তুলিয়া তাতে সশব্দে তিনবার চুমা খাইয়া উহা কপালে ঠেকাইলেন।

বস্তানিটি বালিশের উপর যথাস্থানে রাখিয়া শাহ সাহেব হাতের বাতাসে বাতিটি নিবাইয়া ফেলিলেন। সংগে সংগে তিনি বলিয়া উঠিলেন: কও তুমি কেটা?

বাতি নিবিয়া গেলেও আসমানের তারার আবছা আলোতে লোকজন নজরে আসে। সবাই দেখিল, শাহ সাহেব বর্তিকেই প্রশ্ন করিতেছেন। কিন্তু 'বর্তি' কোন জবাব না দিয়া ডানে-বাঁয়ে হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে।

শাহ সাহেব জোরে ধমকের সুরে বলিলেন: হেই বদমায়েশ, দুষ্টামি কৈর না। আমার কথার জবাব দেও। কও তুমি কে?

বর্তির হেলা-দুলা বন্ধ হইল। সে সোজা বসিয়া রহিল। কিন্তু কোন জবাব দিল না। তার বদলে উঠানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের তাল গাছ হইতে হা: হা: হো: হো: শব্দের একটা হাসি শোনা গেল।

শাহ সাহেব বর্তির উপর হইতে নজর উঠাইয়া তাল গাছের দিকে চাহিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন: ওরে শয়তান, তুই গিয়া বসছস তাল গাছে? আমিই সামনে আসবার সাহস নাই? তবে ক ওখান থনেই ক। তুই কে?

তাল গাছ হইতে আওয়াজ হইল: আমার নাম বেংগু জিন।

শাহ সাহেব: তুই এ বাড়ির মরিয়ম বিবির উপর আসর কসছস কেন?

তাল গাছ: হুঁ হুঁ হুঁ আমার তার উপর আশক হৈছে।

শাহ: বেটা বদমায়েশ, তুই জানস না, মরিয়ম অনেক জনের স্ত্রী?

তাল গাছ: আমি আশক হৈছি। আমার দিল ক্ষণে না।

শাহ: এই বেংগু। তুই তাল গাছ থনে নাইমা এই বর্তির মধ্যে ঢুক্।

তাল গাছ: আপনি আমারে মারবেন না ত?

শাহ: তোর কোন ভয় নাই। তুই আয়।

উপস্থিত জনতা দম বন্ধ করিয়া তাল গাছ হইতে বেংগুর অবতরণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। অকস্মাৎ উঠানের অজ দক্ষিণের বিশাল সাজনা গাছ হইতে আওয়াজ আসিল: শাহ সাব, বেংগু জিন মিছা কথা কইছে। মরিয়ম বিবিরে সে ধরে নাই, ধরছি আমি।

শাহ সাহেব সাজনা গাছের দিকে মুখ ফিরাইয়া গর্জিয়া উঠিলেন: তুই আবার কে? নাম কি তোর?

সাজনা গাছ: আমার নাম বেংগু জিন। আমিই মরিয়ম বিবির রূপে পাগল হৈছি। তারে আমি ছাড়ুম না।

তাল গাছ হইতে বেংগু জিন চিৎকার করিল: ওরে শালা বেংগু, ওরে ঝুটা মিথ্যাবাদী, তুই আবার কবে মরিয়মের উপর আশক হৈলি? তোর জিভ খইসা পড়ব না?

সাজনা: মিথ্যাবাদী বুটা আমি না তুই? আমার জিভ খসব কেন? জিভ খসুক গিয়া তুই শালার। তোর চৌদ্দ পুরুষে মরিয়ম বিবির মতো সুন্দরী চোখে দেখছস কোনও দিন?

তালগাছ: বেশি তেরিবেরি করিস না শালার পো শালা। একবার যদি আমার রাগ উঠে তবে উইড়া গিয়া শালার ঘাড় ভাইংগা ফেলুম কিন্তু।

সাজনা: আয় না শালা আয়। এক হাত হৈয়াই যাউক। শালা ডেংগু চোরা, তোরে আমি ডরাই নাকি?

তাল: কি আমাদের চোরা কইলি? জিনের জাতি মারলি? দাঁড়া তবে আসি।

নাক-কান বন্ধ করিয়া লোকেরা দুই জিনের মারামারি দেখিবার জন্য শুধু চোখ মেলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় পূর্বের ভিটির ঘরের চাল হইতে আওয়াজ আসিল: শাহ সাব ডেংগু-বেংগু দুই শালাই মিছা কথা কইতে আছে। ওরা কেউ মরিয়ম বিবির উপর আশক হয় নাই। আশক হৈছি আমি।

শাহ সাহেব পলকে গর্দান ফিরাইয়া পূর্বের ঘরের চালের দিকে চাহিয়া বলিলেন: তুই আবার কে? বড় বিপদে পড়া গেল ত? আমি কিন্তু এসব বদ্মায়েশি সহ্য করব না। ক তোর নাম কি?

ঘরের চাল: আমার নাম চেংগু জিন। ডেংগু-বেংগু কোন শালাই মরিয়মের উপর আসর করে নাই। আসর করছি আমি, ছাড়লে ছাড়তেও পারি আমিই।

তাল গাছ ও সাজনা গাছ হইতে সমস্তরে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল। পরস্পরের প্রতি বেদম গালাগালি চলিল। সে গাল আর থামে না। শাহ সাহেব বিরক্ত হইয়া ধমক দিলেন। বলিলেন: ওরে শয়তানের দল। তোরা চুপ করবি? না আমার আতশী লাঠি দিয়া তোরায়ে শায়েস্তা করা লাগব?

মহূর্তে জিনদের ঝগড়া থামিয়া গেল। তিনজনেই একদম চুপ।

শাহ সাহেব নরম সুরে বলিলেন: দেখ বাবারা, তোরারও একটা ইনসাফ আছে। তোরা তিনজনে ঝগড়া করবি? আর আমার রোগিনী এদিকে কষ্ট পাব? আমার কথা শোন। তোরা কে সাচা কথা কৈতেছস ঠিক কৈরা ক।

তাল: আমি সাচা কথা কইছি বেংগু-চেংগু বুটা।

সাজনা: আমিই সাচা। ডেংগু-চেংগু বুঝা।

ঘরের চাল: কেবল আমিই ঠিক। ডেংগু-বেংগু বুটা।

শাহ সাহেব এবার আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না। পাশে রাখা মালাক্কা বেতের লাঠিটার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন: দেখ তোরার মধ্যে দুইজন মিছা কথা কৈতেছস। এই মুহূর্তে যদি স্বীকার না করস, তবে আমি কিন্তু বেত মাইরা শায়েস্তা করুম।

তাল গাছ সাজনা গাছ ও ঘরের চালে আবার কথা কাটাকাটি ও গালিগালাজ শুরু হইল। গালি-গালাজ ক্রমে মা-বোন টানাটানিতে গিয়া উঠিল। কাজেই অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনটি জিনই ক্ষেপিয়া গেল।

তাল: তবে রে শালা।

সাজনা: তবে রে শালা

ঘরের চাল: তবে রে শালা।

ঘরের চাল ও সাজনা গাছ হইতে নামার শব্দ হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই বোঝা গেল তিনটা জিনই তাল গাছে জমা হইয়া পরস্পরকে গালিগালাজ করিতেছে এবং চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুমি ও লাথি-গুড়ি মারিতেছে। হামিদ ও জনতা দম বন্ধ করিয়া জিনের লড়াই শুনিতে থাকে।

শাহ সাহেব আর সহ্য করিতে পারিলেন না। এবার সত্য-সত্যই বেতের লাঠিটা হাতে লইয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন এবং মাটি ফাটাইয়া গর্জন করিলেন: হারামজাদার পোতেরা। তোরা আমার সামনে মারামারি কৈরা বেআদবি করবি? আমার রোগিনীকে কষ্ট দিবি? আর বর্তিটার জান পেরেশান করবি? মনে করছস্ আমি এসব সহ্য করুম?

শাহ সাহেব উঠিবার ভাব দেখাইতেই জিনেরা একদম চুপ করিয়া গেল। শাহ সাহেবও উঠিলেন না। বলিলেন: তোরা সাচা কথা কইবি কি না ক।

তাল গাছ হইতে তিনটা জিনই এক সুরে বলিল: শাহ সাব, আপনি ত সবই জানেন। আমরা পুছ করেন কেন? আপনিই কন না?

শাহ সাব: আমি কৈলে তোরা মানবি? আমি যে দুই জনরে যাবার হুকুম দিমু, তারা আমার কথামতো চৈলা যাবি?

তিনটা জিন সমস্বরে বলিল: হাঁ চৈলা যামু। কিন্তু আপনি এতাদা করা লাগব ঐ দুইজন অন্য মেয়ের উপর আশক হৈলে আপনি বাধা দিবেন না।

শাহ সাহেব মুচকি হাসিয়া বলেন: এখন ত চৈলা আ, পরে দেখা যাব। শোন তোরা, আমি রায় দিলাম, বেংগু ও চেংগু চৈলা যাব। ডেংগুই ঠিক কথা কইছে। সে থাকব। ডেংগু তুই আইসা 'বর্তি'র কান্ধে ভর কর। এই আমার হুকুম।

তাল গাছে খসখস্ আওয়াজ হইল। ডানার আওয়ায করিয়া যেন দুইটা বড় পক্ষী তাল গাছ হইতে উড়িয়া দুই দিকে চলিয়া গেল।

শাহ সাহেব চিল্লাইয়া বলিলেন: তাল গাছে এখন কে আছস?

তাল গাছ: আমি ডেংগু জিন একলা আছি।

শাহ: বেশ, তুই এইবার নাইমা আয়। বর্তির কান্ধে ভর কর।

বর্তি হুঁ হুঁ করিয়া মাথা এদিক-ওদিক হেলাইতে শুরু করিল। শাহ সাহেব বর্তিকে জিজ্ঞাস করিলেন: এইবার ক ত ডেংগু তুই মরিয়মের উপর কেন আসর করলি?

বর্তি: শনিবার ঠিক দুপুর বেলায় মরিয়ম বিবি মাথার চুল ছাইড়া খালি মাথায় লোটা লৈয়া গেছিল। আমি তার চুল দেইখা আশক হৈচি।

শাহ: এবার তুই মরিয়মরে ছাইড়া দে। সে আর খালি মাথায় চুল ছাইড়া পায়খানায় যাব না।

বর্তি: এক শর্তে আমি মরিয়মরে ছাড়বার পারি।

শাহ: ক কি তোর শর্ত?

বর্তি: নূরা পীরের দরগার বট গাছের আগায় আগামী অমাবস্যায় দুপুর রাত্রে গরু কোরবানি করা লাগব।

শাহ: ঠাট্টা-ময্যাক করিস্ না ডেংগু। বটগাছের আগায় গরু কোরবানি করে কেমনে?

বর্তি: আমি ঠাট্টা-ময্যাক করি না। এটাই আমার শর্ত, ওটা না হৈলে আমি মরিয়মরে ছাড়ুম না।

শাহ: গরু দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু বট গাছের আগায় কোরবানি দিমু কেমন কৈরা?

বর্তি: সেটা আমি দেখায়া দিমু। আপনারা গরু লৈয়া বটগাছ তলায় যাবেন।

শাহ: বেশ, আমরা তোর প্রস্তাবে রাজি। এখন ক দেখি তুই কি রংগের কেমন গরু চাস?

বর্তি: আমি মিস্ কালা রংগের ষাঁড় চাই।

শাহ: বেশ, আমরা তাতেই রাজি। আগামী অমাবস্যায় দুপুর রাতে নূরা পীরের বটগাছ তলায় আমরা ষাঁড় গরু নিয়া যামু। বাকি কাজ তুই করবি? কেমন রাজি ত?

বর্তি: হুঁ হুঁ আমি রাজি।

বর্তি ডান দিকে হেলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পর্দার ভিতর হইতে মরিয়ম 'বাবা গো' 'মা গো' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

শাহ সাহেব বালিশের উপর-রাখা দিয়াশলাই জ্বালিয়া চেরাগ ধরাইলেন। আলোকে সবাই দেখিল, বর্তি নিজীব হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। পানি-ভরা বদনা কাছেই ছিল। সেই বদনা হইতে এক চৌল পানি বহিয়া শাহ সাহেব বর্তির চোখে মারিলেন এবং ঐ ভাবে বর্তির চোখে-মুখে পানি ছিটাইতে থাকার আদেশ দিয়া তিনি মরিয়মের স্বামীকে লইয়া কাল পর্দার আড়ালে ঢুকিলেন। মরিয়ম চিৎকার করিয়া কাঁপিতেছিল। শাহ সাহেব তার সারা গায় হাত বুলাইয়া দোওয়া করিলেন। পর্দার বাইরে আসিয়া ঘোষণা করিলেন: মরিয়ম ভাল হৈয়া গেছে। তাকে ঘরে লৈয়া যাও।

ইতিমধ্যে বর্তি সম্পূর্ণ চেতন হইল। তাকে ঘেরিয়া ভিড় করিয়া লোকজনেরা নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। শাহ সাহেব মুচকি-মুচকি হাসিতে থাকিলেন।

এমন সময় মরিয়মের স্বামী মরিয়মকে ঘরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিল এবং ঘোষণা করিল: সত্যি তার স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।

জনতা করতালি দিয়া সে কথায় আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করিল।

করতালি থামিলে শাহ সাহেব তব্বির সুরে বলিলেন: করতালি দেওয়া শরিয়তের বরখেলাফ কাজ। ভবিষ্যতে কেউ আর এমন কাজ কৈর না। এখন আমার সাথে হাত উঠাইয়া শোকরানার মোনাজাত কর সকলে।

শাহ সাহেব হাত উঠাইলেন। গোটা জনতা তাঁর সাথে হাত উঠাইল। শাহ সাহেব 'খানিক আরবী, খানিক উর্দু ও খানিক বাংলায় দোওয়া করিতে লাগিলেন। জনতা 'আমিন' 'আমিন' বলিতে লাগিল।

অনেক রাতে শাহ সাহেব হামিদকে সংগে লইয়া বিদায় হইলেন। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ততক্ষণে উঠিয়াছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার। কাজেই বাড়িওয়ালার অনুরোধ সত্ত্বেও শাহ সাহেব থাকিতে রাজি হইলেন না। সংগে লোক দিবার প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করিলেন।

হামিদ দেখিল, বাড়িওয়ালা শাহ সাহেবকে অনেকগুলি টাকা দিল। শাহ সাহেবের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও বট গাছে গরু কোরবানি দেওয়ার দায়িত্বও বাড়িওয়ালা শাহ সাহেবের ঘাড়ের চাপাইল।

১১.

এর পর শাহ সাহেবের প্রতি হামিদের টান আরও বাড়িয়া যায়। তাঁর কথা-মতো সে সাধনায় লাগিয়া যায়। আগে-আগে সে শুধু পয়গম্বর সাহেব ও খাজে-খেয়েরকে খাবে দেখিবার সাধনা করিত। এখন হইতে সে জিনপরী পালিবার এবং খাজে-খেয়েরকে সশরীরে দেখিবার সাধনা শুরু করে। সারা রাত সে নফল এবাদত করে; সারা দিন রোযা রাখে। খাজে-খেয়েরের দিদারের জন্য বিকালে নদীর ধারের জংগলে একা-একা বসিয়া থাকে।

আট বছরের শিশু সত্য-সত্যই সারা দিন রোযা রাখিবে এটা মাজেলা বিবি প্রথম-প্রথম বিশ্বাস করেন নাই। মনে করিয়াছেন, দুপুর পর্যন্ত উপাস থাকিয়াই ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িবে। একটু সাধাসাধি করিলেই খাইবে কিন্তু তিনি সেখিয়া চিন্তিত হইলেন, ছেলে সত্য-সত্যই সারা দিন রোযা রাখিয়াছে। তাও অস্বাভাবিক সেহরি না খাইয়া। তার উপর সারা দিনের রোযার ফলে অত ক'হিল হইয়াও রাতের নমাজ পড়িয়াছে। তিনি কত মানা করিয়াছেন। নিজে বুড়া মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তার চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু হইয়াছে। কি আশ্চর্য! ঐ টুকু শিশুর চোখে ঘুম নাই। তিনি শুইয়া-শুইয়া ছেলের নমাজের রাকাত হিসাব করিয়াছেন। হিসাবে মাজেলা বিবি পাকা নন। তিনি প্রথমে আংগুলে কুড়ি গনিয়া শাড়ির আঁচলে কুড়ির গিরো দিয়া দুই শ তক হিসাব করিয়াছেন। তার পরই তাঁর হিসাবে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। শাড়িতে আর গিরোর জায়গা নাই। তিনি এরপর শুধু আন্দাজ করিয়াছেন তিন শ রাকাত ত হইবেই।

একদিন-দুদিন নয়। দিনের পর দিন এমনি চলিয়াছে। মাজেলা বিবির মনে চিন্তার অবধি নাই। নিজের পেটের ছেলে না হইলেও ছয় ছয়টা বছর এই ছেলেকে তিনি কোলে-কাঁখে মানুষ করিয়াছেন। হামিদকে তাঁর বড় ভাল লাগে। ওকে ঘিরিয়া তাঁর মাতৃ-হৃদয় আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। হামিদ যে তাঁর পেটের ফরযন্দ নয়, একথা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন। এই ছেলেই দিনের পর দিন উপাস থাকিয়া এমন শুকাইয়া যাইতেছে, এটা তাঁর মাতৃ-প্রাণ সহ্য করিতে পারিতেছে না। ছেলেকে তিনি অনেক বুঝাইয়াছেন। পীর সাহেবের দৌলতে তিনি হাদিস-কোরআন মসলা-মসায়েল কম জানেন না। অত ছোট শিশুর জন্য নফল ইবাদত কিছুতেই আবশ্যিক নয়। এসব কথা ছেলেকে অনেকবার বলিয়াছেন। হামিদ হাসিয়া মার কথা উড়াইয়া দিয়াছে। সে-হাসিতে মাজেলা বিবি বুকে আরও ব্যথা পাইয়াছেন। কারণ হামিদের শুকনা মুখে হাসি ফুটে না। তার দাঁতের সাথে শুকনা ঠোঁট আটকাইয়া যায়।

মাজেলা বিবি কত রাত দেখিয়াছেন, ছেলে সিজদায় গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আহা পড়িবে না? ঐ টুকু শিশু সারাদিন রোজা রাখিয়া কত কাহিল হইয়া পড়িয়াছে! কতক্ষণ আর নমাজের উঠ-বস করিতে পারে? আহা! বাছাধন আমার ঘুমাউক, আরও ঘুমাউক। ঘুমটা পাকিবার অপেক্ষায় তিনি আরও কিছুকাল অপেক্ষা করেন। তারপর সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়া পাঞ্জাকোলে ছেলেকে তুলিয়া বিছানায় শোওয়াইবার জন্য যেই তিনি ধরিয়াছেন, অমনি ছেলে সিজদা-অবস্থায়ই গা ঝাড়া দিয়া মার হাত ফস্কাইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাতেও মাজেলা বিবি না বুঝিলে সে মাথা তুলিয়া মাকে তস্থিহ করিয়াছে। মা ভুল বুঝিয়াছেন। হামিদ ঘুমায় নাই। সে সিজদায় এক হাজার বার সোবহানাল্লা পড়িতেছিল। আট শ পঞ্চাশবার সে পড়িয়াই ফেলিয়াছিল। আরেকটু হইলেই সে হাজার পুরা করিয়া ফেলিত। আশ্চর্য্য তার সে তসবীহ পড়াটাই মাটি করিয়াছেন। আবার তাকে নতুন করিয়া এক হইতে শুরু করিতে হইবে।

মাজেলা বিবির মনে ধিক্কার ও চোখে পানি আসিল। তিনি হতভাগা না বুঝিয়া ছেলের কষ্ট দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। রাগে নিজের চুল ছিঁড়বার ইচ্ছা হইল তাঁর। কি তিনি করিবেন এখন? এ অবস্থায় ছেলেকে এবাদত রাখিয়া তিনি ঘুমাইতেও পারেন না। ছেলে যদি আবার দুহুইয়া এবাদত শুরু করে, তবে ত রাত সাবার হইয়া যাইবে। এভাবে অঘুমে কাটাইলে ছেলে বাঁচিবে কয়দিন? অনেক বলিয়া-কহিয়া ছেলেকে রাজি করিয়া ঘুম পাড়াইলেন।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দ্বিধা সংকোচ ডিংগাইয়া একদিন পীর সাহেব কেবলাকে সব বলিয়া দিলেন। মাজেলা বিবির বকের উপর হইতে পাথর নামিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, পীর সাহেব ছেলের সব খবর রাখেন। মাজেলা বিবির চেয়ে বেশিই রাখেন। হরিণের চামড়া ও জাফরানের কাহিনী মাজেলা বিবি জানিতেন না।

চেরাগে দম্কা হাওয়া

১

পীরজাদা সৈয়দ আবদুল হামিদ সিদ্দিকী আল-কোরায়েশী এখন সিরাজগঞ্জ সিনিয়র মাদ্রাসায় পড়ে। জমাতে সিওম। প্রভাবশালী ছাত্র-নেতা। তিন বছর আগে ফতেপুর মাদ্রাসার পড়া শেষ না করিয়াই সিরাজগঞ্জে আসিয়াছে সরকার-অনুমোদিত উলা পাশ করিবার জন্য। এই তিন বছরে অনেক নাম করিয়াছে। ফতেপুরের পীরজাদা বলিয়া এমনিতেই সে সুপরিচিত। এর উপর সে পড়াশোনায়ও ভাল। ক্লাসের পড়ার চেয়ে জ্ঞানও রাখে প্রচুর। নিজের ক্লাসের ছাত্ররা ত বটেই, উপরের ক্লাসের ছাত্ররা এমনকি মুদাররেসরা পর্যন্ত হামিদকে সমীহ করিয়া চলেন তার জ্ঞানের জন্য। সে ফারসী ও উর্দুতে কবিতা রচনা করিতে পারে। আরবীতে অনর্গল বক্তৃতা ও কথোপকথন করিতে পারে। জমাতে উলার ইসমাইল ও আযিয প্রভৃতি জন তিন-চারেক ছাত্র ছাড়া আর কোনও ছাত্র হামিদের সাথে আরবী-ফারসীতে কথা বলিয়া ও বক্তৃতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারে না। আযিয-ইসমাইলরা পড়ার দিক দিয়া মাত্র দুই জমাত উপরে হইলেও বয়সে ওরা হামিদের চেয়ে দশ-বার বছরের বড়। হামিদ আসার আগে এরাই এ মাদ্রাসার ছাত্র-নেতা ছিল। আজও তাই আছে। কিন্তু সকল ব্যাপারেই ছাত্রদের হামিদের উপদেশ-মতো চলিতে হয়। হামিদ যে শুধু পড়া-শোনায়ই ভাল, সে যে শুধু আরবী-ফারসী-উর্দুতে কবিতা রচনা ও বক্তৃতা করিতে পারে তা নয়, সে গান-গয়লও গাইতে পারে।

ফতেপুর মাদ্রাসায় পড়াকালেই সে খোশ ইলহানে কাসামুল্লাহ পড়িতে পারিত। মক্কী মিসরী ও বাগ্দাদী সব এলহানেই সে ছিল উত্তম। তার গলা যেমন দরায় ও বুলন্দ, তেমনি মিঠা ও দরদী। সরকারী অফিসার ও মন্ত্রীরা ফতেপুর আসিলে তাঁদের সম্বর্ধনা সভায় এবং মাদ্রাসার বার্ষিক সম্মিলনীতে হামিদের গয়ল ও ইলহান শুনিবার জন্য লোকের ভিড় হইত। হামিদ যখন মসজিদের মিনারে উঠিয়া আজান দিত, তখন নিতান্ত বেনামাজী চাষীরা হাতের কাজ ফেলিয়া এবং পথিকরা চলা বন্ধ করিয়া হামিদের আজান শুনিত। হামিদের আজানের লম্বা রেশ শ্রোতাদের কানে ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো কাঁপিয়া-কাঁপিয়া আবেশ সৃষ্টি করিত।

সিরাজগঞ্জে আসার পর হামিদের এই সব গুণ একটা-একটা করিয়া সব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ফলে শুধু মাদ্রাসার নয়, মাদ্রাসা-সংলগ্ন হাইস্কুল ও অদূরবর্তী কলেজের সমস্ত ফাংশানেও হামিদের ডাক পড়ে। তার গানে গয়লে খোশ ইলহানে ও দরদী গলায় মসনবী শরিফ পাঠে চারদিক হইতে 'মারহাবা' পড়িয়া যায়।

এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও হামিদ ছাত্রদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় নয়। সকলেই তার পাণ্ডিত্যের ও গলার তারিফ করে বটে, কিন্তু বড় কেউ তার কাছ ঘেঁষে না। তার সাথে বন্ধুত্ব করে না। সবাই তাকে বোধ হয় ভক্তি করে। কিন্তু কেউ তাকে ভালবাসে না।

কারণ প্রায় সকলেই ভাবে ফতেপুরের পীরজাদা বলিয়া হামিদ দেমার্গী ও অহংকারী। সেই জন্যই সে সকলের সাথে দিল খুলিয়া মিশে না। কেউ-কেউ মনে করে, হামিদের মাথায় ছিট আছে।

এর কারণ এই: প্রথমত সে পোশাক-পরিচ্ছদে এমন কাঠ মোল্লা যে মুদাররেসরা পর্যন্ত তার বাড়াবাড়িতে অসুবিধা বোধ করেন। ছাত্ররা তার পোশাক-পাতি লইয়া আড়ালে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। হামিদ হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলওয়ালা কল্লিদার কোর্তা, টাখনোর চার আংগুল উপরে চুড়িদার পায়জামা ও মাথা-চাপা পাঁচ কল্লি কাপড়ের টুপি পরে। ঈদ পর্বে ও সভাসমিতিতেও হামিদ কোনদিন শেরওয়ানী আলিগড়ী পায়জামা বা তুর্কীটুপি পরে না। যারা পরে তাদের হামিদ ভাল চক্ষে দেখে না। অথচ সকল ছাত্র এবং অনেক শিক্ষকও ঐ পোশাক পরিয়া থাকেন। হামিদের পোশাক লইয়া বন্ধুরা যতই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে, হামিদের জিদ তত বাড়িয়াছে। সে এক মূর্ত টুপি ছাড়া থাকে না। এমন কি টুপি পরিয়া ঘুমায়। টুপি পরিয়া গোসল করিতে পুকুর-ঘাটে যায়। পানিতে নামিবার আগে কোর্তা-গেঞ্জি খুলিবার পরে মাথা হইতে টুপি নামায়। গোসল শেষ করিয়া তোয়ালিয়ায় গা মুছিয়া সবার আগে টুপি মাথায় দেয়। তারপর ভিজা কাপড় বদলায়। এই লইয়া বন্ধুরা হামিদকে শুনাইয়া-শুনাইয়া সেই কিংবদন্তির হাজী সাহেবের পরনের লুংগি খুলিয়া পাগড়ি বাঁধার চির নুতন কাহিনী বয়ান করে। এত করিয়াও বন্ধুরা হামিদকে চটাইতেও পারে না; তার অভ্যাসও বদলাইতে পারে না। হামিদ বন্ধুদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জবাব দেয় না। নিজের মতে ঠিক থাকে। এতে বন্ধুরা হার মানিয়া হামিদের নতুন বদনাম বাহির করে, সে দেমার্গী। ফতেপুরের পীরজাদা বলিয়া সে নিজেকে বড় লোক মনে করে। অথচ, হামিদ জানে, তার মনে কোনও অহংকার নাই। সে কোনও দিন নিজেকে বড়লোক মনে করে না। অথচ বন্ধুদের ভুল ভাংগাইবার কোন চেষ্টাও করে না। গায় পড়িয়া কারও সাথে খাতিরও জমায় না। বন্ধুরা তাকে এড়াইয়া চলায় সে বরঞ্চ খুশীই হয়। বন্ধুদের সাথে ইয়ার্কি দিয়া গল্প-গোয়ারি করিয়া কাটাইবার মতো সময় তার নাই। এটাই তার আনন্দপুলারিটির দ্বিতীয় কারণ।

সে খেলাধূলা করিতে খেলার মাঠে যায় না। বই-পুস্তক পড়িতে কমন রুমেও আসে না। লাইব্রেরি হইতে পুস্তক আনিয়া সে সারাদিন নিজের সিটে বসিয়া পড়ে। আর রাত-ভর সে এবাদত করে। দু-চার জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে মাঝে-মাঝে সে রেললাইন ধরিয়া খোলা মাঠে, কিস্বা নদীর ধারের বনে-জংগলে অথবা শুকনা দিনে নদীর চরে বেড়াইতে যায়। সেখানে গলা ছাড়িয়া দু-চারটা গান-গযল গায়। ঠিক মগ্রেবের ওয়াকতে হোস্টেলে ফিরিয়া সেই যে নিজের সিটে যায়, আর বাহির হয় না।

হামিদ হোস্টেলের যে কামরায় থাকে, তাতে চারটা সিট পড়ে। কিন্তু এই তিন বছরে সে-কামরায় কোনও ছাত্র দুই এক মাসের বেশি থাকে নাই। বর্তমানে হামিদ ছাড়া সে কামরায় আর কেউ থাকে না। কারণ হামিদ সারা রাত এবাদত করে। আয়ামবাযের রোজা ও রাতের এবাদত কোনটাই ছাড়ে না। শবে-কদর শবে-বরাত বারই রবিউল-আউয়াল এগারই রজব কোনটাই বাদ যায় না। এ ছাড়া সব চাঁদের মাসে নাকি অনেকগুলি আফযল রাত আছে। ঐ সব রাতে এক রাকাত নমাজ পড়িলে নাকি সত্তুর রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়। ঐ সব রাতে হামিদ বিছানার সাথে পিঠ লাগায়

না। এসব এবাদত হামিদ অবশ্য করে নীরবে। কেরাত আয়াত ও দোওয়া দরুদ পড়ে সে চুপে-চুপে। এতে রুম-মেটদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অন্ধকারে এবাদত জায়েয নয় বলিয়া হামিদ হারিকেন জ্বলাইয়া রাখে। বন্ধুদের অনুরোধে সে বাতির তেজ অবশ্য খুবই কমাইয়া ও কাগজের ঘের দিয়া দেয়। তবু ঐটুকু আলাতেও অনেকের ঘুম হয় না। তাছাড়া এবাদতের মাঝে-মাঝে কিতাব-বিনি ও কোরআন-খানি দরকার হয়। তখন অল্প সময়ের জন্য হইলেও বাতির তেজ বাড়াইতে হয়। এর উপর এবাদতের রুকু-সিজ্জা ও উঠ-বসে চৌকির মড়-মড় ও কেচ্চৎ-কোচ্চৎ আওয়াজ হয়। সে আওয়াজে অনেকের ঘুম ভাংগিয়া যায়। একবার ঘুম ভাংগিলে অনেকেরই আর ঘুমে ধরে না। এইসব অভিযোগের খুটিনাটি লইয়া হোস্টেলের সুপার এবং শেষে মাদ্রাসার হেড মুদাররেস, রেক্টর ও প্রিন্সিপাল পর্যন্ত দরবার হইয়াছে। ফতেপুর ও এবাদত এই দুই যুক্তিতে সব অভিযোগই বিফল হইয়াছে। কেউ না বলা সত্ত্বেও হামিদ এখন একাই চার সিটের রেন্ট জমা দেয়। এরপর কারও কিছু বলিবার নাই। নাই বলিয়াই এটাকেও হামিদের বড়লোকির প্রমাণ বলিয়া বন্ধুরা চালাইয়া দিয়াছে।

হামিদ ওদিকে কান দেয় নাই। তবে একটা ব্যাপারে সে মনে খুব ব্যথা পাইয়াছে। মাদ্রাসার ছাত্র হইয়াও তার বন্ধুরা, এমনকি কোনও কোনও মুদাররেসও হামিদের এবাদতে বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সহপাঠীদের অনেকেই এবং মুদাররেসদের কেউ-কেউ হামিদের এই সব এবাদতের আবশ্যিকতা ও উপযোগিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। দুই-এক জন এগুলিকে শরিয়ত বিরোধীও বলিয়াছেন।

কিন্তু হামিদ টলে নাই। কারণ হামিদ ভাল করিয়াই জানে যে তার এবাদতের ভেদ কথা কেউ জানেন না। ওঁরা মনে করিয়াছেন, সওয়াব হাসিল করিয়া বেহেশতে যাইবার আশাতেই হামিদ এই সব এবাদত করিতেছে। তাঁরা ত জানেন না যে হযরত পয়গম্বর সাহবকে খাবে দেখিয়া খাজে-খেয়েরের দিদার লাভ করিয়া, জিন-পরীর উপর এলাকা বিস্তার করিয়া আবে-হায়াতের কুয়ার সন্ধান লাভ করিয়া এবং শেষ পর্যন্ত তার পানি খাওয়াই হামিদের একমাত্র উদ্দেশ্য। হামিদের এই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা জানিতে পারিলে বেচারারা কখনই হামিদের এবাদতের নিন্দা করিতে পারিতেন না। তবু নিজের এই ভেদ কথা সে কাউকে বলে না। নীরবে চোখ বুজিয়া সব সহিয়া যায়। নিজ মনে এবাদত করে।

২

হামিদ তার এবাদতের ফল পায়-পায় পায় না। পয়গম্বর সাহেব ও খাজে-খেয়েরকে খাবে দেখে-দেখে দেখে না। প্রতি রাত তার খাবের অবস্থা এমন স্তরে আসে যে আর এক লহমা স্বপ্নটা স্থায়ী হইলেই হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, স্বপ্নটা ঠিক মোক্ষম সময়ে হয় ভাংগিয়া যায়, নয় ত স্বপ্নের মোড় ফিরিয়া যায়। এবাদতের কোনও ফ্রুটির জন্যই নিশ্চয় এমন হয়। পরদিন হামিদ আরও নিখুঁতভাবে এবাদত করে। আশা, এ রাত্রি সে সাফল্য লাভ করিবেই। এমনি হইতেছে কতদিন ধরিয়া। হামিদ তবু নিরাশ হয় না।

বছর দুই আগে হামিদ একটু-একটু নিরাশ হইয়াছিল। তার মনে দুর্বলতাও খানিকটা আসিয়াছিল। সেটা বন্ধুদের বিদূষে বা মুদাররেসদের সমালোচনায় নয়।

নিজের অক্ষমতার দরুন। সে-নৈরাশ্যের ফলে মনের অবস্থা তার এক সময়ে এমন হয় যে এবাদত প্রায় ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করে। কিন্তু গুনিয়াতুত্তালেবিন মূর্শেদুত্তালেবিন মিন্‌হাযুল আবেদিন ফতহুল গায়েব ওগায়রা যে-সব কিতাব এতদিন হামিদ বাংলা বা উর্দু তরজমায় পাঠ করিয়াছিল, এখন সেগুলি সে মূল আরবীতে পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। ফলে তার নৈরাশ্য ও দুর্বলতা সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হইয়াছে। মনে নতুন আশা ও বৃক্কে নতুন বল পাইয়া নব উদ্যমে এবাদত শুরু করিয়াছে।

তাতে ফল যে একেবারে পায় নাই, তা নয়। এবারের চেষ্টায় সে খাবে হয় পয়গম্বর সাহেবকে, নয় ত খাজে-খেয়েরকে নিশ্চয় দেখিয়াছে। কিন্তু ঠিক কাকে দেখিয়াছে, তা মনে পড়ে না। যে মহাপুরুষকে হামিদ খাবে দেখিয়াছে, তিনি কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু ঠিক কি কথাটা বলিয়াছেন, হামিদ তাও মনে করিতে পারিতেছে না। পরদিন সকাল হইতে সারাদিন নিজের মাথা চাষ করিয়াছে। কিন্তু কিছুই মনে করিতে পারে নাই। রাগে সে নিজের মাথার চুল টানিয়া ছিড়িয়াছে। মাথা তবু জবাব দেয় নাই। খাবে-দেখা মহাপুরুষের মুখাকৃতিটা পর্যন্ত হামিদের মনে পড়িতেছে না। মুখের চেহারা ছাড়া আর সবই তার মনে পড়িতেছে। ডান হাতে কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হযরত মুসা নবীর আসার মতো লাঠি, বাঁ হাতে হাজার দানার আতশী তসবিহ, পায়ে জরির দেলওয়ারী জুতা, ধবধবা সাদা চুড়িদার পায়জামা, রেশমী সজ্জাব-দেওয়া কল্লিদার লম্বা কোর্তা, এ সবই হামিদের চোখের সামনে ভাসিতেছে। এমনকি দেলওয়ারী জুতার সুড় দুইটা কপড়টা উচা হইয়া কিভাবে বেকিয়া গিয়াছে, চুড়িদার পায়জামার চুড়ি দুইটি যে পাশে পাঁজা এক ইঞ্চি হইবে কোর্তার বৃকের বোতামগুলি যে ঝিনুকের নয় বৃক্কে কপড়ের পুটলির, এসব খুটিনাটি ব্যাপারও হামিদের দিব্যি মনে পড়িতেছে। কোর্তার বোতামগুলি এক-দুই-তিন করিয়া গনিয়া উপরের দিকে উঠিতেই ঢেউ-খেলানো ধবধবা সফেদ চাপ দাঁড়িটি চোখে পড়ে। সেই চাপ দাঁড়ির দুই গালপাট্টা বাহিয়া হামিদের নজর মহাপুরুষের মাথায় উঠিয়া পড়ে। মাথায় ঝলমলা পাগড়ি। দুই পাশে হইতে পরতে-পরতে প্যাঁচ দেওয়া কপালের মাঝখানে কোন-তোলা কি সুন্দর পাগড়িটি! তার পরতগুলি পর্যন্ত এক দুই করিয়া গণা যায়। হাঁ ঐ ত এ-পাশে পাঁচটা ও-পাশে পাঁচটা প্যাঁচের পরত। কি সুন্দর ধাপে-ধাপে থরে-থরে একটির উপর আরেকটি বসিয়াছে। এইভাবে দাঁড়ি, দাঁড়ির গালপাট্টা মাথার উপরের পাগড়ি সবই হামিদের চোখে ভাসিতেছে। কিন্তু দাঁড়ি ও পাগড়ির মাঝখানের অংশটা হামিদ কিছুতেই দেখিতে পাইতেছে না। অনেকবার সে নিজের চোখ দুটাকে পাগড়ি হইতে নিচের দিকে জুতা পর্যন্ত এবং জুতা হইতে উপরের দিকে পাগড়ি পর্যন্ত নামা-উঠাও করাইয়াছে। প্রতিবারই উঠা-নামা ও নামা-উঠার সময় ঐ জায়গায় আসিয়া হামিদ তার চোখ দুইটাকে প্রথম দিকে টর্চলাইট পরে সার্চ লাইট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রতিবার মুখের কাছে আসিয়া চোখ দুইটা প্রথমে ঝাপসা ও পরে একদম আন্ধার হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই সে মহাপুরুষের মুখটি দেখিতে পাইতেছে না। মুখটি আকৃতি ধরে ধরে করিয়াও ধরিতেছে না। মুখ-মোবারক যেন হামিদের চোখের সাথে লুকোচুরি খেলিতেছে। ঠোঁট-মোবারক ধরা দেয় ত নাক-চোখ-মোবারক ধরা দেয় না। চোখ-মোবারক ধরা দেয় ত নাক-ঠোঁট-মোবারক ধরা দেয় না। হামিদের চোখ দুইটিও তখন লুকোচুরি শুরু করে। তারা তখন টর্চ লাইট সার্চ লাইটের তেজ বাদ দিয়া কুপ্লির টিম্‌টিমা আলোকে অতি সন্তর্পণে আস্তে-আস্তে বুড়া

আংগুলে ভর করিয়া টিপিয়া-টিপিয়া অগ্রসর হয়। পাগড়ির পরতে-পরতে গেরিলা যোদ্ধার মতো গুটি-গুটি পা ফেলিয়া কপাল পর্যন্ত আসিয়া অতর্কিতে হাম্মাৎ করিয়া মহাপুরুষের মুখের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শূন্য মাঠ। মুখ পায় নাই।

তেমনি নিচের জুতা হইতে বাদুড়ের মতো পায়জামায় ঝুলিয়া হাঁটু বাহিয়া সন্তর্পণে কোর্তায় আসিয়াছে। নরম হাতে কোর্তার কল্লি ধরিয়া আস্তে আস্তে বুকে উঠিয়াছে। এক-এক খান করিয়া পুটলির বোতাম গনিয়া দাঁড়িতে উঠিয়াছে। খরগোস-শিকারী যেমন ছন ক্ষেত বিলি দিয়া-দিয়া আগবাড়ে হামিদের চোখ দুইটা তেমনি মহাপুরুষের দাঁড়ি বিলি দিয়া থুতিতে উঠে। তারপর অতর্কিতে লাফ দিয়া মুখে পড়ে। কিন্তু এবারও খালি মাঠ। ধু-ধু করে। কিছু দেখা যায় না।

জুতার কথা ভাবিতে গিয়া হামিদের মনে পড়ে, সব রাতে মহাপুরুষ জুতা-পায় আসিয়াছেন, একথাও ত ঠিক নয়। কোনও-কোনও রাতে তিনি খড়ম পায়ও আসিয়াছেন। হাঁ, এই ত হামিদের চোখের সামনে খড়মের রং, সাইজ, এমন কি বোলা দুইটা পর্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পাকা হলুদ রং এর কাঁঠাল কাঠের খড়ম, ঝলমল টুকটুকা পিতলের-সোনারও হইতে পারে-সুন্দর খাবলি-কাটা বোলা। খড়মের উপর তাজা মুলার রংএর লালচে সফেদ দুইটি পা। পায়ের লম্বা-লম্বা লকলকা আংগুলগুলি কি সুন্দর! নখগুলি লাল টুকটুকা। খড়মের খটর-পটর আওয়াজ করিয়া মহাপুরুষ কোন দিক হইতে আসিলেন, হামিদের সাথে কথা বলিয়া হামিদকে দোওয়া করিয়া কোন দিক চলিয়া গেলেন, পিছন হইতে মহাপুরুষকে কেমন দেখা গেল সবই হামিদের স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। জায়গাটাও হামিদের পরিচিত। ফতেপুরে হামিদদের বাড়ির পশ্চিম দিকে সুতুয়া নদীর যে বাঁকটা আছে, সেই বাঁকে নদীর পরিসর বেশ বড়। পানিও তাতে খুব বেশি। এই বাঁকের পূর্ব পাড়ে একটি জায়গায় ঘন-ঘন তাল-খেজুর গাছ অনেকগুলি। ফতেপুর থাকিতে হামিদ খাজে-খেয়েরের দিদারের অশ্রু অর্পণ অনেক দিন সন্ধ্যা-তক এইখানে বসিয়া কাটাইয়াছে। সিরাজগঞ্জের হোসেন গুইয়া খাবে হামিদ ঠিক এই জায়গাটিতেই মহাপুরুষকে দেখিয়াছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু হামিদের বেশ মনে পড়ে, ঠিক ঐ ধরনের না হইলেও তার সাথে বেশ মিল আছে, এমন জায়গা সিরাজগঞ্জেও আছে। তার মনে পড়িল ঐ জায়গাটাতে সে যতবার গিয়াছে ততবারই তার ফতেপুরের নদীর পাড়ের তাল-খেজুরের ঐ কুঞ্জটার কথা মনে পড়িয়াছে। কিন্তু ঠিক কোনদিকে কোনখানে ঐ জায়গাটা, সে সহজে তা ধরিতে পারে নাই। খাব দেখার পর প্রথম দিন সারা সকাল এবং মাদ্রাসার সময়টা আকুল আগ্রহে সময় কাটাইয়াছে। বিকাল হওয়া মাত্র সে সেই জায়গাটার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। কয়েকটা জায়গা দেখার পর একটা জায়গায় তার মন বসিয়াছে। হাঁ, এই জায়গাটাই বটে। ফতেপুরের নদীর পাড়ের তাল-খেজুর-কুঞ্জের সাথে অনেকটা মিল আছে। স্বপ্নে-দেখা পরিবেশের সাথে এই পরিবেশের মিল দিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাতে তার মনে হইয়াছে খাবে-দেখা পরিবেশের সাথে এই জায়গাটার মিল যেন ফতেপুরের জায়গাটার চেয়েও বেশি। এ ধারণাটা হামিদ যতই সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছে ততই এ ধারণাটা বদ্ধমূল হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বাস হইয়াছে যে খাবে যে জায়গায় মহাপুরুষকে একাধিকবার দেখিয়াছে, সেটা ফতেপুরের নদীর পাড় নয়, সেটা এই সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীর ধার। কথাটা মনের মধ্যে সে যতই তোলাপাড় করিয়াছে তত তার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে এই একই জায়গায় মহাপুরুষ খাবে হামিদকে বারবার দেখা দিবার কারণ কি? কারণ নিশ্চয়ই একটা আছে। কিন্তু সেটা কি?

সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে জমাতে-উলার ইসমাইলকেই হামিদ কিছুটা বিশ্বাস করিত। একমাত্র ইসমাইলই হামিদের এবাদতে বিদূপ করিত না। বরঞ্চ বন্ধুদের সাথে হামিদের পক্ষ লইয়া তর্ক করিত। হামিদ নিজেও ইসমাইলের সাথে আলাপ-সালাপে বুঝিয়াছে ইসমাইল মারফতী কথা কিছু কিছু জানে। সে জন্য হামিদ কচিৎ-কদাচিৎ ইসমাইলের নিকট আবে-হায়াতের কথাটা বাদে পয়গম্বর সাহেব ও খাজে-খেয়ের দিদারের বাসনার কথা আভাসে-ইংগিতে বলিয়াছে। ইসমাইল তাতে সহানুভূতি জানাইয়াছে এবং তার পীরের-মুখে-শোনা বলিয়া দু-চারটা তরকিবের কথাও হামিদকে বলিয়াছে। তার অধিকাংশই অবশ্য হামিদের জানা তরকিব। তবু হামিদ তাতে বুঝিয়াছে ইসমাইল এই ধরনের সাধনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া থাকে।

তাই হামিদ যখন অজানা মহাপুরুষকে খাবে দেখার জায়গা সম্পর্কে ঐরূপ সমস্যা ও দুটানার সামনে পড়ে, তখন অতি গোপনে একমাত্র ইসমাইলের নিকটই সে কথাটা প্রকাশ করে। নিতান্ত স্বতঃপ্রবৃত্তি হইয়া প্রকাশ করে নাই। অবস্থা-গতিকে বাধ্য হইয়াই করিয়াছে এবং খুব সংক্ষেপেই বলিয়াছে। বলিয়া কিন্তু হামিদকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। বরঞ্চ সে বুঝে, বলিয়া সে ভালই করিয়াছে কারণ ইসমাইল ঐ দুটানার সুন্দর একটা ব্যাখ্যা ও সমাধান দিতে পারিয়াছে। হাজার হইলেও ইসমাইল ক্রয়সেও বড়, পড়েও সে দুই ক্লাস উপরে। ইব্রাহিম নবী যতদিন পুত্রকে কোরবানী দিয়াছিলেন ততদিন তিনি কয়েকদিন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ একই ধরনের খাচা দেখিয়াছিলেন। এই ঘটনার নজির দিয়া ইসমাইল হামিদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিল; হয়ত খাজে-খেয়ের ঐ জায়গাতেই হামিদকে দিদার দিবেন বলিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ খাবে ঐ জায়গার কথা হামিদকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। ইসমাইল হামিদকে আরও বুঝাইল যে হামিদ যাকে দেখিয়াছে তিনি নিশ্চয়ই খাজে-খেয়ের কারাগারসেও তার পীরের কাছে গুনিয়াছে ইসমে-আযম না জানা পর্যন্ত পয়গম্বর সাহেবকে খাবে দেখা যায় না।

কথাটা হামিদের খুবই পছন্দ হইয়াছে। খাজে-খেয়ের দিদার লাভ করার আশা তার দ্বিগুণ দৃঢ় হইয়াছে। হামিদ এখন হইতে সারা বিকালটাই নদীর ধারে ঐ জায়গাটাতে কাটায়। এমনিতে ঐ জংগলের দিকে বড় কেউ যায় না। ওটা চলাচলের রাস্তাও নয়। স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার খেলার মাঠও ঐ জায়গার উল্টা দিকে। ছাত্ররা এই সময় খেলা-ধুলায় মশগুল। কাজেই হামিদ এই জায়গাটাতে নির্বিঘ্নে সারা বিকাল বসিয়া কাটাইতে পারে। বসিয়া মানে বিনা-কাজে বসিয়া নয়। হামিদ সে পাত্রই নয়। ওখানে বসিয়া-বসিয়া হামিদ কালামুল্লার বাছা-বাছা আয়াত ও দরুদ শরিফ পড়ে। তসব্বিহ তেলাওয়াত করে। এবং দিদারের জন্য খাজে-খেয়ের দরবারে কান্নাকাটি করে। মাঝে-মাঝে তার মনে হয় খাজে-খেয়ের দয়া হইয়াছে। তিনি হামিদকে দিদার দিবার জন্য আসিয়াছেনও। হামিদ তার তেলাওয়াত ও মোনাজাত হইতে লাফাইয়া উঠিয়াছে। অমনি খাজে-খেয়ের আত্ম-গোপন করিয়াছেন। ধৈর্যহীনতা খাজে-খেয়ের পছন্দ করেন না। বোধ হয় হামিদ বারবার সে কারণেই দিদার পাইতে-পাইতে হারাইয়াছে। সে ধৈর্যধারণ করিল। ঘোর সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মগরেবের নমাজ সেখানেই পড়িতে লাগিল।

এমনি একদিন হামিদের বরাত খুলিল। ধৈর্যের পুরস্কার পাইল। বরাবরের মতো সেদিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিয়াছে। মগরেবের নমাজ ওখানেই পড়িয়াছে। নমাজের পরেও তসবিহ-তেলাওয়াত করিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। অন্যান্য দিনের মতোই সে নিরাশ হইয়া সেদিনকার মতো সবুর করিয়া এবং পরদিনের জন্য খাজে-খেয়েরকে অনুরোধ করিয়া উঠিবে-উঠিবে মনে করিতেছে। হঠাৎ পিছনের জংগল হইতে খড়মের আওয়াজের মতো একটা শব্দ তার কানে আসিল। সে কান পাতিয়া শুনিল। হাঁ, খড়মের আওয়াজই বটে। এর আগেও সে খড়মের আওয়াজ পাইয়াছে দু-চার বার। কিন্তু আজকার আওয়াজটা অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক স্পষ্ট। খড়মের খটর-খটর শব্দ ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য দিন খড়মের আওয়াজ শোনা মাত্র অধৈর্য হইয়া সে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। ঘাড় ফিরাইয়াছে। তাতেই খাজে-খেয়ের দিদার না দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আরেকদিন সে ধৈর্য ধরিয়া শেষ পর্যন্ত বসিয়াছিল। ঘাড়ও ফিরাইয়া নাই। তবু সেদিনও খড়মের আওয়াজ বন্ধ হইয়াছিল। দিদার না দিয়াই খাজে-খেয়ের চলিয়া গিয়াছিলেন। খাজে-খেয়েরের দিকে পিছন ফিরাইয়া বসিয়া থাকার অপরাধেই হয়ত সেদিন ঐরূপ ঘটিয়াছিল। আজ হামিদ ঐ বিপরীত রকমের দুইটা ভুলের একটাও করিল না। খড়মের আওয়াজ শোনা মাত্র অধৈর্য হইয়া লাফাইয়া উঠিল না বটে; কিন্তু খড়মের আওয়াজ স্পষ্ট হওয়ার পরে আস্তে-আস্তে ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে তাকাইল। তসবিহ কিন্তু তেলাওয়াত করিয়াই চলিল।

সোবহানাল্লাহ! আল্‌হামদুলিল্লাহ! হামিদের আজ বরাত! সত্যই ত। ঐ যে হয়রত খাজে-খেয়েরকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ঐ যে জংগলের ধারে দাঁড়াইয়া হামিদের দিকেই চাহিয়া মুচ্‌কি মিষ্টি হাসিতেছেন। অবিকল খাবে-দেখা সাদা ধবধবা দাঁড়ি বুক পর্যন্ত ঝুলিয়া আছে। ঐ যে বাঁ হাতে হাজার দানার আতশী তসবিহ। ডান হাতে কাঁধ সমান উঁচা আসা। লাফাইয়া উঠিবার জন্য হামিদের দেহ-মন-নাচিয়া উঠে। কিন্তু হামিদ জানে খাজে-খেয়ের ধৈর্যহীনতা পছন্দ করেন না। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলায়। আস্তে-আস্তে সে উঠিয়া দাঁড়ায়। হাঁ, ঐ ত মাথার উপর জরির পাগড়ি। গায় লম্বা কোর্তা। সে ঘুরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায় এবং বিনীতভাবে কোমর বাঁকা করিয়া খাজে-খেয়েরকে তসলিম জানায়। বলে: আসসালামু আলায়কুম ইয়া খাজে-।

কিন্তু অতি-উৎসাহে কিম্বা ভয়ে-বিস্ময়ে কথা শেষ করিতে পারে না। ওটা গলার মধ্যেই আটকাইয়া যায়।

খাজে-খেয়ের নিজেই কথা বলেন। নিখুঁতভাবে মুখেরেজ-তালাফ্‌ফুয আদায় করিয়া বিশুদ্ধ আরবীতে তিনি বলেন হে আবদুল আওয়ালের বেটা আবদুল হামিদ, ওয়া আলায়কুমুস সালামু ওয়া রহমতুল্লাহ বরাকাতাহ। আমি তোমার ডাকে সাড়া না দিয়া পারিলাম না।

হামিদের বুকে সাহস আসে। তার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়ে। তার মুখ ও মনের জড়তা কাটিতে লাগে! সে আবার নত হইয়া কুর্নিশ করিয়া সাধ্যমতো বিশুদ্ধ আরবীতে বলে: হে হয়রত, হে পীরানেপীর, হে হাদী, হে মুর্শেদ, আসসালামু আলায়কুম। আপনার এই থাকসার আশেকের কদম-বুসি কবুল করিয়া এই অধমকে সরফরায করুন।

বলিতে-বলিতে হামিদ খাজে-খেয়েরকে কদম-বুসি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে আগ বাড়িতে পা বাড়াইল।

খাজে-খেয়ের তসব্বিহ-সহ বাঁ হাতটি উঁচা করিয়া আরবীতে আবার কহেন: হে আমার পিয়ারা আশেক, তুমি যেখানে আছ, সেখানেই থাক। আগ বাড়িবার চেষ্টা করিও না। আমার অত নয়দিকে আসিও না। আমার চোখের নূরে-তজল্লি তোমার চোখে পড়লে তোমার চোখ জ্বলিয়া যাইবে। মুসাকে আমি বারণ করা সত্ত্বেও সে খোদার নূর দেখিতে চাইয়াছিল। ফলে মুসা জ্বলিয়া যায় নাই বটে কিন্তু তুর পর্বত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল। মুসা নিজে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিল। আমিই তাকে হুঁশে আনি। আমার নূরে এই জংগল পুড়িয়া যায় নাই বটে, কিন্তু তুমি পুড়িয়া যাইবা। অতএব হে আমার লখতে-জিগর আমার নয়দিক হইতে তফাৎ থাক। ওখানে থাকিয়াই কথা কও। বল তুমি কেন আমাকে বুলাইয়াছ। তুমি কি চাও?

হামিদ আবার খাজে-খেয়েরকে কুর্নিশ করিয়া বলে: হে আল্লার মকবুল ও মহবুর দুষ্ট। হে যিন্দা পীর, আমি আবে-হায়াতের পানি খাইতে চাই।

খাজে খেয়ের: আবে-হায়াতের পানি খাইতে হইলে আগে ইলমে বাতেনী হাসিল করিতে হইবে বাবা।

হামিদ: হে ইলমের দরিয়া, আপনিই আমাকে বাতেনী এলেমে তালিম দেন। আমি শিখিতে চাই।

খাজে: হে আমার নওজোয়ান আশেক আমি তোমার কথায় বড় খুশী হইলাম। তোমার আগে আমাকে যত লোকে ডাকিয়াছে তারা সকলেই আমার কাছে শুধু ধন-দওলত দাবি করিয়াছে। তুমিই এক মাত্র লোক যে আমার কাছে জ্ঞান চাহিল। ইনশাআল্লাহ তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু বাবা বাতেনী এলেম হাসেলের পথে তোমার একটা মস্ত বড় বিঘ্ন আছে।

হামিদ ব্যাকুল হইয়া বলে: কি বিঘ্ন হয়রত?

খাজে তোমার মধ্যে তাকাবুর আছে। তুমি অহংকারী।

হামিদ ভয়ে-বিস্ময়ে বলে: আমার মধ্যে তাকাবুর আছে? আমি অহংকারী?

খাজে: হাঁ বাবা, তুমি বড় দেমাগী। সহপাঠীদের সাথে তুমি তুকাবুরি কর। তোমার কি জানা নাই, হে হামিদ-বিন-আউয়াল, দুইজন বেহেশ্তী আল্লার নাফরমানি করিয়াছিল? একজন আদম, আরেকজন আযাযিল? আল্লার বিচারে দুই জনই সমান গোনাগার। কিন্তু নাফরমান আদম হইল পয়গম্বর, আর না-ফরমান আযাযিল হইল শয়তান। কেন, জান?

হামিদ বিনয় করিয়া বলে: কেন হুজুর?

খাজে: আযাযিল তুকাবুরি করিয়াছিল। আদম তা করে নাই। তুমি আমার প্রিয় শাগরিদ শেখ সাদীর পান্দেনামাজ পড় নাই: 'তাকাবুর আযাযিলেরা খারে কর্দ' তুমি তোমার সহপাঠী এমন কি কোনও কোনও মুদাররেনের সাথে তুকাবুরি করিয়া থাক। সেজন্য আল্লাহ-পাক তোমার উপর নাখোশ আছেন।

হামিদ ভয়ে-আতঙ্কে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। ভীতি-বিভ্রান্তিতে আত্মহারা হইয়া সে আরবী ছাড়িয়া বাংলায় কাঁদিয়া ফেলে। বলে: হুজুর, আমার কোনও দোষ নাই; সব দোষ ওদের। ওরা এবাদত-বন্দেগি করে না। বল্কে এবাদত বন্দেগি লৈয়া মশ্করা করে।

খাজে-খেয়ের গলা কাঁপিয়া উঠে। কাঁপা গলায় তিনিও বাংলায় বলেন: মশকরা করে? কি মশকরা করে তারা?

খাজে-খেয়ের পিছনের জংগল হইতে চাপা হাসির শব্দ হামিদের কানে আসে। হামিদ কান খাড়া করে। চিন্তায় পড়ে। খাজে-খেয়ের তবে একা আসেন নাই? তিনি কি তবে জিন-পরী সংগে লইয়া আসিয়াছেন? তারাই কি হামিদের বাংলা কথা বুঝিতে না পারিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে? না, তা কিরূপে হইবে? জিন-পরীরা ত বাংলাও বুঝে? খোদ খাজে খেয়েরও ত এইমাত্র বাংলায় কথা বলিলেন। তবে কি খাজে-খেয়ের সাথে ফেরেশতা আসিয়াছে? ফেরেশতার আবশ্য বাংলা বুঝে না। কারণ বেহেশতের ভাষা আরবী। কাজেই হামিদ বাংলায়-কওয়া নিজের কথাটাই শুধু ফেরেশতাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য আরবী করিয়া পুনরাবৃত্তি করে।

বলিতে-বলিতে হামিদ দেখিতে পায় খাজে-খেয়ের দাঁড়ি থুতি হইতে খসিয়া গলায় ঝুলিয়া পড়িয়াছে। খাজে-খেয়ের সে দাঁড়ি টানিয়া থুতিতে চাপিয়া দৌড় মারেন। দু-চার কদম খড়ম-পায় দৌড়াইয়া শেষে খড়ম ফেলিয়াই খাজে-খেয়ের দ্রুত-বেগে জংগলে প্রবেশ করেন।

হামিদ সহসা নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারে না। কিসে কি হইল বুঝিতে পারে না। হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে, দাড়ি খসিয়া পড়াতে খাজে-খেয়ের যে মুখ তার চোখে পড়িয়াছিল, তা কতকটা ইসমাইল মিয়ার মুখের মতো। তার মনে বিজলি চমকের মতো একটা সন্দেহ জাগে। তবে কি তাঁরই কি-

হামিদ তখন খাজে-খেয়ের পিছনে-পিছনে দৌড় দেয় জংগলের একটা ফাঁক জায়গায় চান-তারার আলোতে দেখা যায়, তিনজন লোক দৌড়িয়া পলাইতেছে।

খাজে-খেয়ের ফেলিয়া-যাওয়া খড়ম হামিদের নজরে পড়ে। সে বুঝিতে পায় তাদের হোস্টেলেরই সাধারণ খড়ম। খড়ম জোড়া ইসমাইল মিয়ার হওয়া খুবই সম্ভব। কারণ খড়ম জোড়া বড়। হোস্টেলের ছাত্রদের যে দুচার জনের পা খুব বড়, ইসমাইল মিয়া তাদের একজন। সে খড়মজোড়া হাতে তুলিয়া লয়। রাগে-লজ্জায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরাফেরা করিয়া হোস্টেলে ফিরিয়া আসে।

৫

বন্ধুদের কানাকানি দেখিয়া হামিদের মনে আর কোনও সন্দেহ থাকে না যে ইসমাইল মিয়াই খাজে-খেয়ের সাজিয়া তাকে এভাবে বোকা বানাইয়াছে। ইসমাইল মিয়ার উপর তার রাগ হয় খুবই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি রাগ হয় নিজের উপর। সে রাগে অনেকক্ষণ কাঁদে। কাঁদিয়া চোখ-মুখ লাল করিয়া সে নিজের কামরায় ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। রাতে খাবার জন্য খানা-কামরায় যায় না। যতই রাগের কারণ হউক, নিজের লজ্জা ঢাকিবার জন্যই সে ব্যাপারটা চাপিয়া যাইবে স্থির করে। খাওয়ার জন্য বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করিতে আসিলে বলিবে: পেটের অসুখ করিয়াছে।

কিন্তু তা হয় না। অল্পসময়ের মধ্যেই একজন-দুইজন করিয়া হামিদের কামরায় হিতৈষী ও সান্ত্বনাদাতা বন্ধুদের ভিড় হয়। তাদের কথা-বার্তায় হামিদ দেখিতে পায় বন্ধুরা সবই জানে। আরও বেশি জানে।

হামিদের মুখে তার খাবে-দেখা খাজে-খেয়েরের চেহারার বর্ণনাটা শোনা অবধি ইসমাইল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে কানা-ঘুষা করিয়াছে। তাদের কেউ-কেউ ইতিমধ্যে রাত্রের অন্ধকারে গাল-পাট্টা বাঁধিয়া সিরাজগঞ্জ বাজারে যাত্রা গান শুনিয়াছে। যাত্রায় নারদ মুনির চেহারা দেখিয়া তাদের মাথায় একটা ফন্দি জুটে। তারা দেখে, হামিদের খাবে-দেখা খাজে-খেয়েরের সাথে নারদ মুনির চেহারার অপূর্ব মিল। ইসমাইলকে তারা তাদের মনের কথা বলে। এক হিন্দু বন্ধুর সাহায্যে নারদের চুল-দাঁড়ি ও মুখে মাখার কিছু রং যোগাড় করে। তারপর ঐ ঘটনা।

বন্ধুদের শত তসল্লি ও বোঝা-প্রবোধেও হামিদ সান্ত্বনা পায় না। তবু এমন শরমের ব্যাপার নিয়া ঘাটাঘাটি করার ইচ্ছা হামিদের ছিল না। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন ঘটনা ঘটিয়া যাইতে লাগিল। হোটেল সুপার ও পরে হেড মুদাররেসের কাছে খবর গেল। হামিদ সত্যবাদী। সে সব কথাই বলিল। কিছুই গোপন করিল না। এইভাবে নিতান্ত ঘটনাচক্রে সে মামলার ফরিয়াদী হইয়া পড়িল।

যথা সময়ে বিচার হয়। হামিদের জবানবন্দী বিচারক হেড মুদাররেস বিশ্বাস করেন। আর কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার হয় না। হামিদের জয় হয়। ইসমাইলের পাঁচ টাকা ও দুই জন সংগীর তিন টাকা করিয়া জরিমানা হয়।

কিন্তু আসলে এতে হামিদের জিত হয় না, হার হয়। সে নিজে হইতে নালিশ করে নাই। বিচার চায় নাই। হেড মুদাররেস নিজেই উদ্যোগি হইয়া মামলা নিবিল। কিন্তু তিনি বিচারটা করিলেন কি? হযরত খাজে-খেয়েরকে লইয়া যারা মশকরা করিল, তাদের এই শাস্তি? এমন গুরু পাপে লঘু দণ্ড? তার মানে এই নয় যে ইসমাইল মিয়ারা কঠোর শাস্তি পাইলে হামিদ খুশী হইত। না, তা নয়। হামিদের মন অত ছোট না। হামিদ ইসমাইল মিয়াদের কথা মোটেই ভাবে না। সে ভাবে হেড মুদাররেস ও আর যে কয়জন মুদাররেস বিচারে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কথা। এত বড় একটা কবির গোনাকে তাঁরা কেউ গুরুত্ব দিলেন না। নিতান্ত শান্ত হইয়া ঘটনার বিবরণ শুনিলেন যেন মুরগীর আগা চুরির একটা সাধারণ মামলা। শুধু কি তাই? হামিদ ঘটনার যখন বিস্তৃত বর্ণনা দিতেছিল তখন সমবেত ছাত্রেরা হো-হো করিয়া হাসিয়াছিল যেন এটা কত বড় রং-রসের কথা! অথচ হেড মুদাররেস তাদের একটা ধমকও দিলেন না। আর ধমক দিবেন কি? ছাত্রদের ঐ হাসিতে উপস্থিত মুদাররেসরা এমন কি হেড মুদাররেস সাহেবও যোগ দিয়াছিলেন। কারণ কি? অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়াও হামিদ এর সন্তোষজনক উত্তর পায় নাই। এত বড়-বড় আলেম সবাই। এঁদের কোনও ভক্তি নাই? খাজে-খেয়েরের প্রতি যদি আলেমদের ভক্তি না থাকে তবে এই আলেমদের প্রতি হামিদের ভক্তি থাকিবে কেন? হামিদ স্বভাবতই গুরু-ভক্ত। তার আজন্ম শিক্ষা এই। গুরুজনের প্রতি এমন মনোভাব গোনাহ। কিন্তু হামিদের বুকের নিচে হইতে হক-পরস্তী সত্য-প্রিয়তা শিং নাড়া দিয়া উঠিল: উস্তাদ বড়, না খাজে-খেয়ের বড়? হক বড়, না, মুরুর্কি বড়?

হামিদের চিন্তায় ঝড় উঠে।

ইসমাইল ও তার বন্ধুরা হামিদের উপর ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইল। ইসমাইলরা ত করিয়াছিল সামান্য একটু রং-তামাশা। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে অমন কত হয়। তাই বলিয়া নালিশ করা? উস্তাদের কাছে দোষী সাব্যস্ত করা? থাক বাবা, কত বড় পীরজাদা দেখা যাইবে!

৬

এরপর হামিদের পক্ষে সিরাজগঞ্জে থাকাই মুশকিল। ইসমাইলরা যদি প্রকাশ্য শত্রুতা নাও করে, তবুও। অতবড় শরমের কেলেংকারিটা কেউ ভুলে না। হামিদকে শোনাইয়া দিন-রাত ছাত্ররা টিটকারি দেয়। মশ্করা করে। এটা সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকা কোনও আত্ম-সম্মানী লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়-হামিদের ত নয়ই। সিরাজগঞ্জ ছাড়িয়া হামিদ যাইবে কোথায়? হামিদ এ নিয়া অনেক চিন্তা করিয়াছে। বস্তুত চিন্তায়-চিন্তায় তার মন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। সে আজ বাইরে-ভিতরে পরাজিত। সে আজ নিজের কাছে ও বন্ধুদের নিকট সমানভাবে অপমানিত।

বন্ধুদের কাছে সে অপমানিত তাদের নজরে সে একটা আস্ত আহমক প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া। সহপাঠীদের সে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র হইয়াছে বলিয়া। সহপাঠীরা তাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ আজ নতুন করে নাই। তার পোশাক-পাতি, চাল-চলন ও এবাদত-বন্দেগি লইয়া বন্ধুরা ঠাট্টা-মশ্করা করিয়া আসিতেছে বরাবরই। কিন্তু হামিদ তাতে চটে নাই, অপমান বোধ করে নাই। বরঞ্চ নিজের ঐ সব বিসদৃশতায় সে গর্ব বোধ করিয়াছে। মনে-মনে বন্ধুদেরে সে কৃপার পাত্র মনে করিয়াছে।

কিন্তু আজ? আজ তার মনে সে বল আর নাই। নিজের প্রতি তার নিজেরই শ্রদ্ধা নাই। সে কি সত্যই নির্বোধ? তার এবাদত-বন্দেগি কি সব ভুল-ভ্রমের এতকালের এবাদত কি বৃথা? তার এত কিতাব পড়াও কি তবে নিষ্ফল? হামিদের মনে এই ধাক্কাটা লাগিয়াছে নিতান্ত অকস্মাৎ! যেন পথিক দৌড়াইতেছে। প্রাণপণ বেগে ছুটিতেছে। কোথায়? মন্ডিলে মক্সুদের দিকে। সারা দেহে তার শ্রান্তি-দমে আর কুলায় না। তবু ছুটিতেছে। চোখে-মুখে তার আশার দ্যোতনা, কারণ মন্ডিলে-মক্সুদ আর দূরে নাই। ঐ যে দেখা যায়-যায়। ঐ মোড়টা ফিরিলেই পৌছবে। সেখানে পৌছা মাত্র তার সব শ্রান্তি সব ক্লান্তি দূর হইবে। নব-জীবনের শর্যবন-তহুঁরা তার দেহ-মন সঞ্জীবিত করিবে। অতএব হে মন, আর এক লহমা সবুর কর। হে দেহ, আর একটা মিনিট খাড়া থাক। হে পা, আর মাত্র দুই কদম। তার পরেই বিশ্রাম। এই এক লহমা সময়, এই দুই কদম জায়গার জন্য নিজের সাধনা নষ্ট করিও না। দেহ-মনকে এমনি প্রবোধ দিয়া পথিক তার দেহের শেষ শক্তি-বিন্দুর জোরে পা দুটাকে একরূপ টানিয়া নিতেছে। এমন সময় উল্টা দিক হইতে-আসা সুফী কেসেমের এক লোক গায়েবী নেদার সুরে বলেন: 'ওদিক কোথায় ছুটিয়াছ বাবা? তোমার মন্ডিলে-মক্সুদ ত ওদিক নয়। তুমি ত বাবা উল্টা দিকে যাইতেছ।' এ কথা শুনিয়া পথিক কি করিবে? সে কি তার গতি বদলাইয়া উল্টা দিকে ছুটিবে? না। তা সে করিবে না। পারিবেও না। সে একদম মাটিতে বসিয়া পড়িবে। দেহের দিক দিয়াও। মনের দিক দিয়াও। এত শ্রম করিল কি সে বৃথাই? কেন বৃথা হইল? কোথায় সে ভুল করিল? এ পথে যারা তাকে আসিতে বলিল, তারা কি তবে সব ঝুটা?

হামিদের মনের অবস্থা আজ ঠিক এই।

এ কয়দিন ধরিয়া তার মনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিতেছে, তার চোখেমুখে-দেহে তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। তার গোসল-খাওয়ার কথা মনে থাকে না। পড়া-শোনায় মন বসে

না। ক্লাসে যায় না। লজ্জায় সে উদাস মনে রাস্তায় বাইর হয়। রেল-লাইন ধরিয়া যমুনা নদীর দিকে চলে উদ্দেশ্যহীনভাবে। শুকনা দিনে যমুনা বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। রেল লাইনের দু'ধারে ধান ক্ষেত বহু দূর পর্যন্ত ধু-ধু করিতেছে। কোনও দিকেই হামিদের নজর নাই। নজর নিজের অন্তরে। সেখানে হামিদ দেখে, দু'কুল-ছাপা ভরা যমুনা থৈ-থৈ করিতেছে। উত্তাল তরংগ। সে ভয়াল তরংগের বুকে একটি ছোট ডিংগিতে হামিদ ভাসিয়া চলিয়াছে। সে একা। সে ডিংগিতে না আছে একটা বৈঠা, না আছে একটা লগি। কোথায় যাইতেছে কিছু দেখা যায় না। ঘুঁটঘুঁটা অন্ধকার। কিছু শোনাও যায় না। প্রবল ঝড় কানে শোঁ-শোঁ করিতেছে। বিজলি চমকায়। তাতে দেখা যায় শুধু তরংগের ভয়ালতা। আর দেখে ডিংগি ডুবুডুবু। আরেকটা তরংগের ধাক্কায় ডিংগি ডুবিল যে!

হামিদ চমকিয়া উঠে। থমকিয়া দাঁড়ায়। তার এ কি হইল? সে কি দুপুরবেলা পথ চলিতে স্বপ্ন দেখিতেছে? এমন হইলে ত সে ট্রেন চাপা পড়িবে। কখন ট্রেন আসিয়া পড়িবে। কত হুইসেল দিবে। সে ত কিছুই শুনিবে না।

লাইন ছাড়িয়া সে ফুটপাথে নামিয়া আসে। ফুটপাথের নিরাপত্তায় আসিয়া সে এত দুঃখেও মনে-মনে হাসিয়া ফেলে। সে মৃত্যুকে এত ভয় পায়? অল্পদিন আগেও ত এ ভয় তার ছিল না। বরঞ্চ বেহেশতে যাওয়ার জন্য তার আগ্রহ ছিল দুর্নিবার। আর এখন? এখন তার এ জীবনের আর মূল্য কি? এখন ত তার মরণই ভাল। তবে মৃত্যু ভয় কেন? তার এতদিনের সাধনা শুধু ব্যর্থ হয় নাই। আলেমদের বিচারে ত ছিল প্রমাণিত হইয়াছে। বন্ধুদের বিচারে সে একটা গাধা প্রমাণিত হইয়াছে। শুধু বন্ধুদের বিচারেই বা কেন? নিজের বিচারেই সে আজ অন্তরের দিকে রিঙ দরিদ্র। তার আর কোনও সম্বল নাই। সে আজ সম্পূর্ণ পরাজিত। তার উচ্চ শির আজ সকলের কাছে অবনত। সে আর মুখ তুলিয়া কারও চোখে-চোখে চাইতে পারিবে না।

কাজেই সিরাজগঞ্জ ছাড়াই তার একমাত্র পথ। কিন্তু কোথায় যাইবে? ঢাকা? কলিকাতা? হিন্দুস্থান? সব কথাই হামিদ ভাবিয়াছে। এর যে কোনও স্থানে যাইতে হামিদ প্রস্তুত। কিন্তু মুশকিল বাপজানকে লইয়া। অত দূরে, অত বড়-বড় শহরে হামিদকে তিনি একা ছাড়িয়া দিবেন না। হামিদ তা ভাল করিয়াই জানে। তার উপর স্কুল-মাদ্রাসা বদলানো কাজটাকেই পীর সাহেব দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। মাত্র সেদিনের কথা। হামিদের ছেলে বেলার ক্লাসফ্রেণ্ড ইয়াকুব এখন হাইস্কুলে পড়ে। তার বাবা ফতেপুরের মাতব্বর মুরিদ। টাকাওয়ালা লোক। ইয়াকুবের স্কুল বদলানো সম্পর্কে পীর সাহেবের অনুমতি লইতে আসিয়া সেদিন এমন ধমক খাইয়াছিলেন যে স্কুল বদলানোর কথা দ্বিতীয় বার মুখে আনেন নাই। কাজেই হামিদ বাপের কাছে এ প্রস্তাব দিতে পারিবে না। অথচ সিরাজগঞ্জে থাকাও যায় না। কি করিবে সে?

এমন অবস্থায় মাত্র একজন লোকের কথাই তার মনে পড়ে। তিনি স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল। হামিদদের মাদ্রাসার তিনি রেক্টর। প্রিন্সিপাল সাহেব নামজাদা স্কলার, মশহুর আলেম। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা হইতে ফখরুল মুহান্দেসিন টাইটেল পাশ করার পর আলীগড় ইউনিভার্সিটি হইতে প্রথমে আরবীতে ও পরে ইংরাজিতে এম. এ. পাশ করিয়াছেন। সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া কলেজ হাই স্কুল হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসা এই চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূলত একই কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। সিনিয়র মাদ্রাসাটি ওল্ড স্কিমের, হাই মাদ্রাসাটি নিউ স্কিমের এবং হাই

স্কুলটি সাধারণ ইংরাজি স্কুল। বর্তমান প্রিন্সিপাল সাহেব কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া আসার পর পরিচালকগণ তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হইয়া অপর তিনটি প্রতিষ্ঠানেরও কর্তৃত্ব তাঁর হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্তে আছেন। সেই হিসাবেই তিনি ওদের রেক্টর। রেক্টর হিসাবেই হামিদের ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার সংগে তাঁর সম্পর্ক। সেই হিসাবেই তাঁর সাথে হামিদের পরিচয়।

সিরাজগঞ্জে আসিয়াই হামিদ প্রিন্সিপাল সাহেবের খ্যাতিতে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। তবে তাঁর সাথে পরিচিত হইতে একটু সময় লাগে। পরিচয় হওয়ার পর ঘনিষ্ঠ হইতে দেরি হয় না। বস্তুত প্রথম দিনেই হামিদ প্রিন্সিপাল সাহেবের মন জয় করে। রেক্টর হিসাবেই হামিদ সহপাঠীদের সাথে তাঁর কাছে যায়। সহপাঠীরা সকলে যখন প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করিতে থাকে, হামিদ তখন প্রিন্সিপাল সাহেবের বই-পুস্তক নাড়াচাড়া করিতে থাকে। প্রিন্সিপাল সাহেবের বৈঠক খানায়ই তাঁর লাইব্রেরি। এতে কয়েকটি আলমারি, খান-কতক ছোট-বড় টেবিল ও অনেকগুলি টিপয়। আলমারিগুলির কাঁচের পাল্লা। সেগুলি বড় বড় কিতাবে ভর্তি, দরজা বন্ধ। কিন্তু টেবিল ও টিপয়ের উপর অসংখ্য ছোট-বড় বই-পুস্তক, সাময়িক কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যন্ত ছড়ানো। হামিদের বন্ধুরা যখন প্রিন্সিপাল সাহেবের সামনে কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া তাদের অভিযোগ বর্ণনা করিতেছিল, হামিদ তখন এই সব ইত্যন্ত ছড়ানো বই-পুস্তক থরে-থরে সাজাইতেছিল। বই পুস্তক সাজানো ব্যাপারে প্রিন্সিপাল নিতান্ত ল্যাভেণ্ডিস মানুষ হইলেও তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন খুবই হুঁশিয়ার। কাজেই পুরাতন নেসাবের একটা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র তার ঐ সব পুঁথি-পুস্তক ঘাটিতেছে দেখিয়া আড়-চোখে মাঝে-মাঝেই তার উপর নজর রাখিতেছিলেন। অল্পক্ষণেই তিনি বুঝিতে পারেন, হামিদ যে তাঁর ইত্যন্ত ছড়ানো কিতাব ও ম্যাগাজিন সুন্দর থরে-থরে সাজাইল তা সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া করে নাই। অভ্যাস বশেই করিয়াছে। হাঁ, নিশ্চয়ই এ ছেলে লাইব্রেরি ব্যবহার করিতে জানে।

এরপর প্রিন্সিপাল সাহেবের প্রিয়পাত্র হইতে হামিদের সময় লাগে না। প্রিন্সিপাল বড়ই বেখেয়ালী মানুষ। তাঁর রাইটিং টেবিলে তাঁর শোবার বিছানায় বই-পুস্তকের ভিড়। পড়িবার জন্য তিনি আলমারি হইতে যে কিতাব একবার নামান, পড়া হইলে তা আবার আলমারিতে তুলার কথা মনে থাকে না। হামিদকে এ ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন দেখিয়া প্রিন্সিপাল সাহেব তাকে তাঁর বই-পুস্তক ঘাটিতে নীরব অনুমতি দেন। ক্রমে হামিদ তাঁর লাইব্রেরিতে পায় অফুরন্ত পড়ার খোরাক। অধিকাংশ অবসর সময় সে এখানে কাটায়। কিছু দিনের মধ্যেই উভয়ের অজ্ঞাতে হামিদ হইয়া উঠে প্রিন্সিপাল সাহেবের লাইব্রেরিয়ান। সহকর্মীদের সাথে আলোচনায় অথবা একা পড়ার সময় কোনও কিতাবের দরকার হইলে এবং তখন হামিদ হাযির থাকিলে প্রিন্সিপাল সাহেব হামিদকেই ফরমায়েশ দেন।

এইভাবে প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে হামিদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছে। তাঁর অফুরন্ত স্নেহ সে পাইয়াছে। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সাথে হামিদ এটাও বুঝিয়াছে যে প্রিন্সিপাল সাহেব পীরালি-ব্যবসা ও হামিদের নফল এবাদত-প্রীতি সুনজরে দেখেন না। হামিদ আরও শুনিয়াছে যে হযরত খাজে-খেয়েরের প্রতি অমন অসম্মান দেখাইয়াও যে ইসমাইল মিয়ারা অত অল্প শাস্তিতে বাঁচিয়া গেল, তার মূলেও রহিয়াছে প্রিন্সিপাল সাহেবের উপদেশ।

তবু হামিদ অনেক দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিল, তার বর্তমান বিপদে উপদেশ দিবার ও উপকার করিবার লোক প্রিন্সিপাল সাহেব ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তাঁর কাছে যাওয়াই ঠিক।

সরলভাবে হামিদ সব কথা তাঁর কাছে বলে। প্রিন্সিপাল সাহেব হামিদের মেধার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বস্তুত তিনি যে হামিদকে অত স্নেহ করিতেন ও প্রশংসা দিতেন, সেটা ফতেপুরের পীরজাদা বলিয়া নয়; হামিদের প্রতিভার জন্যই। তাঁর বিবেচনায় ফতেপুরের পীরজাদেগি হামিদের গুণ নয়, নিষ্ঠুর। ওটা তার সুবিধা নয়, অসুবিধা। তিনি অনেকবার মনে করিয়াছেন, হামিদকে পুরাতন নেসাব ছাড়িয়া ইংরাজি লাইনে আসিতে বলিবেন কিন্তু তা বলেন নাই শুধু তাঁর পৈত্রিক ব্যবসা ও তার উত্তরাধিকারের কথা ভাবিয়া। সুযোগ পাইয়া হামিদকে তিনি এবার মনের কথা খুলিয়া বলেন। হামিদ কথায় কথায় তিনি বলেন যে হামিদ পীরজাদা হইয়াও যদি বাপের একমাত্র ছেলে না হইত, তবে প্রিন্সিপাল সাহেব হামিদকে ইংরাজি লাইনে জোর করিয়াই নিয়া আসিতেন। এসব আলোচনায় প্রিন্সিপাল সাহেব পুরাতন নেসাবের শিক্ষার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার যে সব নজির দিলেন, হামিদের তা খুব পছন্দ হইল। সে আরবী লাইন ছাড়িয়া তখনই ইংরাজি লাইনে যাইবার সংকল্প জানাইল। কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেব একদমে অতটা যাইবার পরামর্শ দিলেন না। প্রথমত: পীর সাহেব রাজি নহইতে পারেন; দ্বিতীয়ত: অতটা দরকারও নাই। হামিদ যদি পুরাতন নেসাব ছাড়িয়া নিউ স্কিমের হাই মাদ্রাসায় যায়, তবে একটা বছর নষ্ট না করিয়াও সে তৃতীয় সনে ইসলামিক ম্যাট্রিক দিতে পারিবে। পাশ করিয়া সে সোজা আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হইতে পারিবে। শেষ পর্যন্ত বাপের অনুমতি সাপেক্ষে এটাই ঠিক হয়।

৭

সিনিয়র মাদ্রাসা হইতে হাই মাদ্রাসায় যাওয়ার ব্যাপারটা হামিদের বিবেচনায় নিতান্তই তুচ্ছ। বাপের কাছে নিজের আবদারের সাফল্যে বিশ্বাসও ছিল তার অসীম। বাপের অনুমতি যে সে পাইবেই, তাতে তার কোনও সন্দেহ ছিল না। কাজেই জাবেদা ভাবে ট্রান্সফারটা করাইয়া ফেলিবার জন্য সে প্রিন্সিপাল সাহেবকে চাপিয়া ধরে। যুক্তি হিসাবে বলে, সে আর একদিনও ঐ মাদ্রাসা হোস্টেলে থাকিতে পারে না। প্রিন্সিপাল সাহেব বাবার অনুমতি ছাড়া ট্রান্সফার নিয়ম-বিরোধী হইবে জানান। কিন্তু হামিদের হোস্টেল পরিবর্তনের দাবিটা মানিয়া লন।

কাজেই হামিদ যেদিন বাপের অনুমতির জন্য ফতেপুর রওয়ানা হয়, সেদিন সে নিউস্কিম হাই মাদ্রাসা হোস্টেলের বাশিন্দা। উভয় মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা তখন ধরিয়া নিয়াছেন, হামিদ ওল্ড স্কিম ছাড়িয়া নিউ স্কিমে চলিয়া গেল। ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা একজন নাম-করা মেধাবী ছাত্র হারাইল বলিয়া শিক্ষকদের সকলের এবং ছাত্রদের অনেকের মধ্যে একটা বিষাদ দেখা গেল। কিন্তু স্বয়ং রেঙ্টর সাহেবই এ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া কোনওদিক হইতে কেউ আপত্তি করিতে পারিলেন না।

বাপের অনুমতি সহজ হইবে জানিয়াও কিন্তু হামিদের মন নিশ্চিন্ত থাকে না। বাড়ির পথে টেনে ও স্টিমারে সর্বক্ষণ সে ব্যাপারটা মনে-মনে আলোচনা করিয়াছে। বাপের কাছে কিভাবে কথাটা পাড়িবে, এ কাজের সমর্থনে কি কি যুক্তি দিবে, সে সব কথা পর্যালোচনা করিয়াছে। সিরাজগঞ্জ ত্যাগ করিতে হইবে না। বলিবার সময় বলা যাইবে সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসায় পড়ে। সুতরাং পরিবর্তনের কথা বাইরের কেউ জানিতেও পারিবে না। এ সবই হইল সপক্ষের যুক্তি। বাপজান এ সব যুক্তি উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। কাজেই স্কুল বদলানোর বিরুদ্ধে বাপজানের আপত্তির বড় একটা অংশ কাটা গেল। কিন্তু এক লাইন ছাড়িয়া একদম আরেক লাইন, এটা বাপজানকে কিরূপে বোঝান যাইবে? খাজে খেয়েরের ব্যাপার বন্ধুদের ঠাট্টা-মশ্কারা এসব কিছুই বলা চলিবে না। অথচ এই একমাত্র কারণেই হামিদ হোস্টেল বদলাইতেছে; হোস্টেল বদলাইতে গিয়া মাদ্রাসা বদলাইতেছে; মাদ্রাসা বদলাইতে গিয়া লাইন বদলাইতেছে। আসল একমাত্র কারণই যখন বলা যাইবে না, তখন আর যা কিছু বলা হইবে, তাই হইবে মিছা কথা। তেমন কোনও যুক্তি-সংগত কারণ তার মাথায় এখন নাই বটে, কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করিলে একটা বাহির করা যায় না, তা নয়। কিন্তু হামিদ জীবনে মিছা কথা বলে নাই। বাপের কাছে ত নয়ই, কারো কাছেই না। সে এ ব্যাপারেও মিছা কথা বলিবে না। বড়ই সমস্যা।

হামিদ নিজের আসনে শুইয়াছিল। উঠিয়া বসিল। তার যেন একটা চমক ভাংগিল। ব্যাপারটা যত সহজ তার মনে হইয়াছে আসলে এত সহজ নয়। অসম্ভব সত্য কথাটাও বলা যাইবে না। মিথ্যা কথাও সে বলিবে না। তবে কি করিবে?

হামিদ প্রিন্সিপাল সাহেবের উপদেশ হইতে আলোক পাইবার সাধ্যমতো চেষ্টা করে। পুরাতন নেসাব ছাড়িয়া নিউস্কিমে যাইবার কি কি যুক্তি তিনি দিয়াছেন? তাঁর-দেওয়া যুক্তি পীর সহেব ফেলিবেন না। হামিদ জানে প্রিন্সিপাল সাহেব সম্বন্ধে তার বাবার ধারণা উচ্চ। তবু তাঁর-দেওয়া যুক্তিগুলির একটিও সে বাপের কাছে গোছাইয়া বলিতে পারিবে না। কারণ যুক্তিগুলি খুবই কড়া। আলেমদের নিন্দা-সূচক। সে নিন্দা তার বাপকেও ছাড়ে না। নিন্দা হইলেও প্রিন্সিপাল সাহেবের কথার মধ্যে যুক্তি ছিল। কাজেই রুঢ় শোনায় নাই। তাই ওগুলি হামিদের এত ভাল লাগিয়াছে। হামিদ অত যুক্তি বাপের সামনে দিতে পারিবে না। কাজেই কথাগুলি রুঢ় হইবে। সেটা হইবে বেআদবি। বাপের কাছে ত বটেই।

তবু উপায়ান্তর নাই দেখিয়া হামিদ ঐ যুক্তিগুলিই মনে-মনে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বিচার করিল। প্রথমত প্রিন্সিপাল সাহেব বলিয়াছেন: পুরাতন নেসাব সত্যই পুরাতন। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে এবং বাস্তব জীবনের সাথে এ শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করিয়াও মানুষ বর্তমান দুনিয়ার বিচারে মূর্থ থাকিয়া যায়। দ্বিতীয়ত তিনি বলিয়াছেন: ঐ শিক্ষার ফলে মানুষ অনুদার সংকীর্ণমনা হয়। নিজের মতের বাইরের সকলকেই তারা ভ্রান্ত মনে করে। এই জন্যই এঁরা খোদ মুসলমানদের মধ্যেও এত-এত মযহাব ও ফেরকাবন্দির আমদানি করিয়াছেন এবং এক ফেরকা আরেক ফেরকাকে কাফেরি ফতোয়া দিতেছেন। তৃতীয়ত প্রিন্সিপাল সাহেব বলিয়াছেন: এই শিক্ষা আলেমদের এবং তাঁদের প্রভাবে গোটা মুসলমান জাতিকে ধর্মের রুহের বদলে তার জেসেমে, শাঁসের বদলে খোলসে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। ফলে এরা ঈমান ও

আমলে-সালেহার বদলে বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কর্মকেই ধর্মের সবটুকু মনে করিয়া থাকে।

প্রিন্সিপাল সাহেব আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। তবে তার মধ্যে এই কয়টাই প্রধান। তাছাড়া এত তাড়াহুড়ার মধ্যে সব কথা হামিদের মনেও আসিতেছে না। এর সব কথাই যে হামিদের মনের মতো হইয়াছে তাও নয়। বরঞ্চ তখন হামিদ আদবের সংগে প্রিন্সিপাল সাহেবের কোনও কোনও কথার প্রতিবাদও করিয়াছিল। যেমন নমাজ-রোজার মধ্যে ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়, শুধু কোরআন-হাদিস পড়িলেই জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হয় না, এই ধরনের কথার প্রতিবাদ না করিয়া হামিদ পারে নাই। হামিদের প্রতিবাদে প্রিন্সিপাল সাহেব চটেন নাই, শুধু মুচকি হাসিয়াছেন। এখন হামিদ চিন্তা করিয়া দেখিতেছে, প্রিন্সিপাল সাহেবের সব কথাই অর্থপূর্ণ। মযহাবী মতভেদ সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে বটে, কিন্তু মুসলমানদের মতো উগ্র মতভেদ আর কোথাও নাই। মযহাবে-মযহাবে এমন দাংগা-হাংগামাও আর কোনও ধর্মে নাই। প্রিন্সিপাল সাহেব বলিয়াছেন: পুরাতন নেসাবের শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমদের কর্মক্ষেত্র নাই বলিলেই চলে। এক কাযীগিরি ও আরবী-ফারসী মাষ্টারি। ফলে কাজের অভাবে এরা মযহাবী কলহ লাগাইয়া বেড়ায়

হামিদের আত্মীয়-স্বজনের প্রায় সকলেই মৌলবী-মওলানা। এক-এক জন করিয়া সে সকলের কথা চিন্তা করিয়া দেখিল। দুইচার জন মাষ্টার-মুদাররেস ও ছাত্রী ছাড়া আর সকলেই কেবল সয়ের-সওয়াল ও ওয়াজ-নসিহত করিয়া বেড়ান। ওয়াজ-নসিহত মানে যে মযহাবে-মযহাবে ও পীরে-পীরে ঝগড়া-ফসাদ বাহাস মুলাহেসা, হামিদ ছেলেবেলা হইতেই তা দেখিয়াছে। কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে শোনার আগে পর্যন্ত তাতে সে দোষ দেখিতে পায় নাই। আজ হামিদ বুঝিয়াছে, এদের কাজ শুধু অন্যায় নয়, আল্লাহর হুকুমের খেলাফও। প্রিন্সিপাল সাহেব দেখাইয়াছেন কোরআনে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন: তোমরা ধর্মকে ভাগ-ভাগ করিও না। অথচ ওলামারা আজ ঠিক এই কাজটিই করিতেছেন। আশ্চর্য! হামিদ কত বড় কাল্লামুল্লাহ পড়িয়াছে। অথচ এই আয়াতটির তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই।

নমাজ-রোজা ও এবাদত-বন্দেগিরি নিন্দায় হামিদ সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হইয়াছিল। কিন্তু এখন তার মনে পড়িল, প্রিন্সিপাল সাহেব নমাজ-রোজার নিন্দা করেন নাই, ও-সবের বাড়াবাড়িরই নিন্দা করিয়াছেন। আজ তার মনে পড়িল, বহুদিন আগে, তার ছেলে-বেলায়, ঠিক এই কথাটাই তারও মনে হইয়াছিল। একবার হামিদ বাবার সাথে মুরিদানে গিয়াছিল। সেখানকার মুরিদদের কয়েক জনের তরফ হইতে স্থানীয় খলিফার বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়। ব্যাপার এই যে স্থানীয় মসজিদের ইমাম আঠার জন মুসল্লিকে এক টাকা করিয়া কাফ্ফারা করেন এবং ছয় মাসের জন্য সমাজে আটক ফেলেন। তারা ইমাম সাহেবের দণ্ডের বিরুদ্ধে স্থানীয় খলিফার কাছে আপিল করে। খলিফা ইমাম সাহেবের রায় বহাল রাখেন। এইবার পীর সাহেব-কেবলার দরবারে দ্বিতীয় আপিল। পীর সাহেব-কেবলা উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে। তার সারমর্ম হামিদের আজও মনে আছে। ব্যাপার এই: নিকটস্থ এক বাড়িতে আগুন লাগায় অভিযুক্ত আঠার জন মুসল্লি জুম্মার ফরজ নমাজের নিয়ত ছাড়িয়া আগুন নিবাইতে গিয়াছিল। অপরাধীদের পক্ষ হইতে বলা হইল এবং গ্রামের লোক সাক্ষী দিল যে ঐ লোকেরা গিয়া আগুন না নিবাইলে ঐ বাড়ি এমন কি পাশের কয়েকটা বাড়ি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত।

এত সব গুনিয়াও পীর সাহেব-কেবলা ইমাম সাহেব ও খলিফা সাহেবের রায় বজায় রাখেন। ছেলেবেলার ঘটনা হইলেও পীর সাহেবের একটা কথা আজও হামিদের মনে আছে। তিনি অপরাধী ও গ্রামবাসীদের কাকুতি-মিনতির জবাবে বলিয়াছিলেন: ফরজ নমাজ ছাড়িয়া আশুন নিবাইতে যাওয়া সমর্থন করিলে দিনের চেয়ে দুনিয়া বড় এ কথা মানিয়া নিতে হয়। হামিদ তৎকালে বাপের এই যুক্তির অকাট্যতা মানিয়া নিয়াছিল। এমনি মানিয়া নিয়াছিল হামিদ আরেকটা ব্যাপারে বাবার যুক্তি। একবার হানাফী-মোহাম্মদী বাহাসে দুই দলের মুসলমানদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত দাংগা-হাংগামা খুঁস-জখম ও জেল-জরিমানা হয়। হামিদের শিশুসুলভ প্রতিবাদের জবাবে বাপজানু বলিয়াছিলেন: অসত্য অধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ করা সওয়াবের কাজ, আপোস করা গোনাহর কাজ।

এসব কথা যে অন্যায়, এতদিন হামিদের তা মনেও হয় নাই। কাজেই ঘটনাগুলি সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। মুঘলধারে শিলা বৃষ্টিপাতের ফলে ধূলি-মাটিচাপা রাস্তার খোওয়া-কংকরগুলি যেমন খোঁচা-খোঁচা হইয়া মাথা উঠাইয়া উঠে, হামিদের মনের ঝড়ে তার অন্তর-চাপা এইসব কথা আজ মাথা চড়ে দিয়া উঠে। তার মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। হামিদের আজ মনে হয়, প্রিন্সিপাল সাহেবের কথাই ঠিক। পুরাতন নেসাবের শিক্ষা আমাদিগকে সংকীর্ণ ধর্মাক্ষ করিয়াছে। বাস্তব জীবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে দূরে সরাইয়া নিয়াছে। আজই প্রথম হামিদের মনে পড়ে, হাই স্কুল ও কলেজের বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলাপ-প্রসংগে হামিদ অনেকবার লজ্জা পাইয়াছে এই দেখিয়া যে তারা দুনিয়ার অত খবর রাখে, অথচ হামিদ তার কিছুই জানে না।

ভাবিতে-ভাবিতে হামিদ টেনে ঘুমাইয়া পড়ে।

না-ফরমান বনি-আদম

১

নিতান্ত অকস্মাৎ হামিদ বাড়ি আসায় সবাই খুশী। বিবি সাহেবরা হাল-পুরসি করেন। চাকর-চাকরানীরা মোরগ-মুরগী ধরার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে।

কিন্তু নিরাশ হয় হামিদ নিজে। পীর সাহেব-কেবলা সফরে বাহির হইয়াছেন। তিন-চার দিন পরে ফিরিবার কথা আছে। হামিদের ধার্মিক মন এতে আল্লার ইশারা দেখিতে পায়। লক্ষণ ভাল নয়।

কিন্তু সে নৈরাশ্য অল্পক্ষণেই দূর হয়। হাত-মুখ ধুইয়া নাশ্তা-চা খাইতে বসিয়া আশ্বাদের কথায় সে জানিতে পারে আগের দিন নানাজী রমযান শাহ আসিয়াছেন। মেহমানখানায় আছেন। বেশ-কিছুদিন ধরিয়া হামিদ নানাজীর সাক্ষাৎ কামনা করিতেছিল। ইতিমধ্যে প্রিন্সিপাল সাহেবের লাইব্রেরিতে হামিদ মেস্মেরিয়ম হিপনটিয়ম সম্মোহনবিদ্যা ভেন্ট্রিলকিয়ম ইত্যাদি বিষয়ের কয়েকখানা বই পড়িয়াছে। বেশরা ব্যাপার মনে হওয়ায় সে ওসব নিয়া প্রিন্সিপাল সাহেবের সহিত আলোচনা করে নাই। কিন্তু নিজের মনে একটা ধারণা করিয়াছে। নানাজীর ডেংগু-সেংগু নিজের আমদানি যে ভেন্ট্রিলকিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়, তাও সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে। তাই নানাজীকে জন্ম করিবার ইচ্ছা তার প্রবল হয়। এই কারণেই তাঁর সাথে মোলাকাতের আগ্রহ।

নানাজীর কথা শোনামাত্র নাকে-মুখে নাশ্তা গিলিয়া গরম চা পিরিচে ঢালিয়া খাইয়া রুমালে মুখ মুছিতে-মুছিতে হামিদ মেহমানখানায় ছুটিয়া গেল। 'নানাজী ও নানাজী' বলিয়া চিৎকার করিয়া শাহ সাহেবের ঘুম ভাঙাইল। শাহ সাহেবের ঘুম কুত্তার ঘুম, আসিতেও এক লহমা, যাইতেও এক লহমা। তিনি উঠিয়া বসেন। বহুদিন পরে হামিদকে দেখিয়া খুশী হন। দাঁত বাহির করেন। হামিদ আসসালামু আলায়কুম বলিয়া মুসাফেহা করে। ফতেপুরের পীর সাহেবরা হাজার মুরক্বি হইলেও বাহিরের লোককে কদম-বুসি করেন না। মুসাফেহা করার সময় হামিদ নানাজীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসির জবাবে হাসিল। নানাজীকে জন্ম করিবার ইচ্ছায় আঙুনে পানি পড়িল। নানাজীর উপর তার রহম হইল। কারণ তাঁর সামনের দুইটা দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। অতবড় স্বাস্থ্যবান জওয়ান নানাজীকে আজ বুড়া মনে হইল।

শাহ সাহেব এবার উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠেন। বলেন: কি নানাভাই, আমার দাঁত পড়া দেইখা মনে কষ্ট পাইলা? মনে করছ নানাজী বুড়া হইয়া গেছেন?

হামিদ চমকিয়া উঠে। লজ্জা পায়। শালার বুড়া হামিদের মনের কথা জানিলেন কেমন করিয়া?

জবাব দিলেন শাহ সাহেব। বলিলেন: তোমার মুখ দেইখা তোমার মনের কথা জান্তে পারছি।

নানাজী শুধু ভেট্টলকিয়ম জানেন না! থট্ রিডিংও জানেন? শালার বুড়া পাক্কা ভেঙ্কিবাজ! হামিদের মনের রহম দূর হয়। নানাজীকে জন্দ করিবার তার পুরাতন জিদ আবার দেখা দেয়। শাহ সাহেবের শেষ কথাটা শুনে নাই, এমন ভাব দেখাইয়া হামিদ হাসিতে-হাসিতে বলে: আপনারে জারি-জুরি ধইরা ফেল্ছি নানাজী, ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

শাহ সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন: কি জারি-জুরি ধরলা আমার? কারে আমি ফাঁকি দিছি?

হামিদ আরো জোরে হো হো করিয়া হাসে। হাসির চোটে হাতে পেট টিপিয়া ধরিয়া সে বলে: অই যে আপনারে সেই ডেংগু-বেংগু জিনের কথা। কি ফাঁকিটাই না আপনে দিছিলেন!

হামিদের হাসি আর থামে না। শাহ সাহেব ভুরু কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর মুখে বলেন: ডেংগু-বেংগু জিনেরে আমি ফাঁকি দিছিলাম? কেমনে?

হামিদ তেমনি হাসিয়া বলিল: ডেংগু-বেংগুরে না। আমরাই। দুইতিন শ লোকেই। উস্তাদির তারিফ আপনার।

হামিদ হাসি থামাইয়া সুরে গাম্ভীর্য আনিয়া বলে: শুনে নানাজী, আমি আর আগের শিশুটি নই। ইতিমধ্যে বয়সও হৈছে। ম্যাজিক ভেঙ্কি ও মেসমেরিয়ামের অনেক বইও পড়ছি।

শাহ সাহেব তাজিল্য ভরে বলেন: বই পড়ছ। ভাল করছ। তাতে ডেংগু-বেংগুর কি হৈল?

হামিদ: হৈল এই যে ডেংগু-বেংগু জিন-টিন কিছু না। আপনে নিজের গলা থনে ঐ ভিন্ন-ভিন্ন সুরের আওয়াজ বার করছেন। এটা একটা ভেঙ্কিবাজি। ইংরাজিতে ওটারে কয় ভেট্টলকিয়ম। আমার শুধু তাজ্জব লাগে, আপনে ঐ বিদ্যা শিখলেন কই? বই-পুস্তক পড়লেন কবে।

শাহ সাহেব হামিদের কথার সেজা উত্তর দিলেন না। বলিলেন: কেন নানাভাই, তুমি কি জিন-পরীতে বিশ্বাস কর না?

একেবারে হামিদের আঁতে ঘা। সে নিশ্চয়ই জিনে বিশ্বাস করে। কোরান শরিফেই আছে জিনের কথা। হামিদ সহসা কোন জবাব দিতে পারিল না। সে হারিয়া গিয়াছে মনে করিয়া শাহ সাহেব খুশী হইলেন। নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া তিনি মুকুন্দিয়ানা সুরে বলিলেন: বেশ ত ধর না, ঐ যে বানতারা লোকের যম না কি কৈলা এটাই আমল কর না।

হামিদ আদবের সাথে নানাজীকে শুদ্ধ করিয়া দেয়: ভেট্টলকিয়ম। আরও বলে: ওটা তেমন কঠিন কাজ না। শুধু একটু প্র্যাকটিস মানে এক আধটু অভ্যাস লাগে। কিন্তু ওটা যে শরিয়তের বরখেলাফ।

শাহ সাহেব: আমিও ত অই কথাই কই। অভ্যাস লাগে। সব কাজেই লাগে। ঐ অভ্যাস করারেই আমরা ফকিররা কই সাধনা, তোমরা আলেমরা কও আমল মোরাকেবা-মোশাহেদা। কিরিস্তানরা কয় পেরাকটিস। যে নামেই ডাক আল্লা ঈশ্বর গড় যেমন একই, সব ধর্মের সাধনাও তেমনি একই। কোনও ধর্মই মিথ্যা না, কোনও সাধনাই বেকার না।

নানাজীর এসব বেশরা কথা হামিদের ভাল লাগে না। সে ইসলামকেই আল্লার এক মাত্র ধর্ম বলিয়া জানে। নানাজীর এই সব শেরকী-বেদাতী কথার জন্যই পীর সাহেব-কেবলা চাচা-শ্বশুরকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না, হামিদ তাও জানে। কিন্তু নানাজীর কথাগুলি শুনিতে ভাল, খুবই উদার, মনে-মনে তা স্বীকার করে হামিদ। মনে-মনে সে সাবধান হয়। তওবা আস্তাগফার পড়ে। সে জানে শয়তানের সব কথাই শুনিতে মিষ্টি। তাই বলিয়া সে-সব মিষ্টি কথার ফাঁদে হামিদ পড়িবে না। অন্য লোক হইলে হামিদ তাকে তিরস্কার করিত। কিন্তু নানাজী যতই বেশরা ও বে-ইলিম হোন, তাঁকে তিরস্কার করা চলে না। কাজেই সে মৃদু হাসিয়া দৃঢ়তার সংগে বলে: নানাজী আপনি আমল বা সাধনার কথা কহিতেছিলেন তাই কন। কোন ধর্ম ভাল কোন্টা মন্দ, কোন্-কোন্টা সমান তার আলোচনা বাদ দেন।

শাহ সাহেব বুঝেন, বয়সে যতই ছোট হউক হামিদ আলেমের বেটা আলেম। তাই তাঁর অজ্ঞতার খুঁটা দিল সে কৌশলে। কিন্তু কিছুমাত্র না চটিয়া তিনি সহজ সুরে বলেন: 'আমি ধর্মের কথা কহিতাছি না; সাধনার কথাই কহিতাছি। বান্ধারা লোকের যম বা মেষ মারার যম যে নামই দেও না কেন, সবই সাধনা। হিন্দুয়ানি বা ক্রিস্তানি বৈলা কোনোটারই নফরত করা উচিত না। আমরা ফকিররা যেটারে কই মোহন বিদ্যা, বশীকরণ, তোমরা আলেমরা সেটারেই কও নিসবতে-বায়নান্নাস। ক্রিস্তানিরাও একই সাধনারে কয় মেষ-মারা-যম। যার-তার আমলের লাগি ও-সবই দরকার। অমন যে শরিয়তওয়ালা পীর সাহেবরা, তাঁরাও মোহন বিদ্যা বা মেষ-মারা-যম আমল করেন। তোমার বাপজানও করেন। তোমার দাদা-পরদাদারাও করতেন। এ বিদ্যার জোরে মানুষের মেঘের পালের মতো বশ করা যায় বৈলাই ত ক্রিস্তানিরা ওর নাম রাখছে মেষ মারা -যম। জান নানাভাই, মান ও হুঁশ আছে বৈলাই আমরা মানুষ। মোহনবিদ্যা ও মেষ-মারা-যম বিদ্যার জোরেই তারার মান ও হুঁশের উপর পর্দা ঢালা যায়। তাতেই মানুষ হয় মেষ।

নানাজীর মুখে মনুষ্যত্ব ও মেস্‌মেরিয়মের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া হামিদের খুব জোর হাসি পাইল। কিন্তু তার ভক্তিভাজন আব্বাজানও মেস্‌মেরিয়মের জোরে পীরগিরি করেন শুনিয়া তার মনটা বিষাইয়া উঠিল। সে বিরক্তি-মাথা সুরে বলিল: আপনি কহিতে চান নানাজী, আব্বাজানও বেশরা মেস্‌মেরিয়মের জোরে পীরগিরি করেন?

শাহ সাহেব জিভে কামড় দিয়া হুঁশ করিয়া একটা শিসের আওয়াজ করিয়া বলেন: আস্তে ভাই, আস্তে। অত জোরে না। কেউ শুনলে আমার গর্দানে আর মাথা থাকবে না।

চারদিকে তাকাইয়া শাহ সাহেব সুর নিচা করিয়া বলেন: মোহন বিদ্যা না জানলে কারো কাছে লাখ-লাখ লোক অমন বশ হৈয়া থাকে? ওটা দোষের কথা না। বলকে বুয়ুর্গি কেরামত। বহুদিন সাধনা না কৈরা উস্তাদ-গুরু না ধইরা কেউ এসব শিখতে পারে না। আমার আপত্তি খালি এই পীর সাহেবরা নিজেরা এসব করেন, কিন্তু আমরা ফকিররা দোষ দেন। তুমি পীরের বেটা পীর, কিছু মনে কৈর না ভাই, আমরা ফকিররা দরকার-মতো দু'চার জনরে বশ করি তারারই ভালার লাগি। এই ধর রোগ সারাবার লাগি, মামলা-মোকদ্দমা জিতাবার লাগি ইত্যাদি। আর পীর সাবরা কি করেন? তাঁরা দেশকে-দেশ বশ করেন শুধু নযর-নেয়ায ওসুল করবার লাগি। আফসোস এই যে, চালুনে কয় সুইচেরে তোর হেঁদা।

হামিদের মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল: আপনি যাই কন নানাজী আব্বাজান কোরআন-হাদিসের খেলাফ কাজ করেন, এটা আমি মানি না। বিশ্বাস করি না।

শাহ সাহেব মৃদু হাসিয়া বলেন: তোমার আব্বাজান কোরআনের খেলাফ কাজ করেন, অমন কথা আমি কই নাই। আর কোরআনের কথাই যখন তুললা, তখন শোন তাই, আসল কোরআন এইটা।

বলিয়া শাহ সাহেব ডান হাতের শাহাদৎ আংগুল দিয়া নিজের সিনার উপর জোরে একটা গুতা মারিলেন। তারপর বলিয়া চলিলেন: তোমার দিল, তোমার রুহই তোমার কোরআন। এটাই আল্লার আরশ। সেই আরশে বৈসাই আল্লা তোমার পাপ-পুন্নি নেকি-বদির বিচার করে। আমরা দুনিয়ার লালচে, সাংসারিক কাজে, নিজের ও পুত্র-কন্যা-স্ত্রীর খাওয়াপরার যোগাড়ে দিন-রাত কত পাপ-পুন্নি করি, কত সাচা-মিছা কথা কই। মুখে যাই কই না কেন নিজের দিলে ত বুঝি কোন্টা সাচা কোন্টা মিছা; কোন্টা পাপ আর কোন্টা পুন্নি। কথায় কয়: মনের অগোচরে পাপ নাই। আল্লা হাজির-নাজির। তার অগোচরেও পাপ নাই। আল্লা সব জানে। কাজেই তোমার মনও যা, আল্লাও তাই। একেই কয় 'আনাল হক'।

একটু হাসিয়া শাহ সাহেব বলেন: কিন্তু এসব বাতেনী কথা যাহেরায় কইয়া যায় না। কারণ সকলে তা বুঝে না। সকলে বুঝে উল্টা। তোমার কথা মানুষকে বদলে লোকে তোমার মাথায় মারবে লাঠি। তোমার বাপজানও এসব বাতেনী কথা যাহিরায় কন নাই। আমিও এতদিন তোমাতে কই নাই। আগে কইলে সুখতা না। এখন তুমি সাবালেগ হৈছ। বুঝবা বৈলাই কইলাম।

নানাজীর এই তোষামোদে হামিদ খুশী হইল। গর্বও বোধ করিল। কারণ আজই প্রথম সে নানাজীর বে-এল্মির মধ্যেও এলেমের একটা রূপ দেখিতে পাইল।

গোসল-খাওয়া ও নমাজে নানা-নাতির আলেখ্যচনা বাধাপ্রাপ্ত হইল। বৈকালিক ভ্রমণ ও পড়শীদের সাথে, বিশেষত: ইব্রাহিম সর্দারের সাথে, দেখা-সাক্ষাতের দরুণ এশার নমাজ ও রাতের খাওয়ার আগে তাদের বৈঠক আর বসিতে পারিল না।

রাত্রের আলাপে মোরাকেবায়ে-নিসবতে-বায়নান্নাসের কথা উঠিল। অবশেষে শাহ সাহেব বলিলেন: এই তরকিবের যরিয়াতে তোমার রুহ যে কোনও জায়গার যে কোনও লোকের রুহের সাথে কথা কইতে পারে। যে কোনও রোগীর রোগ ভালা কৈরা দিবার পারে।

হামিদ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলে: যে কোনও জায়গা মানে কি? দুনিয়ার যে কোনও জায়গা? যে কোনও লোক মানে কি দুনিয়ার যে কোনও লোক? এই ফতেপুর থনে আমি সিরাজগঞ্জের প্রিন্সিপাল সাহেবের রুহের সাথে কথা কবার পারি?

হামিদের কথায় অবিশ্বাস ও শ্লেষের সুরটা শাহ সাহেব অগ্রাহ্য করেন। স্বাভাবিক গাভীরের সাথে বলেন: সিরাজগঞ্জ ত সিরাজগঞ্জ, তোমার রুহ ঢাকা-কলিকাতা হিল্লি-দিল্লি মক্কা-মদিনাও যাবার পারে। তোমার পিরিসিপালের ত কথাই নাই। জিন্না, গাফী, হক সাহেব, সরওয়াদী, শেখ মুজিব সাব ওগায়রা যিন্দা-মুর্দা যে কারও সাথে কথা কইতে পার। নিস্বতে বায়নান্নাসের মরতবা এতদূর।

শাহ সাহেবের সুরের গাণ্ডীৰ্য ও দৃঢ়তা হামিদের মনে খানিকটা প্রত্যয় সৃষ্টি করে। সে বলে: দূরদেশী বড়-বড় যিন্দা-মুর্দা লোকের কথা বাদ দেন নানাঙ্গী, কাছে-ভিতের কোনও যিন্দা লোকের কথাই বলেন। তাতে সত্য-মিথ্যা পরখ করা সহজ হয়।

শাহ-সাহেব মুচকি হাসিয়া বলেন: বুঝলাম তুমি এখনও আমার কথা বিশ্বাস করতে পারতেছ না। বেশ পরখই কর। পরখ করা সব চাইয়া সহজ হয় যদি তুমি নিজেই সে লোকের নাম কর। কও তুমি তোমার ইয়ার-দস্ত দু একজনের নাম।

হামিদ নানাঙ্গীর এই চ্যালেঞ্জে চঞ্চল হয়। খানিক চিন্তা করে। অবশেষে ফতেপুরের এবং আশে-পাশের গ্রামের কয়েকজন ছাত্র-বন্ধু এবং মাদ্রাসার দু-একজন মুদাররেসের নাম করে। শাহ সাহেব তাঁদের সবাইকে চিনেন। সুতরাং তিনি রাজি হইলেন। হামিদ তখন জানিতে চায় কবে কখন শাহ-সাহেব ওদের মধ্যে কার সাথে কথা বলিবেন। উত্তরে শাহ সাহেব জানান যে তিনি রাতের বেলা ওদের একজনের রুহের সাথে কথা বলিবেন। কিন্তু কার সাথে ঠিক কখন বলিবেন তা জানাইতে রাজি হইলেন না। কারণ স্বরূপ বলিলেন, নির্দিষ্ট ব্যক্তি যদি আগে সে কথা জানিতে পারে, তবে তার রুহ শাহ সাহেবের রুহের সাথে কথা বলিবে না। হামিদের চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ দেখিয়া শাহ সাহেব এই বলিয়া তার বক্তব্য শেষ করিলেন: যাহোক, যার রুহের সাথেই আমি কথা কই, তুমি তা জানতে পারবা। সেই লোক নিজেই তোমার কাছে সে কথা কইব।

হামিদের মনের সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হয় না। সেটা প্রমাণ হয় তার পরবর্তী প্রশ্নে। সে বলে: রাতের বদলে দিনে করা যায় না?

শাহ সাহেব সরলভাবে বলেন: করা যাব না কেন? কিন্তু সে লোককে ঘুমন্ত পাওয়া চাই। দিনের বেলা অনেকেই ত ঘুমায় না।

হামিদের চোখে-মুখে নতুন সন্দেহের ছায়া পড়ে। সে বলে: ঘুমের দরকার কি?

শাহ সাহেব: রুহের সাথে রুহের মোলাকাত ত? এটা কেবলমাত্র ঘুমের মধ্যেই হইতে পারে। আমি ত ভাই আগেই কইছি। আর আমার কইতে হৈব কেন? তুমি আলেমের বেটা আলেম, তুমি ত জানই। দিলটা মানুষের বিষয়ী মন, রুহটা তার ভাবুক মন। চেতন অবস্থায় আমরা উপর এই বিষয়ী মনের বাদশাহী। এ সময় রুহের কোনও কথাই খাটে না। রুহ বড় নিরীহ। দিল বড় ঝগড়াটিয়া। এই কারণে যতক্ষণ দিলের বাদশাহী চলে, ততক্ষণ রুহ ঘরের বাইর হয় না। মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার দিল হয় অচেতন। তার বাদশাহী শেষ। এই সময়ই রুহের বাদশাহী শুরু।

হামিদ পরম আগ্রহের সাথে নানাঙ্গীর কথা শুনিতো থাকে। নানাঙ্গীকে ক্রমেই সে অধিকতর পণ্ডিত আলেম সূফী দরবেশ মনে করিতে লাগে। সে প্রশ্ন করে: রুহের এ বাদশাহীর মানে কি, নানাঙ্গী? ঘুমের মধ্যে আমরা জেসম ত অসাড়া হৈয়া বিছানায় পৈড়া থাকে। তা হৈলে জেসম ছাড়া শুধু রুহেরার মধ্যে মোলাকাতই হয় বা কেমনে? তারা কথা বলা-বলিই বা করে কেমনে?

শাহ সাহেব মুচকি হাসিয়া বলেন: তুমি ত জানই ভাই, তবু কেন পুছ কর? আল্লার কাছে যেমন স্থান-কাল নাই রুহের কাছেও তেমনি স্থান-কাল নাই। রুহের আজ-কাল বা দূরে-কাছে বৈলা কিছু নাই। আমরা জেসমী চোখে যা দেখি অচেতন-অসাড়া রুহানী চোখ তাই দেখি সচেতন আর সজাগ।

হামিদ নানাজীর এ সব কথা বুঝিল না। কিন্তু সে এটা বুঝিল যে নানাজী তার ব্যবসার খাতিরে হামিদের কাছেও একটু বুয়ুর্গি দেখাইবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সে নানাজীর এই দুর্বলতা মাফ করিয়া দেয়।

বৈঠক শেষ হইতে বেশ সময় লাগিল।

সেই রাত্রে। ছোট বিবির পরিত্যক্ত ঘরেই আজ-কাল হামিদের শোওয়ার ব্যবস্থা হয়। আজও হইয়াছে। এটা পীর সাহেব-কেবলার কামরার লাগ কামরা। বিবি সাহেবদের কামরা হইতে বেশ দূরে।

হঠাৎ হামিদের ঘুম ভাংগিয়া যায়। দেখে নানাজী তার খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসিয়া মুচ্চিক হাসিতেছেন। পরনে লুংগি, গায়ে নিমা। ঠিক যেমনটি হামিদ বিকাল ও সন্ধ্যারাত্রে দেখিয়াছিল। ধড়মড় করিয়া হামিদ উঠিয়া বসে। ঘুমের কথা অন্দের নিজের কামরার কথা সে ভুলিয়া যায়। তার মনে হয় সে মেহমানখানায় নানাজীর কামরায়। নানাজীরই বিছানায় সে শুইয়া পড়িয়াছিল। তাই ধড়মড় করিয়া উঠা। কিন্তু চারদিক তাকিতুকি করিয়া সে বুঝে, এটা টিনের ঘর নয়। পাকা দালান। সে অবাক নজরে নানাজীর দিকে চায়।

নানাজী হাসিমুখে বলেন: ইটা মেহমানখানা না; অন্দের তোমার নিজের কামরা। বড় আরামে ঘুমাইতে আছিল। ভাই। আগের রাতটা টেনে-ইষ্টিমারে ঘুমাবার পার নাই। এই কারণে তোমার এমন ভাল ঘুমটা ভাংতে আমি চাইছিলাম না। কিন্তু কি করি? তুমিই জিদ করলা এটাও আমার ফাঁকি কি না পরখ করবার! সে উদ্দেশে বাইছা-বাইছা নিজের বিশ্বাসী লোকের নাম কৈলা। আমি চিন্তা কৈয়া দেখলাম অন্য বিশ্বাসী লোক তালাশ করিবার দরকারটা কি? তুমি নিজেই তোমার সবচেয়ে বিশ্বাসী লোক। কাজেই আমার রুহরে কইলাম: যাও আমার নাতিব রুহের সাথেই কথা কইয়া আস গিয়া। তাই আমার রুহ তোমার রুহের সামনে হাজির। এই বলিয়া নানাজী হাসিতে লাগিলেন।

হামিদের সব কথা মনে পড়িয়া যায়। সন্ধ্যা আজই সন্ধ্যা রাতে নানাজীর সাথে তার অমন কথা হইয়াছিল বটে। নিজের চোখ-কানকে সে তবু বিশ্বাস করিতে পারে না। সে আবার চারদিকে তাকায়। বিশেষ করিয়া ঘরের দরজাটা দেখে। দরজায় কপাটে খিল দেওয়া, ছিটকানি মারা, যেমনটি সে শোবার সময় মারিয়াছিল। টেবিলের উপরে হারিকেন, যথাস্থানেই আছে। কিন্তু সেটা ফাৎ-ফাৎ করিয়া জ্বলিতেছে। সারা ঘর আলোকিত। অথচ শোবার সময় সে হারিকেনটার তেজ একদম কমাইয়া দিয়াছিল। হামিদকে চিন্তামুক্ত দেখিয়া শাহ সাহেব বলেন: না নানাভাই, আমার আর থাকা চলে না। তোমার কাচা ঘুমটা ভাংগাইছি বৈলা তুমি আমার উপর রাগ করছ। কিন্তু উপায় আছিল না। আজ রাত্রেই এ কাজ না করলে হৈত না। কারণ আগামী দিনই আমি চৈলা যাব। দুলা মিয়া বাবাজী কালই সফর খনে ফিইরা আসতেছেন। তুমি জান ভাই, দুলা মিয়া আমারে বেশি পছন্দ করেন না।

হামিদ এতক্ষণে কথা বলিতে পারে। সে বলে: না নানাজী, আব্বাজান কাল আসবেন না। আরও তিন-চার দিন বাকি।

শাহ সাহেব মৃদু হাসিয়া বলেন: সেই রকম কথাই ছিল। কিন্তু দামাদ মিয়া মত বদলাইছেন। কালই তিনি ফিইরা আসবেন। যাউক কাইলের কথা কালই দেখা যাব। এখন তুমি ঘুমাও নানাভাই। আমি চললাম।

কিসে কি হইল হামিদ বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ দেখিল, হারিকেনটা নিবু-নিবু হইয়া আসিল। ঘরটায় আর আগের মতো রোশনি নাই। হারিকেন হইতে চোখ ফিরাইয়া নানাজীর দিকে তাকাইল। কিন্তু চেয়ারটা খালি।

হামিদ কি স্বপ্ন দেখিতেছে? সে হাতড়াইয়া বিছানা-বালিশ ছুইল। নিজের মাথায়-কপালে চোখে-মুখে-বুকে হাত বুলাইল। না, স্বপ্ন ত নয়। হাত বাড়াইয়া হারিকেনটার সলতা বাড়াইয়া দিল। তেজ বাড়িল। ঘর রোশনি হইল। সলতাটা ত নামানোই ছিল। তবে এতক্ষণ ওটায় এত তেজ ছিল কেমন করিয়া? সে আবার চারদিক তাকাইল। না কোথাও কিছু না। সে বিছানা হইতে নামিয়া দরজার কপাট খিল ও ছিটকানি পরখ করিল। সবই ঠিক আছে। না হামিদ তবে স্বপ্নই দেখিয়াছে। কিন্তু স্বপ্ন হইলে এই চেয়ারটা তার খাটের অত কাছে আসিল কেমন করিয়া এটা ত দেওয়ালের পাশের ঐ চেয়ারটার সাথে ছিল। সে আশ্বে-আশ্বে বিছানায় উঠিয়া হারিকেনটার তেজ কমাইয়া গুইয়া-গুইয়া ভাবিতে লাগিল: সত্যই কি নানাজীর রুহ তার কাছে আসিয়াছিল?

পরদিন সকালে দেখা হওয়ামাত্র হামিদ কথা বলিবার আগেই শাহ সাহেব তার স্বাভাবিক মুচকি হাসিয়া বলেন: রাত্রে কিছু দেখছিল ভাই?

হামিদের আর সন্দেহ থাকে না। সত্যই নানাজীর রুহ তার ঘরে গিয়াছিল। ওটা তবে স্বপ্ন নয়। হামিদ কোনও জবাব দিবার আগেই শাহ সাহেব আবার বলেন: সত্যই নানাভাই, আজই দুলা মিয়া বাবাজী ফিইরা আসতেছেন। আমি দুপুরের খানা খাইয়া সইরা পড়তে চাই।

অতপর এক ফাঁকে হামিদ নানাজীকে ধরিয়া বসিল এর তরকিব তাকে শিখাইতেই হইবে। শাহ সাহেব চারদিকে তাকাইয়া খুব ছোট মনে ব বলেন: ভাই তোমারে শিখাবার লাগিই আমি সহজ তরকিবের এই আমলটা দেখাইছি। এটা সত্যই খুব সোজা। পাক-সাফ হৈয়া গুইতে যাব। শোবার আগে নমাজের আসনে পশ্চিমমুখী হইয়া বস্বা। ‘লাইলাহা ইলাল্লাহ’ দুই যিকিরে পড়বা। প্রথম যিকির ‘লাইলাহা’ লতিফায়ে-নফসে মারবা। আর দ্বিতীয় যিকির ‘ইল্লালাহ’ লতিফায়ে-রুহে মারবা। এইরূপ সাতবার মারবা। তুমি ত জানই লতিফায়ে-নফস্ নাভির দুই আংগুল নিচে। আর লতিফায়ে রুহ ডান বুনির দুই আংগুল নিচে। লতিফায়-রুহে ফুঁ দিবার সময় জোরে ফুঁ দিবা। সাতবারই সমান জোরে লতিফায় ফুঁ দিবা। প্রতিবার রুহে ফুঁ দিবার সময় রুহের উদ্দেশ্য কইরা কইবা: ‘আয় মেরে রুহ, তুই আজ রাতে অত ঘড়ির সময় অমুক জায়গায় ফলানার ঘরে ঢুকি তাই তার রুহের কাছে এই-এই কথা কইয়া আইবা। সাতবার লতিফায়ে রুহেরে এই কথা কইয়া তুমি গুইয়া পড়বা। আর কোনও কাজ করবা না। কোনও কথা কইবা না। কারও সাথে দেখা করবা না। ঘর থনে বাইর হবা না। যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ কেবল রুহের কাছে ঐ একটা কথাই কইতে থাকবা। ব্যস, তাতেই কাজ হৈয়া যাব। সেই লোকের মুখেই তুমি শুনতে পারবা যে রাত্রে অতটার সময় তুমি তার কাছে গেছিল। শুধু খেয়াল রাখবা যার কাছে তোমার রুহ পাঠাবা, সে লোক যেন আগে তা জানতে না পারে।

হামিদের পিড়াপিড়ী সত্ত্বেও শাহ সাহেব সেই দিনই বিদায় হইলেন।

২

হামিদকে বাড়িতে দেখিয়া পীর সাহেব-কেবলা আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু মনে-মনে তিনি অসন্তুষ্ট ও চিন্তাযুক্ত হন। এমন অসময়ে কেন? কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে দেখামাত্র কৈফিয়ৎ চান না। অপেক্ষা করেন।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর হামিদ নিজেই কথাটা পাড়ে। কিন্তু যেমন ভাবে বলিতে চাহিয়াছিল, তেমনটা হয় না। কেমন যেন ঘোরপ্যাঁচ লাগিয়া যায়। ইতিমধ্যে নানাজীর সাথে তার যে ব্যাপারটা ঘটিয়াছে, হামিদের মতি-গতির উপর তার প্রভাব পড়িয়াছে নিশ্চয়ই।

বাপের সাথে কথা বলিতে তর্ক করিতে হামিদের কোনও দিন বাধ-বাধ ঠেকে না। এটাই তার শিক্ষা। বাপকে সে ভয় করে না। ভাল বাসে, শ্রদ্ধা করে। বাপজানও যে তাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, তাও সে জানে। তিনি হামিদের ভাল চান, অমংগল চান না, এটা বুঝিবার বুদ্ধি হামিদের হইয়াছে। তার বাপজান জ্ঞানী লোক, বড় আলেম। তাঁর সেই বিপুল জ্ঞান ছেলেকে তিনি শিখাইতে চান, হামিদের মনে এই বিশ্বাস আছে। সুতরাং হামিদের ভয়টা কিসের? তর্ক করিয়া যে কোনও বিষয়ে বাপের কাছে জ্ঞান লাভ করিবে না কেন সে? এতদিন হামিদের ছিল এই মনোভাব।

কিন্তু আজ? আজ যেন সে মনোভাব তাকে ত্যাগ করিয়াছে। মর্মে সাহস যেন সে হারাইয়াছে। নানাজীর শেষ কথায় বাপের প্রতি শ্রদ্ধাও যেন নষ্ট হইয়াছে। বাপ-বেটার মনের মধ্যে যে উন্মুক্ত দরজা ছিল, তা যেন আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অথবা অন্তত সে দরজায় একটা পর্দা ঝুলান হইয়াছে। এতদিন বাপের নিকট তার গোপনীয় কিছু ছিল না। আজ যেন তা হইয়াছে। সত্যই ত জা হইয়াছে! সে ত কিছুটা গোপন করিতে চায় নিশ্চয়ই। কাজেই সাবধান হয় সে। কিন্তু সাবধান হইবার বিপদ এই যে যতই বেশি চেষ্টা করা যায়, তত বেশি ভুল হয়। হামিদেরও তাই হইল।

সে খুব সতর্কতার সাথে কথাটা পাড়িল। পরিবর্তনটা বিশেষ কিছু নয়। শুধু ওল্ড স্কিম হইতে নিউ স্কিমে যাওয়া। মাদ্রাসা মাদ্রাসাই থাকিল। সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জই থাকিল। উপসংহারে সে বলিল: এতে প্রিন্সিপাল সাহেবের অনুমোদন আছে। বলিবার সময় হামিদ বাপের চোখে-মুখে নজর রাখিল। সে বুঝিল বাপ তার কথা পছন্দ করিতেছেন না। রাগ করিতেছেন। ভিতরে-ভিতরে ফুলিতেছেন। বাপের অসন্তোষ সে যত বেশি দেখিল, কথা তার তত জড়াইয়া যাইতে লাগিল। ভুল তার তত বেশি হইতে লাগিল। তাই সব ভুল সংশোধন করিবার আশায় প্রিন্সিপাল সাহেবের অনুমোদনের কথাটা টানিল।

পীর সাহেব-কেবলা আদত শরিফ লোক। ছেলে যতক্ষণ তার বক্তব্য শেষ না করিল, ততক্ষণ তিনি একটা কথাও বলিলেন না। হামিদ তার কথা শেষ করিয়া যখন বাপের এজায়তের আশায় তাঁর দিকে চাহিয়া চুপ করিল, তখনই পীর সাহেব মুখ খুলিলেন। বলিলেন: তোমার কথা শেষ হৈছে, বাবা?

হামিদ স্পষ্ট বুঝিল, ‘বাবা’ শব্দটা বাপজান যোগ করিলেন অসহ্য রাগ গোপন করিবার জন্যই। সে অতিশয় বিনয়ে বলিল: জি হাঁ।

পীর সাহেব তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি সোজা হইয়া বলিলেন: প্রিন্সিপাল সাবের কথা এর মধ্যে তুমি টাইনো না। তুমি প্রিন্সিপাল সাবের ছেলে নও, আমার ছেলে। আমার ছেলে কোন্ লাইনের শিক্ষা পাব, সেটা আমি ঠিক করব, তিনি করবেন না।

বাপের গলার সুরের দৃঢ়তায় হামিদ হকচকাইয়া গেল। সহসা কোনও জবাব তার মুখে যোগাইল না। পীর সাহেব বলিয়া চলিলেন: কাজেই তুমি আমারে বুঝাও, কেন তুমি মাদ্রাসা ত্যাগ করতে চাও?

হামিদ তার কওয়া-কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল: আমি ত মাদ্রাসা ছাড়তে চাই না বাপজান, শুধু ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা থানে নিউ স্কিম মাদ্রাসায় যাবার চাই।

ধমক দিয়া পীর সাহেব বলিলেন: চুপ কর বেটা, আমারে বোকা বুঝবার চেষ্টা কৈর না। নিউ স্কিম মাদ্রাসারে আমি মাদ্রাসা বৈলা স্বীকারই করি না। ওটা মাদ্রাসার ছদ্ম নামে ইংরাজি হাই স্কুল মাত্র। ধর্ম-প্রাণ মুসলমানদেরে ফাঁকি দিবার, ধর্মহীন করার ওটা নাসারায়ী ফন্দি ফিকির মাত্র।

বাপের মুখে এই ধরনের কথা হামিদ এই প্রথম শুনি। নিউ স্কিম মাদ্রাসার বিরুদ্ধে এমন কঠোর কথা পীর সাহেব আর কোনও দিন বলেন নাই। হামিদ বুঝিল, বাপজান ভয় দেখাইয়া তার মত পরিবর্তন করিবার জন্যই এই ধরনের কথা বলিতেছেন। হামিদ একটু জিদ করিলেই বরাবরের মতো তিনি হামিদের আবদার মানিয়া নিবেন। কাজেই তর্ক না করিয়া সে আবদারী সুরে বলিল: হাই হোক বাপজান আমি নিউ স্কিমেই পড়ব। পুরাতন নেসাবে আর পড়ব না।

ছেলের জিদের সামনে হের মানা পীর সাহেবের কথারই অভ্যাস। কিন্তু আজ কিছুতেই তা করিবেন না, এটা তাঁর সংকল্প। কারণ এটা ধর্ম-ঈমানের ব্যাপার। তাঁকে দৃঢ় হইতেই হইবে। কিন্তু সংকল্প এক কথা, আর বরাবরের অভ্যাস আরেক কথা। ছেলের সুরে আবদারের ভাব দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি একটু নরম হইয়া গেলেন। তাঁর মুখ দিয়া তাঁর অজ্ঞাতেই বাহির হইয়া পড়িল: কেন তুমি পুরাতন নেসাব ছাড়তে চাও? কি অসুবিধা হৈছে তোমার? তুমি ত বরাবর সব ইম্তেহানে জমাতে প্রথম হইয়া আসতেছ! কও, কি তোমার অসুবিধা?

বাপের মুখে ‘অসুবিধা’র কথা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তবে কি বাপজানের কানে আসল কথাটা কেউ পৌছাইয়া দিয়াছে? হামিদ প্রখর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে বাপের দিকে নজর করিল। না, তা মনে হয় না। তবু হামিদকে সতর্ক হইতে হইবে। অসুবিধার ধারে-কাছে যাওয়া চলিবে না। দূরে-দূরে থাকিতে হইবে। অতএব যে-সব কথা বলার ইচ্ছা তার ছিল না সে তাই বলিল: অসুবিধার কথা না বাপজান, জ্ঞান লাভের কথা।

পীর সাহেব বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলেন: কি কইলা? অসুবিধার কথা না, জ্ঞান লাভের কথা? তুমি কি কৈতে চাও, মাদ্রাসা-শিক্ষায় জ্ঞানলাভ হয় না?

হামিদের মন তখন অসুবিধা হইতে দূরে পালাইতেছে। বাপের মুখে সেই অসুবিধারই পুনরাবৃত্তি শুনিয়া হামিদের মন দিল দৌড় ভোঁ দৌড়। অসুবিধা হইতে আরও দূরে যাইতে হইবে আরও দূরে দশ মাইল তফাতে। যেখানে গেলে বাপজান

অসুবিধার কথা চিন্তাও করিতে পারিবেন না। অতএব হামিদের অজ্ঞাতসারেই তার যুক্তির ধারা অনভিপ্রেত পথে চলিল। সে বলিল: জি হাঁ, বাপজান। পুরাতন নেসাবে জ্ঞান লাভ হয় না। জ্ঞানের বদলে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় অজ্ঞান। চোখ বুইজা কেমনে দুরুজের আলোক অস্বীকার করা যায়, মাদ্রাসায় তাই শিখানো হয়।

উপমাটা প্রিন্সিপাল সাহেবের। হামিদ ওটাকে কাজে লাগাইতে পারিয়া মনে-মনে পুলকিত হয়।

পীর সাহেব অরাক হন। পনের বছরের বালক এসব কথা শিখিল কোথায়? তিনি বিরক্তি-মাখা সুরে বলেন: এ কথা তুমি শিখছ কার কাছে?

হামিদ মনে-মনে গর্ব বোধ করিয়া বলে: কারো কাছে না বাপজান, আমি নিজের চোখে দেখি কইতেছি। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা যে জ্ঞান পায়, আমরা তা পাই না। ওদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভূগোল খণ্ডেল পড়ান হয়, আমাদের তা পড়ান হয় না।

পীর সাহেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন: ও, এই কথা? তাই কও। স্কুল-কলেজ ও মকতব-মাদ্রাসায় দুই রকম শিক্ষা ত হৈবই। স্কুল কলেজে শুধু দুনিয়াবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মাদ্রাসায় শিখানো হয় ধর্ম-ঈমানের কথা, আখেরাতের কথা। স্কুল-কলেজে পড়ে মানুষ চাকরিবাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চুরামি-খাউরামি কৈরা টাকা রোজগারের জন্য। খোদার ফজলে, তোমার ত চাকরি-বাকরি কৈরা টাকা রোজগারের দরকার নাই। তুমি যাবা কেন ও-সব নাসারায়ী বিদ্যা শিখতে?

একটু দম নিয়া মদু হাসিয়া পীর সাহেব বলিয়া চলিলেন: তুমি পীর ছেলে। সত্তুর লাখ মুরিদের হৈবা তুমি পীর। ধর্ম-পথে থাইকা হকহালালী উপায় তুমি রুজি করবা বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাদ্রাসা পাশ কৈরা মওলানা তেওরক হৈতেই হৈব। আমি মাদ্রাসা পাশ করি নাই বৈলা অনেকবার আমাকে বেকায়দায় পড়তে হৈছে। আমি দোওয়া করি, তেমন বেকায়দায় যেন তুমি না পড়।

পীর সাহেব এত কথা বলিলেন এই আশায় যে পীরটা এইখানেই মিটিয়া গেল। এর পরে হামিদের আর কোনও কথা থাকিতে পারে না। কিন্তু হামিদের কথায় তিনি চমকিয়া উঠেন। হামিদ বলে: আমি পীরগিরি করব না বাপজান।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই হামিদ বুঝিল, এতদূর যাইবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না। কিন্তু আর উপায়ও নাই। ফিরিবার পথও নাই। স্বাভাবিক জিদ তার ঘাড়ে চাপিল। মনকে আশ্বাস দিল, ঠিক আছে।

পীর সাহেব কিন্তু ছেলের কথাটা বিশ্বাস করেন না। তবু শুধু বেকায়দায় ফেলিয়া ছেলেকে তর্কে হারাইবার মতলবে বলেন: পীরগিরি করবা না? তবে খাবা কি কৈরা?

হামিদ দৃঢ়স্বরে বলে: আল্লা রিযিকের মালিক। তানি এক সুরতে আমার রিযিক দিবেনই।

যে চিরন্তন মহাসত্য পীর সাহেব-কেবলা নিজের মুখে হাজার মহফিলে লক্ষ লোকের কাছে প্রচার করিয়াছেন, সে সত্যই আজ নিজের ফরযন্দের মুখে শুনিয়া তিনি চটিয়া যান। বিরক্তি ও বিদ্রূপ মাখা সুরে বলেন: আল্লা রিযিকের মালিক সত্য, কিন্তু তোমার চেষ্টা করতে হৈব ত?

হামিদ: জি হাঁ, সে চেষ্টাই আমি করতে চাই। যে শিক্ষায় আমি নিজের মেহনতে হালাল রোজগার করতে পারব, সেই শিক্ষাই আমি পাবার চাই।

হামিদের কথার মধ্যে তিনি বাঁকা বিদূপের সুর শুনিতে পান। রাগে বলেন: পীরগিরির রোজগার হালাল না, তুমি কৈতে চাও?

পীরগিরি সম্পর্কে প্রিন্সিপাল সাহেবের-কওয়া কথাটা হামিদের ঠোঁটের আগায় আসিয়া পড়িয়াছিল। মোটরের ব্রেক চাপার মতো ক্ষিপ্ততার সংগে সেটা চাপিয়া হামিদ বলে: পীরগিরির রোজগার হালাল কি হারাম আমি কিছুই কইতে চাই না।

পুত্রের সুরের দৃঢ়তায় পীর সাহেব নরম হন। বলেন: তবে কেন তুমি পীরগিরি করবা না।

হামিদ নিরুদ্বেগে জবাব দিল: আমি পীরগিরির যোগ্য নই বৈলা।

পীর সাহেব: এখন যোগ্য নও ঠিকই। কিন্তু বয়স হৈলে আর এলেম হাসেল করলে নিশ্চয়ই যোগ্য হবা। তার লাগিই ত কইতেছি তুমি মাদ্রাসা শেষ কর। টাইটেল পাশ কর।

পীরগিরির বিরুদ্ধে প্রিন্সিপাল সাহেবের-দেওয়া আসল যুক্তিটার উল্লেখ করা হামিদের ইচ্ছা ছিল না। কারণ তাতে বাপজান মনে ব্যথা পাইবেন। তাছাড়া নানাজীর কথাটাও তার মনে পড়ে। সেটাও বলা যায় না। কিন্তু তিনি এখন যে কথা বলিলেন তার জবাবে হামিদ আসল কথা বলিতে বাধ্য। সেই আসল কথাটাই ভদ্রভাবে বলার উদ্দেশ্যে হামিদ বলে: 'হাজার টাইটেল পাশ করলেও আমি পীরগিরির যোগ্য হব না বাপজান। কারণ পীরগিরিতে আমি বিশ্বাস করি না। ওটাকে আমি নাজায়েজ কাজ মনে করি।'

পীর সাহেব ক্ষেপিয়া যান। উত্তেজনায় লম্বা হইয়া তিনি বলেন: 'কি কইলা? পীরগিরি না-জায়েজ?'

হামিদেরও জিদ চাপিয়াছে। সে সমান জোরে বলে: 'জি-হাঁ। শুধু নাজায়েজ না শিরকও। আপনে জানেন বাপজান, কোরআন-পাঠক এটা নিষিদ্ধ।'

পীর সাহেব অতি কষ্টে নিজেকে দমন করিলেন। একটু নরম হইয়া বলিলেন: 'আমারে কোরআন শিখাবার চাও আজই?'

বাপের গলায় ব্যথার রেশ পাইয়া হামিদ ব্যথিত হইল। নরম সুরে বলিল: 'শিখাবার কথা না বাপজান। আল্লার কালাম মনে করাইয়া দেওয়ার মধ্যে ছোট-বড় নাই। সবারই এটা কর্তব্য।'

পীর সাহেব আবার শক্ত হইয়া ঘাড় সোজা করিলেন। বলিলেন: 'তার মানে আমি নাজায়েজ কাজ করি, এটা আমার মনে করাইয়া দেওয়াকে তোমার কর্তব্য মনে কর বুঝি?'

হামিদ জবাব দেয় না। চুপ করিয়া থাকে। পীর সাহেবের রাগ তাতে বাড়ে। তিনি বলেন: 'তার মানে তুমি কইতে চাও, আমি নাজায়েজ রাস্তায় হারাম রোজগার করি? আমি হারামখোর?'

এতদূর যাইবার ইচ্ছা হামিদের ছিল না। বস্তুত এই কথাটাই সে ঠোঁটের আগায় দাঁত কামড়াইয়া এতক্ষণ চাপিয়া রাখিয়াছিল। বাপের মুখ হইতেই কথাটা বাহির হওয়ায় সে আর চাপিতে পারিল না। নিজের অজ্ঞাতেই বাহির হইয়া পড়িল: 'জি হাঁ। কোরআন মানলে তা বলতেই হয়।'

পীর সাহেব জীবনে যা করেন নাই, তাই করিলেন। ‘তবে রে হারামজাদা, শুয়রের বাচ্চা! যত বড় মুখ না, তত বড় কথা?’ বলিয়া ছেলেকে গাল দিলেন। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভাংগিয়া গেল। তিনি উত্তেজনা লাফাইয়া খাট হইতে নামিয়া আসিলেন। হামিদ বুঝিল, বাবা তাকে মারিবার জন্যই নামিয়া আসিলেন। কিন্তু এ ধরনের অবস্থায় পাথর হইয়া যাওয়া হামিদের ছোট বেলার অভ্যাস। আজও সে তাই হইল। একচুল না সরিয়া পাথরের মূর্তির মতো সে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল।

পীর সাহেব কিন্তু হামিদের উপর হাত তুলিলেন না। নিজের ছেলে ত দূরের কথা চাকর-বাকর বা গরু-ছাগলের উপর হাত তোলার অভ্যাসও পীর সাহেবের নাই। আজও তিনি তা পারিলেন না। পারিলেই ভাল হইত। না পারিয়া তাঁর মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত জ্বালা করিয়া উঠিল। তিনি গলার জোরে চিল্লাইয়া বলিলেন: আমি হারামখোর! আমার রুজি-রোজগার হারাম। তোমার মতো ঈমানদার হালালখোরের এ হারাম খাওয়া উচিত না। তুমি এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থনে বার হইয়া যাও। এখানে আর এক দানা যদি মুখে দেও, তবে তুমি আমার। পীর সাহেবের শরায়ত কথাটা শেষ করিতে দিল না। তিনি ঠোট কামড়াইয়া ডান হাতটা দরজার দিকে বাড়াইয়া বলিলেন: যাও কইলাম। দূর হও সামনে থনে। এ মুহূর্তে আমার বাড়ি ছাড়।

হামিদ একটি কথাও না বলিয়া ধীরে-ধীরে বাপের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পীর সাহেব কটমট করিয়া ছেলের দিকে চাহিয়াছিলেন। ছেলে সত্যসত্যই নীরবে চৌকাঠ পার হইতেছে দেখিয়া তিনি আবার চিল্লাইয়া বলিলেন: আজ থনে তোমার লেখা-পড়ার লাগি আমি এক কানা-কড়িও খরচ করব না। বুঝেন ত?’

হামিদ ফিরিয়াও চাহিল না। জবাবও দিল না। বাপের ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরে গেল।

পীর সাহেবের রাগের গলা শুনিয়া বিবি সাহেব ও চাকরানীরাও পীর সাহেবের ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। তাদের চোখের সামনে দিয়াই হামিদ বাহির হইয়া গেল। বিবি সাহেবরা ‘কি হৈছে’, ‘রাগ করলেন কেন’ বলিতে-বলিতে পীর সাহেবের ঘরে ঢুকিলেন। পীর সাহেবের ভাব-সাব দেখিয়া তাঁরা কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। হামিদের মুখে ব্যাপারটা শুনিবার আশায় তাঁরা যখন হামিদের ঘরের দিকে রওয়ানা হইলেন, তখন হামিদ খালি হাতে জুতা খটখট করিতে করিতে বাহির হইয়া যাইতেছে। তাঁরা দৌড়াইয়াও হামিদের নাগাল পাইলেন না। ডাকিয়াও তাকে ফিরাইতে পারিলেন না। হামিদ বাড়ির বাহির হইয়া গেল। বিবি সাহেবরা বাড়ির বাহিরে যাইতে পারেন না।

তখন সুরুজ ডুবো-ডুবো। সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নাই।

৩

অনেক দূর আসিবার পর হামিদের মনে হইল সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এমন সময়ে একা কোনও দিন সে পথে বাহির হয় নাই। পায় হাটিয়া এত রাস্তাও সে কোনও দিন চলে নাই। এতক্ষণে তার মনে দুশ্চিন্তা আসিল। সন্ধ্যার মুখে রাগ করিয়া বাড়ি ছাড়া

ঠিক হয় নাই। না ছাড়িয়া উপায়ও ত ছিল না। বাপজানের ঐ কথার পরে বাহির হইয়া না আসিলে সে নিজের কাছেই যে অতি ছোট হইয়া যাইত। সে তবে ঠিকই করিয়াছে।

কিন্তু যাইতেছে সে কোথায়? খি-ছু ঠিক নাই। তার এ যাত্রা উদ্দেশ্যহীন। যাওয়ার জায়গা ঠিক না থাকিলেও সে যে পথে চলিতেছে, সেটা তার অচেনা পথ নয়। সে চার দিকে ডাইনে বাঁয়ে চাহিয়া দেখিল। এ পথে হাঁটিয়া কোনও দিন না গেলেও গরু-ঘোড়ার গাড়িতে সে এ পথে অনেকবার গিয়াছে। এটা জিলা বোর্ডের রাস্তা। এরই একটা ছোট শাখা ফতেপুর গিয়াছে। হামিদ ইচ্ছা করিয়া এ রাস্তায় আসে নাই। কে যেন তার অজ্ঞাতেই তাকে এ রাস্তায় টানিয়া আনিয়াছে। কিম্বা বরাবরের অভ্যাস বশেই সে এ রাস্তায় চলিতেছে। এ রাস্তায় পায় হাঁটিয়া চলার অভ্যাস থাকিলে সে তাই মনে করিত। কিন্তু গাড়িতে চড়িয়া কোনও রাস্তা দিয়া যাতায়াতের অভ্যাস থাকিলে তাই পায় হাঁটার অভ্যাসে পরিণত হইতে পারে, এটা হামিদ বিশ্বাস করিল না। এই জন্যই তার মনে হইল কোনও অজ্ঞাত শক্তি তার হাত ধরিয়া টানিয়া এ পথে আনিয়াছে। কারণ কোন পথে চলিতেছে এতক্ষণ তার সে জ্ঞানই ছিল না। এ পথ জামালপুর রেল স্টেশনে যাইবার পথ। এই পথেই রেল স্টেশন হইয়া সে সিরাজগঞ্জে যায়। আজ কেন সে রেল স্টেশনের দিকে যাইতেছে। তাঁর ইচ্ছা কি? সিরাজগঞ্জে যাইবার? কেন সেখানে যাইবে? সে ত আর পড়াশোনা করিতে পারিবে না বাপজান কত কথার স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন।

তবু সে থামে না। পথ চলিতেই থাকে। শুধু নজর রাখে জামালপুরের সামনে না পড়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে আশঙ্কা খুব কম ছিল। একরকম নির্জন রাস্তায় সে বিনা বাধায় চলিতে থাকে। পথ চলিতে চলিতে নানা কথা তার মনে তোলপাড় হইতে থাকে।

বিপদ কাকে বলে হামিদ তা জানে না। জীবনে কোন বিপদে সে পড়ে নাই। বিপদ ত দূরের কথা, জীবনে কষ্ট বা অভাব কি, তাও সে জানে না। আজ তার মনে হইল, সে সত্যই বিপদে পড়িয়াছে। বিপদ ছাড়া আর কি? কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, কি খাইবে আজ কিছুরই ঠিক নাই। এতদিন, আজ বিকাল পর্যন্ত তার সবই ছিল। কত কথা তার মনে পড়িল। শৈশবের কথা, বাপ-মার স্নেহ-ভালবাসার কথা, বাড়ি-ঘর দালান কোঠা খাট-পালং বিছানা পত্রের কথা, লোক-জনের ভক্তি শ্রদ্ধা ও আদর-যত্নের কথা, সুখ-স্বাস্থ্যবৃদ্ধির কথা, একে-একে সব তার মনে জাগিল। আজ সেসব কোথায়? তার সে সব নাই। এটাই নিশ্চয় বিপদ। এ বিপদে সে কেন পড়িল? কে তাকে এ বিপদে ফেলিল? বাপজান? তাঁর দোষটা কি? হামিদ চিন্তা করিয়া দেখিল বাপজান এ অবস্থার সৃষ্টি করেন নাই, সে নিজেই করিয়াছে। পুরাতন নেসাব ছাড়িয়া নতুন নেসাবে আসার কথা সেই তুলিয়াছে। ও-শিক্ষাকে কুশিক্ষা জ্ঞানলাভের বদলে অ-জ্ঞান লাভের কথা সেই বলিয়াছে। পীরগিরিকে না জায়েজ কাজ বলিয়া সেই গাল দিয়াছে। না, বাপজানের কোনও দোষ নাই। সব দোষ তার নিজের। এ কথা স্বীকার করিয়া হামিদ কি অনুশোচনা করিতেছে? সে অন্যায় করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেছে? না, নিশ্চয়ই না। সে যা বলিয়াছে সত্যই বলিয়াছে। যা করিয়াছে ঠিকই করিয়াছে। ঠিক করিয়াছে? কেমন করিয়া এ কথা সে বলিতে পারে? সে বাপের আদেশ অমান্য করিয়াছে। যে বাপ তাকে এত ভালবাসেন, তার জন্য যে বাপ এত করেন, যে বাপকে হামিদ এত

ভালবাসে, এত ভক্তি করে, সেই বাপের আদেশ অমান্য করিয়াছে। বাপ-মার অবাধ্য হওয়াকে হামিদ বরাবর ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছে, বেআদবি বেতমিযি মনে করিয়াছে, গোনার কাজ বলিয়াছে। আর সে নিজেই আজ অত বড় স্নেহময় শ্রদ্ধেয় পূজনীয় বাপকে অমান্য করিয়াছে! অথচ হামিদ বলিতেছে, সে ঠিক কাজ করিয়াছে!

হামিদের মনে হইল নূহ নবীর পুত্র আন তার বাপের হুকুম অমান্য করিয়াছিল। আর আজরের পুত্র ইব্রাহিম নবীও তাঁর বাপের আদেশের খেলাপ কাজ করিয়াছিলেন। আন তার বাপের কথামতো কিস্তিতে উঠে নাই। সে ডুবিয়া মরিয়াছিল। ইব্রাহিম তাঁর বাপের নিষেধ অমান্য করিয়া মূর্তি ভাংগিয়াছিলেন। তিনি পয়গম্বর হইয়াছিলেন। কাজেই বাপের হুকুম অমান্য করিলেই অন্যায় হয় না। কাজটা অন্যায় হওয়া চাই। হামিদের কাজটা অন্যায় হয় নাই। কথাটা চিন্তা করিয়াই হামিদ শিহরিয়া উঠিল। সে শুধু নিজেকে ইব্রাহিম নবির সংগে তুলনা করিতেছে না। নিজের বাপকে আজরের মতো মুশরেকের সংগে তুলনা করিতেছে। বাপকে সে এখনও ভালবাসে, ভক্তি করে। উত্তেজনাবশে পীরগিরিকে সে শিরক বলিয়াছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া বাপকে সে মুশরেক মনে করে না। মিসালটা তার মনে বড়ই অস্বস্তি দিতে লাগিল এই শ্বাসরোধকারী অস্বস্তি হইতে বাঁচিবার জন্য তার মন মোড় ফিরাইল। ফতেপুরের বালাখানা হইতে অকস্মাৎ রাস্তার ধুলায় নামিয়া আসার ব্যাপারটা হযরত আদমের বেহেশত হইতে দুনিয়ায় পতনের অবস্থার শামিল বলিয়া তার মনে হইল। এই মিসালটা তার মনের মতো হইল। এখানে বাপকে বা নিজেকে কাউকে ছোট করিতে হইল না। অথচ অবস্থাটা ঠিক সেই রূপ। আদম তাঁর মুরুব্বির আদেশ অমান্য করিয়া প্রায় বেহেশতের মতো আরাম আয়েশ হইতে আশ্রয়হীনের দুঃস্থায় পতিত হইয়াছে। বেহেশতের সে অফুরন্ত আরাম-আনন্দ সুখ-শান্তি মিষ্টি স্বপ্ন মেলিয়া শরাবন-তহুরা ফেলিয়া গন্দম খাইবার লোভে আদম আল্লার নিষেধ অমান্য করিলেন কেন? হামিদ কোন্ বই-এ পড়িয়াছে, অথবা কোন্ মোদাররোদে মুখে শুনিয়াছে, খৃষ্টানদের মতে গন্দমটা আসলে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল। তাদের মতে নাকি খোদা আদমকে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইতে মানা করিয়াছিলেন। হামিদ যতই চিন্তা করে, গল্পটা ততই বিস্তারিতভাবে তার মনে পড়ে। গল্পে এও বলা হইয়াছে: ‘আল্লাহ্‌তাল্লা আদমকে ইঁশিয়ার করিয়া দিয়াছিলেন, জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইলে অর্থাৎ জ্ঞান-লাভ করিলে আদম সমস্ত সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। তার কপালে দুঃখ-কষ্ট দেখা দিবে। গল্পে আরও বলা হইয়াছে, আদম আল্লার নির্দেশ মানেন নাই। আদম ঠিক করেন, যতই দুঃখ-কষ্ট হউক, তিনি জ্ঞানলাভ করিবেনই। কারণ অজ্ঞানের সুখ-শান্তি তাঁর পছন্দ হয় না। তাই আল্লার নির্দেশ অমান্য করিয়া তিনি জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খান। তাঁর জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া যায়। তিনি বেহেশত হইতে দুনিয়ায় পড়িয়া যান, অর্থাৎ সুখ-শান্তি হইতে দুঃখ-কষ্টে পতিত হন।

আজই প্রথম হামিদের কাছে গল্পটা পছন্দ হইল। তার মনে হইল বেহেশত হইতে আদমের পতনের চেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা আর হইতে পারে না। এটা যে নাসারাদের গল্প, তা হামিদের মনে হইল না। তার মনে হইল, ঠিক এই ধরনের কথা যেন সে কোনও তফসিরের কিতাবেও পড়িয়াছে। ঠিক কোন্ কিতাবে পড়িয়াছে, তা অবশ্য তার মনে পড়িল না। কিন্তু তার বিশ্বাস হইল, এইটাই সত্য ঘটনা। এটা তার কাছে এত সত্য মনে হইল যে সে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিল: আল্লার আরশের সামনে আদম

দাঁড়াইয়া আছেন। আরশ হইতে নেদা আসিল: হে আদম তুমি যদি বেহেশতের এই অফুরন্ত সুখ-শান্তি অনন্তকাল ভোগ করিতে চাও তবে ঐ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইও না। ঐ গাছের ধারে-কাছে যাইও না। যদি যাও, তবে ঐ গাছের ফল খাইবার ইচ্ছা হইবে; যদি ঐ গাছের ফল খাও, তবে তোমার জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া যাইবে। যদি তোমার জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া যায়, তবে তোমার সুখ-শান্তি দূর হইবে। তুমি সুখ-শান্তির বেহেশতে থাকিতে পারিবে না। দুঃখ-কষ্টের দুনিয়ায় তুমি পড়িয়া যাইবে। দুনিয়ায় গিয়া তোমাকে ক্লেশ-যন্ত্রণা পোহাইতে হইবে। মেহনত করিয়া খাইতে হইবে। বিনা-পরিশ্রমে বেহেশতে যে-সব মেওয়া-মধু খাইতেছ এই সব হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে।'

হামিদ স্পষ্ট দেখিল: আল্লাহ এই উপদেশ শুনিয়া আদম হাত জোড় করিয়া বলিলেন: 'হে মেহেরবান খোদাবন্দ করিম, আমি অজ্ঞানের সুখ শান্তি চাই না; আমি জ্ঞানের দুঃখ কষ্ট চাই। বেহেশতে শুইয়া-বসিয়া বিনা-মেহনতের মেওয়া-মধু খাইয়া আমি আসল সুখ-শান্তি পাইব না-যদি আমার জ্ঞান লাভ না হয়। জ্ঞান লাভের মূল্য স্বরূপ যদি আমাকে এই সব সুখ-শান্তি মেওয়া-শরবৎ সব বিসর্জন দিতে হয়, আমি তাতেও রাজি। অতএব হে রহমানুরহিম আল্লাহ, আমি তোমার উপদেশ অমান্য করিব। তুমি আমাকে মাফ কর।'

এরপর হামিদ দেখিল, আদম-হাওয়া জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইলেন। তাঁদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেল। তাঁরা দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত হইলেন। যাঁরা এক মুহূর্ত আদম-হাওয়া বেহেশতের সুখ-শান্তি ও মেওয়া-শরবতের আরামে দিন গুয়রান করিতেছিলেন, তাঁরাই পরের মুহূর্তে দুনিয়ায় ধূলা-মাটিতে পড়িয়া এক মুঠা অন্তের কষ্ট কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

হামিদের আজকার অবস্থার সাথে একদম মিলিয়া গিয়াছে। হামিদের বাবা হামিদকে যে উপদেশ ও শাস্তি দিয়াছেন, সেটা তার দিক হইতে ঠিক। কাজেই তিনি কোনও অন্যায় করেন নাই। হামিদ বাপের আদেশ খেলাফে যা করিয়াছে, তার দিক হইতে সেটাও ঠিক। কাজেই সেও কোন অন্যায় করে নাই। খোদা-আদমের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। কারও কোনও অন্যায় হয় নাই। হামিদ দেখিল, ওখানে খোদাকে ছোট না করিয়াও আদম বড় হইয়াছেন, এখানেও তেমনি বাপকে ছোট না করিয়াও হামিদ বড় হইতে পারে। নিজের তারিফও সে করিতে পারে। আদম যেমন সেদিন জ্ঞানের খাতিরে সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়াছিলেন, হামিদ আজ তেমনি জ্ঞানের জন্য সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়াছিলেন, হামিদ আজ তেমনি জ্ঞানের জন্য সুখ শান্তি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করিল। মানুষের আদি-পিতা আদমের মতো জ্ঞানবান পয়গম্বরের সাথে নিজের কাজের মিল দেখিয়া গর্ববোধ করিল। জ্ঞান লাভের জন্য তা হইলে মুরুব্বির আদেশও অমান্য করা যায়। সেটা তবে অন্যায় নয়! বাপের আদেশ অমান্য করিয়া অন্যায় করিয়াছে বলিয়া তার মনে এতক্ষণ যে একটা অনুশোচনার ভাবের উদয় হইয়াছিল, এক মুহূর্তে তা মিলাইয়া গেল। তার চিন্তা দূর হইল। বুকটা হাল্কা হইল। মনে উৎসাহ পাইল। শরীরের বল ফিলিয়া আসিল। গতি-বেগ বাড়িল। গুণ্ণু করিয়া গল গাইতে-গাইতে সে পথ চলিল।

স্টেশনে আসিয়া গুলিল, গাড়ি আসার এখানো দুই ঘন্টা বাকি। অন্যদিন হইলে এ সংবাদে সে দুঃখিত হইত। আজ সুখিত হইল। যাক, চিন্তা করার সময় পাওয়া গেল। দুই ঘন্টা পরে দুইদিক হইতে দুইটা ট্রেন আসিয়া এখানে ক্রস করিবে। একটা

সিরাজগঞ্জ যাইবে। আরেকটা মোমেনশাহী হইয়া ঢাকা যাইবে। সে কোন্টায় উঠিবে? না মোটে উঠিবেই না? চিন্তা করিয়া দেখিবার সে যথেষ্ট অবসর পাইল। আসিয়াই সে যদি শুনিত গাড়ি আসিতেছে, কি বিপদেই না পড়িত তবে!

সে একটি হেলানিয়া বেঞ্চে বসিল গা ছড়াইয়া দিয়া। স্টেশন প্রায় জন-শূন্য। চাপানের দোকানগুলিতে দু-চার জন গল্প করিতেছিল। রেল-কর্মচারীদের দুই-এক জন তাঁদের কাজ নিয়া ব্যস্ত ছিলেন। হামিদ নিরাপদ একাকিত্বে নিজের আশু কর্তব্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কোন্ ট্রেনে সে উঠিবে? সিরাজগঞ্জে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। সে পকেট হাতড়াইয়া পয়সা বাহির করিল। গনিয়া দেখিল। মোমিনশাহী শহরে তার বড় দুলাভাই থাকেন। সেখানে সে যাইতে পারে। সেখানে যাওয়ার মতো ভাড়ার পয়সা তার আছে। কিন্তু সেখানে গিয়াই বা সে কি করিবে? বড়-বু ও দুলাভাইকে কি বলিবে? বড় বু-কে হামিদ ভয় করিয়া চলে। তিনি বয়সে হামিদের অনেক বড়। এক রকম মার বয়েসী। তিনি হামিদকে খুবই ভালবাসেন সত্য, কিন্তু বড় কড়া-গম্ভীর মেয়ে। তাঁর সংগে বা সামনে ঠাট্টা-ফাযলামি করা চলে না। তাঁর সাথে চালাকি করা যায় না। তিনি বড় বুদ্ধিমতী। তাঁকেই হামিদের ভয়। কি কৈফিয়ৎ তাঁকে দিবে হামিদ? অথচ মিথ্যা বলিলেও তিনি চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিবেন। তবে দুলাভাই বড় ভাল-মানুষ। হামিদকে তিনি খুব আদর করেন। হামিদ যা চায়, তাই তিনি দেন। হামিদ তাঁর কাছে কত আবদার করিয়াছে। তাঁর কোলে-কাঁধে কত উঠিয়াছে! কতবার তাঁর কান মলিয়া দিয়াছে। কোনও দিন তিনি হামিদের উপর অশ্রুপূর্ণ হন নাই। হামিদকে ধমক দেন নাই। ঐর কাছে হামিদ সব বলিতে পারে। কিন্তু বড়-বু? এ অবস্থায় তাঁর সামনে যাইতে হামিদের সাহস হইতেছে না। না, হামিদের মোমেনশাহী যাওয়া হইবে না। তবে আর কোথায়? অন্যান্য দুলাভাইদেরও অস্বাভাবিক-স্বজনের বাড়ি ভিন্ন জিলায়। বহুদূরে। সে সব জায়গায় যাওয়ার ভাড়াও তার কাছে নাই। তবে কি হামিদ বিনা-টিকিটে ঐ সব গাড়িতেই চাপিয়া বসিবে? এ কাজটা হামিদের পছন্দ হইল না। ধরা পড়িলে বড়ই কেলেংকারি হইবে। আর ধরা ত পড়িতেই হইবে। সে ত লুকাইয়া থাকিবে না। ধরা পড়িলে সত্য কথাই সে বলিবে। তার পরিচয়ও প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তার বাপ দেশ-বিখ্যাত মশ্হুর লোক। লোকজনেরা জানিবে, খবরের কাগজে বাহির হইবে, ফতেপুরের পীরজাদা বিনা-টিকিটে ভ্রমন করিতে গিয়া হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে। তারপর টিকিট ছাড়াই না হয় সে গেল কোথায়ও কিন্তু সে খাইবে কি?

এতক্ষণে সে বুঝিল আদর্শ ও বাস্তব জীবনের পার্থক্য কত! টাকা-পয়সা যে অত দরকারী জিনিস, খাওয়াটা যে অমনি-অমনি আসে না, কথাটা সে আজই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিল। বাপজান তাকে এসব চিন্তা ও অভাবের উর্ধ্বে কোথায় রাখিয়াছিলেন, তারও পরিমাণ-জ্ঞান আজই তার হইল। সে বুঝিল, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তার মত যতই ঠিক হউক, সেই মতের খাতিরে এমন অন্ধকারে ঝাপ দেওয়া তার কি ঠিক হইয়াছে? তবে কি বাড়ি ফিরিয়া যাইবে? বাপজানের কাছে মাফ চাইবে? বাড়ির চিত্র তার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। আশ্চর্য কাঁদিয়া-কাঁদিয়া চোখের পানিতে শাড়ির

আঁচল ভিজাইতেছেন। বাপজান চারদিকে লোক পাঠাইয়া পরম আগ্রহে তার ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতেছেন; উত্তেজনায় দালানের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। হামিদ ফিরিবামাত্র বাপজান তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আখারা আনন্দের চোটে আবার এক পশলা কাঁদিয়া লইলেন।

সবই ঠিক। কিন্তু যাইবে কি সে ফিরিয়া? মাফ চাইবে বাপের কাছে? স্বীকার করিবে সে অন্যায় করিয়াছে? আর মুখেই বা স্বীকার করিতে হইবে কেন? ফিরিয়া যাওয়াটাই ত যথেষ্ট অপরাধ স্বীকার!

আবার দাদা-আদমের কথা তার মনে পড়িল। তিনি কি চিন্তা করিলে বেহেশতে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন না? তিনি মাফ চাহিয়া বেহেশতে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে আল্লাহ কি তাঁর দোওয়া কবুল করিতেন না? নিশ্চয় করিতেন। আল্লাহ ত রহমান রহিম। তবু দাদা আদম বেহেশতে ফিরিয়া যাইতে চান নাই। তিনি দুনিয়ার কঠোর মেহনত ও দুঃখ-কষ্টের দামে জ্ঞান কিনাই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন। তবে হামিদ তা করিবে না কেন? হামিদ কি দাদা আদমের চেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছে? নিশ্চয়ই না। দাদা আদম যখন দুনিয়ায় আসেন, তখন এখানে তাঁর কোনও সহায়-সম্মল বা আত্মীয়-স্বজন ছিল না। খাইবার খোরাক, পরিবার পোশাক ছিল না। সহায়-সম্মলহীন অবস্থায় সবই তাঁকে নুতন করিয়া নিজ হাতে তৈয়ার করিতে হইয়াছিল। সে স্পষ্টই দেখিল দাদা-আদমের অবস্থা হামিদের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ ছিল। তবু তিনি বেহেশতে ফিরিয়া যান নাই। অথচ হামিদের অপরাধ দাদা আদমের অপরাধের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। দাদা আদম শুধু আল্লার আদেশই অমান্য করিয়াছিলেন, তাঁকে কোনও শক্ত কথা বলেন নাই। হামিদ শুধু তার বাবার আদেশই অমান্য করে নাই, পীরগিরি না জায়েজ, তাঁর রোজগার হারাম, ইত্যাদি গাল-মন্দ পাড়িয়া পিতার অপমানও করিয়াছে। সে জন্য হামিদের শাস্তি অনেক বেশি গুরুতর হওয়া উচিত। তবু সে এইটুকু বিপদেই কাপুরুষের মতো এলাইয়া পড়িয়াছে। বাপের নিকট মাফ চাহিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবার কথা চিন্তা করিতেছে। ছি-ছি! হামিদ এত দুর্বল! এই দুর্বল মন লইয়া সে আদর্শের বড়াই করিতেছিল? না। কিছুতেই না। সে দুঃখ-কষ্টের ভয়ে ভীত হইবে না। মাফ চাহিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে না। বিপদের সংগে সে লড়াই করিবে। কিন্তু কিভাবে লড়াই করিবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। চিন্তার জন্য সময় দরকার। সে সময় নাই। ট্রেন আসার ঘন্টা পড়িয়া গিয়াছে। রাত অনেক হইয়াছে। ট্রেন আসিলে সে মোমিনশাহীর গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

৪

উকিল আফতাবুদ্দিন সাহেব মক্কেল লইয়া বৈঠকখানায় দরবার করিতেছিলেন। এত রাতে হামিদকে একা আসিতে দেখিয়া অবাক হইলেন। কিন্তু মক্কেলদের সামনে ভাবান্তর প্রকাশ করিলেন না। হামিদ দুলাভাই-এর কদম-বুসি করিল। দুলাভাই হাসিলেন। প্রাথমিক হাল পুরসি করিয়া হামিদকে অন্তরে যাইতে বলিয়া পুনরায় মক্কেলদের দিকে মন দিলেন।

কিন্তু অন্দর মহলে হামিদ এত সহজে মুক্তি পাইল না। তখন রান্নাবান্না হইয়া গিয়াছে। ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাদের কেউ-কেউ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেউ-কেউ পড়াশোনা করিতেছে। বড়-বু শাহেদা তখন স্বামীর আসার অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামী অন্দরে আসিলেই খাওয়া হইবে। উকিলের বিবি। এমন প্রায়ই হইয়া থাকে। এই সময়টা শাহেদা সাধারণতঃ সিলাই ও বুনানির কাজ লইয়া কাটাইতেন। আজো তাই করিতেছিলেন হামিদকে দেখিয়া তিনি খুশিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। 'কেমন আছ?' 'কখন আসলা?' 'কই থনে আসলা?' 'বাড়ি গেছিলা, না সোজা সিরাজগঞ্জ থনে আসলা?' ইত্যাদি একটার পর আরেকটা প্রশ্ন করিয়া চলিলেন। হামিদ শুধু প্রথম প্রশ্নের জবাবে 'ভালই আছি' বলিতে-বলিতে বড়-বু-কে কদম-বুসি করিল।

মার গলার আওয়াজে পাঠ-রত ভাগিনা-ভাগিনীরা বুঝিতে পারিল মামু আসিয়াছেন। সকলে একযোগে পড়াশোনা ফেলিয়া মামুকে দেখিতে আসিল। এরা কেউ হামিদের সম-বয়সী কেউ ছোট। শাহেদার সন্তান পাঁচটি। বড় সন্তান ছেলে। বয়সে হামিদের বড়। সে বি.এ. পাশ করিয়া ঢাকায় পড়ে। বাকি চারটির মধ্যে প্রথম তিনটি বিভিন্ন ক্লাসে স্কুলে পড়ে। আর ছোটটি মাত্র দু বছরের। সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যারা পড়িতেছিল, তারা সবাই হৈ-হল্লা করিয়া মামুর সাথে দেখা করিতে আসিল। কিন্তু শাহেদা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাদের বিদায় করিয়া হামিদকে লইয়া বসিবে। অতি অল্পক্ষণেই তার হাতে হামিদ ধরা পড়িয়া গেল। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য হামিদ বড়-বুবুর কাছে পুরাতন ও নতুন নেসাবের তুলনা-মূলক বিবরণ দিল। শেষ পর্যন্ত দাদা আদমের নজির দিয়া খুব বাগিতার সংগে নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থন করিল। বড়-বু অত-শত বুঝিলেন না। তিনি লেখা-পড়া করিয়াছেন সমস্তই। কিন্তু পঁচিশ বছর উকিলের ঘর করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তিনি সবই বুঝিলেন। তিনি বাপ-ভাই দু-জনেরই প্রকৃতি জানেন। দুই জনের একজনও ভাগিবেন তবু মচকাইবেন না। তিনি খুবই ঘাবড়াইয়া গেলেন। দৃষ্টিভ্রান্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি হামিদকে হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইতে গোসলখানায় পাঠাইলেন। স্বামীকে ডাকিতে চাকর পাঠাইলেন। হামিদ যখন গোসলখানা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখনও স্বামী ফিরেন নাই। শাহেদা সময় নিবার মতলবে বলিলেন: তোমার দুলাভাই আসতে-আসতে তুমি ঝটপট এশার নমাজটা পইড়া ফেল। তিনি এখুনি আসতেছেন।

হামিদ শুধু এশা নয়, আজ আসর-মগরেবও পড়ে নাই। সে ইদানিং নমাজে খুব ঢিলা হইয়া গিয়াছিল। তবু এক নাগড়ে এত ওয়াক্ত নমাজ কোন দিনই কায়া করে নাই। যেন হঠাৎ তার মনটা এখন নমাজের দিকে রুজু হইল। বড়-বু শুধু এশার কথা বলিলেন বটে, কিন্তু হামিদ ঠিক করিল এই সংগে কায়া নমাজটাও পড়িয়া ফেলিবে। বড়-বুর দেখানো জায়নমাযটা হাতে করিয়া সে ভাগিনাদের পড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

আফতাব দ্বিতীয় বার স্ত্রীর তাগাদা পাইয়া অন্দরে আসিলেন। শাহেদা হামিদের দিকে চোখ রাখিয়া স্বামীকে সব বলিয়া দিলেন। মায় দাদা আদমের কথা পর্যন্ত। সব শুনিয়া উকিল সাহেবও ভাবনায় পড়িলেন। কি করা যায়? স্বামী-স্ত্রীতে কানা-কানি করিয়া অনেক আলাপ হইল। তাঁদের এত বিস্তারিত আলাপের পরেও যখন হামিদ নমাজ শেষ করিয়া আসিল না, তখন বড়-বু তাকে ডাকিতে গেলেন। তিনি জানিতেন

নমাজবন্দেগিতে হামিদের সুনাম। কিন্তু এক ওয়াক্ত নমাজ পড়িতে হামিদেরত এত লম্বা সময় লাগার কথা নয়!

অবশেষে তিন জনে খানার টেবিলে বসিলেন। বড়-বু স্বামীকে যেন আগে কিছুই বলেন নাই, এই ভাব দেখাইয়া হামিদের ব্যাপারটা আবার বলিলেন। এ কাজে হযরত আদমকেই সে অনুসরণ করিতেছে বলিয়া যে হামিদের ধারণা সে কথাও বড়-বু যথাসম্ভব হামিদের ভাষায়ই বলিলেন। উকিল সাহেবও দেখাইলেন, এই প্রথম তিনি হামিদের ব্যাপারটা শুনিলেন। উকিল সাহেব খুব রসিক মানুষ। মনের ভাব গোপন করিয়া তিনি হামিদের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন: এ সব কথা সত্য হামিদ?

হামিদ অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া জবাব দিল: জি হাঁ।

উকিল সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন: হযরত আদমের সংগে তোমার মেসাল চলে না।

হামিদ বিশ্বয়ে গলা লম্বা করিয়া বলিল: কেন?

উকিল: গন্দমই হোক আর জ্ঞান-বৃক্ষের ফলই হোক, হযরত আদম সেটা খাইয়াছিলেন বিবি হাওয়ার বুদ্ধিতে। আর তুমি আব্বাজানের কথা অমান্য করছ নিজের বুদ্ধিতে।

হামিদ এ দিকটার কথা চিন্তাও করে নাই। তবু সে হারিল না। তার তর্কিক স্বভাব মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। সে বিজয়ীর গর্ব লইয়া বলিল: বেশ, তা হৈলে ত আমার অপরাধ আরো বেশি গুরুতর। সে জন্য আমার শাস্তিও হওয়া উচিত আরও বেশি।

উকিল সাহেব উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন: এখানেই তোমার ভুল। আদম যখন বেহেশত ছাড়েন, তখন তার সংগিনী ছিলেন বিবি হাওয়া। আর তুমি যখন ফতেপুর ছাড়তেছ, তখন তুমি একা। কাজেই এ মেসাল চলে না। যতদিন তোমার সংগিনী হাওয়া না জুটিতেছে, ততদিন তোমার ফতেপুর ছাড়া চলবে না।

দুলাভাই তার বিবাহের ইংগিত করিয়া তার সাথে ঠাট্টা করিতেছেন মনে করিয়া হামিদ রাগ করিল। সে গর্ব-মাথা অভিমানের সুরে বলিল: আমার কোনও হাওয়া-টাওয়ার দরকার নাই। আমি একাই নিজের পথে চলব। কারো সাহায্য আমি চাই না।

উকিল সাহেব চোখে-মুখে সুরে কৃত্রিম গাম্ভীর্য আনিয়া বলিলেন: তুমি আমারে ভুল বুঝ না হামিদ। আমি ঠাট্টা করতেছি না। সত্য কথাই কইতেছি। তুমি যে জ্ঞানের সাধনা করতে চলছ, সে সাধনায় একজন সংগী অত্যাবশ্যক এবং সেটি নারী-সংগী। নারী ছাড়া নর পূর্ণ নয় একথা তোমারে বুঝাবার লাগি আমি এখন তোমার সাথে তর্ক করব না। তুমি আজ শুধু এইটুকু শুইনা রাখ যে যতদিন তোমার হাওয়া না জুটবে ততদিন তোমার জ্ঞান-সাধনা শুরু হৈব না। ততদিন তোমার অপেক্ষা করাই লাগব। আব্বাজানের কথা তুমি রাখ নাই, কিন্তু আমার কথা তোমার রাখতেই হৈব। কারণ আব্বাজান তোমার সাথে একমত ছিলেন না; তোমার কাজে তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না। আর আমি? আমি তোমার সাথে সম্পূর্ণ একমত। তোমার কাজে আমার পুরা সমর্থন আছে। আমি চাই, তুমি এ সংগ্রামে জয়লাভ কর। হামিদ যতই তর্কিক হোক,

উকিলের ঠোঁটের কাছে কিছু না। সে দুলাভাইর কাথায় ভিজিয়া গেল। বলিল: কি করতে বলেন আমারে দুলাভাই?

উকিল: পড়াশোনা চলাইয়া যাওয়া লাগব।

হামিদ: পড়াশোনা করতে আমিও চাই। কিন্তু পুরাতন নেসাবে ফিইরা যাব না। না গেলে বাপজান খরচও দিব না।

উকিল: তোমার পুরাতন নেসাবে যাওয়া লাগব না। আব্বাজানের কাছে খরচ চাওয়াও লাগব না। তোমার বড়-বু তোমার খরচ চালাব।

স্ত্রীর দিকে চাইয়া বলিলেন: কেমন, তুমি হামিদের খরচ চালাবা ত? তুমি না চালাও, আমিই চালামু।

স্বামী-স্ত্রীতে আগেই কথা হইয়াছিল। সুতরাং স্ত্রী সোৎসাহে বলিলেন: নিশ্চয় আমিই চালামু।

উকিল: দেখলে ত হামিদ? আর অযথা দেরি না কৈরা কালই সিরাজগঞ্জে ফিইরা যাও।

হামিদ একটু ভাবিয়া বলিল: কিন্তু বাপজানের চিঠি না পাইলে ত তার আমারে নতুন নেসাবে ফ্রেস্ফার করব না।

উকিল: তার লাগি তোমার চিন্তা করা লাগব না, আব্বাজানের তরফ থনে আমিই পত্র দিয়া দিমু।

হামিদ চিন্তিত হইয়া বলিল: বাপজানের তরফ থনে আপনে পত্র দিবেন? সেটা কেমন কৈরা হৈব? তাঁরা সেটা মানব কেন? কি লেখবেন আপনে?

উকিল: অতশতে তোমার দরকার কি? তোমার একটা পত্র দরকার। কর্তৃপক্ষ যাতে সেটাকে আব্বাজানের পত্র মনে করে তাই তোমার দরকার। ধর, আমি লেইখা দিমু, আমি হযরত পীর সাহেব কেবলার হুকুমে তার সামনে বইসা এই পত্র লিখতেছি।

হামিদ বিশ্বাস করিল না। বলিল: অমন ডাহা মিথ্যা কথা আপনে লেখবেন? আর আপনে লেখলেই আমি জাইনা-গুইনা সেটা নিয়া ইকুলে দাখিল করমু?

উকিল: দেখ হামিদ আমরা উকিল মানুষ। আমরা সত্য-মিথ্যা বিচার করি উদ্দেশ্য দিয়া। ভাল কাজের লাগি মিথ্যা কথারে আমরা পাপ মনে করি না। যাহোক, পত্রের ভিতরের ময়মুন জাইনা আর তোমার দরকার নাই। রেক্টরের নামে এড্রেস করা একখানা পত্র তুমি পাবা। সেখানে দাখিল করবার সময় সত্য কথা বলবার লাগি যদি তোমার ঠোঁট চুলকায়, তবে গায় পৈড়া বলতেও পার দুলাভাই এই পত্র দিছেন।

পরদিন প্রয়োজন-মত টাকা ও রেক্টরের নামে একখানা বন্ধ চিঠি লইয়া হামিদ সিরাজগঞ্জের গাড়ি ধরিল।

পরের গাড়িতে আরেকজন লোককে উকিল সাহেব ফতেপুর পাঠাইলেন। শ্বশুরের নামে একখানা চিঠিতে তিনি জানাইলেন হামিদ সম্পর্কে চিন্তার কারণ নাই। উকিল সাহেব তাকে সিরাজগঞ্জে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ঐ পত্র পাইয়া ফতেপুরের সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন।

চেরাগের সলিতা বদল

১

ভিতরের কথা কেউ জানিল না। হামিদের জীবনে যে এমন একটা বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে তা কেউ বুঝিতে পারিল না। খোদ রেকটর সাহেবের সম্মতিতেই সে সিনিয়র মাদ্রাসা হইতে হাই মাদ্রাসায় ট্রেন্সফার হইয়াছে। এতে কার কি বলিবার থাকিতে পারে? আগে হইতেই হামিদ হোস্টেল বদল করিয়াছিল। কাজেই এটা ত জানা কথা। কেউ অবাক হইল না। আগের মতই মাসে-মাসে টাকা আসিতে লাগিল। কেউ কোনও সন্দেহও করিল না।

কিন্তু সবাইকে অবাক হইতে হইল হামিদের চাল-চলনে বিশেষতঃ তার পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন দেখিয়া। কল্লিদার কোর্তা, চুড়িদার পাজামা পাঁচ-কল্লি টুপির বদলে এখন সে ধরিয়াছে শেরওয়ানী আলিগড়ী পাজামা ও জিন্স ক্যাপ। শেরওয়ানীর বদলে কোটও পরে মাঝে-মাঝে। নফল নমাজ ও রাত্রির এবাদত সে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই পরিবর্তন সকলেরই নজরে পড়িল। স্কুল ও হোস্টেল বদল হইলেও জায়গা ও আর বদল হয় নাই। কাজেই সহপাঠী-সমপাঠী বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে চলিল নানান কল্পনা-জল্পনা। যারা বরাবর শেরওয়ানী-কোট পাজামা পরে তাদের কোনও দোষ নাই। কল্লিদার কোর্তা ও চুড়িদার পাজামা ছাড়িয়া কোট-শেরওয়ানী-আলিগড়ী ধরারই দোষের। অন্ততঃ সন্দেহজনক। বরাবরের বেনমাজী ও দাড়ি-চাছার দোষ নাই। নমাজীরা নমাজ ছাড়া ও দাড়ি-ওয়ালারা দাড়ি চাছাটাই সন্দেহজনক। নিশ্চয় কল্লিডার চরিত্রে কোন দোষ ঢুকিয়াছে। হামিদ সম্বন্ধে কল্পনা-জল্পনার ভিত্তি এই।

কিন্তু কারও কোনও কল্পনায় কাজ দিল না। হামিদ অতি সহজে ক্লাসের পর ক্লাস পাশ করিয়া যাইতে লাগিল। লেখাপড়ায় মেধাবী ছিল হামিদ আগে হইতেই। পাঠ বদল করিয়া সে পড়া-শোনায় এমন মন দিল যে-দু-বছরের মাথায় ইসলামিয়া ম্যাট্রিক পাশ করিল বৃত্তি লইয়া।

দুই বছরে হামিদ একবারও বাড়ি যায় নাই। তবু বাপের সাথে তার বিরোধের কথা কেউ জানিতে পারেন নাই। ছাত্ররা ত না-ই, স্বয়ং রেক্টর সাহেবও না। হামিদ প্রতি ছুটিতেই বাড়ি যাওয়ার নাম করিয়া মোমিনশাহী শহরে দুলাভাইর বাসায় আসিত। সারা বন্ধ সেখানেই কাটাইত। দরকার হইলে পড়াশোনার নাম করিয়া হোস্টেলে ফিরিয়া আসিত।

এই দুই বছরে হামিদ বাপের কথা, আশ্বাদের কথা, বাড়ির চাকর চাকরানী মায় পাড়া-পড়শীর কথা অনেক ভাবিয়াছে। বাপের স্নেহের কত স্মৃতি, মেজ-আশ্বার আদর-যত্নের কত কথা তার মনে পড়িয়াছে। ঐ সব মধুর স্মৃতি তাকে ঘন-ঘন বাড়ির দিকে টানিয়াছে। এমন কি বুড়া ইব্রাহিম পর্যন্ত হামিদকে হাতছানি দিয়াছেন। এসব টানে

ছুটিয়া গিয়াছে তার মন ফতেপুরে। লজ্জা-সংকোচ তাকে বাধা দিয়াছে। লজ্জা-সংকোচের সাথে সে যুদ্ধ করিয়াছে। কেন লজ্জা? কেন সংকোচ? সে ত আর টাকা-পয়সা ভিক্ষা চাইবার জন্য বাপের কাছে যাইতেছে না! সকলের সাথে একবার দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া মুরুবিবদেরে সালাম দিয়াই সে চলিয়া আসিবে। যাক না সে একবার। দোষ কি?

না, দোষ আছে। বাপজান হামিদকে ভুল বুঝিবেন। মনে করিবেন, হামিদ অভাবে পড়িয়া মাফ চাহিয়া টাকা-পয়সা আদায় করিতে আসিয়াছে। হামিদ জানে সে টাকা-পয়সা চাইতে যাইবে না। সে বাপ-মাকে সেকথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবে। কিন্তু কেউ হামিদের কথায় বিশ্বাস করিবেন না। এ অপমান হামিদ সহ্য করিতে পারিবে না।

বাপের কাছে হার মানিতে হামিদের আপত্তি নাই। যে-কোনও অবস্থায় বাপের কাছে নতি স্বীকারকে হামিদ অপমান মনে করে না। হামিদের বর্তমান অবস্থাটা তা নয়। অন্য লোক দূরের কথা। অন্য লোকের পরোয়াও হামিদ তেমন করে না। কিন্তু তার বাপ যে মনে করিবেন, অভাবের তাড়নায় হামিদ এতদিনে বাপকে খোশামুদ করিয়া টাকা আদায় করিতে আসিয়াছে, এটা সে কিছুতেই বরদাশত করিতে পারিবে না। সে টাকা-পয়সা না চাহিয়া ফিরিয়া আসিবে যখন, তখনও কি বাপজানের ভুল ভাংগিবে না? হামিদ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে তাতেও তার বাবার ভুল ভাংগিবে না। তিনি তখনও ভাবিবেন তাঁর ভাব-গতিক ও মর্জি মেজাজ দেখিয়া হামিদ টাকা চাইতে সাহসই করে নাই। হামিদ যদি বাপজানের মুখের উপর আত্মদেহে গুণাইয়া বলিয়া আসে: 'আমি আপনার টাকা চাই না, দিলেও নিব না' তবু কি বাপজান মনে করিবেন, আমি টাকা-পয়সার জন্যই ফতেপুর গিয়াছিলাম? হামিদের মুক্তি জবাব দিল: হাঁ, তবু তোমার বাবা মনে করিবেন তুমি টাকা খুবই চাও। কিন্তু না পাইয়া এখন ইউসুফের গল্পের খেকশিয়ালের মতো বলিতেছ: আংগুর ফল চাই। এই সব চিন্তা করিয়াই হামিদ এই দুই-দুইটা বছর ফতেপুর যাওয়ার প্রবল বাসনাকে নিবৃত্ত রাখিয়াছে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর তাকে নতুন চিন্তায় পাইল। পরীক্ষার পরের লম্বা অবসর কোথায় কাটাইবে? শুধু বড়বুর বাসায় অতদিন বসিয়া থাকা যায় না। রাজশাহী-রংপুরে যে সব বোন আছেন, তাঁরা কেউ হামিদের ভেদ কথা জানেন না। সেখানে যাওয়াও নিরাপদ নয়। অতএব এই লম্বা অবসর কাটানো এক বড় সমস্যা। তার পরের সমস্যাটা আরও জটিল। ম্যাট্রিক পাশ করার পর সে করিবে কি? ম্যাট্রিকে কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পাইবে, এটা সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু পাশ সে করিবেই এবং ফাস্ট ডিভিশনও পাইবে, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল। কাজেই কলেজে পড়ার সম্ভাবনাটা একটা দুঃস্বপ্ন রূপেই তার সামনে ভাসিতেছে। বড়বু-দুলাভাই হয় ত তার কলেজের খরচাও দিতে চাইবেন। কিন্তু দিতে চাইলেই কি হামিদের নেওয়া উচিত? দুলাভাই বেচারার ওকালতিই ত একমাত্র রোজগার। পসার তার যথেষ্ট। রোজগারও করেন খুবই। কিন্তু তাঁর খরচ কত! ছেলেমেয়ে ত আছেই। এক ছেলে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে। তার বাবত যায় অনেক টাকা। ছোট চারটির পিছেও কম যায় না। হামিদ ত নিজে চোখেই দেখিয়াছে। আজ কাল লেখা-পড়ার যা খরচ! দিন-কাল যা পড়িয়াছে। লেখা-পড়ারই বা দোষ কি?

এর পরেও হামিদের কি উচিত হইবে দুলাভাইর নিকট হইতে কলেজের খরচা নেওয়া? তিনি এর মধ্যেই যা করিয়াছেন, তার বদলাই কি সে দিতে পারিবে? পিঠের চামড়ায় জুতা বানাইয়া দিলেও ত সে দেনা শোধ হইবে না। সে বাপের সাথে বিবাদ করিয়াছে আদর্শের জন্য। আদর্শের জন্যই সে বাপের ধন সম্পদ বিসর্জন দিয়া দারিদ্র্যের পথ স্বেচ্ছায় বাছিয়া লইয়াছে। কিন্তু এটা এখনও কথার কথা মাত্র। সত্য-সত্যই দারিদ্র্যের পথে আজও সে যায় নাই। অভাবের মুখ সে আজও দেখিতে পায় নাই। বড়-বু ও দুলাভাই মাঝপথে পড়িয়া হামিদকে অভাবের সামনে পড়িতে দেন নাই। যেমনটা বাপজান করিতেন, যত টাকা যখন-যেমন হামিদ বাপের কাছে পাইত, আজও বড়-বু দুলাভাই তাই-তেমনি দিয়া আসিতেছেন।

বেচারি হামিদ একটা ঘটনার বিন্দু-বিসর্গ জানে না। বাবার সংগে ঝগড়া করিয়া হামিদ বাহির হইয়া আসার পরদিনই দুলাভাই শ্বশুরের কাছে লোক মারফত পত্রে বিস্তারিত সব অবস্থা জানাইয়া ছিলেন, এটাই এ ব্যাপারের শেষ কথা নয়। তারপরও জামাই-শ্বশুরে হামিদ সম্পর্কে অনেক বার আলাপ হইয়াছে। পীর সাহেবের মেজাজ ঠাণ্ডা হওয়ার পর হইতেই তাঁর মনও নরম হইয়াছে। মেয়ের জামাই তাঁর ছেলের লেখা-পড়ার খরচ বহন করেন, এই ব্যাপারটাই তাঁর মনে বারবার আঘাত করিতে থাকে। লোকে শুনিবে বলিবে কি? দুলা মিয়া কত বুঝাইলেন, দুনিয়ার কার্যকরীও এ ব্যাপার জানে না। মনি অর্ডার বরাবরের মতই পীর সাহেবকে বলার নামেই যায়। তবু কিন্তু পীর সাহেবের মন মানে না। স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দুলা মিয়াও কিছু মানেন না। অবশেষে স্থির হয় আগামী লম্বা ছুটিতে যখন শাহেদা বাপের বাড়ি নাইওর আসিবেন, তখনই এ ব্যাপার পীর সাহেব-কেবলা নিজের মেয়ের মাথায় ফয়সলা করিবেন। শাহেদা ফতেপুরে আসিলেই যদি হয়, তবে আদালতের লম্বা ছুটির জন্য বসিয়া থাকিবার দরকার কি? সেটা ত হয় মাসের ব্যাপার। কাজেই পীর সাহেব শাহেদাকে ফতেপুর আনিবার ব্যবস্থা করিলেন হামিদের গৃহত্যাগের ঠিক মাসের মধ্যে। দুলা মিয়াও সাথে আসিলেন।

পীর সাহেবের প্রস্তাবের জবাবে শাহেদা উকিলের বিবির মতই কথা বলিলেন: বাপজান, আমার টাকা ত আপনারই টাকা। চলুক না এইভাবেই। দরকার হৈলে আমরাই ত চাইয়া নিমু।

পীর সাহেবের পীড়াপীড়িতে অবশেষে শাহেদা বলিলেন: বাপজান যে কথাটা কইতে চাইছিলাম না আপনে জোর কৈরা সেই কথাটাই কওয়াইলেন। আপনার টাকা হামিদ নিব না।

কথাটায় বাপজান ব্যথা পাইবে মনে করিয়া শাহেদা অন্যদিকে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া ও-কথা বলিয়াছিলেন। চোখ ফিরাইয়া শাহেদা তাজ্জব হইলেন। পীর সাহেব মোটেই ব্যথা পান নাই। হাসি মুখেই তিনি মেয়ের কথার জবাব দিলেন। বলিলেন: আমি তা জানি মা। আমি সে কথা বলিও নাই। আমি কইতে চাই তোমরা এখন যেমন দিতেছ তেমনি দিয়া যাও। শুধু তোমরার হিসাবে আমার নামে সেটা খরচ লেখ। বাড়ি ভাড়ার আদায়ী টাকা থনে সেটা কাইটা রাখ।

কথাটা যুক্তিপূর্ণ। দূরদর্শী উকিলের মনে-মনে সেটা পছন্দ হইল। কিন্তু শাহেদা জিদ করিয়া বলিলেন: আমার একমাত্র সহোদরকে আমিই কি কিছু দিতে পারি না, বাপজান? কেন আপনে আপত্তি করেন?

‘আপত্তির কথা না মা।’ পীর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন। ‘নিশ্চয় তুমি সহোদর ভাইকে সাহায্য করতে পার। সময় হৈলে কৈরোও একদিন। কিন্তু আমি যতদিন হায়াতে বাঁইচা আছি, ততদিন আমারেই ঐ খরচটা করতে দেও। তাছাড়া আমার টাকাতেও তোমার হক আছে। মনে কর, সেই টাকা খনেই হামিদের পড়ার খরচ চলতেছে।’

শেষ পর্যন্ত পীর সাহেবের প্রস্তাব মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। এ ভাবেই হামিদের পড়ার খরচ চলিতেছিল।

কিন্তু বাপ-বেটি-জামাইর কড়া পাহারায় কথাটা দুইকান হয় নাই। হামিদও জানিতে পারে নাই। জানিবার কথাও নয়। পীর সাহেবের বাড়ি-ভাড়া বরাবর দুলা মিয়াই আদায় করেন। পীর সাহেবের সমস্ত সম্পত্তির আয়কর রিটার্ন তিনিই দাখিল করেন। হিসাব-পত্র প্রায় তাঁর কাছেই থাকে। আগেও যেমন ছিল, হামিদের ব্যাপারে এই নতুন ব্যবস্থা হওয়ার পরেও তেমনি চলিতে থাকিল।

তাই হামিদের দুশ্চিন্তার এতে কোনও লাঘব হয় না। সে ভাবিতে থাকে প্রথম যেদিন বড়-বু ও দুলাভাই তার লেখা-পড়ার ভার নেন, সেদিন কার কথায় হামিদ বুঝিয়াছিল সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই তাঁরা সে দায়িত্ব নিয়াছিলেন। হামিদের যতদূর মনে পড়ে, তাঁরা বছর-দুই কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলেন। দুই বছর কথাটা তাঁরা ম্যাট্রিক পর্যন্ত হিসাব করিয়াই বলিয়াছিলেন। কিন্তু মনে-মনে নিশ্চয়ই তাঁরা ভাবিয়াছিলেন, বাপ-বেটার বিবাদ আর কতদিন স্থায়ী হইবে? বড় জেঁয় দু-চার দিন বা দু-চার মাস। কিন্তু এটা এত লম্বা মেয়াদী হইবে, সত্য-সত্যই যে ম্যাট্রিক পর্যন্ত খরচ তাঁদেরই বহন করিতে হইবে, এটা নিশ্চয়ই ভাবেন নাই। আর ভাবিলেই বা কি? ম্যাট্রিকের পরের কথা নিশ্চয়ই তাঁদের কল্পনায়ও ছিল না। এখন কি করা যায়?

এতদিন সে দুলাভাই-এর বাড়িতে আছে। দুলাভাইর সাথে অনেক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। বড়-বুর সাথে ত রোজই কথা হয়। কিন্তু এই আসন্ন জরুরী কথাটা উঠে নাই। তাঁরা তুলেন নাই বলিয়া হামিদও তুলে নাই। লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া কেউ অমন কথা বলিতে পারে?

কিন্তু যেদিন ম্যাট্রিকের রিজাল্ট আউট হইল সেদিন কথাটা আপনি উঠিয়া পড়িল। স্কলারশিপের লিষ্ট তখনও বাহির হয় নাই। কিন্তু প্রথম দশ জনের মধ্যেই হামিদের নাম থাকায় একটা স্কলারশিপও সকলেই ধরিয়া লইলেন। কথাটা উঠিল। দুলাভাই কথাটা সহজ করিয়া দিলেন। বলিলেন: আই. এ. না আই. এস. সি. কোন্টা পড়বা, ঠিক করছ?

হামিদের বৃকের উপর হইতে ভারি পাথরটা নামিয়া গেল। তবে দুলাভাই বড়-বু নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আলাপ করিয়া রাখিয়াছেন। খরচের তবে চিন্তা নাই। আর আই. এ. না, আই. এসসি সে সম্বন্ধেও হামিদের একটা ধারণা আছে। বিশেষত: এ বিষয়ে কিছু চিন্তাও সে ইতিমধ্যে করিয়াছে। তার মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে বাপের সাথে ঝগড়া করিয়া পড়ার লাইন বদলাইয়াছে কেন? জ্ঞান লাভের জন্য ত? জ্ঞান অর্থে সে কি বুঝিয়াছিল? হামিদের ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। তাদের বাড়িতে যেদিন প্রথম সেলাই এর কল আসে, সেইদিন কৌতূহলে বাপজানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: ওটা কে বানাইয়াছে? তারপর গ্রামোফোনে খোশ্‌ এলহানে কোরান তেলাওয়াত শুনিয়া

বাপজানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: ওটা কে বানাইয়াছে? তারপর আরেকটু বড় হইয়া রেল-স্টিমার মোটরগাড়ি হাওয়াই জাহাজ দেখিয়া বাপজানকে ঐ একই প্রশ্ন করিয়াছে। বাপজান বরাবর একই উত্তর দিয়াছেন: কিরিস্তানরা। হতাশ হইয়া সে বাপজানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: মুসলমানরা কিছু বানায় নাই? বাপজান উত্তর দিয়াছিলেন: দুনিয়ার সুখ-আয়েশের এই সব যন্ত্রপাতি বানাইয়া মুসলমানরা যিন্দিগি বরবাদ করিতে পারে না। তারা আল্লার এবাদত-বন্দেগি করিয়া আখেরাতের সম্বল জোগাড় করিতেছে। হামিদের শিশুমন এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয় নাই। তার বুকে অপমানের ব্যথা বাজিয়াছে। মুসলমানরা এসব বানাইতে পারে না? সে মনে-মনে ওয়াদা করিয়াছিল: বড় হইয়া সে যন্ত্রপাতি বানাইবে। আজ সে বুঝিতেছে সে জ্ঞানের কথা বলিয়াছিল বিজ্ঞানের অর্থে। বিজ্ঞান মানে সায়েন্স। অতএব তার আই.এস.সি পড়া উচিত। কিন্তু দুলাভাইর জবাবে ও-কথা বলিতে পারিল না। তার বদলে বিনয় করিয়া বলিল: আমি কি জানি বুঝি? আপনে যা বলবেন, তাই আমি পড়ব। আমার আবার মতামত কি।

দুলাভাই হাসিলেন। বলিলেন: বল কি হে তোমার মতামত নাই? কবে থনে তুমি পরের মতে চলতে শুরু করছ?

মতামত লইয়াই বাপের সাথে বিরোধ, সেই দিকেই দুলাভাই ইশারা করিতেছেন? হামিদ লজ্জা পাইল। বলিল: এটা ত মতামতের প্রশ্ন না দুলাভাই। আই.এ.সি. আই.এস.সি.র মধ্যে কোনটা আমার জন্য ভাল, সেটা আমার চেয়ে আপনে জানেন অনেক বেশি। তাই আমি আপনার মত চাই। তাছাড়া আমারে সিরাজগঞ্জেই রাখবেন, না মোমিনশাহী নিয়া আসবেন তাও ত ঠিক করবেন আপনেই।

‘না, সেটাও ঠিক করবা তুমিই।’ দুলাভাই মৃদু হাসিয়া বলিলেন: ‘কারণ যেদিন তোমার ভার নেই, সেদিনই আমি আর তোমার বুঝ ওয়াদা করছিলাম তুমি যা পড়তে চাও যেখানে পড়তে চাও, তাই আমরা করব। সে শর্ত আমরা খেলাফ করতে পারি না। কি কও শাহেদা?’

শাহেদা একমত হওয়ার জন্য এক পায় খাড়াই ছিলেন। স্বামীর প্রশ্নের জবাবে বলিলেন: আমরা কিছুতেই ওয়াদা খেলাফ করতে পারি না।

‘আর সিরাজগঞ্জ-মোমিনশাহী সম্বন্ধে যে কথা কইলা’, উকিল সাহেব স্ত্রীর দিকে আড় চোখে চাইয়া বলিলেন: সে সম্বন্ধে একটা কথা তোমার জানা থাকা উচিত। যেখানেই তুমি পড় থাকতে হবে তোমার হোস্টেলেই। আমার বাসার হট্টগোলে তোমারে ফেলতে চাই না।’

‘হোস্টেলেই যদি থাকতে হয় তবে সিরাজগঞ্জেই ভাল।’ কথাটা হামিদের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। চাপিয়া গেল। স্থির হইল সিরাজগঞ্জে গিয়া প্রিন্সিপাল সাহেবের পরামর্শ চাওয়া হইবে।

২

প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে কথা বলিতে গিয়া হামিদ বিষম বিপদে পড়িল। তিনি প্রথম কথাই বলিলেন: এ ব্যাপারে তোমার বাবার মতই চূড়ান্ত। তাঁর মত কি?

হামিদ এ জন্য প্রস্তুত ছিল না। নিতান্ত আতঙ্ক আক্রান্ত হইল। এমন অবস্থায় গোছাইয়া মিছা কথা সাজাইবার অভ্যাস হামিদের ছিল না। যে সত্য কথা বলিতে বাধ্য

হইল। নিজের এই অবাধ্যতার সমর্থনে তার যে সব যুক্তি ছিল, সেগুলি যথাসাধ্য আন্তরিকতার সাথে সুতরাং খুব জোরের সংগেই বলিয়া গেল।

যতক্ষণ হামিদের কথা শেষ না হইল, প্রিন্সিপাল সাহেব ততক্ষণই এক দৃষ্টে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাঝে-মাঝেই তাঁর চোখে-মুখে মৃদু হাসি হামিদের নজরে পড়িল। তাতে সে সাহস পাইল। উৎসাহ বোধ করিল। কাজেই কথাগুলি ঠিকমতো বলিতে পারিতেছে বলিয়া হামিদের মনে হইল। প্রিন্সিপাল সাহেবের দৃষ্টিতে সত্য-সত্যই বিস্ময় ও প্রশংসা ফাটিয়া পড়িতেছিল। হামিদের কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন: সব কথা আমারে কৈয়া ভালই করলা বাবা, আমি সত্যই খুশী হৈলাম। তোমার অবাধ্যতার জন্য না। তোমার সত্য কথা বলবার সাহসের জন্য। এক মাত্র ছেলে তুমি পীর সাহেবের। এ অবস্থায় বাপ-বেটার বিরোধটা দেখতে সত্যই দুঃখজনক। কিন্তু তুমি এতে দুঃখ কৈরো না। এটা বাপ-বেটার বিরোধ না, বাবা। এটা আসলে প্রবীণ ও নবীনের, নতুন ও পুরাতনের, আগত ও অনাগতের চিরন্তন সংঘাত। এতে অবাধ্যতার লজ্জা বা দুশ্মনির নিচতা কোনোটাই নাই। এটা স্বাভাবিক। প্রকৃতির বিধান এটা। জীবজগতের এটা উদ্বর্তন ইভোলিউশন। পুরাতন যতই ভাল হোক, নতুনের জন্য তাকে জায়গা ছাড়তেই হবে। আনার পাকলে পুশ্‌তের ফাটতেই হবে। বাচ্চা হওয়াটাই আগার পরিণতি। তার সাফল্য। সবুর কর, তোমার বাপকে তোমার কাছে হার মানতেই হবে। কারণ তুমি সত্যই নতুন।

প্রিন্সিপাল সাহেবের এমন প্রাণঢালা প্রশংসা ও সমর্থন পাইলে, হামিদ এটা আশা করে নাই। তিনি চটিয়া না গেলেই হামিদ নিজের ভাগ্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। প্রিন্সিপাল সাহেবের সমর্থন ও তার মুখে এমন মূল্যবান যুক্তি শুনিয়া পূর্ণ ও আনন্দে হামিদের বুক ভরিয়া উঠিল। সে চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা ফুটাইয়া বলিল: এখন আপনাই ইচ্ছা করেন, স্যার, আমি আই.এ. না কি আই.এস.সি. তে ভর্তি হব।

প্রিন্সিপাল: তোমার নিজের ঝোঁকটা কোন্ দিকে?

হামিদ বিনয়ে নুইয়া পড়িয়া বলিল: আপনার জ্ঞানের সামনে আমার ঝোঁকের কি নাম আছে স্যার? আমি জ্ঞান লাভ করতে চাই।

প্রিন্সিপাল: জ্ঞান আর্টেও আছে সায়েন্সেও আছে। ঝোঁকের কথা বললাম এই জন্য যে ইচ্ছাই জ্ঞান লাভের পয়লা শর্ত।

মনের দিক দিয়া হামিদ প্রিন্সিপাল সাহেবের ঘনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে অনেক আগেই। তাঁর কাছে হামিদের গোপনীয় কিছু নাই, এ বিশ্বাস তার মনে দানা বাঁধিয়াছে। তবু বেশ কিছু দ্বিধা-সংকোচ করিয়া সে একরূপ ধরা গলায় বলিল: সার যদি পাগলামি বৈলা হাইসা উড়ায় না দেন, তবে একটা কথা কইতে পারি। এর খনেই আমার ঝোঁক বোঝা যায় কি না আপনে বিচার করেন।

প্রিন্সিপাল সাহেব উৎসাহ দিয়া বলিলেন: আমার কাছে তুমি মনের সব কথা খুলিলা বলতে পার, এমন ভরসা কি তুমি আজও পাও নাই। বল তোমার পাগলামিটাই আগে শোনা যাক।

হামিদ তখন তার ছেলেবেলার বাপ-মার মুখে শোনা, পুঁথি-পুস্তকে পড়া আবে-হায়াতের কথা, খাজে-খেয়ের আবেহায়াত পান করিয়া অমর হওয়ার কথা,

আবেহায়াত নামে তার রোমাঞ্চ হওয়ার কথা, বাপজানের মুখে তার দুর্লভতার কথা, অনেকের মুখে ওটার উদ্ভটতার কথা, এবং বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে-সাথে নিজের চিন্তার পরিবর্তনের কথা সব সংক্ষেপে অথচ নিপুণতার সংগে বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিল: কিন্তু স্যার, যুক্তি-তর্কের সামনে কল্পনাটা যতই উইড়া যাক না কেন, আজো ক্ষণে-ক্ষণে ওটা আমার মনে দোলা দিয়া যায় কেন? এর মধ্যে সত্য কিছু আছে কি? যদি থাইকা থাকে, তবে আর্টে না সায়েন্সে তার সাক্ষাত পাওয়া যায়, আপনে তারই সন্ধান দেন। আমি সেই সাবজেক্টই পড়ব।

প্রিন্সিপাল সাহেবের মুখে গাভীরের ছায়া পড়িল। তিনি ভূ কুঞ্চিত করিলেন। চোখের চশমা জোড়া খুলিলেন। মুখের ভাপ দিয়া ভালরূপ মুছিয়া আবার পরিলেন। এইভাবে নিজের অন্তর-দৃষ্টি-শক্তি যেন বাড়াইয়া লইলেন। তার পর বলিলেন: বড় ভাবনায় ফেললা বাবা। কথাটা বুঝবার মতো বয়স তোমার হয় নাই। অথচ বয়সের দোহাই দিয়া জ্ঞান লাভের ইচ্ছা দমন করার চেষ্টার আমি ঘোর বিরোধী। আমি মনে করি বলতে জানলে সব ব্যাপারই সবাইকে বুঝান যায়। তুমি যে কথাটা বললা ওটা কবির কল্পনা নয়। আবে-হায়াত সত্যই আছে। শুধু বুঝবার ইতর-বিশেষ মাত্র। আবে-হায়াতের সোজা মানে জীবনের পানি। ফাউন্টেন-অব-লাইফ। স্প্রিং-অব-লাইফও বলতে পার। ওর একটা গূঢ় মানেও আছে। আমরা সহজ মানের কথাটাই বিবেচনা করব। এই অর্থেও আবে-হায়াত সত্যই দুর্লভ। কারণ ওটা পাইতে সাধনার প্রয়োজন। ওটা গভীর অরণ্যে দুর্লভ পর্বতের ওপারে, রূপক হিসাবে সে কথাও সত্য। প্রকৃতির গহীনেই আবে-হায়াতের অবস্থিতি। প্রকৃতির গহীন মানে জংগলের গভীরতা নয়। সুফী-দরবেশ মুনি-ঋষিরা এখানেই ভুল করছেন। প্রকৃতির গহীন মানে সৃষ্টি-রহস্যের তলদেশ। ডেপথ্-অব-দি ইউনিভার্স। সেখানে যাওয়ার সাধনায় কোলাহল থনে দূরে যাওয়া দরকার নিশ্চয়ই। কিন্তু কোলাহল থনে দূরে মানে শব্দ থনে, সৃষ্টি থনে দূরে না। যেমন কোরআন শরিফের মধ্যেই ইসমে-আয়ম সাধিত। সাধনা কৈরা বার করতে হবে। কোরআনের বাইরে ইসমে-আয়মের তালাশ করলে তা পাওয়া যাবে না। ঠিক তেমনি, সৃষ্টির মধ্যেই আবে-হায়াত তালাশ করতে হবে, সৃষ্টির বাইরে তালাশ করলে তার সন্ধান মিলবে না।

নিজের ভাবোচ্ছ্বাসে প্রিন্সিপাল সাহেব এমনি ভাসিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁর শ্রোতা একটি সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করা ষোল বছরের বালক, সে কথা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। হঠাৎ যেন তাঁর চমক ভাংগিয়া গেল। তিনি হাসিলেন। নিজের একমাত্র শ্রোতার চোখে-মুখে নজর করিলেন দেখিয়া খুশী হইলেন, হামিদ প্রবল আগ্রহে তাঁর কথা শুনিতেছে। তবু তিনি জিগ্গাস করিলেন: তুমি আমার কথা বুঝতেছ বাবা?

উৎসাহের সাথে হামিদ জবাব দিল: জি হাঁ, আমি বেশ বুঝতেছি। আমার খুব ভাল লাগতেছে। আপনার কথা শেষ করেন। আমার আগ্রহ বাড়তেছে।

প্রিন্সিপাল সাহেব সোয়াস্তি পাইলেন। তবে কি তিনি অরণ্যে রোদন করেন নাই? উলু বনে মুন্ডা ছড়ান নাই? অতি-উৎসাহে অমন আহম্মকি তিনি করেন নাই? হাজার বালক হউক, কত বড় আলেমের ছেলে! কোন্ খান্দানের পয়দা!

একটু দম লইয়া প্রিন্সিপাল সাহেব আবার বলিলেন: এই দিক থনে বিচার করলে বিজ্ঞানের লাইনেই তোমার যাওয়া উচিত। আমি আর্টের নিন্দা করতেছি না আমার শুধু

বক্তব্য এই যে সৃষ্টি-রহস্যের তলদেশে ডুব দিয়া আবে-হায়াতের সন্ধান করা যায় শুধু বিজ্ঞানের সাহায্যেই। ফিজিকস্কেমিস্ট্রি বায়োলজি জিওলজি, এক্ট্রনমি যখন পড়বে, তখন দেখবে সৃষ্টির কি অপূর্ব অভাবনীয় কৌশল, সৃষ্টি-কর্তার কি বিচিত্র মহিমা। সে রহস্যে সে মহিমায় যত ডুব দিবা তত দেখবা সে বৈচিত্র্যের যেন শেষ নাই, সে মহিমার যেন সীমা নাই, সে তলদেশের যেন তলা নাই। আরও বিচিত্র। আরও মহিমাময়। আরও গভীর।

ঠিক হইয়া গেল। হামিদ আই.এস. সি.তেই ভর্তি হইল। গভীর মনোযোগে পরম উৎসাহে পড়াশোনা করিতে লাগিল। কলেজ হোস্টেলের নতুন পরিবেশ নতুন আবহাওয়া বড়ই ভাল লাগিল হামিদের।

৩

কলেজ-জীবনে হামিদের যে দ্রুত ও বিশ্বয়কর পরিবর্তন হইল, তা কেউ ভাবিতে পারে নাই। ছাত্র ও শিক্ষক মহলের সকলে তা বটেই শহরের গণ্যমান্য সকলে এবং জনসাধারণেরও অনেকেই হামিদকে চিনিতেন। ফতেপুরের পীরজাদা হওয়া ছাড়াও পড়াশোনায় ভাল ছাত্র হিসাবে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ও গানে-গজলে এমনকি ফুটবল খেলার মাঠের খেলওয়াড় রূপে সকলেই তাকে চিনিত। তারিফ করিত। সম্মান করিত। এমন লোকের পোশাকী পরিবর্তন সহজেই সকলের চোখে পড়ে। হামিদের বেলা পড়িলও তা। কল্লিদার কোর্তা ও পাচ-কল্লি টুপি ছাড়িয়াছিল সে সিনিয়র মাদ্রাসা হইতে হাই-মাদ্রাসায় আসিয়াই। হাই-মাদ্রাসায় সে আলিগড়ী পাজামার উপর শেরওয়ানী বা কোট পরিত। মাথায় পরিত সে জিন্স ক্যাপ। এ পরিবর্তন লোকের চোখে তেমন বাজে নাই। কিন্তু কলেজে আসিয়া সে যে কাণ্ডটা করিল, সেটা বন্ধুরা সহজে হজম করিতে পারিল না। কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই পাজীবী-পাজামা ছাড়িয়া ফুল প্যান্ট ও হাফ শার্ট ধরিয়াছে। কলেজের ছাত্রদের অনেকেই ঐ পোশাক পরে। কিন্তু তাদের বেলা কারো আপত্তি নাই। যত আপত্তি হামিদের বেলা। অপর মানুষে যা-ই করুক হামিদ করিবে কেন? সে ত পীরজাদা। তাছাড়া হামিদ ত আগে সুনীতি পোশাক পরিত।

কিন্তু হামিদ এসব সমালোচনায় কান দিত না। শুধু পোশাকের বেলায়ই যদি হইত, তবু না হয় আস্তে-আস্তে এটা সহ্য করা যাইত। ধর্মীয় ব্যাপারে হামিদের পরিবর্তন কিছুতেই সহ্য করা যায় না। নফলিয়াত ও রাতের এবাদত হামিদ আগেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। ওয়াকতিয়া নমাজও সে বেশ কায়া করিত আগে হইতেই। সেটাও আস্তে-আস্তে বন্ধদের গাসহা হইয়া গিয়াছিল। প্রফেসররাও এ নিয়্যাকোনও কথা বলিতেন না। কিন্তু হামিদ এখন যা শুরু করিয়াছে, এটাত বরদাশ্ত করা যায় না। এখন সে শুধু ওয়াকতিয়া নমাজই তরক করে না। জুম্মার নমাজেও সে যায় না। শুধু যে নমাজ পড়ে না, তাও নয়। নমাজ-রোজাকে সে এখন ঠাট্টা-বিদূপ করিয়া থাকে। বন্ধু-বান্ধবের প্রতিবাদে সে ক্রটি স্বীকার করে না। বরঞ্চ তাদের প্রতিবাদে হামিদের জিদ যেন আরও বাড়িয়া যায়। হোস্টেলের সুপার কলেজের প্রফেসরদের কেউ-কেউ হামিদকে মৃদুভাবে হুশিয়ারও করিয়া দিয়াছেন। এঁদের মধ্যে দু'চারজন ফতেপুরের মুরিদ-মোতেকাদও আছেন। পীর সাহেব-কেবলার কাছে নালিশ

করিবার ভীতিও কেউ-কেউ দেখাইয়াছেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। হামিদ যেন বেপরোয়া হইয়াই ঐ পথ ধরিয়াছে। সে যেন তার অতীতকে ধুইয়া-মুছিয়া একদম নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য জিদ করিয়া লাগিয়াছে। নমাজ-রোজাকে এতদিন সে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বলিত। এখন ও সবকে কুসংস্কার ও কুপ্রথা বলা শুরু করিয়াছে। খোদ ধর্মকে সে আক্রমণ করিতে শুরু করিয়াছে। সে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে আচার-অনুষ্ঠান প্রধান ধর্ম আসলে ধর্মই নয়। তেমন ধর্মে মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি হয় না। তার বদলে ওতে মানুষের মন হয় সংকীর্ণ, গোঁড়া। তাদের আচার-অনুষ্ঠান হয় ব্যায়াম-চর্চায় পরিণত।

একদিন সন্ধ্যায় ডিনার টেবিলে বসিয়া হামিদ বরাবরের মতো এই সব কথা বলিতেছিল। বি. এ. ক্লাসের ছাত্র মজিদ প্রতিবাদ করিল। বলিল: দেখেন হামিদ মিয়া, আপনি ফতেপুর শরিফের ভাবী সাজ্জাদনশিন। একদিন আপনি কটর মোল্লা ছিলেন। কাজেই আপনার পোশাক পরিবর্তনরে আমরা বাবুগিরির মানসিক খেয়াল মনে কৈরা বরদাশ্ত করছি। নমাজ-বন্দেগিতে আপনার অবহেলাকে তরুণের স্বাভাবিক দুর্বলতা বৈলা ক্ষমার চোখে দেখছি। আমাদের মধ্যেও সে দুর্বলতা আছে। আমাদের অনেকের মুখেই ওরূপ তারুণ্যের চপলতা ফুটে। কিন্তু এ সবার একটা সীমা আছে!

মজিদের এই উচ্চাংগের বক্তৃতায় ডিনার-হল নীরব হইল। সকলে মন দিয়ে তার বক্তৃতা শুনিতেছিল। স্বয়ং হামিদও হাসি-মুখে তার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। এই বার সে হাসি মুখেই প্রশ্ন করিল: বলতে পারেন সে সীমাটা কোথায়?

বক্তৃতায় বাধা পাইয়া মজিদ থমকিয়া গেল। বিশেষত প্রশ্নটা ছিল বেকায়দার। সীমার কথাটা সে বাত-কি-বিত বলিয়াছে। যরিফ করিয়া বন্ধে নাই। হামিদের এ প্রশ্নে মজিদ অসুবিধায় পড়িল। ডিনার টেবিলের সকলে হামিদের দিকে এক নজর চাহিয়াই আবার মজিদের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় সে অসুবিধাটা সকলেরই চোখে ধরা পড়িল। মজিদের রাগ হইল। সে রাগের চোটে বলিল: ফেলিল: সীমা কোথায় সে কথা জিজ্ঞাসা করেন গিয়া আপনার বাবা পীর সাহেবকে।

হামিদ তেমনি হাসিয়া বলিল: আমার বাপজানকে আর এর মধ্যে টানেন কে? আপনিই সীমাটা দেখান না।

মজিদের এই বাপ-দেখানো কথাটা আগেই সকলের না-পছন্দ হইয়াছিল। হামিদের কথার পরে ওটা সকলের কাছে আরও অশোভন মনে হইল। মজিদের সমালোচনামূলক গুন-গুন শব্দে গোটা ডিনার টেবিল ঝংকৃত হইয়া উঠিল। মজিদ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বলিল: আপনার বাপজানের কথা বললাম আপনার খোটা দিবার মতলবে না। তিনি পীর সাব বৈলা। আপনার ভালর জন্যই ও-কথা বলছিলাম। ধর্মকে আক্রমণ কৈরা আজকাল প্রগতিবাদী হওয়ার বাহবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আখেরাতে সে বাহবা চলবে না।

সকলে গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু হামিদের হাসি বন্ধ হইল না। সে তেমনি তরল হাস্যে বলিল: ও, আপনি আমার দুয়খে যাওয়ার আশঙ্কায় চিন্তিত হৈছেন মজিদ ভাই?

সকলের দৃষ্টি হামিদের মুখের উপর পড়িল। হামিদ সুরে আরও তরলতা আনিয়া বলিল: আচ্ছা মজিদ ভাই, আমি যদি আখেরাতে দুয়খেই যাই, তবে তাকে তখন আর আফসোসটা কি? আপনার লোকসান কোথায়? আপনি ত ঠিকই বেহেশত যাবেন।

আমি না গেলে বেহেশতের একটা ক্যানডিডেট কমল। বেহেশতে একটা বেশি ভ্যাকেন্সি হৈল। বেহেশতের মেওয়ার একটা অংশীদার কমাতে আপনার ভাগটা বড় হৈল। তাতে আপনার বরঞ্চ খুশী হওয়ার কথা।

সকলে সমস্বরে হো-হো করিয়া উচ্চ হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। মজিদ হারিয়া গেল। সে জানে সহপাঠীদের মধ্যে তার মতো ধর্মপ্রাণ লোক খুব কম আছে। বাকি সবাই প্রকাশ্যে ও মুখেমুখে ধর্ম-প্রাণতা দেখায় বটে, কিন্তু অন্তরে-অন্তরে সবাই বেঈমান। ধর্মের সমালোচনায় এরা সোল্লাসে সমর্থন জানায়। মজিদ রাগে গজগজ করিতে করিতে হন-হন করিয়া ডাইনিং হল হইতে বাহির হইয়া যায়।

সকলে স্তম্ভিত এবং সম্ভবতঃ বিরক্ত হইল। কিন্তু হামিদের মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। সে অবশিষ্ট বন্ধুদের দিকে দীপ্তিমান চোখে চাহিয়া হাসিয়া বলিল: ভ্যাগিস্য, আল্লা মজিদ ভাইর মত রাগী নন। নৈলে আমাদের আর রক্ষা ছিল না।

হামিদের এই রসিকতায় কেউ-কেউ হাসিল। বেশির ভাগ চুপ থাকিল। হামিদ এর অর্থ বুঝিল। সে আর কিছু বলিল না।

পরদিনই প্রিন্সিপালের দফতর হইতে হামিদের তলব হইল। কেউ না বলিলেও হামিদ বুঝিল এটা মজিদ ভাইর কাজ।

হামিদকে বসিবার ইশারা করিয়া প্রিন্সিপালই প্রথম প্রশ্ন করিলেন: তুমি নাকি নমাজ-রোজা ছাইড়া দিছ?

এটা প্রিন্সিপাল সাহেবের আসল প্রশ্ন ত নয়ই। মোটেই জানিবার বিষয় নয়। কারণ তিনি অনেক আগেই তা জানেন। আশ্চর্য্যের প্রশ্ন আরও কঠিন। কারণ অভিযোগ অনেক বেশি গুরুতর শুধু মজিদ নয়। আরও অনেকের কাছে তিনি শুনিয়াছেন, হামিদ খোদা মানে না। কোরআন হাদিস ও স্বয়ং পয়গম্বর সাহেবের মতামতকে সে কানে-আংগুল দেওয়ারমত কথাবার্তা কয়। সে সবই তাঁর জ্ঞাতব্য। সে জন্যই আজ তিনি কঠোর হইয়াই হামিদকে ডাকিয়াছেন।

কিন্তু তিনি প্রবীণ অভিজ্ঞ শিক্ষক। ছাত্রদের স্বভাব জন্মই বাপের মতো দরদ তাঁর। হামিদকে তিনি বিশেষ ভালবাসেন। ওর জন্য তাঁর অন্তরের কোণে বিশেষ একটা স্থান আছে। ছাত্রদের সাথে, বিশেষ করিয়া এই ধরনের যুবকদের সংগে, কিভাবে কথা বলিতে হয়, তা তিনি জানেন। শিক্ষক-জীবনে অনেক দুষ্ট ছেলেকে তিনি দরদ দিয়া শায়েস্তা করিয়াছেন। এই অভিজ্ঞতার বলেই তিনি প্রথমেই কঠোর প্রশ্ন না করিয়া একটা মামুলি প্রশ্ন করিলেন।

কিন্তু হামিদ প্রশ্নটাকে মামুলি থাকিতে দিল না। কারণ সে মামুলি উত্তর দিল না। সে প্রকৃতিস্থ সরলতার সাথে জবাব দিল: জি হাঁ, স্যার।

প্রিন্সিপাল সাহেবের অন্তর হামিদের চোখের দিকে চাহিয়া নরম হইয়া গেল। এই চোখ-জোড়াকে তিনি বড় ভালবাসেন। হামিদকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে উত্তর জোগাইয়া দিবার মতলবে তিনি স্থিতহাস্যে বলিলেন: কেন? সুস্তি? আলসামি? সময়ের অভাব?

হামিদ শান্তভাবে বলিল: ও-সব কারণ না স্যার। আমি নমাজ-রোজায় বিশ্বাসই করি না।

কিছুমাত্র বিরক্ত বা রাগত না হইয়া প্রিন্সিপাল সাহেব ধীরে স্বাভাবিক গলায় বলিলেন: কেন?

হামিদ: আমার বেআদবি মাফ করবেন স্যার। রোজা স্বাস্থ্যনীতি বিরোধী একটি কুসংস্কার মাত্র। আর নমাজ মানুষকে সংকীর্ণমনা স্বার্থপর তোষামুদী জীবে পরিণত করে। তোষামোদের দ্বারা কারো- আত্মমর্যাদাবোধ জাগে না, সে তোষামোদ খোদাকেই করুক, আর রাজা-বাদশাকেই করুক।

প্রিন্সিপাল সাহেব মোটেই চটলেন না। স্নেহ-ভরা গলায় হাসিমুখে বলিলেন: এর একটা কথাও নতুন নয় বাবা। তোমার আগে এসব কথা আরও অনেকেই কইছে। অনেক দর্শনী-বিজ্ঞানীও কইছেন। ভবিষ্যতেও কইবেন। কিন্তু তোমার বিচারের মাপকাঠি হবে তোমার নিজের অন্তর। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসতে হৈলে পক্ষের বিপক্ষের দুই দিককার কথাই শুনতে হয়। নমাজ-রোজার বিরুদ্ধের কথাই তুমি ভাবছ। পক্ষের কথাটা বিজ্ঞানীর মনোভাব নিয়া বিচার কর নাই।

হামিদ বাধা দিয়া বিনয়ের সাথে বলিল: গোস্তাখি মাফ করবেন সার, নমাজ-রোজার পক্ষের কথাই ত জীবন-ভর শুনলাম। জ্ঞান হৈছে অবধি ত নমাজ-রোজার ফযিলতের ব্যানই শুইনা আসতেছি।

হাসিয়া প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন: আমি ফযিলতের কথা কইতেছি না বাবা। আমি কইতেছি যুক্তি-তর্কের কথা। ধর্ম-দর্শনের কথাও আমি বলতেছি না। শুধু মানব-কল্যাণের দিক খেনেই বিচার কইরা দেখ না। ধর্মে যারা বিশ্বাস করে, তারাও নীতিবাদে বিশ্বাসী। নীতিবাদীরাও সংঘের কথা কয়। সাম্য ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধ মানব কল্যাণের বুনিয়াদ এটা তারাও কয়। রোজা শুধু সংঘের নয়। ওটা সমবেত সামাজিক সংঘম। যত চিন্তা করবা ততই এর আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝবা। আর নমাজ? ওর সামাজিক অর্পূর্ব সুন্দর দিকটা তোমার নজরে আজো পড়ে নাই। একদিন তা পড়বেই। আজানের ধ্বনিতে যে যেখান থাকে, সে যে কাজই কর সবাই ছুইটা মসজিদে জমায়েত হওয়া, লক্ষ জনতার কোম্পানিতে একটি মাত্র আল্লাহ-আকবর-ধ্বনিতে চোখের নিমেষে জনতা নিশ্চুপ হৈয়া যাওয়া, এক ইমামের ডাকে লক্ষ লোকের এক কাতারে এক সংগে রুকু-সিজদায় যাওয়া, আল্লাহ আকবর ধ্বনির এক ডাকে ওঠা, আরেক ডাকে বসা, ধুম-ধরক্কিহীন শাসনহীন এমন ম্যাজেস্টিক উপাসনা, ছোট-বড়-ধনী গরিব-চাকর-মুনিব-নির্বিশেষে সকলে এক কাতারে এক সংগে উপাস্যের সামনে মাথা লুটাইয়া দেওয়া, মানব-মনের উপর এর কোনও তাসির নাই? সে তাসিরটা সমাজ-কল্যাণমুখী নয় কি বাবা?

হামিদ শ্রদ্ধা ভরে প্রিন্সিপাল সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাঁর কথা শেষ হইলে অতি সন্তুর্পণে বলিল: কিন্তু স্যার, ঐ ক্ষণিকের ডিসিপ্লিনে আর ছোট-বড় সবাইকে এক কাতারে দাঁড় কারানোতে স্থায়ী কি উপকার হয়? আত্ম-বিকাশের কি উপকারটা হয় তাতে?

প্রিন্সিপাল: নিশ্চয়ই হয়। আল্লার সামনে আমরা সবাই সমান, তাঁর বিচারে উচ্চ-নিচ নাই, দৈনিক পাঁচ বার, সপ্তাহে একবার বছরে দুইবারের এই অনুভূতিটা নিশ্চয়ই মানুষের আত্মাকে উন্নত, মনকে প্রসারিত ও দৃষ্টিকে উদার কৈরা থাকে।

হামিদ বিনয় ও দৃঢ়তা মিশাইয়া বলিল: কিন্তু স্যার, বেহেশতের আরামের লোভে আর দুখের আগুনের ভয়ে যারা দিন-রাত আল্লা তোষামোদ গুণকীর্তন করে, রাজা-বাদশার দরবারের মোসাহেবদের চেয়ে তারা কোন দিকে বড়? উভয়ের জন্যই ত ঐ চাটুকারিতা তাদের ব্যবসা মাত্র। ওতে ওদের আত্মা দিন-দিন ছোট হয় ছাড়া বড় হয় না।

প্রিন্সিপাল সাহেব তেমনি হাসিয়া বলিলেন: তোমার আপত্তি আমি বুঝতে পারছি বাবা। ওতে তোমার আত্মার মহত্বই প্রমাণিত হৈতেছে। তুমি যতদিন নমাজকে চাটুকারিতা মনে করবা ততদিন তোমার নমাজ না পড়াই উচিত। তুমি যেদিন বুঝবা এবাদত চাটুকারিতা নয়, আত্মোপলব্ধি মাত্র, শুধু সেইদিনই তোমার জন্য নমাজ ফরয। তার আগে নয়। এ অনুভূতি আসবে তোমার সেইদিন যেদিন তুমি আল্লাকে প্রবল পরাক্রান্ত ডিস্টেক্টর মনে করবা না, তাঁকে মনে করবা চরম সত্য, চরম অভীষ্ট হক রূপে। তখন সে হক হৈব তোমার শ্রেয়। সে শ্রেয়কে তুমি প্রেয় রূপে ধারণা করবা। সেই প্রেয়লাভের জন্যই করবা তুমি তার সাধনা। এরই নাম এবাদত।

হামিদ আগ্রহের সাথে বলিল: স্যার, আপনে বোধ হয় ধৈর্য নিছেন, আমি খোদার অস্তিত্বই স্বীকার করি না। এ কথা যদি কেউ কৈয়া থাকে, তবে সে আমার কথার ভুল অর্থ করছে। আমি আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধেই বলি, খোদার অস্তিত্বই বিরুদ্ধে কোনও কথা বলি না।

প্রিন্সিপাল সাহেব হাসিয়া বলিলেন: পরিণামে দুইটুকু একই কথা বাবা। ধর্ম-বিরোধিতা খোদা-বিরোধিতার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

একটু দম নিয়া প্রিন্সিপাল সাহেব আবার বলিলেন: তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানের প্রাণই হচ্ছে জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার গোড়ার কথা সন্দেহ, পয়েন্ট সন্দেহ, অবিশ্বাস। তোমার তরুণ মনের জিজ্ঞাসা, তোমার সন্দেহ-অবিশ্বাসকে কাজেই আমি দোষের মনে করি না। সন্দেহ-অবিশ্বাস ছাড়া শুধু বিশ্বাস নিয়া কেউ বিজ্ঞানী হৈতে পারে না। যে মনে সন্দেহ-অবিশ্বাস নাই সে মন মৃত। সে জন্য আমি তোমারে দোষ দেই না। আমার আপত্তি অন্যখানে।

হামিদ কৌতূহলে জিজ্ঞাস করিল: কোথায় আপনার আপত্তি স্যার?

প্রিন্সিপাল: সন্দেহ পোষণে আমার আপত্তি নাই, প্রচারেই আমার আপত্তি। বিজ্ঞানে সাফল্য লাভ করতে হৈলে তোমার মনকে বিজ্ঞানী করতে হবে। বিজ্ঞান সন্দেহ পোষণ করতেই বলে, প্রচার করতে বলে না। যে সন্দেহকেই ডগমা মনে করে তার মনের দরজা ত বন্ধ। তোমার মনোবিকাশের এটা সন্দেহ-অবিশ্বাস সুতরাং জিজ্ঞাসার যুগ। যত ইচ্ছা সন্দেহ পোষণ কর। কিন্তু ওটাকেই যদি চরম সত্য রূপে ধৈর্য বস তবে তোমার মনের বিকাশের রাস্তা বন্ধ হৈয়া গেল।

সকলে দেখিয়া অবাক হইল হামিদ আর আগের মতো কথা বলে না। প্রিন্সিপাল সাহেব খুব ডাটিয়া দিয়াছেন, সকলে ধরিয়া নেয়।

হামিদ আই. এস. সি. পাশ করিল ফাস্ট ডিভিশনে। স্ট্যাণ্ড করিয়া স্কলারশিপও পাইল একটা বিশ টাকার।

কিন্তু আই. এস.সি. পাশ করিয়া কি করিবে, কোন লাইন ধরিবে, এ নিয়া চিন্তা করিয়াছে সে পরীক্ষা দিবার পর হইতেই। দুলাভাইর সাথে পরামর্শ করিয়াছে অনেক। জ্ঞানের প্রতি হামিদের বরাবরের টানের কথা বিবেচনা করিয়া তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। বি. এস.সি. এম. এস. সি. পড়িয়া শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রফেসর হইতে। তিনি আশা করিয়াছিলেন, হামিদ এই পরামর্শ লুফিয়া লইবে। কিন্তু তিনি দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, হামিদ তার মত গ্রহণ করিল না। তার বদলে সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার ইচ্ছা জানাইল।

দুলাভাই হামিদের এই আকস্মিক মত পরিবর্তনে বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন না যে এটা হামিদের মত পরিবর্তন নয়। বরঞ্চ এটাই তার ছেলেবেলার স্বপ্ন। সিলাইর কল থামোফোন হইতে শুরু করিয়া রেল-স্টিমার মোটর-হাওয়াই জাহাজ পর্যন্ত কোনো জিনিসই মুসলমানরা তৈয়ার করে না শুনিয়া সেই যে ছেলে-বেলায় জিদ হইয়াছিল আই. এস. সি. পরীক্ষা দিয়া সেই ভুলিয়া-যাওয়া সংকল্প তার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। আই. এস. সি. পাশ ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে পারে, ফাস্ট ডিভিশন হইলে এডমিশনের কোনও অসুবিধা নাই শুনিয়া অবধি সে ঢাকা আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়া একরূপ স্থিরই করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু যত গোলমাল লাগাইলেন দুলাভাইটা। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব ওয়াদা স্মরণ করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, এ বিষয়ে হামিদ যা স্থির করিবে, সেটাই চূড়ান্ত, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কাজটাকে তিনি যেভাবে কুলি-মজুরের কাজ বলিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবে এবং নিজের কথার পক্ষে যেসব যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিলেন, তাতে হামিদের উৎসাহ অনেক দমিয়া গেল। অথচ দুলাভাইর মতানুসারে বি.এস.সি. এম. এস.সি. পড়িতেও মন বসাইতে পারিল না। সে কার কাছে শুনিয়াছিল এম. এস.সি. পাশ করিয়া প্রফেসরি বা মাস্টারি করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। স্বাধীনভাবে কিছু করার উপায় নাই চাকরিকে হামিদ শুধু ভয় করে না ঘৃণাও করে।

শালা-দুলাভাইর মধ্যকার এই মতভেদ অবশ্য কার্যতঃ কিছুই গুরুতর ছিল না। কারণ দুলাভাই সবই হামিদের মতের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু সে এটাকে একটা সমস্যা রূপেই দেখিল। এমন সমস্যার সমাধান দিতে পারেন হামিদের মতে একই ব্যক্তি। তিনি প্রিন্সিপাল সাহেব। হামিদ দুলাভাইর কাছে সে কথা বলায় তিনি সোৎসাহে তাতে মত দিলেন। উভয়ে একমত হইলেন এবং বড়-বুও সায দিলেন যে এ বিষয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের মত লওয়া হউক।

পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পরদিনই হামিদ সিরাজগঞ্জে গেল। প্লেইস রাখিয়া ফাস্ট ডিভিশন পাওয়ায় সবাই তাকে কংগ্রেচুলেট করিলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব নিজেই জিগ্গাস করিলেন, এর পর হামিদের কি ইচ্ছা?

হামিদ নিজের ইচ্ছা ছেলেবেলার স্বপ্নসহ বিস্তারিত বলিল। সেই সংগে দুলাভাইর মতটাও খুলিয়া বলিল। শেষ পর্যন্ত প্রিন্সিপাল সাহেবের মত নেওয়াই সকলের ইচ্ছা তাও বলিল।

চেরাগের সলিতা বদল

সব কথা শুনিয়া প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন: বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার দুইটাই আমার পছন্দে। আমাদের দেশে দরকারও আছে উভয়ের। কিন্তু আমার মনে হয় বাবা তোমার লাইন ডাক্তারি। তুমি মানব-সেবার যে সুযোগ পাবা এমন আর কিছুতেই পাবা না। আর আমাদের দেশের জন্য তার দরকারও খুব বেশি। দেশের অধিকাংশ লোক গরিব, অশিক্ষিত। চিকিৎসার পয়সা নাই, স্বাস্থ্য-রক্ষার জ্ঞান নাই। কাজেই রোগও তাদের মধ্যে বেশি। ডাক্তারের সংখ্যা সে অনুপাতে কত কম। যে অল্প-সংখ্যক ডাক্তার আছেন, তাদের প্রায় সবাই অর্থ-লোভী। তারা স্বার্থপর। মানবতার প্রতি তাদের কোন দরদ নাই। তোমার মতো দরদী ডাক্তারের সংখ্যা যত বাড়বে, গরিব জনসাধারণের সুদিন তত কাছে আসবে। রোগজীর্ণ অসহায় দেশবাসীর মুখে সেদিন হাসি ফুটবে।

হামিদের জন্য ইহাই ছিল যথেষ্ট। সেই দিনই স্থির করিয়া ফেলিল সে মেডিক্যাল কলেজেই ভর্তি হইবে। বড়-বু ও দুলাভাইকে সে মর্মে চিঠি লিখিয়া দিল।

হামিদ বিদায়ের কথা বলিলে ছাত্র-বন্ধুরা অত সহজে ছাড়িল না। কলেজের ছাত্র-ইউনিয়ন হামিদকে বিদায়-সম্ভাষণ দিবে ঠিক করিল। কয়েকজন অধ্যাপক, এমনকি গভর্নিং বডির কোনও কোনও মেম্বর এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। এর পিছনে প্রিন্সিপাল সাহেবের ইশারা ছিল।

নির্ধারিত দিনে বিপুল উদ্যমের সাথে সম্বর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হইল। ছাত্র-ইউনিয়নের তরফ হইতে ছাপা অভিনন্দন পত্রে হামিদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইল। তার সিরাজগঞ্জ ত্যাগে ছাত্র-বন্ধুদের মর্ম-বেদনার কথা বলা হইল। হামিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র আঁকা হইল। সভাপতির ভাষণে প্রিন্সিপাল সাহেব ভাব-গম্ভীর ভাষায় হামিদ সম্পর্কে এমন সব প্রশংসা-সূচক কথা বলিলেন, যাতে অন্যেরা ত বটেই স্বয়ং হামিদও বিস্মিত হইল। জবাবে হামিদ ভাবাবেগপূর্ণ ওজস্বী বক্তৃতা দিল। আবেগ-পূর্ণ ভাষায় সে যখন বলিল যে কর্তব্যের টানে সিরাজগঞ্জ ছাড়িয়া গেলেও তার অশরীরী আত্মা সর্বক্ষণ ছাত্র-বন্ধুদের বুকের কাছে এবং অধ্যাপকদের বিশেষতঃ প্রিন্সিপাল সাহেবের পায়ের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তখন অনেকেই রুমালে চোখ মুছিলেন।

শেষদিন সবগুলি হোস্টেলের সিটে-সিটে ঘুরিয়া ছাত্র-বন্ধুদের সকলের নিকট, আশে-পাশের অধ্যাপকদের বাড়ি গিয়া তাঁদের কাছে বিদায় লইয়া সকলের শেষে গেল প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায়। প্রিন্সিপাল সাহেব হামিদের জন্য অপেক্ষাই করিতেছিলেন।

এতক্ষণে হামিদের মন পুড়িতে লাগিল। ঢাকায় যাওয়া, মেডিক্যাল কলেজে পড়া, নতুন পরিবেশ ভোগ করা ইত্যাদি ব্যাপারে কল্পনায় এতক্ষণ তার বুকে যে পুলক-চাঞ্চল্যটা নাচিতেছিল, প্রিন্সিপাল সাহেবকে দেখা মাত্র এক মুহূর্তে সে सबের অবসান হইল। এই স্নেহময় মহাজ্ঞানী লোকটির নিকট হইতে হয় ত চিরতরে বিদায় নিতে সে আসিয়াছে। হয়ত জীবনে এই লোকটির পুণ্য সংসর্গ, মূল্যবান উপদেশ আর পাইবে না। চোখ ঠেলিয়া পানি আসিতে লাগিল। গলার স্বর জড়াইয়া গেল। সে কথা বলিতে পারিল না। প্রিন্সিপাল সাহেবের বুড়া শুকনা চোখও ভিজিয়া উঠিল।

অবশেষে প্রিন্সিপাল সাহেবই নীরবতা ভাংগিলেন। অতি সহজভাবে তিনি বলিলেন: এক কাপ চা না খায়া তুমি যাবার পারবা না বাবা। বস, দুমিনিট কথা কই। তারই মধ্যে চা আইসা পড়বে।

উভয়ে বসিলেন। প্রিন্সিপাল সাহেবই কথা বলিলেন। স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই যেন তিনি বলিলেন: আজ বিদায়ের দিনে আমাদের শেষ পরিচয়টা হৈয়া যাওয়া উচিত। বুড়া হৈলেও আমার মধ্যে ইমোশন আছে। কিন্তু আজ ইমোশনের কথা থাক। তুমি বিজ্ঞানী, আমি দার্শনিক। তোমার-আমার পরিচয় নতুন ত না-ই আকস্মিকও না। আমার উপদেশে দীর্ঘ একটা বছর ধর্মের বিরুদ্ধে কোনও কথা না বৈলা মুখ বুইজা কাটাইছ, কলেজ এডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান হিসাবে আমি সে জন্য আনন্দিত ও গর্বিত। কিন্তু দার্শনিক হিসাবে আমি চিন্তিত। আমার সব সময়ে এই দুর্ভাবনা হৈছে তোমার মনের নর্মাল গ্রোথে বাধা দিলাম বুঝি।

হামিদ কৌতূহলে প্রশ্ন করিল: কেমনে স্যার?

প্রিন্সিপাল: তোমার মনে আছে, যেদিন তুমি বলছিলি তুমি ধর্ম মান না কিন্তু খোদা মান, জবাবে আমি কইছিলাম ধর্ম না মানাটা খোদা না মানারই প্রথম পদক্ষেপ।

হামিদ হাসিয়া স্বীকার করিল: জি হাঁ, স্যার, আমার মনে আছে। কিন্তু বাধা দিলেন কই?

প্রিন্সিপাল: আমার আশঙ্কা হৈছিল তুমি বুঝি আমার কথায় না সাবধান হৈয়া যাও।

হামিদের কৌতূহল বাড়িল। বলিল: আমারে সাবধান করাই ত আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল। মুরক্বিবদের উপদেশের মতলবই ত তাই।

প্রিন্সিপাল: ঠিক ঐ কারণেই আমার ভয় ছিল। আমার উপদেশের ফলে তুমি যদি প্রভাবিত হৈতা, তবে তুমি খোদা মানা ও ধর্ম না মানার স্তরেই থাইকা যাইত। তাতে তোমার মনের নর্মাল গ্রোথ বাধা-প্রাপ্ত হৈত। তোমার মন স্থির হৈয়া যাইত। আজ তাই আমার জিগ্গাসা, তুমি কি আজো সেই ধর্ম-না-মানা-কিন্তু-খোদা-মানার স্তরেই আছ? না খোদা-না-মানার স্তরে পৌঁছিয়া গেছ?

এটা ছিল হামিদের মনের গোপন কথা। প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে ধরা দেওয়ার মোটেই তার ইচ্ছা ছিল না। কারণ তার নিজের বিচারেই ছিল এটা তার পরাজয়। আজ সত্যই সে খোদা মানে না। অথচ সেদিন সে বড়াই করিয়া বলিয়াছিল ধর্ম মানা-না-মানার সাথে খোদার কোনও সম্পর্ক নাই। ধর্ম ও খোদা সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। ধর্ম মানুষের সৃষ্টি। খোদা স্বয়ং-সৃষ্টি। কোরআনের ভাষায় সামাদ। সেদিন তার মনে খুবই জোর ছিল ধর্ম-বিরোধিতা তার মনে কখনো খোদা-বিরোধিতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কিন্তু পরে হামিদের মনের পরিবর্তন হইয়াছে। সত্যই এখন আর সে খোদা মানে না। প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে এই পরাজয়টা গোপন রাখিয়াই সে সিরাজগঞ্জ হইতে বিদায় হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আজ প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে সে কথা গোপন রাখা সম্ভব হইল না।

বিশ্বয়ে হামিদ বলিল তবে কি স্যার আপনি আশা করতেছিলেন, ধর্ম না মানার পরিণাম রূপে আমি যেন খোদার অস্তিত্বেও আস্থা হারাই।

প্রিন্সিপাল: হাঁ, বাবা, তাই আশা করতেছিলাম। প্রার্থনা করতে ছিলামও বলতে পার।

হামিদের বিশ্বয় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। বলিল: কেন স্যার? তবে কি আমি আপনার স্নেহ হারাইছি?

হাসিয়া প্রিন্সিপাল বলিলেন: না বাবা। তোমারে স্নেহ করি বৈলাই অমন করছি। কারণ এটাই চিন্তার কনটেম্প্লেশন-মেডিটেশনের ফুল সার্কেল। ফুল সার্কেল না ঘুইরা কোনও কিছুই পরিপূর্ণ হয় না। ফিযিক্সে তুমি পড়ছ বিজ্ঞানের একটা সার্কিট আছে। ওটা কাটা গেলে বিজ্ঞান মৃত। মনোবিকাশের সার্কিট পূর্ণ না হৈলে মনও তেমনি মৃত। আমি তোমারে অনেকদিন কইছি, সুবা-সন্দেহ যেমন জ্ঞান সাধনার স্টার্টিং পয়েন্ট, সন্দেহের চরম পরিণতিই তেমনি জ্ঞান লাভের স্টার্টিং পয়েন্ট। সব শক্তি ও পদার্থ সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। অবিশ্বাস হৈতেই জ্ঞান। সমস্ত শক্তির কেন্দ্র, সমস্ত পদার্থের মূলসূত্র। খোদা সম্বন্ধেও কাজেই এটা সত্য। তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ না কৈরা কেউ তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। বিশ্বাস আর জ্ঞান এক জিনিস নয়। মারেফাতের এটাই পয়লা সবক। এই সবক হাতে কলমে পরখ করেন হংরত ইমাম গায্যালি। তিনি প্রায় সারা জীবন নাস্তিক থাকার পর বুড়া বয়সে খোদা-বিশ্বাসী হৈছিলেন। এই নাস্তিকতা তাঁর ভাব-বিলাসিতা ছিল না। ছিল ওটা সত্য-সন্ধানীর জ্ঞান-পিপাসা।

হামিদ অনুভব করিল, তার মন হারিয়া যাইবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়িয়া দেখা হামিদের ছেলেবেলার অভ্যাস। শেষ চেষ্টা রূপে সে বলিল: কিন্তু স্যার ইমাম গায্যালি ত বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুফী।

প্রিন্সিপাল: এটা তোমার ভুল বাবা। ইমাম গায্যালি সুফী ছিলেন না, তিনি ছিলেন জ্ঞান-সাধক। ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধিবাদী। বুদ্ধিবাদী কখনো নাস্তিক হৈতে পারেন না; সুফীও হৈতে পারেন না। এথিয়ম ও সুফিয়ম দুইটাই কাল্ট। কাল্টই পরিণত হয় ডগমাতে। ডগমা গোড়ামি। কোনও বুদ্ধিবাদীই গোঁড়া হৈতে পারেন না। তাঁর মন যুক্তিবাদী, সুতরাং বৈজ্ঞানিক, কাজেই পরিবর্তনীয়। তার মানেই ডিভেলপিং উন্নতিশালী।

হামিদ প্রিন্সিপাল সাহেবের কথা হইতেই মুক্তি টানিয়া বলিল: গায্যালি বিজ্ঞানী হৈলে তাঁর ঐ পরিবর্তন হৈত না। বিজ্ঞান যেমন ধর্ম মিথ্যা প্রমাণ করছে খোদাকেও তেমনি অস্তিত্বহীন প্রমাণ করছে।

প্রিন্সিপাল জ্ঞানীর ঐতিহাস্য করিয়া বলিলেন: আসলে বাবা বিজ্ঞান খোদা বা ধর্ম কোনোটাই মিথ্যা প্রমাণ করে নাই। যেমন করে নাই প্রকৃতিকে। মানুষ বিজ্ঞান শিখবার আগে যেমন প্রকৃতিকে বুঝত না, ধর্ম ও খোদাকেও তেমনি বুঝত না। বিজ্ঞান শিইখা এখন আমরা যেমন প্রকৃতির মধ্যে নিত্য-নতুন রহস্য আবিষ্কার করিতেছি, আগে যাকে সত্য মনে করতাম, তা যেমন মিথ্যা প্রমাণিত হৈতেছে, নিত্য-নতুন জ্ঞানে যেমন আমাদের পুরান ভ্রান্ত ধারণা দূর হৈয়া যাইতেছে, ধর্ম খোদা সম্বন্ধেও অবিকল তাই ঘটবে, ঘটুক হৈয়া গেছে।

হামিদ এখন প্রিন্সিপাল সাহেবের যুক্তির দুর্বলতা ধরিয়া ফেলিল। সে বাধা দিয়া বলিল: কি হৈতেছে স্যার? বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাস ফিইরা আসতেছে কইতে চান? কি কৈরা সেটা সম্ভব? মানুষের সৃষ্টি, পৃথিবীর আকার, চান-সুরক্ষ্য ও দুনিয়ার অবস্থিতি সব ব্যাপারেই ত স্যার বিজ্ঞান ধর্ম-বিশ্বাস ভাইংগা চুরমার কৈরা দিছে। তবু কইতে চান, বিজ্ঞানীরা পুনরায় ধর্ম-বিশ্বাসী হৈয়া উঠব।

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন: হাঁ বাবা, তবু কইতেছি। বিজ্ঞান নতুন কিছুই সৃষ্টি করে নাই, আবিষ্কার করছে মাত্র। অবৈজ্ঞানিক মন প্রকৃতির

যে ব্যাখ্যা ইন্টারপ্রিটেশন করত, বিজ্ঞানীগণ তা করে না। ঠিক তেমনি অবিজ্ঞানী মন খোদা ও ধর্মের যে ইন্টারপ্রিটেশন করে বিজ্ঞানী মন তা করবে না। কাজেই এটা শুধু ইন্টারপ্রিটেশনের ব্যাপার, আবিষ্কারের ব্যাপার। ভাংগা-গড়ার রদবদলের ব্যাপার নয়। বিজ্ঞান প্রকৃতিতে কিছু যোগও করে নাই, কিছু বিয়োগও করে নাই। করেছে শুধু ডিসকভারি ও ইন্টারপ্রিটেশন। ঠিক তেমনি ধর্মেও কিছু যোগ-বিয়োগ করতে হবে না। করতে হবে শুধু ব্যাখ্যা ও আবিষ্কার। বিজ্ঞানী ও অবিজ্ঞানী বিদ্বান ও মূর্খ ও বালগ ও নাবালগ একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা কৈরা থাকে। দুই-এর বিচারের মাপকাঠি এক নয়, কারণ দুইএর জ্ঞানের স্তর এক নয়। ব্যক্তি সম্বন্ধে যা, গোষ্ঠী সম্বন্ধেও তাই। মানব-মন যুগে-যুগে যেমন-যেমন ক্রমবিকাশ লাভ করবে, ধর্ম ও খোদার অন্তর্নিহিত সত্যও তার কাছে তেমনি ক্রমে বিকাশ লাভ করবে। সব শিক্ষারই ধারা এই। মকতব পাঠশালায় তোমরা যখন বর্ণ পরিচয় শিখছিল, তখন তোমার কাছে হরফের যে অর্থ ও ইমেজ ছিল, এখন তা নাই। সবই এখন নতুন অর্থ ও ইমেজ ধারণ করছে। শিশুকালে এই সব অর্থ ও ইমেজের কথা বললে কোনও শিশুই বুঝত না।

একটু দম ধরিয়া প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন: আমি জানি বাবা তোমার মধ্যে আগুন আছে। আমি দোওয়া করি সে আগুনের তেজ বাড়ুক কিন্তু সে নারের তেজে নিজে পুইড়া মৈরো না। সে নার মিনার হোক। তুমি নিজে আলোকিত হও। পরকে পথ দেখাও।

হামিদ হাসি-মুখে প্রিন্সিপাল সাহেবকে কদম দ্বিগুণ করিয়া এমনভাবে বিদায় নিল যেন প্রিন্সিপাল সাহেবের আজকার কথার উজ্জ্বল আলোকে তার মনের সুবা-সন্দেহের সব অন্ধকার দূর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু

পথে আসিতে-আসিতে হামিদ মনে-মনে হাসিল। মানুষের বিশ্বাসপ্রবণ মন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মতো দুইটা পরস্পর বিরোধী বিষয়ের সমন্বয় ঘটাইবার কত বৃথা চেষ্টাই না করিতেছে। দুঃখ হইল তার প্রিন্সিপাল সাহেবের জন্য। অতবড় পণ্ডিত হইয়াও তিনি সংস্কার-মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। বাপের মতই তিনি হামিদকে সারা অন্তর দিয়া স্নেহ করেন। হামিদের ব্যথা সেইখানে। নিজের বাপের জন্য তার দুঃখ নাই। দুনিয়ার কোনও খবরই তিনি রাখেন না। জ্ঞানের আলোকে তাঁর মন আলোকিত হয় নাই। কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেব? বিদ্যার জাহাজ, মহাপণ্ডিত তিনি। তিনি বিজ্ঞানও ছাড়িতে পারেন না, ধর্মও ছাড়িতে পারেন না। তাই দুইটার মিল দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিজের পাণ্ডিত্যের অপচয় করিতেছেন। ভদ্রলোকের মনে শান্তি নাই নিশ্চয়ই।

চেরাগে আগুন লাগিল

১

বছর না ঘুরিতেই মেডিক্যাল কলেজে হামিদ সুপরিচিত হইয়া পড়িল। মানে পপুলার নয়, নটোরিয়াস। কারণ দুইটি। এক. পড়াশোনায় সে অতিভাল। দুই. মতোবাদে সে অতি-বিপ্লবী। পড়াশোনায় প্রমাণ-মতো ভাল হওয়া দোষের নয়। মাঝে-মাঝে শ্রদ্ধা দিয়া, ফরাসী বিদায় লইয়া নিয়মিত ক্লাস করাও দোষের নয়। কিন্তু রোজ-রোজ প্রতি ঘন্টায় পাঁচ মিনিট আগে ক্লাসে যাওয়া, পয়লা কাতারে বসিয়া প্রফেসারদের হরেক লেকচারের নোট নেওয়া, প্রফেসারদের ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন করা, প্রফেসারদের কঠিন-কঠিন প্রশ্নের চট্ করিয়া জবাব দেওয়া এবং সে জবাব ঠিক হওয়া এবং সেজন্য প্রফেসারদের প্রশংসা পাওয়া, এসবই অন্যায় বাড়াবাড়ি। আর আজকাল প্রগতিবাদী বামপন্থী বিপ্লবী হওয়া ভাল। কিন্তু ধর্মনীতিতে অতি-বিপ্লবী নাস্তিক রাজনীতিতে কমিউনিস্ট হওয়া অথচ মুখে ইয়া বড় দাড়ি রাখা নিশ্চয় দোষের। হামিদের এই দুইটা দোষই আছে। সেজন্য সে সকলের সমালোচনার পাত্র।

হামিদ কড়া পর্দা-প্রথার মধ্যে মানুষ। সে পরিবেশে যুবতীরা তাকেই আট-ন বছরের মেয়েরাও পর্দা করে। হামিদ জীবনে কোনও যুবতীর সাথে কথা কয় নাই। টেনে-স্টিমারে রাস্তা-ঘাটে ছাড়া কোনও যুবতী মেয়েকে চোখেও দেখে নাই। হামিদের আশ্রয় ও বোনেরা যখন নাইওর করিতেন তখন পালকি আশ্রয় বাড়ির উঠানে রাখিয়া বেহারারা বাহিরে চলিয়া যাইত। মেয়েরা পালকিতে উঠার পর পালকির দরজা বন্ধ করা হইত। বন্ধ পালকির উপর একটা মোটা কাল কাপড়ের গেলাফ জড়াইয়া গোটা পালকিটাই ঢাকিয়া ফেলা হইত। তারপর বেহারাদের বাড়ির ভিতর ঢাকিয়া আনা হইত। পালকিতে উঠিবার সময় যেমন, নামিবার সময়ও তেমনি, বেহারাদের সারাইয়া দেওয়া হইত। টেনে-স্টিমারে উঠিবার সময় পালকির দুদিকে দুইটা পর্দা টানিয়া ধরা হইত। অবশ্য রাস্তাঘাটের জন্য কোনও কোনও মুসলমানের মধ্যে বোরখার চল হইয়াছে। কিন্তু সেটা হামিদদের মতো শরিফ লোকের জন্য নয়।

তবে পর্দার ব্যাপারে হামিদ একটা অসংগতি লক্ষ্য করিয়াছে। সে দেখিয়াছে গরিব মুসলমানদের মধ্যে তেমন পর্দা নাই। ফতেপুরেও হামিদ লক্ষ্য করিয়াছে, অন্যান্য জায়গায়ও দেখিয়াছে, সাধারণ গৃহস্থ মেয়েরা বাহির বাড়িতে সংসারের কাজকর্ম করে। বেগানা পুরুষের আঁহট পাইলেই বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে, অথবা কোন ঝোপে-জংগলের আড়ালে মুখ লুকায়। মুখ লুকাইবার মতো জায়গা না পাইলে অন্তত মাথার কাপড়টা টানিয়া মুখ ঢাকে। মুখ ছাড়া শরীরের আর সব জায়গা কিন্তু দেখা যায়। হামিদের শিশু মনেও প্রশ্ন জাগিয়াছে এটা কেমন পর্দা হইল? কিন্তু গরিব গৃহস্থের বাড়িতেই শুধু নয়, নিজেদের বাড়িতেও হামিদ এই অসংগতি দেখিয়াছে। হামিদের আশ্রয় ও বোনেরা যেরূপ ধুম-ধরকি করিয়া পালকিতে উঠিতেন নামিতেন, তাঁদের

সংগের চাকরানীরা কিন্তু তেমন করিত না। তারা প্রায় বেহারাদের সামনেই ডুলিতে উঠিত। পথে যাইতে-যাইতে অনেক সময় তাদের কেউ-কেউ ডুলির ঢাকনির কাপড় উঁচা করিয়া চারদিক একটু দেখিয়া লইত। হামিদ লক্ষ্য করিয়াছে হিন্দুদের মধ্যে পর্দা নাই। আর গরিবরা গরিবই, তাদের পর্দা করিলে চলে না। তাই ব্যাপারটা হামিদের এখন গা-সহা হইয়া গিয়াছে।

আরও একটা বিষয় হামিদের চোখে অসংগত লাগিয়াছে। সে দেখিয়াছে বুড়া মেয়েদের চেয়ে যুবতীদের মধ্যেই পর্দার কড়াকড়িটা বেশি। এই লইয়া বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠীদের সংগে তার তর্ক হইয়াছে। পর্দা সম্বন্ধে কোরআন-হাদিস ও বই-পুস্তকও সে বেশ পড়িয়াছে। তাতে তার সন্দেহ ঘুচে নাই, বরঞ্চ বাড়িয়াছে।

রেল-স্টিমারে সে অনেক বেপর্দা মেয়েলোক দেখিয়াছে যাদের গায় বোরখাও নাই, মাথায় ঘোমটাও নাই। হামিদ জানিতে পারিয়াছে ঐসব মেয়েরা হয় হিন্দু, নয় গরিব মুসলমান। কালে-ভদ্রে হামিদ টেন-স্টিমারের প্রথম শ্রেণীর কামরায় দু-এক জন বেপর্দা মুসলিম মহিলাকেও দেখিয়াছে। তাদেরে নাসারাদের অন্ধ অনুকারী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে। ফলে হামিদের পর্দা সম্পর্কে মোটামুটি এই ধারণা হইয়াছে যে পর্দাটা শরাফতের লক্ষণ। শরিয়তে সকল মুসলমানের জন্যই পর্দার হুকুম থাকা সত্ত্বেও শুধু বড় লোকদের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ কেন, এ প্রশ্ন হামিদ নিজেই একদিন হাঙ্গামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। পীর সাহেব জবাবে বলিয়াছিলেন: ও-নিয়ম সকলের জন্যই, অবস্থা-গতিকে কেউ পারে, কেউ পারে না। হামিদ এই যুক্তি মার্কিয়া নিয়াছে। এই কারণেই পর্দাটা আরও বেশি করিয়া শরাফতির প্রমাণ বলিয়া হামিদের মনে হইয়াছে।

বিজ্ঞান পড়ার দরুনই হোক আর স্বাধীন চিন্তার ফলেই হোক, সিরাজগঞ্জে থাকিতেই হামিদের চিন্তারাজ্যে অনেক যুক্তিবাদী পরিবর্তন আসিয়াছিল। কিন্তু দুইটা ব্যাপারে আজো সে আগের মতোই প্রাচীন-পন্থী মেজাজ রহিয়া গিয়াছে। একটা পর্দা, আরেকটা দাড়ি।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার পর প্রথম-প্রথম কয়েক মাস সে একরূপ চোখ বুজিয়া কলেজ করিয়াছে। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে ক্লাসে গিয়া প্রথম কাতারের বেক্ষিতে বসিয়াছে। প্রধান উদ্দেশ্য যাতে মেয়ে ক্লাস-মেট্রা নজরে না পড়ে। হামিদ জানে কোরআন-হাদিস মতে মেয়ে-পুরুষ এক জমাতে নমাজ পড়িতে পারে, কিন্তু মেয়েদের দাঁড়াইতে হইবে পুরুষদের পিছনের কাতারে। হামিদ অন্তত ক্লাসে এই নিয়ম পালন করিয়া চলিল। তার এই দুর্বলতা সহপাঠীদের কাছে গোপন থাকে না। হামিদকে উত্যক্ত করিবার দুরভিসন্ধি লইয়া সহপাঠীরা নানা প্রকারে হামিদের আগের কাতারে বসিবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিত। কোন সময় হামিদ থুথু ফেলিবার অথবা পেশাব করিবার জন্য বাহিরে যাওয়া-মাত্র অন্য ছাত্র আসিয়া তার সিট দখল করিত। উদ্দেশ্য, হামিদকে পিছনের কাতারে যাইতে বাধ্য করা। কোনও দিন সামনের কাতারে-বসা হামিদের পাশে আসিয়া দুই একজন ছাত্রী ঠাসিয়া বসিত। এইভাবে হামিদ অনেক উত্যক্ত হইয়াছে। তবু মেয়েদের সম্পর্কে তার লজ্জা দূর হয় নাই। বরঞ্চ সহপাঠী ছাত্র-ছাত্রীরা তার লজ্জা ভাংগিবার জন্য যত বেশি বাড়াবাড়ি করিয়াছে, হামিদের লজ্জা যেন তত বাড়িয়াছে। আসলে শেষ পর্যন্ত লজ্জা ততটা ছিল না যতটা ছিল জিদ।

মেয়েদের এড়াইয়া চলিবার এই জিদের মূলে ছিল তার নারী-ভীতি। মেয়েলোককে হামিদ সত্য-সত্যই ভয় করিয়া চলিত। এই ভয়ের গোড়ায় ছিল অবিশ্বাস। হামিদের ধারণা নারী জাতিকে বিশ্বাস নাই। সে কেতাবে পড়িয়াছে: নারী জাতি শয়তানের ঘোড়া। বিবি হাওয়াই হযরত আদমকে গন্দম খাওয়াইয়া বেহেশত হইতে তাঁকে তাড়াইয়াছেন। হারুৎমারুৎ নামে দুইজন ফেরেশতার ফেরেস্তাগিরি গিয়াছে নারীর জন্য। আরবী-ফারসী-উর্দু-বাংলা সব কেতাবই এই একই কথা বলিয়াছে। শহীদে কারবালা, বাহার দানেশ, চাহার দরবেশ, তুতিনামা প্রভৃতি বহু কিতাবে হামিদ নারী জাতির বিশ্বাসঘাতকতার কত নজির পড়িয়াছে। বিশেষত ফারসী কবি মওলানা জামীর কবিতাটা হামিদ জীবনে ভুলিতে পারিবে না। এই কবিতায় আছে: এক বাদশাহ মুলুকের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে একটি উপদেশমালার পুস্তক লিখিতে বলেন। মহাপণ্ডিত বহু বৎসর একাধ্র সাধনা করিয়া আশি খণ্ডের একটি মহাগ্রন্থ রচনা করেন। এক এক খণ্ডেই আশি হাজার পৃষ্ঠা। বাদশাহ ঐ মহাগ্রন্থের সারমর্ম লইয়া গ্রন্থটিকে আরও ছোট করিতে বলেন। মহাপণ্ডিত তদনুসারে আশি খণ্ডকে ছোট করিয়া প্রথমে এক খণ্ডে আশি হাজার শ্লোকে সীমাবদ্ধ করেন। তাতেও বাদশাহ বলেন আরও ছোট করিতে। বাদশাহ হুকুমে মহাপণ্ডিত সেই আশি হাজার শ্লোকের সারমর্মকে প্রথমে চল্লিশ হাজার, পরে কুড়ি হাজার ও ক্রমে দশ হাজার, এক হাজার, একশ, পঞ্চাশ, পঁচিশ, দশ, শ্লোকে এবং সর্বশেষে একটি মাত্র বাক্যে পরিণত করেন। এই মহাবাক্যটি হইতেছে: “নারীজাতিকে বিশ্বাস করিও না।” সমস্ত আউলিয়া-দরবেশ এক বাক্যে বলিয়াছেন: “নারীকে পাইতে চাও, নারী বর্জন কর। সেইজন্য হামিদ সংকল্প করিয়াছিল, খাজে-খয়ের ও পয়গম্বর সাহেবের দিদার পাইবার শর্ত স্বরূপ সে বিবাহ করিবে না। এটা অবশ্য ছেলেবেলার সংকল্প। নারী জাতির আবশ্যিকতা সম্বন্ধে তার তখন কোনও জ্ঞান বা ধারণা ছিল না। নারী সম্বন্ধে তার ধারণা: এরা মায়াবিনী কুহকিনী।

এখন হামিদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। শরীয়ত, ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে তার মতবাদের পরিবর্তন হওয়ার সংগে-সংগে পর্দা-প্রথা সম্পর্কেও তার মত বদলাইয়াছে। এমন কি, এখন সে নারী স্বাধীনতা ও নারী শিক্ষারও সমর্থন করিয়া থাকে। নারীর দৈহিক প্রয়োজন সম্বন্ধে আজও তার কোনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না হইলেও সে সম্বন্ধে তার একটি অনুভূতি জাগিয়াছে। অনুমানে কতকটা ঠাहरও করিয়াছে। ফায়িল বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছেও অনেক কথা।

কিন্তু অত দিনের অভ্যাস ছেলেবেলার-গড়া স্বভাব পরিবার-গত সংস্কার সে ছাড়াইতে পারে না। দীর্ঘ একটা বছর মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াও সে সহপাঠী ছাত্রীদের সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে পারে না। তাদের দিকে চোখ তুলিয়া চাইতে পারে না। যতদিন যাইতেছে, বন্ধুদের নিকট হামিদ ততবেশি ঠাট্টা-মশ্কারার পাত্র হইতেছে। বন্ধুরা যত বেশি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতেছে, স্বমতে হামিদের জিদ তত বাড়িতেছে। অনেক সময় হামিদের মনে হইয়াছে, সে মেডিক্যাল কলেজে আর পড়িবে না; অন্য কোনও কলেজে ভর্তি হইবে, যেখানে মেয়েদের সাথে একত্রে পড়িতে হইবে না। কিন্তু হামিদ ছাড়ি-ছাড়ি করিয়াও মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িতে পারে নাই। কারণ ছাত্র হিসাবে এখানেও সে নাম করিয়াছে, শিক্ষকদের দৃষ্টি ও স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছে। ক্লাসের প্রথম কাতারে বসিবার হামিদের গোপন উদ্দেশ্য যাই থাক, শিক্ষকরা জানেন,

ভাল ছাত্র বলিয়াই হামিদ সামনে বসে। শিক্ষকদের বহু কালের অভিজ্ঞতা এই যে খারাপ ছাত্রেরা কখনও সামনের কাতারে বসে না। পড়া ফাঁকি দিবার জন্য, ফরাসী বিদায় লইবার জন্য, প্রক্সির সুবিধার জন্য দুষ্ট ছেলেরা চেষ্টা করিয়া বসে পিছনের কাতারে। হামিদ কোনও দিন তা করে না। কাজেই সে ভাল ছাত্র। নিয়মিত নোট করিয়া বুদ্ধি-দীপ্ত প্রশ্ন করিয়া সে প্রমাণ দেয়, সত্যি সে ভাল ছাত্র। বেশির ভাগ শিক্ষক ক্লাসে বক্তৃতা করিতে অধিকাংশ সময় হামিদের দিকে চাহিয়াই বক্তৃতা করেন। ভাল ছাত্রের নজির দিতে গিয়া তাঁরা অনেকেই হামিদের নাম করেন। এইভাবে এই কলেজের প্রতি এবং অনেক শিক্ষকের প্রতি হামিদের একটা প্রাণের টান জন্মিয়া গিয়াছে। এ কলেজ ছাড়িবার চিন্তা করিলেই তার বুকটা বেদনায় টন্টন্ করিয়া উঠে।

দাঁড়ি রাখে হামিদ অন্য কারণে। দাঁড়ির প্রতি তার ধর্মীয় আকর্ষণ দূর হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ থাকিতেই সে দাঁড়ি রাখিয়াছে। দাঁড়িতে কোনও দিন খুর দেয় নাই। দাঁড়ি তার লম্বা না হইলেও ওটা গাল-ভরা চাপদাঁড়ি। চেহারায়ে সে ফতেপুর পীর বংশের কোরায়েশী মুখ না পাইলেও দাঁড়িটি ঠিক বাপের পাইয়াছে।

সাধারণভাবে ঢাকার এবং বিশেষভাবে মেডিক্যাল কলেজের আবহাওয়ার চাপে ছ'মাসের মধ্যে সে দাঁড়িতে কাচি লাগাইয়াছে। মতলব, একদিনে খুর দিয়া না চাহিয়া কাঁচি দিয়া ক্রমে-ক্রমে দাড়ি শেষ করিবে। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর সে একাজে বাধা পায়। সে বাধা আসে সহপাঠী ছাত্রী ললিতার নিকট হইতে। ললিতাই মেডিক্যাল কলেজের একমাত্র ছাত্রী এই এক বছরে হামিদ যার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়াছে; স্বাভাবিক সুরে কথা বলিতে পারিয়াছে। ললিতার সাথে হামিদের কথা হয় নিতান্ত আকস্মিকভাবে। সে একদিন হামিদকে একা পাইয়া তিরস্কারের সুরে বলে: সব দুষ্ট ছেলেরা আপনারে ঠাট্টা-বিদূপ করে, আপনি তার প্রতিবাদ করেন না কেন?

হামিদের কাছে ললিতা অপরিচিতা। সে মেয়েদের দিকে চোখ তুলিয়া চায় না বলিয়াই জানে না, ললিতা তার এক ক্লাসের ছাত্রী। সে আড় চোখে চাহিয়া বলে: আমি কি করব না করব, তাতে আপনার কি? আপনি কে?

ললিতা নিজের পরিচয় দেয়। হামিদ বুঝে ললিতা হিন্দু। তার ধারণা হিন্দু মেয়েদের পর্দা না মানার অধিকার আছে। সে ছেলেবেলা হইতেই হিন্দু মেয়েদের ছোট-বড় ধনী-গরিব সকলকে বেপর্দাভাবে চলাফেরা করিতে দেখিয়াছে। সে শুনিয়াছে, হিন্দু শাস্ত্রে পর্দার কড়াকড়ি নাই। মেডিক্যাল কলেজে আসিবার পর বেপর্দা মেয়েদের মধ্যে হিন্দুদের সে ক্ষমার চোখে দেখিয়াছে। কিন্তু মুসলমান মেয়েদের ক্ষমা করে নাই। তার দৃঢ় বিশ্বাস বেপর্দা হিন্দু মেয়েদের মধ্যে সতী দু'চারজন থাকিতেও পারে, কিন্তু বেপর্দা মুসলমান মেয়েদের মধ্যে একজনও নাই। এরাই মায়াবিনী কুহকিনী। হিন্দু মেয়েরা নয়। কাজেই ললিতার পরিচয় পাইয়া হামিদ তাকে এড়াইয়া দৌড়িয়া পালায় না। এককথা-দুইকথায় তার সাথে অনেক কথা হয়। হামিদের ভাল লাগে। এরপর প্রায়ই ললিতার সাথে দেখা হয়। কথাও হয়। দুই-এক দিন ললিতার সাথে আরেকটা মেয়েকে দেখে। তারা দুটিতে খুব মিল। কিন্তু হামিদ জানিতে পারে ও-মেয়েটির নাম রাখিয়া। ও: তবে সে মুসলমান? হামিদ আর কথা কয় না। দ্রুতপদে আরেক দিকে চলিয়া যায়। ললিতা বুঝে রাখিয়ার সামনে ললিতার সাথে কথা বলিতে হামিদ নারাজ। উদ্দেশ্য হামিদের যাই থাক, ললিতা হামিদের এই মনোভাবের প্রতিবাদ করে না। বরঞ্চ

হামিদের সাথে কথা বলিবার ইচ্ছা হইলে ললিতা রাযিয়াকে পিছে ফেলিয়া আসে। এইভাবে ললিতার সাথে হামিদের বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়। এই ললিতাই একদিন হামিদের দাঁড়ি ছাটার প্রতিবাদ করে। ললিতা যা বলে, তাতে হামিদ তাজ্জব হয়। ললিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ললিতা যা বলে তার সারমর্ম এই: দাড়িতেই হামিদকে ভাল দেখায়। দাড়িটা একদম না ছাটিলে ভাল দেখাইত না ঠিক কিন্তু আর বেশি ছাটিলে হামিদকে অত সুন্দর দেখাইবে না। সব নারী পুরুষেরই মুখের গড়নে কিছু না-কিছু ক্রটি থাকে। কিন্তু পুরুষের যে সুবিধা আছে, নারীর তা নাই। পুরুষ দাড়িতে মুখের আকৃতির ক্রটি ঢাকিতে পারে। হামিদের বেলা তাই হইয়াছে। দাড়ির এই উপকারিতার সুবিধা গ্রহণ না করা বোকামি। ললিতা আশা করে, হামিদ এই বোকামি করিবে না। সেই হইতে হামিদ দাড়ি রাখা ঠিক করিয়াছে।

২

বন্যার পানিতে একবার বাঁধ ভাংগিলে যা হয়। হামিদের চোখের পর্দা ছিঁড়িল। তার সংস্কারের দেওয়াল ভাংগিল। তার আবেগের পাহাড় ধসিয়া পড়িল। তার সংস্কারের দেওয়াল ভাংগিল। যে নারীর দিকে সে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিত না, সেই নারীর মুখ হইতে হামিদ এখন চোখ নামাইতে পারে না। যে নারীকে দেখিয়া হামিদ আগে পাইত ভয়, তাকেই দেখিয়া সে এখন পায় আনন্দ। যে নারীকে দেখিলে আগে হামিদের বুক অন্তর আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিত, সেই নারী দেখিয়া এখন তার বুক পুলকের শিহরনে নাচিয়া উঠে। যে নারীর জনতাকে হামিদ পাপ ও অকল্যাণের অরণ্য মনে করিত, আজ হামিদ তাকেই ফুলের বাগান মনে করে। যে নারী-দর্শন এড়াইবার জন্য সে দৌড়িয়া পলাইত, সেই নারীকে দেখিবার আশায় তার পিছে-পিছে ধাওয়া করে।

হামিদের মধ্যে এই পরিবর্তন আসিয়াছে হঠাৎ, এক মুহূর্তে, ললিতার সাথে আলাপ হওয়ার সাথে-সাথে। ললিতাকে হামিদের বড় ভাল লাগিয়াছে। সে কত মিঠা। কত সুন্দর। কত ভদ্র। এক মুহূর্তে সে হামিদকে খেচিয়া নিয়াছে। ললিতার মুখ সুন্দর। তার মন সুন্দর। তার গলা সুন্দর। তার হাসি সুন্দর। তার পোশাক তার ব্যবহার সবই সুন্দর। এক মুহূর্তে হামিদ ললিতাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পরদিনই হামিদ বুঝে, সে শুধু ললিতাকে ভালবাসে নাই, মেডিক্যাল কলেজের সব ছাত্রীকেই সে ভালবাসিয়াছে। কাকে ফেলিয়া হামিদ কার দিকে চাইবে? কাকে বাদ দিয়া হামিদ কাকে ভালবাসিবে? সবাই যে সুন্দর। সবাই যে মিষ্টি। হামিদের চারদিকে যে এত অপরাধ রূপের মেলা, চাঁদের হাট, হামিদ কেন এতদিন তা বুঝিতে পারে নাই? তার আজ মনে হয় এই দুই বছর ধরিয়া সে চোখ বুজিয়া নাক-কান বন্ধ করিয়া গুলিস্তানে বসিয়াছিল। দুই-দুইটা বছর চোখে সে এই গুলিস্তানের ছুরীদের রূপ দেখে নাই, নাকে তাদের মেশক-আতরের খোশবু পায় নাই, কানে তাদের মিঠা গলার গান শুনে নাই। কত বড় মূর্খ সে। কি দুর্ভাগ্য তার। এমন হতভাগ্য আর কে আছে? চোখ-বাঁধা ক্ষুধার্ত বালক হঠাৎ চোখের বাঁধ খুলিয়া যদি দেখে তার সামনে মিঠাই-মুগা জিলাপী-বাতাসার সারি-সারি খাঞ্চা, তবে তার অবস্থা যা হইবে, হামিদের অবস্থা হইল ঠিক তাই। ঐ ক্ষুধার্ত বালকের মতোই তার মন চাহিল সব নারীকে এক গ্রাসে খাইতে। শুধু হামিদই

যে সব ছাত্রীদেরে চায় তা নয়, সব ছাত্রীরাও হামিদকে চায়। কোনও ছাত্রী তার দিকে চাহিয়া মুচুকি হাসিল, কোনও ছাত্রী পথে পাইয়া হামিদকে একটা প্রশ্ন করিল, কোনও ছাত্রী ক্লাসের বেঞ্চিতে হামিদের গা ঘেষিয়া বসিল, অমনি হামিদ বুঝিয়া ফেলে, ঐ মেয়ে তাকে ভালবাসে।

নারী জাতিকে হামিদ এতদিন শয়তানের ঘোড়া মনে করিত। কারণ সে কিতাবে পড়িয়াছিল, নারী পুরুষের শাহওয়াৎ গালের করিয়া তার নফসে-আম্মারা জাগাইয়া গোনাই করায়। শাহওয়াৎ করে কয়, নফসে আম্মারা জিনিসটা কি, হামিদ এতদিন তা জানিত না। শুধু এটা জানিত, এগুলি খুব খারাপ জিনিস, শয়তানের হাতিয়ার। ঐ গুলির সাহায্যে কুহকিনী আওরত মানুষকে দুখের রাস্তায় নিয়া যায়। ব্যস, হামিদের জন্য ঐটুকুই ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু হামিদ এখন সব বুঝে। সে ইতিমধ্যে যুবক হইয়াছে। যৌনবোধ তার প্রবল হইয়াছে। সে ইতিমধ্যে এনাটমি পড়িয়াছে, নর-নারীর দৈহিক গঠন, তাদের আকৃতি-প্রকৃতি সবই তার চোখের সামনে ভাসে। নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তার কল্পিত, অথচ সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে।

এতদিনে হামিদ বুঝিয়াছে, নারী-দেহ সম্বন্ধে একটা দুর্জয় কৌতূহল তার বরাবরই ছিল। বাড়িতে ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পর্দার ফলে নারী-দেহ ও সুন্দরী যুগ্ম নারী কোনও দিন দেখে নাই। সে জন্য পথে-ঘাটে, রেল-স্টিমারে, বিশেষত জিন্মা এভিনিউ নিউ মার্কেটে সুন্দরী মেয়ে দেখিলে আড়চোখে ক্ষুধার্ত নয়নে সেদিকে চাহিয়া থাকিত। সে আজ নিজের কাছে স্বীকার করিল, সে ছিল তখন একটা অসুস্থ ভণ্ড। বেপর্দা বাহির হওয়ার জন্য যে নারীকে মুখে-মুখে সে নিন্দা করিত, তারই দেহের রূপ অন্তত চোখ ভরিয়া ভোগ করিবার জন্য আড়চোখে তার দিকে চাহিয়া থাকিত। কোনও বন্ধু তার একাজ দেখিয়া ফেলিলে সে অপরাধীর মতো চমকিয়া উঠিত এবং নিতান্ত মিথ্যা একটা কৈফিয়ত দিত। মনের তার যখন এই অবস্থা তখন সে এনাটমির ক্লাসে লজ্জায় চোখ বুঁজিয়া থাকিত। ডা. হোসেন তাদের এনাটমির প্রফেসর। দেওয়ালে লট্কানো চার্টগুলির পাতার পর পাতা উল্টাইয়া তিনি যখন নর-নারীর দৈহিক গঠন বুঝাইতেন, নর-নারীর অংগ-প্রত্যংগ ও লজ্জাস্থানগুলির প্রভেদ হাতের লম্বা কাঠিটা দিয়া গুতাইয়া-গুতাইয়া দেখাইয়া দিতেন, তখন লজ্জায় হামিদের কানের মূল পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিত। ঐ সব অংগ-প্রত্যংগের লজ্জাকর নামগুলি তিনি যেরূপ নিঃসংকোচে এবং জোরে-জোর উচ্চারণ করিতেন, হামিদের মনে হইত, ক্লাস রুমে না হইয়া রাস্তাঘাটে হইলে ঐ নিয়া দাংগা-হাংগামা বাঁধিয়া যাইত। লজ্জায় হামিদ প্রফেসরের মুখের দিকে অথবা তাঁর হাতের কাঠির দিকে চাহিতে পারিত না। আসলে সোজাসুজি চাহিত না, আড়চক্ষে চাহিত। তার মনে হইত, ক্লাসের সমস্ত-ছাত্র-ছাত্রী হামিদেরই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তারা দেখিতে চায়, হামিদ কি করে। তাই সে বেশির ভাগ সময় মাথা হেট করিয়া থাকিত। কিন্তু আড়চোখে চাহিয়া সে তাজ্জব হইল। দেখিল সব ছাত্র, এমনকি ছাত্রীরাও, প্রফেসরের কাঠির আগা অনুসরণ করিয়া ঐ সব ছবির লজ্জাস্থানগুলি দেখিতেছে। দেখিয়া যেন তারা আনন্দ পাইতেছে। প্রফেসরের মুখে উচ্চারিত ঐ সব অসভ্য অশ্লীল কথাগুলি সবাই যেন হা করিয়া গিলিতেছে। নিশ্চয়ই এসব ছবি ও কথা ওদের কাছে মজা লাগিতেছে। কারণ? কারণ হামিদের গোপন মনেই জানা। সেও মনের গোপন

কোণে আনন্দ পাইতেছে। অন্তরের তলা হইতে পুলকের রস যেন উথলাইয়া উঠিতেছে। তা উঠুক পুরুষদের মধ্যে। ছাত্ররা পাউক তাতে আনন্দ। কিন্তু ছাত্রীরা? তাদের ত লজ্জা-শরম থাকা দরকার। তাদের ত পুরুষের মতো বেহায়া বেশরম হইলে চলিবে না। তারা কেন লজ্জায় অধোবদন না হইয়া হা করিয়া প্রফেসারের কাঠির আগা দেখিতেছে? নারী জাতি শয়তানের ঘোড়া বলিয়াই।

এরপর হামিদের আরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। সে গ্রেব এনাটমি ছাড়াও রানী শার্লটের অবস্টেটিকস্ পড়িয়াছে। সে বেশি রাত্রে গোপনে ঐ পুস্তকদ্বয়ের ছবিগুলি দেখিয়াছে এবং উপভোগ করিয়াছে। আজ জীবন্ত নারী অংগ দর্শন ও স্পর্শনের বাসনা তার অনেক তীব্র হইয়াছে।

আজ এই বাসনা অংশত পূর্ণ হইয়াছে ডিসেকশন-অপারেশনে। ওতে মরা-যিন্দা নর-নারী-দেহ দেখিয়াছে সে অনেক। নারী-দেহ বিশেষত যুবতী-দেহের দিকেই তার আকর্ষণ বেশি। কাপড়ের নিচে নারী-অংগ দেখিতে কেমন, এ কৌতূহল হামিদের শুধু চোখের ক্ষুধা নয়, মনেরও। হাসপাতালে তার এই অতঃপূর্বে অকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ মিলিয়াছে তাই যুবতী নারী দেহ অপারেশনের কেসে হামিদ নানাছলে ও-টিতে হাজির থাকে। বুকে ও কোমরের নিচে অপারেশনের সময় প্রফেসাররা অংগের সবটুকু কাপড়ে ঢাকিয়া শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু খোলা রাখেন, হামিদ এটা পছন্দ করে না। সে স্থির করিয়াছে, নিজে ডাক্তার হইয়া ঐ ধরনের অপারেশনে ওরূপ ঢাকাঢাকি করিবে না। অপারেশনের কঠোর দায়িত্বকে সে নারী-রূপ দর্শনের আনন্দ-রসে রুচিল করিবে। একাজে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা হামিদকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দিন-রাত আত্মা লইতে-লইতে হাসপাতালের আইডিন-ফিনাইলেন ঝাঁজাল পর্দার দ্বাণশক্তি ভূতা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দিন-রাত নারী দেহ দর্শনেও তার চোখের দর্শন-শক্তি ও মনের সৌন্দর্য-বোধ ভূতা হইয়া যায় নাই। বরঞ্চ এদের তেজ বাড়িতেছে।

কাজেই নারীর প্রতি মনোভাবের এই পরিবর্তন তার। নারীকে সে আগে জ্ঞান করিত অমংগলের আঁধার, পাপের বস্তু। সর্বপ্রকারে নারীকে এড়াইয়া চলাই ছিল হামিদের কর্তব্য। এখন সে নারীকে মনে করে সুন্দর ফুল, সুগন্ধি আতর। সুতরাং সকল প্রকারে ভোগের বস্তু। আর বোকামি নয়; আর দেরি নয়। হামিদ এখন নারীকে ভোগ করিবে। অতীতের ভুলের দাদ লইবে। সুদে-আসলে।

কিন্তু হামিদ ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোক। তার মনোভাবের এত বড় পরিবর্তন হইলেও বাহিরে তার প্রকাশ নাই। নারীর রূপ উপভোগ করিবার বাসনা তার অতি তীব্র হইলেও সে কোনও নারীর গায় হাত দেয় নাই; কাউকে অভদ্র কোনও কথা বলে নাই। মনের বাসনা সে মনেই চাপিয়া রাখিতেছে। এ যেন কোনও ভদ্রলোকের অপরের বাগানে ফুল দেখা। ফুলটা তার যতই পছন্দ হোক তার খোশবুঁ তার যতই মন হরণ করুক, ভদ্রলোক কখনও অপরের বাগানের ফুল ছিঁড়িবে না। হামিদের হইয়াছে ঠিক তাই। কলেজে যত ছাত্রী-ও হাসপাতালে যত নার্স দেখে সব তার পছন্দ হয়। শুধু কলেজে-হাসপাতালে নয়। শহরের মাঠে-পার্কে মার্কেটে বাজারে যত মেয়েলোক সে দেখে সবাইকে তার ভাল লাগে। সবাই তার চোখে সুন্দরী। ওদের মধ্যে যে-ই হামিদের দিকে চায়, সবাই হামিদকে চায়, এই তার ধারণা। তার বিশ্বাস হামিদ মুখ ফুটিয়া বলিলেই যে-কেউ হামিদের হাতে ধরা দিবে। কারণ নারী মাঝেই চায় পুরুষের ভোগে লাগিতে। সে আজও বিশ্বাস করে, নারীকে বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস নাই বলিয়াই

বুদ্ধিমান লোকেরা তাদের জন্য পর্দা-অবরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তারা অনেক দেখিয়া-শুনিয়াই তা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখন হামিদ ও-সব মানে না। সে চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখিয়াছে, এদেশের মুসলিম সমাজে পর্দা-অবরোধের দ্বারা নারী-পুরুষকে যেভাবে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে, তাতে কি ব্যক্তির কি সমাজের কোনও লাভ হয় নাই। লোকসান হইয়াছে অনেক। তার এই জ্ঞান হইয়াছে যে যৌনচেতনা মানুষের সহজাত প্রকৃতি। খুব শক্তিশালী প্রবৃত্তি এটা। এ প্রবৃত্তির শাসন-সংযম নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক। তা করা যাইতে পারে শুধু যৌন-বাসনাকে অপর সব বাসনার সাথে সংমিশ্রণের দ্বারা। অবরোধ-প্রথা এই সংমিশ্রণের অন্তরায়। নারী জাতিকে আলাদা করিয়া রাখার মানেই যৌন-বাসনাকে অপর সব বাসনা-কামনা হইতে আলাদা করিয়া রাখা। এতে নারী-পুরুষ পরস্পরকে শুধু-যৌন-চেতনা দিয়াই বিচার করিতে বাধ্য হয়। অল্পদিনের অভিজ্ঞতা হইতেই হামিদ এই জ্ঞান লাভ করিয়াছে, যারা বিষয়-কর্মে ক্লাবে-রেস্তুরায় স্কুলে-কলেজে ও সভা-সমিতিতে নারী পুরুষে অবাধ মিলামিশা করে তাদের যৌন-চেতনার মধ্যে একটা সংযম ও শালীনতা আছে। নারীকে তারা সাধারণ মানুষ হিসাবে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে। এর কারণ তারা যৌন-বাসনাকে মনের অন্যান্য বাসনার সাথে মিশাইতে পারিয়াছে। পক্ষান্তরে, পর্দাওয়ালারা নারীকে একমাত্র যৌনচেতনা ছাড়া কোনও চেতনার দ্বারা বিচার করিতে পারে না। হামিদ অনেক আত্মীয়-বন্ধুকে দেখিয়াছে নারীর সাথে তাঁরা চোখে-চোখে চাহিয়া সহজভাবে কথা বলিতে পারে না। তাঁদের অনেকে হামিদের কাছে সরলভাবে স্বীকার করিয়াছে, নারী-দর্শনে ও মস্তকস্পর্শে তাদের নাকি শাহওয়াৎ গালের হয়। গোড়াতে হামিদের নিজেরও ঐ ভাব হইয়াছে। এই মনোভাবের অবসান ঘটাইতে হইলে নারী-স্বাধীনতার দরকার। সেটা হামিদ মেডিক্যাল কলেজের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছে। তাই এখন পর্দা-অবরোধকে সে অন্যায়-অবিচার মনে করে। সে নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতি। ইচ্ছা-মতো চলা-ফেরা করিবার, যা-ইচ্ছা তাই করিবার অধিকার নারীর আছে। কিন্তু তাই বলিয়া হামিদ বিশ্বাস করে না যে নারী জাতি ইঠাৎ ভাল হইয়া গিয়াছে। না, তা হয় নাই। তারা আগের মতোই আছে। পুরুষের ভাল লাগুক আর না লাগুক নারী তার স্বভাব ছাড়িবে না। ছাড়া তার দরকারও নাই। ছাড়িলে বরঞ্চ নারী আর নারী থাকিবে না। সে অন্য কিছু হইবে। নারী সুন্দর, নারী কোমল, নারী মিঠা, নারী সুগন্ধি। এটাই নারীর গুণ। এটাই নারীত্ব। রূপ ও গন্ধ যেমন ফুলের গুণ, রূপ ও ভোগই তেমনি নারীর গুণ। ফুলের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ ভোগের উপর যেমন কোনও বিধি-নিষেধ থাকিতে পারে না, নারীর রূপ ও প্রেম ভোগ করার উপরও তেমনি কোনও বিধি-নিষেধ থাকিতে পারে না। নারী ও ফুলের উপর কোনও মালিকানা চলিতে পারে না। এটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এটা অপরের বেলা যেমন সত্য, স্বয়ং ফুল ও নারীর বেলাও তেমনি সত্য। ফুলের রূপ ও সুগন্ধ ভোগের ব্যাপারে কার চোখ সুন্দর, কার নাক ভাল, এটা বিচার করিবার অধিকার যেমন ফুলের নাই, নারীর রূপ ও প্রেম ভোগের ব্যাপারেও কোন পুরুষের চেহারা ভাল আর কার ভাল নয়, সে বিচার করিবার অধিকারও নারীর নাই। হামিদের চেহারা ভাল নয়, সেটা হামিদ জানে। কিন্তু সে কারণে হামিদকে অগ্রাহ্যও করিবে না। করিতে পারে না। যদি কেউ করে, তবে সে নারী নয়।

হামিদ অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়াই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে। হামিদ স্বভাবতঃই চিন্তুক। সে বিজ্ঞান পড়িয়াছে। তাই তার চিন্তাও বিজ্ঞানভিত্তিক। মেডিক্যাল কলেজে এনাটমি ফিযিওলজি পড়িয়া তার এই ভিত্তি আরও দৃঢ় হইয়াছে। সে এখন আর মোল্লা নয়। কাজেই কথায় কথায় হাদিস ও কোরআনের দোহাই দিয়া নিজের মত সমর্থন করে না। তার বদলে বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলে। বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকৃতিই খোদা। যারা খোদা মানে না তারাও প্রকৃতি মানে। এই প্রকৃতির শক্তিও খোদার শক্তির মতোই শক্তি। কাজেই হামিদের যুক্তি এই যে প্রকৃতিই নারী ও ফুলকে অমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। ফুল মানুষের ভোগের জন্য; আর নারী পুরুষের ভোগের জন্য। এটাই প্রকৃতির বিধান। নারী ও ফুল অবাধ ভোগের বাধা ধর্ম ও আইন-কানুন নয়, আসল বাধা ভদ্রতা।

গোড়াতে এসব ছিল হামিদের মনের কথা। সম্প্রতি সে মুখেও প্রকাশ করিতে শুরু করিয়াছে। কলেজের হোস্টেলে এবং রাস্তাঘাটে, বন্ধুদের সাথে তর্ক-বিতর্কে এসব কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু ঐ বলা পর্যন্তই। কাজে-কর্মে কিছু না। আজো সে কোনও নারীর গায় হাত দেয় নাই; কোনও নারীও তাঁর গায় হাত দেয় নাই। সে দূর হইতে হা করিয়া চাহিয়া-চাহিয়া নারীর রূপ গিলে বটে, কিন্তু কোনও নারীর দিকে স্বাভাবিক স্থির দৃষ্টিতে চাহে নাই। চোখে-চোখে ত নয়ই। যার দিকে হামিদ ক্ষুধার্ত নয়নে হা করিয়া চাহিয়া আছে, সে যদি হামিদের দিকে চায়, অমনি হামিদ চোখ ফিরাইয়া নেয়। এটাকেই হামিদ বলে ভদ্রতা। ঐ পরের বাগানের ফুল না ছেঁড়ার মতো আর কি।

কিন্তু হামিদ পীর বংশের ছেলে। তার রগ-রেশায় পীরের রক্ত বহিতেছে। জ্ঞান হইয়াছে অবধি সে রুহানিয়াৎ তাসাউআফ যিকির জযবা ফুনাফিল্লাহ বাকাবিলাহ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক কথা শুনিয়াছে। তার মনের পটে এই সূর্য্যবস্তুর এক-একটা ইমেজ আছে। মানুষের জন্ম জীবন মৃত্যুর ইমেজও কাজেই এইসব ইমেজেরই সমষ্টি। তার ফলে হামিদের বিজ্ঞানের মধ্যেও একটা আধ্যাত্মিকতার সিজের জোরেই অনুপ্রবেশ করিয়া থাকে। তার সকল চিন্তার মধ্যেই এমনি করিয়া জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতার একটা সংঘাত মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

৩

হামিদের মনের গতিক যখন এইরূপ, তখনকার একদিন সে ক্লাস শেষে কলেজ হইতে বাহির হইয়াই দেখে আগে-আগে ললিতা যাইতেছে। তার সাথে রাযিয়া। আজ কয়দিন হয় ললিতার সাথে হামিদের কথা হয় নাই। ঘটনাচক্রে ক্লাসেও এক বেঞ্চিতে বসা হয় নাই। কাজেই ললিতার সাথে কথা বলিবার খুবই আগ্রহ হামিদের। হামিদের মনে হয় ললিতা তাকে দেখিয়াছে। সে হয়ত হামিদের সাথে কথা বলিবার আশায় তার গতিবেগ কমাইবে। সে নিজের গতি বাড়ায়।

কিন্তু তা হইল না। রাযিয়াকে কি যেন বলিয়া সে ডান দিকে মোড় ফিরিয়া নার্স কোয়ার্টারে ঢুকিয়া পড়িল। রাযিয়া গতি থামাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং যেন হামিদেরই অপেক্ষা করিতে লাগিল। হামিদ ললিতারই সংগ কামনা করিতেছিল। কিন্তু

ললিতা চলিয়া যাওয়ায় তার মনে হইল, বেশ ত রাযিয়াই মন্দ কি? ললিতা থাকিলে অবশ্য সে রাযিয়ার সাথে কথা বলিত না; বরঞ্চ এড়াইয়া যাইত। অতীতে হইয়াছেও তা দুই-একবার। কিন্তু আজ অগত্যা রাযিয়াই সই। ললিতার মতো অত সুন্দরী না হইলেও হামিদের চোখে রাযিয়াও সুন্দরী। সব মেয়েলোকই সুন্দরী। হামিদ স্বাভাবিক গতিতে আগ বাড়ে।

কাছাকাছি গেলে রাযিয়াই কথা বলে: জরুরী কাজে ললিতার চৈলা যাইতে হৈল। আপনার সাথে কথা কইতে পারল না বৈলা দুঃখ কৈরা গেল। আমি ভাবলাম, ললিতার ডিউটিটা আমিই দেই। কি বলেন আপনে? দুধের সাধ ঘোলে মিটব?

হামিদের রোমাঞ্চ হইল। রাযিয়ার গলাটাও কি মিষ্টি। কথাটাও যা বলিল কি মজাদার! হামিদের ইচ্ছা হইল সে বলে: আপনে ঘোল হৈতে যাবেন কেন? আপনে যে খাসা দই, খাটি দুধ।

কিন্তু কথাটা হামিদের গলায় আটকাইয়া গেল। ঠোঁট জিভ শুকাইয়া গেল। হামিদের এ দোষটা আজও সারিল না। নারীর রূপ তার অত ভাল লাগে। যুবতী নারী দেখিলেই তার শিরায়-শিরায় পুলকের নাচন শুরু হয়। কথা বলিবার জন্য, আরও কত কি করিবার জন্য মন তার চঞ্চল হইয়া উঠে। অথচ কথা বলিতে পারে না। এমন করিয়া ঠোঁট জিভ শুকাইয়া যায়। ঠোঁটটা যে জিভ দিয়া ভিজাইয়া লইবে, তদুপায় থাকে না। কতবার সে মনে করিয়াছে আগামীতে এমন আর হইতে দিবে না। কিন্তু প্রতিবারই এমন হইতেছে; হাজার চেষ্টা করিয়াও সে ঠোঁট-জিভ ভিজা রাখিতে পারিতেছে না। সারা কলেজে, এমন কি সারা ঢাকায় একমাত্র ললিতার সাথেই ঠিকমতো কথা বলিতে পারে। রাযিয়া যদিও ললিতারই বন্ধু, আর সর্বক্ষণ একত্রে চলে, সেজন্য যদিও হামিদ তাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছে, আদার-সালামের আদান-প্রদান হইয়াছে, তথাপি তার সাথে স্বাভাবিক কথা হয় নাই। চোখে-চোখে চাইতেও পারে নাই। রাযিয়াকে একা পাইয়া হামিদ খুবই খুশী হইয়াছিল। বড় আশা ছিল আজ তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিবে। গত দুই-দুইটা মিনিট সেই আলাপের মহড়াই দিয়াছে সে। রাযিয়ার কাছে আসিয়াই সে সর্বাংগে একটা পুলকের ঝাঁকি অনুভব করিয়াছে। তার কথা শুনিয়া হামিদের শিরায়-শিরায় আগুনের ফুল্কি ছুটিয়াছে। আনন্দে বুকটা নাচিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ, ঠিক কাজের সময় ঠোঁট-জিভটা লাগিয়া গেল। গলাটা শুকাইয়া গেল। হামিদের ভারি রাগ হয় নিজের উপর। রাযিয়ার হাসির জবাবে নিতান্ত শুক্না হাসি হাসিয়া হামিদ মাথা হেঁট করে।

দুষ্টামির মুচকি হাসিয়া রাযিয়া বলে: থামলেন কেন? চলেন হাঁটতে হাঁটতেই কথা কওয়া যাক।

রাযিয়া হামিদকে আগে চলিবার জন্য হাতের ইশারা করে।

ভদ্রতার নিতান্ত অভ্যাস-বশে হামিদ বলে: জ্বু না, আপনে আগে চলেন।

রাযিয়া হাসিয়া বলে: আওরত মরদের আগে চললে পর্দার খেলাফ হৈব না? আপনে তেমন গোনা করবেন?

মুষ্ড়াইয়া গিয়া হামিদ ধরা গলায় বলে আপনে জানেন, আমি আর পর্দা মানি না। তবু কেন ঠাট্টা করেন?

এতক্ষণে হামিদের জড়তা অনেকটা কাটিয়াছে। সে আবার বলে: বেশ, তা হৈলে আমিই আগে চললাম।

হামিদ পা বাড়াইতেই রাযিয়া খপ্ করিয়া হামিদের হাত ধরিয়া টানিয়া ধরে। বলে: না, তা হৈব না। আপনার আগে গিয়া কাজ নাই। চলেন দুজনে সমানে-সমানে যাই।

রাযিয়া হামিদের হাত ধরিয়াই চলে। দু'চার কদম গিয়াই সে বলে: আপনে আজকাল পর্দা মানেন না, তা আমরা সবাই জানি। ভাল কৈরাই জানি। এখন আমাদের মত কি জানেন? আপনার পর্দা মাইনা চলাই উচিত ছিল।

হামিদ চমকিয়া উঠে। রাযিয়ার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলে: এ কথার মানে কি?

এক ঝাঁকিতে হামিদের হাতটা ছাড়িয়া দিয়া রাযিয়া বলে: যেদিন সভ্য হৈবেন, সেইদিন বুঝবেন। বেপর্দা হৈতে গেলে ভদ্র হৈতে হয়। অসভ্য আনকাল্‌চার্ড পুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া নারীর পক্ষে নিরাপদ নয়। বুঝলেন?

হামিদ অবাকও হয়, দুঃখিতও হয়। সে রাযিয়ার কি অন্যায় করিয়াছে? সে কেন হামিদকে অমন গালাগালি শুরু করিয়াছে? সে বিহবল কণ্ঠে বলে: আপনে আমার সংগে ঠাট্টা করতেছেন মিস্ রাযিয়া?

বিদ্রূপের গলায় রাযিয়া বলে: এমনিতেই বাঁচি না, তার উপর আবার ঠাট্টা? আপনার মতো অসভ্য লোকের সাথে ঠাট্টা-মশ্‌করা করতে গেলে কোনো নারীর রক্ষা থাকব?

হামিদ ক্ষুব্ধ হয়। রাগও হয় তার। সে উত্তেজিত সুরে বলে: আমার অপরাধ?

রাযিয়া গর্জিয়া উঠে: অপরাধ? অপরাধ কি আপনার একটা? অনেক। একশ। সবচেয়ে বড় অপরাধ আপনে আগে ছিলেন ভগ্ন এখন হৈছেন ষণ্ডা।

রাযিয়া এসব কি বলিতেছে হামিদ কিছুই বুঝিল না। সে বিরক্তি ও রাগে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রাযিয়ার দিকে চাহিয়া রহিল। তার চোখ হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কোন কথা বলিল না। বলিলে হয়ত অভদ্র কথাই বলিয়া ফেলিত।

রাযিয়া যেন হামিদের মনের ভাব বুঝিল। সে তারই জবাব দিল। বলিয়া চলিল: আপনের আগে আমরা শুধু ভণ্ড তপস্বীই মনে করতাম। অসভ্য অভদ্র মনে করতাম না। এখন আমরা বুঝতে পারছি আপনে একটা অসভ্য চাষা, একটা ষণ্ডা। আর কিছুদিন গেলে আপনে হৈয়া উঠবেন একটা গুণ্ডা।

হামিদের রাগ ধৈর্যের সীমা ছাড়াইবার উপক্রম হইল। সে বুঝিল, নিজেকে সে আর সামলাইতে পারিবে না। কিন্তু সে আদত ভদ্রলোক। কাজেই সময় থাকিতে সাবধান হওয়া দরকার। তার সরিয়া পড়াই এক মাত্র পথ। তাই সে করিতে চাইল। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত শক্তিতে রাযিয়ার সান্নিধ্য তাকে খেঁচিয়া ধরিয়া রাখিল। সে দাঁতে ঠোট কামড়াইয়া নিঃশব্দে পথ চলিল। একটা ফাঁক পাইলেই সে অন্য পথ ধরিবে। রাযিয়া হামিদের গতিক অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া চলিল: আপনে পর্দা মানেন, মেয়েলোকের সাথে কথা কন না, তারার দিকে চোখ তুইলা চান না। এসব করেন আপনে ধর্মের খাতিরে। এতদিন এ সব কথাই আপনে বলতেন। এসব কথা কে আমরা

নারী জাতির অপমান মনে করি। তবু আমরা এ অপমান সহ্য করছি এই কারণে যে আমরা জানতাম, এসব কথাই আপনার ভণ্ডামি। আপনে ডুব দিয়া পানি খান। আড়চোখে চাইয়া-চাইয়া আপনে নারীর রূপ-সুখা পান করেন।

একটু দম ধরিয়া রাখিয়া হামিদের দিকে চাহিল। হামিদ তার দিকে চাইয়া নাই দেখিয়া মুচকি হাসিয়া আবার বলিতে লাগিল: কিন্তু আপনে সীমা ছাইড়া গেছেন। নারীর রূপ-সুখা পান করবার বদলে আপনে নারীকে গিলবার চেষ্টা করিতেছেন। এটা আমরা নারীরা সহ্য করতে রাজি না। আমরা চাই, পুরুষরা আমাদের রূপ-সুখা পান করুক। এটা না করলে বরঞ্চ আমরা পুরুষের উপর চটি। যে পুরুষ নারীর রূপ পান করে না, অথচ বড়াই কৈরা বেড়ায় 'আমি নারীর দিকে ফিরাও তাকাই না' সে পুরুষকে আমরা কিছুতেই ক্ষমা করি না। কিন্তু তাই বৈলা আমাদের রূপ পান করতে আইসা পুরুষরা আমাদের সশরীরে গিইলা ফেলবে, এটা আমরা বরদাশ্ত করতে রাজি না। দুনিয়ার বাগিচায় আমরা নারীরা সুগন্ধি সুন্দর ফুল। লোকেরা চোখু দিয়া আমাদের সৌন্দর্য, নাক দিয়া আমাদের খোশবুঁ উপভোগ করুক, এটা আমরা নিশ্চয়ই চাই। এই জন্যই আমাদের জন্ম। কিন্তু তাই বৈলা লোকেরা বোঁটা ধইরা টান মাইরা আমাদের ছিঁইড়া ফেলবে? বুকে লাগাইয়া আমাদের বাড়ি নিয়া যাবে? আমরা এটা হৈত্বে রাজি না। কারণ ফুল তাতে তাজা থাকে না। শুকাইয়া যায়।

রাখিয়া আবার দম নেয়। হামিদের দিকে চায়। দেখে, হামিদ কিছুমট করিয়া তার দিকে চাইয়া আছে। হামিদ ভাবিতেছিল: এসবই হুবহু তার নিজের কথা। রাখিয়া এসব কথা পাইল কই? রাখিয়ার চোখে চোখ পড়িতেই হামিদ বলে: আমারে এসব কথা শুনান কেন? আমি এসব কুকর্ম কবে করলাম?

মাথাটা উপরের দিকে একটা ঝাকি মারিয়া রাখিয়া বলে: কবে করলেন? সব সময় করেন। এই এখনও করিতেছেন। আপনে সোজাসুজি মেয়েদের চোখের দিকে তাকাইয়া কথা বলতে সাহস পান না। অথচ তাদের গলা বুক বাহু ও নিতম্বের দিকে হা কৈরা চাইয়া গিলতে থাকেন। কি আমার শরমের ডালি রে! এই এখনই আপনে আমার বুকের দিকে হা কৈরা চাইয়া আছিলেন। কি দেখতেছিলেন? শরম করে না? কালচার্ড ফ্যামিলিতে পয়দা নাই বা হৈলেন। লেখা-পড়া ত শিখছেন?

অসহ্য রাগে হামিদ ফুলিতে লাগিল। এত অপমান সে জীবনে হয় নাই। অথচ একটা মেয়েলোকের হাতেই তার এই চরম অপমান? অন্য লোক হইলে সে এখনি একটা কারবালা বাধাইয়া দিত। কিন্তু মুশ্কিল হইয়াছে মেয়েলোক বলিয়া। এখানে সে কিছু করিতে পারে না। অথচ একটা কিছু করা দরকার। হামিদ কাঁদিয়া ফেলে। এটা হামিদের ছেলেবেলার অভ্যাস। রাগে আর কিছু করা না গেলে হামিদের একমাত্র প্রতিবাদ ও প্রতিকার ছিল কাঁদিয়া ফেলা। বাপ-মার সামনে এটাই ছিল হামিদের একমাত্র অস্ত্র। সে অস্ত্রে হারও মানিতেন বাপ-মা। হামিদ আজও তাই করিল। নিজের অজ্ঞাতেই করিল। সে চোখে রুমাল চাপিয়া কান্না গোপন করিতে চাইল। কিন্তু নাকের ফোঁৎফোঁৎ গোপন করা গেল না।

৪

যার বিরুদ্ধে হামিদ তার এই অস্ত্র আজ প্রয়োগ করিল, সে তার মা নয় বটে কিন্তু একজন নারী। সে নারীর প্রাণে ঘা লাগিল। রাযিয়া অবাক হইল। প্রাণে ব্যথা পাইল। পুরুষ মানুষ কাঁদিতে জানে? সে হামিদের কাছে ঘেঁষিয়া হামিদের হাত ধরিয়া টানিয়া চোখ হইতে নামাইবার চেষ্টা করিল। বলিল: ছিঃ আপনে কানতেছেন? চোখ থনে হাত নামান। লোকে দেইখা ফেলব।

রাযিয়ার সত্যই যেন ভয় হইল। সে চারদিক তাকাইয়া দেখিল কেউ আসিতেছে না। হামিদের হাতে আরেকটা টান দিয়া বলিল: কানবার মতো কি কইলাম আমি? আমি যদি আপনেনে গাল দিয়া থাকি, তবে আপনেও আমারে পাণ্টা গাল দেন। কানবেন কেন?

হামিদের হাত নামাইতে পারিল না। রাগ ও অনুতাপ হইল রাযিয়ার। ক্রুদ্ধ বেদনাতুর গলায় সে বলিল: আপনের ভালর লাগিই আমি এসব কথা কইছিলাম। আপনে শুধু কাপুরুষ না, নির্বোধও। আপনে জানেন না, কলেজের সব ছাত্র-ছাত্রীরা আপনার উপর ক্ষেপা। তারা প্রিন্সিপালের কাছে আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন্ট করছে। আপনে ছাত্রীদের সাথে কাপুরুষের মতো অভদ্র ব্যবহার করেন। প্রিন্সিপাল আপনার বিরুদ্ধে স্টেপ্ নিবেন শুনতেছি। আপনার ভাল চাই বৈলাই সাবধান কর্তে চাইছিলাম। আপনে ভুল বুঝবেন জানলে কার ঠেকা পড়ছিল, এসব কথা কইতে!

হামিদ চোখ হইতে রুমাল নামাইয়া কান্না-রংগিন চোখ দুইটা পাকাইয়া রাযিয়ার দিকে চাহিল। কান্না-বিকৃত মুখে বলিল: প্রিন্সিপাল আমাদের যা ইচ্ছা তাই শাস্তি দেউক, আমারে কলেজ থনে বার কৈরা দেউক, তাতে আপনার মাথা-বিষ কেন? আপনে আস্লেন কেন আমার হিতৈষী সাইজা আমারে পাল পাড়তে? কি সম্পর্কটা আপনার সাথে আমার? আমি বীর হই বা কাপুরুষ হই তাতে আপনার কি?

রাযিয়া কোনও কথা বলিবার আগেই হামিদ ভনভন্ করিয়া আরেক রাস্তায় চলিয়া গেল। হোস্টেলের দিকে গেল না। বাইরের রাস্তায়ও গেল না। কলেজ-হাসপাতালের বিশাল আংগিনা। তার মাঝে-মাঝেই মওসুমী ফুলের বাগান। বাগানের ফাঁকে-ফাঁকে ছোট-ছোট রাস্তা। কোনটা পিচ্ করা, কোনটা বা গ্র্যাভেল দেওয়া। তারই একটায় হামিদ চলিল উদ্দেশ্যহীনভাবে। খুব কয়েক মিনিট দ্রুত চলিবার পর বুঝিল রাযিয়া হইতে সে অনেক দূরে আসিয়াছে। গতি মন্দ করে। এতক্ষণে ভাবিবার অবসর পায় সে। কাজটা কি ভাল হইল? নিতান্ত অভদ্রতা হইল না কি? আর কিই বা অপরাধ রাযিয়ার? সে ত হামিদের -কওয়া কথাই বলিয়াছে! হামিদও ত কতবার কত জায়গায় বলিয়াছে নারী বাগানের ফুল। তার রূপ গন্ধ ভোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু ছিঁড়িবার অধিকার কারও নাই। তবে, রাযিয়া হামিদের এসব কথা পাইল কোথায়? হামিদ ত একথা কোনও বই-পুস্তকে পড়িয়া শিখে নাই। এটা যে তার নিজস্ব মত। সে ত রাযিয়ার বা ললিতার কাছে, কোনও মেয়েলোকের কাছেই, এসব কথা বলে নাই। খুব সম্ভব এটা সবারই মত। হামিদের একার নয়।

হামিদ মাটির দিকে চাহিয়া ভাবিতে-ভাবিতে চলিতেছিল। এবার সে মুখ তুলিয়া এদিক-ওদিক তাকাইল। চমকিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য! ঐ যে রাযিয়া তার দিকেই আসিতেছে। এতক্ষণের অনুতাপের ভাব রাযিয়াকে দেখিয়াই মিলাইয়া গেল। ফের রাগ হইল তার। কি বেহায়া মেয়েটা! আবার হামিদের পিছু লইয়াছে। সে গতি ফিরাইবার উপক্রম করিতেই রাযিয়া ডাকিয়া বলিল: পলাবেন না। দাঁড়ান। আমারে মাফ চাইবার সুযোগটাও দিবেন না? এটা বড় অন্যায়। অপরাধের কি মাফ নাই?

কোনও কথা হামিদ বলিল না। দাঁড়াইয়া রহিল। কাছে আসিয়া রাযিয়া বলিল: আগে আমারে মাফ করেন। তারপর শুনেন। আপনে আমার অধিকারের প্রশ্নটা তুলিয়াই দৌড় মারলেন কেন? আমার জবাবটাও শোনা আপনের উচিত ছিল। আমার জবাব এই যে আপনের সাবধান করার কোন অধিকার সত্যই আমার নাই। নিজের অধিকারের দাবিতে তা করিও নাই আমি। আমার এক বন্ধুর অনুরোধেই তা করতে গেছিলাম। দেখলাম ভুল হৈছে। বন্ধুরে গিয়া বলব, এ কাজ আমার না। পারলে সে নিজের কথা নিজেই বলবে। না পারলে বলবে না। আমার কি?

হামিদের রাগ পানি হইয়া গেল। কৌতূহল তার জায়গা দখল করিল। রাযিয়ার মুখের উপর এই প্রথমবার সোজা দৃষ্টিপাত করিয়া পরম আগ্রহে সে বলিল: আপনার সে বন্ধুটি কে?

রাযিয়া মিটমিটাইয়া হাসিতেছিল। এবার তার রাগের পালা। সে মাথা দিয়া হাওয়ায় একটা বাড়ি মারিয়া বলিল: আমার ভারি ঠেকাটা পড়ছে আম বলবার। যার কথা সেই কইব এখন।

হামিদ মিনতিতে গলিয়া গিয়া খোশামুদির সুরে বলিল: না না, রাগ করবেন না। আমি মিনতি করি, নামটা বলেন।

রাযিয়া হাসি গোপন করিবার জন্য মুখ ঘুরাইয়া নিল। বলিল: শুধু মিনতি করলে হৈব না। মাফ চাইতে হৈব।

হামিদ: আচ্ছা মাফ চাইলাম। হাতজোড় কৈরা।

রাযিয়া: শুধু মাফ চাইলেই হৈব না। হাতজোড় করলেও না। আমার গা ছুইয়া হলফ করা লাগব, অমন আর কোনও দিন করবেন না।

হামিদের কৌতূহল ও আগ্রহ তখন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম। রাযিয়া যা বলিবে তাতেই সে রাজি। সে 'এই হলফ করলাম' বলিবার সংগে সংগে ডান হাতটা উচা করিল। কিন্তু রাযিয়ার গায়ের কোথায় ছুঁইয়া ওয়াদা করিতে হইবে, তা বুঝিতে না পারিয়া হাতটা উচা করিয়াই রাখিল।

রাযিয়া হামিদের অসুবিধা বুঝিল। নিজের হাত বাড়াইয়া সে হামিদের তোলা হাতটা ধরিয়া নিজের বাঁ কাঁধে লাগাইয়া বলিল: এইখানে ছুঁইয়া হলফ করেন: কখনও এমন করবেন না।

হামিদ রাযিয়ার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল: হলফ করলাম। এইবার বলেন আপনার বন্ধুর নাম।

রাযিয়া দুষ্ঠামির মুচকি হাসিয়া বলিল: ললিতা।

হামিদ এটা আগেই জানিত। তবু রাযিয়ার মুখে শুনিবার জন্যই শুধু জিদ করিতেছিল। কিন্তু শুনিবার আগে ওটা যতটা ভাল লাগিবে মনে করিয়াছিল, সত্য-সত্য কিন্তু অতটা ভাল লাগিল না। এবার তার মনে হইল, রাযিয়া যদি ললিতার নাম না বলিয়া নিজের নাম বলিত, তবেই ভাল হইত। রাযিয়া যদি উচ্চস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিত: 'বন্ধু-টন্ধু সব মিছা কথা: আমি নিজের অধিকারের জোরেই আপনেনে সাবধান করতে চাইছি,' তবে হামিদের কানে মধু ঝরিয়া পড়িত। হামিদ রাযিয়ার প্রতি একটা নতুন টান অনুভব করিল। বলিল: আপনেও নিশ্চয়ই ললিতা দেবীর সাথে একমত। নইলে তার কথাটা আমারে কইবার ভার আপনে নিতেন না।

রাযিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে-হাসির সাথে তাল দিয়া তার দেহের উর্ধ্বাংশ নাচিয়া উঠিল। বিশেষত: তার শাড়ির উপর দিয়া ফাটিয়া-পড়া বুকটা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হামিদের নজর তার উপর পড়িল। রাযিয়া বুঝিল। হামিদের মন ও চোখ অন্যদিকে ঘুরাইবার জন্য বলিল: এতক্ষণে আপনে একটা বুদ্ধিমানের কথা কইলেন।

হামিদ ভেবাচেকা খাইয়া গেল। কোনোমতে বলিল: কি রকম?

রাযিয়া তাচ্ছিল্য ভরে বলিল: কি রকম আপনে বুঝেন না? মনে হয় আপনে কিছু দেখেন না। অথচ খোদা আপনেনে অমন তেজী সুন্দর দুইটা চোখ দিছেন। চোখ দুইটা থনে আগুনের তেজে নূর ঠিকরাইয়া বার হৈতেছে। না, না, আপনে লজ্জা পাবেন না, রাগও করবেন না। আমি সত্য কথাই কইতেছি, অন্তর দিয়াই কইতেছি। ঠাট্টা না। এটা সকলের কথা। সত্যই আপনার চোখ দুইটা অপূর্ব সুন্দর। শুধু সুন্দর না, অসাধারণ। ও চোখ দুটা শুধু দেখে না। ভিতরও দেখে। ষড়্‌দিকে নজর করে তার অন্তর্ভেদ করে। এটা প্রতিভার লক্ষণ। কিন্তু কোথায় সে প্রতিভা? শুধু বই এর পাতা দেখেন আর কিছুই আপনে দেখেন না।

রাযিয়া চোখ ঠারিয়া দুই হসি হাসিয়া যোগ করিল: মেয়েলোকের রূপ ছাড়া।

হামিদ জানে, তার চোখের একটা অসাধারণ বিশেষত্ব আছে। সবাই একথা বলে। ছোটবেলা হইতেই একথা শুনিয়া আসিতেছে। ছাত্রবন্ধুরাও বলে। রাযিয়ার মুখে ঐ একই কথা আজ তার কানে মধু ঢালিল। খুশি গোপন করিবার আশায় কথার মোড় ঘুরাইবার মতলবে সে বলিল: আমার মতো নির্বোধ হঠাৎ কি একটা বুদ্ধিমানের কথা কইলাম যার জন্য এই মাত্র আমার তারিফ করলেন?

রাযিয়া আবার গম্ভীর হইয়া বলিল: এই ত আপনে আবার আহাম্মক সাজলেন। ললিতার সাথে আমি এ ব্যাপারে একমত বৈলা এই যে এইমাত্র আপনি একটা মন্তব্য করলেন, সেটা এক মুহূর্তে ভুলিলা গেলেন? যাক সে কথা। আপনার সাথে আমার ঝগড়া যখন মিটাই গেছে, তখন ললিতার কথাটা শেষ কৈরাই ফেলি। কি বলেন? আপনে ঠিকই কইছেন, ওটা আমারও কথা। কথাটা এই: আজ থনে আপনার হুশিয়ার হৈতে হবে। মেয়েদের দিকে ষণ্ডা-গুণ্ডার মতো লোভের দৃষ্টিতে আর চাইয়া থাকবেন ন। তাদের সাথে সহজ-সরলভাবে কথা কইবেন। অন্যান্য অংগ যদি দেখবার সাধ হয়, তবে আড় চোখে দেইখা নিবেন। হা কৈরা গিল্‌তে থাকবেন না।

হামিদের ঘাড়ের কাছাকাছি কাঁধে একটা বড় রকমের থাপ্পড় মারিয়া রাযিয়া তার বক্তৃতা শেষ করিল। বলিল: বুঝলেন ত আমার কথাটা।

থাপ্পড়ের ভাৱেই বোধহয় হামিদ বাধ্য অনুগত শিশুর মতো জবাব দিল: বুঝলাম।

রাস্তার দিকে চাহিয়া হামিদ সংগে সংগে বলিয়া উঠে: ইয়া আল্লাহ, কথায়-কথায় আমি যে অনেকদূর আইসা পড়ছি।

রাযিয়া হাসিয়া বলে: আমি তা জানতাম। ইচ্ছা কৈরাই কই নাই আপনেন্নে। এতই যখন আসলেন, মেহেরবানি কৈরা আমাৱে একটা রিকশায় তুইলা দিয়া যান।

হামিদ: আপনে কোন দিক যাবেন? বোর্ডিং কোথায় আপনার?

রাযিয়া: বোর্ডিং না বাসা। আমি বাসাতে থাকি। ঐ যে দেওয়ান বাজার রোড দেখা যায়। ওখানেই রিকশা পাওয়া যাবে চলেন।

রাযিয়াকে লইয়া রিকশাটা অনেকদূর চলিয়া গেলেও হামিদ সেদিকে চাহিয়া রহিল।

৫

হোষ্টেলের মধ্যে রশিদের সাথেই হামিদের ঘনিষ্ঠতা বেশি। রশিদ ফিফথ ইয়ারের ছাত্র। বয়সে হামিদের বছর পাঁচেকের বড়। সাত বছর ধরিয়া সে মেডিক্যালে পড়িতেছে। গত তিন বছর একই ফিফথ ইয়ারে। পাশের জন্য তার খুব তাড়া দেখা যায় না। প্রফেসরদেরে ধরাধরি করিলে, তাঁদেরে রোগী-পত্র যোগাড় করিয়া দিলে পাশ করা যায়, অনেক বন্ধুই রশিদকে সে কথা বলিয়াছে। রশিদ কিছু করে নাই। ফলে রশিদের অনেক সহপাঠী ডাক্তারি পাশ করিয়া গিয়াছে। কেউ এই কলেজের হাসপাতালেই ক্লিনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট করিতেছে। কেউ চাকরি নিয়াছে। আবার কেউ প্র্যাক্টিসও করিতেছে। তাতে রশিদের মনে কোনও কষ্ট আছে বলিয়াও মনে হয় না। পড়ার খরচের কোনও চিন্তা নাই। বাপ-চাচা জরী বড় ব্যবসায়ী। তাঁদের সে একমাত্র ওয়ারিশ। এর বেশি আর কিছু কেউ জানে না। জানার দরকারও পড়ে নাই।

এ ছাড়া, চরিত্রহীন বলিয়া রশিদের বদনাম আছে। সে মেয়ে লোকের সাথে প্রেম করিয়া বেড়ায়। এমন কি কুস্থানে যায়। তার চেয়েও বড় অপরাধ রশিদ ধর্ম-টর্ম মানে না। তার মানে সে নাস্তিক। এ অবস্থায় রশিদকে হোষ্টেলে জায়গা না দেওয়ার কথা। অন্তত একঘরে করিয়া রাখা ত নিশ্চয়ই। কিন্তু রশিদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনও কিছুই হয় নাই।

কারণ রশিদের গুণেরও সীমা নাই। সে গায়ক। সে বাদক। তার গলাটি অতি মিঠা। তার বাঁশির আওয়াজ শুনিলে কান পাতিয়া থাকিতে হয়। হোষ্টেলের কেউ-কেউ গান-বাজনায় রশিদের নিকট তালিম লয়। হোষ্টেলের সব ফাংশানেই রশিদের গান হয়। বাহির হইতেও তার দাওয়াত আসে। ফলে রশিদ এই হোষ্টেলের একটা গৌরবের বস্তু, একটা এসেট।

এর উপর রশিদ স্বভাবতই সেবা-পরায়ণ। হোষ্টেলের কলেজের বাহিরের কোন বন্ধু-বান্ধবের অসুখে সেবা-শুশ্রূষার জন্য তার শয্যা-পার্শ্বে রশিদকে দেখা যাইবেই। এ ব্যাপারে তার জুড়ি নাই।

এইসব কারণে বন্ধুদের নজরে রশিদের চরিত্রের অন্ধকার দিকটা এখন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ও-সব কথা বড় কারও মনেই পড়ে না। মনে যাদের পড়ে তাদের ভাবটা যেন এই: রশিদ ভাইর দশ খুন মাফ।

ঘটনাচক্রে এবং বরাতে গুণে বা দোষে হামিদের সিট পড়ে রশিদের সাথে। গোড়াতে হামিদ এটা পছন্দ করে নাই। বয়সের পার্থক্যের দরুন প্রথম-প্রথম হামিদ রশিদকে এড়াইয়া চলিত। কিন্তু বেশি দিন তা পারে নাই। অল্পদিনেই দুজনই পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়। রশিদের চেয়ে হামিদের গলা ভাল। শুধু উস্তাদী গান ও বাজনাটাই হামিদ জানে না। রশিদ দুদিনে ওসব শিখাইয়া দিবার ভার নিল। হামিদ সানন্দে রশিদের শাগরেদ হইল। এই সংগে বহু বিষয়ে দুই বন্ধুর মতের আদান-প্রদান হইল। অনেক বিষয়ে হামিদ রশিদের মত গ্রহণ করিল।

ইতিমধ্যে রশিদের মদ-মেয়ে সম্পর্কিত চরিত্রহীনতার কথা হামিদের কানে আসিল। বিশ্বাসও অনেকটা করিল। কিন্তু ততদিনে ফিরার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্য দশজনের মতো হামিদও রশিদের দোষ সহিয়া গেল। উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল। কিন্তু রশিদের চরিত্রহীনতা হামিদকে স্পর্শ করিল না। প্রধানত রশিদেরই চেষ্টায় সন্ধ্যার পর আমোদ-প্রমোদে যাইবার সময় রশিদ কোনও দিন হামিদকে সংগে নিত না। নিজে যাইতে বলে নাই। অন্য কেউ প্রস্তাব করিলে রশিদ বলিয়াছে, 'না' হামিদ থাক। ফলে রশিদ-চরিত্রের ঐ দিকটা হামিদের কাছে কার্যত গোপনই রহিয়া গিয়াছে। হামিদ জানে, রশিদভাই নারী ব্যাপারে বহুদর্শী। রশিদ জানে, হামিদ ও-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। অথচ কেউ কারো কাছে কিছু বলে না। শুধু মাত্র এক একটা ব্যাপারে তারা বড়-ছোট দুই সহোদরের দুরত্ব রাখিয়া চলে। নারী জাতি, কুহকিনী মায়াবিনী রূপ সম্বন্ধে হামিদের ছেলেবেলাকার মতও যেমন সে রশিদকে বলে নাই, বই-পুস্তক পড়িয়া বন্ধু-বান্ধবের মুখে শুনিয়া ইদানিং তার মতের যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাও বলে নাই।

অথচ রাযিয়ার সাথে আজ যে ঘটনাটা ঘটিয়াছিল, এটা কারও কাছে না বলিয়া হামিদ থাকিতে পারিল না। রশিদভাই ছাড়া এমন গোপন কথা কারো কাছে বলাও যায় না। অনেক দ্বিধা করিয়া শেষ পর্যন্ত রশিদকে সব কথা বলিল। প্রথমে সে নিজের পছন্দ-মতো কাট-ছাট করিয়া বলে। কিন্তু রশিদের জেরার সামনে সে কিছুই গোপন রাখিতে পারে না। খুটিনাটি ব্যাপারগুলি রশিদ বাহির করিয়া নেয়।

সব শুনিয়া রশিদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হামিদের মুখ-ভাব লক্ষ্য করে। শেষে হাসিয়া বলে: এ সব ত প্রেমে পড়ার লক্ষণ হে।

আমার, না রাযিয়ার?—হাসির জবাবে হাসিয়া হামিদ বলে।

তোমার নিশ্চয়ই। রাযিয়ার হৈতে যাব কেন? নারী কখনো প্রেমে পড়ে না। অন্তর বৈলা তাদের কোনও বস্তু নাই। তারা দেহ-সর্বস্ব। সহজ সুখে তাচ্ছিল্য-ভরে রশিদ বলে। গলায় গাভীর আনিয়া যোগ করে: সাবধান, নারীকে দেহ দিও, মন দিও না।

কথাটা ভাল লাগে না হামিদের। রাযিয়াকে গাল দেওয়া হইল বলিয়া নয়, রশিদের আক্রমণটা তার নিজের গায় লাগিল বলিয়া। রাযিয়াকে হামিদ ভালবাসে নাই। কিন্তু হামিদের ধারণা রাযিয়া তাকে ভালবাসিয়াছে। হামিদ আশা করিয়াছিল রশিদ এই কথাটাই বলিবে। অথচ রশিদ বলিল উল্টা। সে হামিদকে কোনও গুরুত্ব দিল না।

প্রকারান্তরে রশিদ বলিয়া দিল, রাযিয়াকে আকৃষ্ট করার মতো কোনও গুণ হামিদের নাই। এতে হামিদ ব্যথিত হয়। সে বিরক্তির সাথে বলে: কেন, প্রেমটা দোষের কিসে?

দোষের বা গুণের কথা আমি কই নাই। প্রেম নামে কোনও জিনিস নাই, তাই কইলাম। আংগুলের তুড়ি মারিয়া রশিদ বলে।

হামিদ খানিক চিন্তা করে। পরে ধীরে ধীরে বলে: প্রেম বৈলা কোনও বস্তু নাই, তবে নর-নারীর মধ্যে যে আকর্ষণটা আছে এটা কি? না, এটাও মিথ্যা?

বুদ্ধিমানের মুচকি হাসিয়া রশিদ বলে: না, টানটা মিথ্যা নয়; তবে ওটা নিতান্ত দৈহিক।

এটা আপনার অন্যায় কথা রশিদভাই। প্রতিবাদের সুরে বলে হামিদ। সবাইর মধ্যে না থাকতে পারে, কোনও-কোনও নারী-পুরুষের মধ্যে প্রেম আছেই। না থাকলে লায়লা মজনুর জন্য, ফরহাদ শিরির জন্য, যোলেখা ইউসুফের জন্য, রাধা শ্যামের জন্য সব বিসর্জন দিত না।’

রশিদ নীরবে মিটিমিটি হাসিতে থাকে।

রশিদ হামিদকে দুর্বল-চেতা নির্বোধ মনে করিতেছে? হামিদ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। নারী জাতি সম্পর্কে তার ছেলেবেলার ঘৃণা অবিশ্বাস কহকিনী-মায়াবিনী থিওরি সব রশিদকে প্রাণ খুলিয়া বলে। তার পর বাগানের ফুলের পী তার সর্বাধুনিক মতও বলে। শক্তিশালী যুক্তি দিয়াই বলে।

হামিদের সব কথা রশিদ মন দিয়া শুনে। কিন্তু আগের মতো মৃদু-মৃদু হাসিতেই থাকে। হামিদের কথা শেষ হইলে সে বলে: তোমার এসব স্বপ্নের একটাও ঠিক না। কিন্তু তর্ক কৈরা তোমারে বুঝাইতেও চাই না। নিজে-নিজেই যেমন আগেকার মত বদলাইছ, আস্তে-আস্তে বর্তমান মতও বদলাইবা। নারী জাতি সম্পর্কে তোমার ব্যক্তিগত দৈহিক কোনও অভিজ্ঞতা নাই। নারী-বিচারে তোমার মতেরও কোনও মূল্য নাই।

দৈহিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকিলেই মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, এ মত হামিদ মানে না। সে রশিদকে খোঁচা দেওয়ার মতলবে বলিল: আপনিই কি সব ব্যাপারে ব্যক্তিগত দৈহিক অভিজ্ঞতা দাবি করতে পারেন?

খোঁচাটা গায় না মাখিয়া রশিদ বলে: অন্তত নারীর ব্যাপারে নিশ্চয় পারি। অভিজ্ঞতা যে দরকার রাযিয়ার ব্যাপারটা দিয়াই তোমারে বুঝাইয়া দেই। ওর একটা কথার একটা ভংগিরও সঠিক মানে তুমি বুঝতে পার নাই। অথচ তার সবগুলো কথা ও কাজের অর্থ আমার কাছে সুস্পষ্ট।

কৌতূহলে হামিদ বলে: কি রকম?

রশিদ জ্ঞানীর গাভীর মুখে আনিয়া বলে: তুমি রাযিয়ার গলা-বুকের দিকে নয়র করায় সে তোমারে তব্বিহ করছে। তুমি গাধা সেটা সত্য তিরস্কার বৈলা মাইনা নিছ। অথচ রাযিয়ার ঐ তিরস্কারের অর্থ ঠিক উল্টা। নারী মাঝেই চায়, রাযিয়াও চায়, পুরুষ তার দেহ-সৌষ্ঠব হা কৈরা দেখুক। পুরুষরা যদি তা না করে, তবে নারী অপমান বোধ করে। ভাবে, পুরুষ তার রূপ অগ্রাহ্য করল। রাযিয়ার ইশারা তুমি বুঝতে পার নাই বৈলা সে কৌশলে তার গায় হাত দেওয়াইছে। প্রকারান্তরে সে তোমারে কইছে শুধু

চোখ দিয়া না হাত দিয়া আমার রূপ-যৌবন ভোগ কর। আমারে দুই হাতে জড়াইয়া ধর।

‘বলেন কি রশিদভাই?’-বিশ্বয়ে হামিদ বলে। ‘রাখিয়ার সাথে অমন ব্যবহার করলে সে অপমান বোধ করত না, চিৎকার করত না?’

‘নিশ্চয় করত।’-রশিদ হাসিয়া বলে। ‘চিৎকারও করত, তোমারে অসভ্য বৈলা গালও দিত। কিন্তু অপমান বোধ করত না। গর্ববোধ করত। যে নারী তার নিতম্বের দিকে চাইয়া থাক বৈলা তোমারে অসভ্য বেহায়া বৈলা গাল দিতে-দিতে রাগ কৈরা চৈলা যায়, সেও যাবার সময় খুব-তেরেসে মাজা দোলায়। নিতম্ব কাঁপাইয়া যায়। অংগের ভাষায় বৈলা যায়: ‘দেখ, আরও দেখ। আমার নিতম্বের কথা শোন, মুখের কথা শুইনো না।’ নারীর অংগের ভাষা যারা না বুঝে, তার মুখের কথাতেই যে পুরুষ নারী-ভোগে নিরস্ত হয়, নারী তারে কাপুরুষ মনে করে।

রাগত গলায় হামিদ বলে: নারী জাতিকে যতটা হীন ও নীচ রূপে আপনে আঁকতেছেন রশিদভাই, আসলে তারা অত নীচ ও হীন না।

রশিদ মুরুব্বির মুচকি হাসিয়া বলে: আমি নারীকে হীন বা নীচ বলি নাই। ওটা হীনতাও না, নীচতাও না। ওটা নারীত্ব। বুড়ারা যদি ওটাকে নীচতা ও হীনতা বলে, তরুণরা ওটাকে বলবে মহত্ত্ব ও উদারতা।

সে রাত্রে হামিদের না বসে বই এ মন, না পারে সে ঘুমাতে। রশিদ রাতের খানা সকাল-সকাল খাইয়া বাহির হইয়াছে। বলিয়া গিয়াছে সেকেও খেদেখিয়া ফিরিবে। তার মানে একটার আগে নয়। রুমে সে একা। অন্যদিন এই অবস্থায় হামিদ অন্যান্য বন্ধুদের সংগে আড্ডা দেয়। আজ তা করিল না। বরঞ্চ কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া বই নিয়া টেবিলে বসিল।

কিন্তু পড়া হইল না। রশিদের কথাগুলি তার মন তোলপাড় করে। কথাগুলি হামিদের কাছে একদম নতুন। কি সাংঘাতিক কথা! সত্য হইতেই পারে না। অথচ একটা কথার বিরুদ্ধেও ত হামিদ যুক্তি দিতে পারে না। বরঞ্চ মওলানা জামীর কথার সাথে রশিদভাইর কথার মিল কত! রশিদভাই বলিয়াছেন, নারীকে দেহ দিও মন দিও না। মওলানা জামী বলিয়াছেন: নারী জাতিকে বিশ্বাস করিও না। দুইটা একই কথা। অথচ রশিদভাই জীবনে ফারসী পড়েন নাই। হামিদ বহুকাল আগে মওলানা জামীর মত বাতিল করিয়া দিয়াছিল। আজ সে বুঝিল জামীর মত আজও সে বিশ্বাস করে। বাতিল করাটা হামিদের মুখের কথা মাত্র।

না, রশিদভাইর কথাটা উড়াইয়া দেওয়া চলে না। নারীকে মন দেওয়া যায় না। অবশ্য দেয়ও নাই হামিদ তার মন। রশিদভাই নাহক সন্দেহ করিয়াছেন। হামিদ অত দুর্বল-চেতা নয়। নয় ত বটেই, তবু হামিদ সব সময় রাখিয়ার কথা ভাবে কেন? কেন রাখিয়ার চেহারা সর্বদা তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে? হামিদ দুই হাতে ঠেলিয়াও যে রাখিয়াকে তার চোখের সামনে হইতে সরাইতে পারে না। এটা তবে কি?

এটা হামিদ রাখিয়াকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া নয় রাখিয়াই হামিদকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া। রাখিয়া হামিদকে ভালবাসিতেই পারে না এটা রশিদভাইর এক গুয়েমি। তাঁর মনের হিংসা অসূয়া। নিজে কোনও দিন কোনো মেয়েলোকের ভালবাসা পান নাই ত

সেই জন্য। কেন রাযিয়া হামিদকে ভালবাসিতে পারে না? রাযিয়া সুন্দরী বলিয়া? হামিদ অসুন্দর বলিয়া? রাযিয়া সত্যই সুন্দরী। ললিতার চেয়েও সুন্দরী। ললিতার চামড়াটাই সাদা। মুখটা রাযিয়ার মতো সুন্দর নয়। সবই ঠিক। কিন্তু হামিদ অসুন্দর কিসে? তার চোখ দুইটা যে অসাধারণ সুন্দর, এটা ত রাযিয়ার নিজের কথা। আরও বহু লোকে একথা বলিয়াছে। সবাই হামিদের চোখের তারিফ করিয়াছে। কিন্তু রাযিয়ার মুখের তারিফ হামিদের যত মজা লাগিয়াছে, এমন কখনও হয় নাই। রাযিয়া কি অমন তারিফ করিয়াছে? সত্যই হামিদের চোখ হইতে জ্যোতি ঠিক্রাইয়া পড়ে।

টেবিলের কোণে-রাখা আয়নাটা হামিদ টানিয়া সামনে আনিল। চোখ দুইটা একবার ছোট করিয়া মাথাটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘুরাইয়া দেখিল। সত্যই চোখ দুইটা সুন্দর। ভূ দুইটা প্রায় জোড়া ধনুর মতো বাঁকিয়া চোখের শেষ সীমানা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ক্রমে সরু হইয়া একদম সুই-এর আগার মতো মিলাইয়া গিয়াছে। এ চোখ পছন্দ না করিয়া পারে রাযিয়া? আর শুধু চোখই কেন? তার নাক কান ঠোঁট কোনটা খারাপ? কপাল বড়? সেটা ত শুভ লক্ষণ। খুঁটিটা খাট? দাড়িতে সেটা ত ঢাকাই পড়িয়া গিয়াছে। ললিতা এই জন্য দাড়ি কামাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ললিতাকে ধন্যবাদ। রাযিয়াও বলিয়াছে, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হামিদকে বড় সুন্দর দেখায়। এর পরেও রশিদভাই বলিতে চান, রাযিয়া হামিদকে ভালবাসে নাই? তিনি ত নিজেই বলিয়াছেন, নারীর বুক ফাটে তবু মুখ ফুটে না। আহ! রশিদভাই কি সত্য কথাটাই না বলিয়াছেন!

তবে কি হামিদের একটু জবরদস্তি করিতে হইবে? রাযিয়া কি তবে তারই অপেক্ষা করিতেছে? কিন্তু তা করিতে হইলে হামিদকেও ত রাযিয়াকে ভালবাসিতে হইবে। সেটাই যে হামিদ পারিতেছে না। অত সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও রাযিয়াকে সে মন দেয় নাই। তবু মনে তার আগুন লাগিয়াছে। কিন্তু হামিদের দেহে আগুন লাগিতেছে না কেন?

চেরাগের আগুনে ঘর পুড়িল

১

আজ পাঁচ বছর হয় পীরজাদা আবদুল হামিদ আল-কোরায়েশী ফতেপুর ত্যাগ করিয়াছে। আর আসে নাই। এই পাঁচ বছরে ফতেপুরে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। ফতেপুরের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বড় দুলাভাই উকিল আফতাবুদ্দিন সাহেবের মুখে ও পত্রে হামিদ সে সব ঘটনা ও পরিবর্তনের অনেক কিছুই জানিয়াছে। কিন্তু হামিদ তাতে প্রভাবিত বা বিচলিত হয় নাই। সে সব ঘটনার বেশির ভাগই হামিদের প্রতিকূল। তবু হামিদ তাতে দুঃখিত হয় নাই।

সিরাজগঞ্জের চার বছরের প্রথম বছর কাটিয়াছে বিজয়ের আনন্দে। নিজের পিতার সাথে ছিল সেটা আদর্শের লড়াই। সে যুদ্ধে হামিদ জিতিয়াছে। এটাই তার আনন্দ। দ্বিতীয় বছর কাটে তার আত্ম-নির্যাতনের মেসোকিস্টিক পুলকে। আদর্শের জন্য সে নিজেকে যন্ত্রণা দিতে পারিয়াছে, এবং এই 'নিজেটা' ফতেপুরের সম্পদশালী পীরেরই সন্তান। এমন ধনী-পুত্রের আত্ম-নির্যাতনের পুলক কত তীব্র! এই নিশাফ কাটিয়াছে দ্বিতীয় বছর। তৃতীয় ও চতুর্থ বছর কাটিয়াছে তার পর-নির্যাতনের জ্যাকোবী স্যাডিস্টিক পুলকানন্দে। এটা চলে ঢাকায় মেডিক্যাল কলেজে এক বছর। মাস্টার্স পাশ করিয়া হামিদের আই. এস. সিতে ভর্তি হওয়ার খবর যেদিন ফতেপুরে পৌঁছে, সেদিন পীর সাহেব-কেবলার বাড়িতে এবং সারা গাঁয়ে বিষম হৈ-চৈ। স্বামী পীর সাহেব-কেবলার তর্জন-গর্জন। খলিফা শাগরিদ-মুরিদের হায় আফসোস! বিজ্ঞান? সে ত নাস্তিকদের খৃষ্টানী কুশিক্ষা! ঐ শয়তানী শিক্ষা লাভ করিতে গিয়াছিল ফতেপুর শরিফের পীরজাদা? দেশ গোনায়ে ডুবিয়া গেল। কিয়ামতের আর সেরা নাই। পীরজাদা পবিত্র ফতেপুর খান্দানের কুপুত্র। চান্দের কলংক। ফুল-বাগিচার গোবরিয়া পোকা। দুলাভাই যখন এইসব কথার অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া বিস্তারিত বিবরণ দেন, তখন শালা-দুলাভাই দুইজন মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিতেছিলেন। এতে বড় বু শাহেদা দুঃখিত হইয়াছিলেন। উভয়কে তব্বিহ করিয়াছিলেন। এত বিপদেও মানুষ হাসি-মশ্কারা করিতে পারে?

তারপর আই.এস.সি. পাশ করিয়া হামিদের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার খবর যেদিন ফতেপুরে পৌঁছে, সেদিন ফতেপুরে একেবারে দস্তুরমতো কারবালার হাহাকার। ডাক্তারি? ডাক্তাররা যে রোগীদের মদ খাওয়ায়। তাদের প্রেসক্রিপশনের সব ঔষধই ত মদ দিয়া তৈয়ারি! ডাক্তাররা সবাই ত বিলাতী মদের বেপারীদের এজেন্ট। নিয়মিত কমিশন পায়। এমন ডাক্তারি পড়িতে গেলেন কি না ফতেপুরের পীরজাদা? দরবারে সমবেত সব খলিফারাই বিভিন্ন ভাষায় পীর সাহেব-কেবলাকে উষ্কানি দিলেন। পীর সাহেব-কেবলার ক্রোধ চরমে উঠিল। তিনি প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা করিলেন পীরজাদাকে তিনি ত্যজ্য পুত্র করিবেন। তাকে ফতেপুরের সাজ্জাদানশিন করিবেন না। অন্য কোনও লোককে গদিনশিন করিয়া রেজিস্টারি ওসিয়তনামা করিয়া যাইবেন।

মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে হামিদের কামরায় বসিয়া উকিল সাহেব যেদিন এসব কথা বলেন, সেদিন তিনি এও বলিয়াছিলেন যে একমাত্র পুত্রের পাঁচ বছর অদর্শনে পীর সাহেব-কেবলার মর্যি-মেযাজের পরিবর্তন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়া শত্রুপক্ষের নানারূপ প্রচারণায় পীর সাহেব-কেবলার স্বাস্থ্যও খুব ভাংগিয়া পড়িয়াছে। এখন দেখিয়া হামিদ তাঁকে সহজে চিনিতেই পারিবে না। এবারও হামিদের মনের প্রতিক্রিয়া হয় সেই যালেমী পুলকানন্দ। বেশ হইয়াছে। প্রগতির দূশমনদের জ্ঞান বিস্তারের শত্রুদের এমন মানসিক নির্যাতনের দরকার আছে। ওতেই যদি তাঁদের জ্ঞান হয়। কিন্তু এবার হামিদের মনের এই জালেমী পুলকানন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। রুগ্ন পিতার শীর্ণ মুখের কোটর-গ্রস্ত চোখ দুইটি তার কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল। সে চোখে আঁসু ছলছল করিতেছে। বাপের প্রতি হামিদের দিলটা নরম হইল। না বাপজান আসলে খারাপ লোক নয়। যত দোষ ঐ বদমায়েশ খলিফাগুলির। নিজেদের লাভের ব্যবসা চালাইবার জন্যই তাঁরা সরলমনা পীর সাহেবকে দিয়া মূর্থ জনসাধারণের ধর্মীয় কুসংস্কার শোষণ করিতেছেন। সুযোগ পাইলে ঐ বদমায়েশদেরে শায়েস্তা করিবে হামিদ। বাপজানকে ওদের কবল হইতে উদ্ধার করিবে সে।

২

পীরজাদা পীর সাহেব-কেবলার সহিত কোন এক ব্যাপারে ঝগড়া করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, আর আসিবে না বলিয়া গিয়াছে, কথাটা বেশিদিন গোপন রাখা যায় নাই। দু'চার মাসেই কানাকানি শুরু হইয়াছিল। বছর না ঘুরিতেই কথাটা পাকা হইয়া গেল। লম্বা ছুটিতে ও ঈদ-পরবেও হামিদ বাড়ি আসে নাই। অথচ মোমিনশাহী শহরে ভগ্নিপতির বাসায় বেশ-কিছুদিন থাকিয়া গিয়াছে, এমন চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া গেল অনেক। গাঁয়ের মাতব্বর মুরিদরা, শেষ পর্যন্ত খলিফাদের অনেকেই, পীর সাহেব কেবলার মুখে ব্যাপারটা জানিতে চাহিলেন। প্রথমে নানা অজুহাতে পীর সাহেব কথাটা এড়াইয়া গেলেন। অবশেষে স্বীকার করিলেন। কিন্তু বাপ-বেটার বিরোধটা পাতলা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেন। বিশেষ কিছু না। ছেলের ইংরাজি পড়ার খেয়াল। পীর সাহেব-ওসব পছন্দ করেন না। ছেলে জিদ করে। পীর সাহেব ধমক দেন। মুখের চোটে বলিয়া ফেলেন: আমার বাড়ি থনে বার হইয়া যাও। এই সামান্য কথাতেই ছেলে রাগ-অভিমান করিয়াছে।

এ কৈফিয়ত বেশি দিন চলে নাই। খলিফাদের খুটিনাটি জিগ্গাসার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার যুক্তি-পূর্ণ জবাব দিতে গিয়া পীর সাহেব ধরা পড়িয়াছেন। ছেলের লেখা-পড়ার খরচ কেমনে চলে? এ কথার উত্তরে তিনি ঐ নাসারায়ী শিক্ষার খরচ দেন না বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইভাবে আসল কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং অতিরঞ্জিত হইয়াই বাহির হইয়াছে। ক্রমে রাষ্ট্র হইয়াছে, হামিদ রোজা-নমাজ ছাড়িয়া দিয়াছে নাস্তিক হইয়াছে, খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে, মদ খাইতে শুরু করিয়াছে। এইসব কথা এখন ফতেপুরের রাস্তাঘাটে মুখে-মুখে আলোচনা হইতেছে। স্বয়ং পীর সাহেব এসব কথার প্রতিবাদ না করায় লোকজনের আর কোনও সন্দেহ থাকে নাই। তারপর পীর সাহেব যখন তর্জন-গর্জন করিয়া হামিদকে তাজ্য পুত্র করিবার ও অন্য লোককে সম্ভবত

এক আলেম মেয়ে-জামাইকে সাজ্জাদানশিন করিয়া যাইবার সংকল্প প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা করেন, সেইদিন এই দুঃসংবাদ চূড়ান্ত রূপে গৃহীত সত্যে পরিণত হয়।

বড় বিবির এন্তেকাল ও ছোটবিবির ডাইনি হওয়ার পর হইতেই খলিফাদের কেউ-কেউ এবং মাতঙ্গর মুরিদদের অনেকেই পীর সাহেব কেবলাকে আরেকটি কাজ করিবার পরামর্শ দেওয়া শুরু করেন। পীর সাহেব-কেবলার দৃঢ় এন্কার সত্ত্বেও খলিফারা ঐ পরামর্শ দিতেই থাকেন। কিন্তু একটি ব্যাপারে স্বয়ং খলিফাদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় পীর সাহেব কেবলা সে যাত্রা খলিফাদের হিতৈষণার পীড়াপীড়ি হইতে বাঁচিয়া যান। ঘটনাটি এই: খলিফাদের সকলে যখন সমবেতভাবে পীর সাহেবকে আরেকটি শুভ কাজ করিতে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন এবং পীর সাহেব যখন প্রায় একরূপ রাজি হইয়া গিয়াছিলেন, এমন সময় খলিফাদের মধ্যে একজন নিজের বিবাহযোগ্য মেয়েকে পীর সাহেব-কেবলার খেদমতে দিবার প্রস্তাব করেন। এতেই অন্যান্য খলিফাদের উৎসাহ মাটি হইয়া যায়। মেয়েওয়ালা খলিফাটি এর পরেও অনেক যুক্তি-তর্ক দেন। স্বয়ং পয়গম্বর সাহেবও নিজের খলিফার মেয়ে শাদি করিয়াছিলেন বলিয়া সুন্নতী নজিরও পেশ করেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মাত্র একজন পীর সাহেব-কেবলার শ্বশুর হওয়ার মরতবা হাসিল করিবেন, এই সম্ভাবনা কারও পছন্দ না হওয়ায় তাঁরা আপাতত: পীর সাহেবের আরেকটি বিবাহ করার বিপক্ষে নিত্য-নতুন যুক্তি খাড়া করিতে লাগিলেন। মেয়ের বাপ একা আর এ ব্যাপারে চেষ্টা করিবার সাহস করিলেন না। পীর সাহেবের শাদির প্রস্তাবটা তখন এইভাবে চাপা পড়িয়াছিল।

হামিদের খৃষ্টান হওয়ার কথা প্রকাশ হইয়া যাওয়ার এবং পীর সাহেব কেবলা তাকে ত্যজ্য পুত্র করিবার সংকল্প ঘোষণার পর এই কথাটাই নতুন করিয়া উঠিয়া পড়িল। মেয়েওয়ালা খলিফার মেয়েটির ততদিনে বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কাজেই পীর সাহেবের আরেক বিবাহে কোনও খলিফারই কোনও অসুবিধা না থাকাতে এবার সকলে সমবেতভাবে পীর সাহেবকে এ ব্যাপারে প্রবলভাবে চাপিয়া ধরিলেন। প্রবলভাবে চাপিয়া ধরিবার কারণ এই যে পীর সাহেব-কেবলা কথায়-কথায় সাজ্জাদানশিনরূপে নিজের এক আলেম জামাইর নামও করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হাদিস কোরআনে খুব লিয়াকতওয়ালা হিন্দুস্থান হইতে মওলানার সনদ-পাওয়া বলিয়া তাঁর বাখানিও করিয়াছিলেন। জামাই হউক আর যেই হউক ফতেপুরের সাজ্জাদে বাইরের কোনও লোক 'নশিন' হউক, এটা খলিফাদের কেউ পছন্দ করিতেন না। পক্ষান্তরে খলিফাদের মধ্য হইতে সিনিওরিটি হিসাবে কেউ সাজ্জাদানশিন হউন এ ব্যাপারেও খলিফারা একমত হইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় পীর সাহেব-কেবলাকে আরেকটি বিবাহ করাইয়া সে পক্ষে একটি নয়া পীরজাদা পয়দার চেষ্টা করাই তাঁর সর্ব-সম্মতিক্রমে মাকুল মনে করিলেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে পীর সাহেব-কেবলার একটা নিজস্ব মতামত ছিল। সেটা তিনি সকলের কাছে খুলিয়া বলেন নাই। খলিফা ও মুরিদ-মোতেকাদদেরে খুশী করিবার জন্য এবং নিজের যশ সুনাম রক্ষার উদ্দেশ্যে নিজের ছেলেকে ত্যজ্য পুত্র করিবার কথা বাইরে-বাইরে যতই বলুন না কেন, এক মাত্র পুত্রের প্রতি পিতৃস্নেহটাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া সাধারণ মা-বাপের মতো তিনি দরদে গলিয়া গিয়া নিজের কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছেন তাও নয়। সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার

ধারাটা এই রূপ: হামিদকে তিনি অন্তর দিয়া ভালবাসেন। সেই হামিদই বাপকে অপমান করিয়াছে। এটা বড় কথা নয়। তেমন হইলে তিনি ছেলেকে কবে মাফ করিয়া দিতেন। হামিদ অপমান করিয়াছে ধর্মের, শরিয়তের, খোদ আল্লার। এটা হক্কুল্লা। এ অপরাধ মাফ করিবার পীর সাহেবের কোনও অধিকার নাই। অথচ হামিদ তাঁরই নুৎফার ফরযন্দ। তাঁরই পুত্র হইয়া হামিদ এই না-ফরমানি এই বগাওৎ করিয়াছে আল্লার আইনের বিরুদ্ধে, এটা পীর সাহেবের জন্য একটা মহা পরীক্ষা। আল্লাপাক পীর সাহেবের ঈমান পরখ করিবার জন্যই তারই নুৎফার একমাত্র পুত্রকে দিয়া এ বিদ্রোহ করাইয়াছেন। হযরত নূহ ও হযরত ইব্রাহিম নবীকেও আল্লাহ ঠিক এমনি পরীক্ষার সামনে ফেলিয়াছিলেন। তিনি নিজে পয়গম্বর না হইলেও বাংলা-বিহার-আসাম-বর্মার সত্তুর লক্ষ মুরিদের পীর। সিদ্দিকী বংশের ফতেপুর খান্দানের তিনি প্রতিনিধি। তাঁকে পরীক্ষায় পাশ করিতেই হইবে। কাজেই পুত্র-শ্নেহের কাছে তিনি পরাজিত হইতে পারেন না। তিনি হামিদকে ত্যজ্য পুত্র করিবেনই। আবার ফতেপুর খান্দানকে তিনি নির্বংশও করিতে পারেন না। এক জামাইকে গদি-নশিন করার কথা তিনি যে বলিয়াছেন ওটা শুধু তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা প্রমাণের জন্য। সত্য-সত্যই তিনি ত আর ফতেপুরের সিলসিলা ভাংগিতে পারেন না। সেজন্য পুত্র-সন্তানের জন্য তাঁকে আরেকটি শাদি করিতে হইবে। তিনি ত আর যেখানে-সেখানে যা-তা বংশের মেয়েকে ঘরে আনিয়া ফতেপুরের লহু নাপাক করিতে পারেন না!

কাজেই এ ব্যাপারে পীর সাহেব-কেবলার কর্তব্য দুইটি। এক্ষণে নিজের নুৎফার ফরযন্দকে তওবা করিবার সময় দিতে হইবে; দুই. দেখিয়া শুনিয়া সঙ্গশে শাদি করিতে হইবে। শুধু সঙ্গশ হইলেই চলিবে না। বয়সে সন্তান ধারণের যোগ্য এবং রং-চেহায়ায় ফতেপুর খান্দানের উপযোগি হওয়া চাই।

এই দুই কারণে পীর সাহেব-কেবলা এতদিন পরীক্ষাদের পীড়াপীড়িতে পড়েন নাই। শরিয়ত মতো তিন বছর সময় সবুর করিয়া পীর সাহেব অবশেষে আল্লার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং শুধু ফতেপুর খান্দানের সিলসিলা রক্ষার জন্য এক গরিব ভদ্রলোকের সতর বছর বয়সের এক মেয়েকে শাদি করিলেন। আল্লার ফযলে পীর সাহেব-কেবলার কুওত কোনও যুবকের চেয়ে কম নয়। আল্লার মেহেরবানিতে তাই মাসেকের মধ্যেই নয়া বিবি হামেলা হইলেন। আবার মর্জিতেই বছর ঘুরিবার আগেই তিনি একটি মৃত-পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়া মরণাপন্ন কাহিল হইয়া পড়িলেন। আর ভাল হইলেন না। সূতিকা রোগে চিররুগ্ন হইলেন। তার উপর কয়েক মাসের মধ্যে আবার হামেলা হইয়া অকাল-প্রসব-বেদনায় এক্কেম্শিয়ায় সেই যে বেহুশ হইলেন, আর হুশ হইলেন না।

পীর সাহেব-কেবলা এতে খোদাওন্দ-করিমের ইশারা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সহ্য করিতে পারিলেন না। অসুখে শয্যাশায়ী হইলেন।

৩

শেরপুরের পীর হযরত মওলানা শাহ সূফী আহসানউল্লা আগে ফতেপুরের খলিফা ও প্রচার-সচিব ছিলেন। অপুত্রক ফতেপুরী সাহেবের অবর্তমানে তিনি সাজ্জাদানশিন

হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করায় অন্যান্য খলিফাদের সাথে তাঁর মত-বিরোধ হয়। তিনি ফতেপুরের দরবার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ফতেপুরের প্রচার-সচিবের অভিজ্ঞতার বলে তিনি স্বাধীন ব্যবসা চালাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হন না। বট গাছের নিচে কি আর কোনও গাছ হইতে পারে?

পীরালি ব্যবসায়ে সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি ইসলাম প্রচারে মন দেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা ও পাশ করা মওলানা। কাজেই এদিকে তিনি সফল হইলেন। চর অঞ্চলের এক ধনী গৃহস্থের মেয়ে শাদি করিয়া মেয়ের নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করাইলেন। সেই ছাপা খানা হইতে 'নেদায়ে ইসলাম' নামে সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিলেন। সম্পাদক হিসাবে এক শালার নাম দেওয়া হইল। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক হিসাবে আসমায়ে-সিফত, কুনিয়াত ও তাখল্লুস সহ মওলানা সাহেবের নাম ছাপা হয় কাগজের শিরোনামায়। চার পৃষ্ঠার কাগজের প্রায় সব টুকুই থাকে মওলানা সাহেবের তারিফ। সভা-সমিতির রিপোর্ট ও বক্তৃতা। বক্তা ও লেখক হিসাবে অন্য লোকের নাম ছাপা হইলেও সবই মওলানা সাহেবের নিজ হাতে লেখা। তিনি ছিলেন সুলেখক। বক্তারা সভায় যা বলিতেন না, রিপোর্টে তাও ছাপা হইত। তাতে বক্তাদের আপত্তি ছিল না। তাঁদের নাম কাগজে উঠিলেই হইল।

এই কাগজের জোরেই মওলানা সাহেব আঞ্জুমনে-মুবািল্লিগানে-ইসলামে বাংগালা ও আসাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি হইলেন তার সভাপতি। তাঁর অন্তর্গত একজন মৌলবি হইলেন জেনারেল-সেক্রেটারি। হেড অফিস হইল তার শেরপুরে। মওলানা সাহেবের বৈঠকখানায়। এই মুবািল্লিগানের কাজ হইল ওয়াজের সজ্জা করিয়া 'নেদায়ে ইসলামের' গ্রাহক সংগ্রহ করা। সভার রিপোর্টে উদ্যোক্তাদের নাম ছাপা হইত বলিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করা সহজ হইত। আদায়ী চাঁদার কমিশন মিষ্টি পার্সেন্ট।

এইভাবে 'নেদায়ে-ইসলামের' যরিয়াতে মওলানা শেরপুরী কিছু দিনের মধ্যে হযরত মওলানা শাহ সূফী আহসানুল্লাহ পদবী লাভ করিলেন। কিন্তু ফতেপুরের সাথে সোজাসুজি কোনো সংঘাতে আসিলেন না। বক্তৃতায়ও না, কাগজেও না। বরঞ্চ আঞ্জুমনে-মুবািল্লিগান গঠনের সময় ফতেপুরের পীর সাহেব-কেবলার নাম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ছাপা হইল। পীর সাহেব কেবলা তা গ্রহণও করিলেন না। অগ্রাহ্যও করিলেন না। শেরপুরী সাহেবের তাতে লাভ বই লোকসান হইল না। প্রয়োজন মতো তিনি তার ব্যবহার করিতে থাকিলেন। ফতেপুরের বিরুদ্ধে তাঁর খুব সাবধানে পা ফেলিতে হইত। ফতেপুর খান্দানী পীর। তাঁর অর্গানাইজেশন প্রাচীন ও সুগঠিত। পক্ষান্তরে শেরপুরী সাহেবের খলিফা সিস্টেমও নাই। তিনি খান্দানী পীরও নন। মক্কা-মদিনা-বাগদাদ-খোরাসান-বোখারা ত দূরের কথা, দিল্লি-লাখনৌ হইতেও তিনি কোনও কুরসিনামা টানিতে পারেন নাই।

তাছাড়া খান্দানী পীরদের সম্পর্কে মওলানা শেরপুরীর একটা নিজস্ব গোপন ধারণা ছিল। তিনি সারা হিন্দুস্থানের পীর বংশের ইতিহাস ঘাটিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে পীর-বংশের মেয়াদ তিন পুস্ত। সেই হিসাবে পীরজাদা আবদুল হামিদকে ধরিয়া ফতেপুরের তিন পুস্ত হয়। ফতেপুরীরা অবশ্য সাত পুস্তের পীর বলিয়া দাবি করেন। স্বয়ং শেরপুরী সাহেবও নিজমুখে ঐ প্রচার করিয়াছেন। প্রচার-সচিব হিসাবে কল্পিত নাম ও সিলসিলা দিয়া সাত পুস্ত প্রমাণও করিয়াছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে

ফতেপুরের বর্তমান পীর সাহেবই খান্দানের দ্বিতীয় পীর। ইনার বাবাই এ বংশের প্রথম পীর। তাঁর বাবা দোওয়া-তাবিয়ের ব্যবসায়ী ফকির-খোন্দকার ছিলেন মাত্র। সেই হিসাবে পীরজাদা আবদুল হামিদ বাঁচিয়া থাকিতে ফতেপুরের পতনের কোনও সম্ভাবনা নাই। বিশেষত হামিদের যেহেন মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি নিতান্ত দুঃখের সাথে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে হামিদের আমলে ফতেপুরের পতন ত হইবেই না; বরঞ্চ আরও উন্নতি হইবে।

হামিদের বিরুদ্ধে যখন প্রচার শুরু হয়, তখন শেরপুরী সাহেব তাতে যোগ দেন নাই এই কারণে। জয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া তিনি অত বড় কাজে হাত দিতে পারেন না। কিন্তু সেই আন্দোলন যখন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ও গভীরতায় বড় হইতে লাগিল, তখন শেরপুরী সাহেব আর নির্লিপ্ত থাকিতে পারিলেন না। পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। চার হাত পায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু অতি কৌশলে। প্রথম 'নৈদায়ে ইসলামে' চিঠি-পত্রের আকারে, পরে কল্পিত বানাওট সভা-সমিতির রিপোর্টে হিতৈষীর ছদ্মবেশে ফতেপুরের মুরিদের যবানিতে এই অভিযান চলিল। চিঠি-পত্র ও রিপোর্ট সবই অবশ্য গোড়াতে মওলানা শেরপুরীর নিজেই লেখা ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সত্যসত্যই সাদ্কা চিঠি-পত্র আসিতে শুরু করিল। এই সব পত্রে গোড়াতে পীরজাদার নাস্তিকতা খুঁটান হওয়া ও মদ খাওয়ার অপরাধে তারই শুধু নিন্দা করা হইত। কিন্তু ক্রমে এই আক্রমণ স্বয়ং পীর সাহেবের বিরুদ্ধে চলিল। প্রথম দিকে পীরজাদাকে সাজা না দিবার দরুন পীর সাহেব-কেবলাকে অনুযোগ করা হইত। শেষ দিকে পীরজাদার ঐ ধর্ম-বিরোধী কাজে পীর সাহেবের আশ্কারা এমন কি সমর্থন আছে বলা হইতে লাগিল। পীর সাহেব পীরজাদার পড়ার খরচপত্র না দিলে সে কিছুতেই রাজার হালে হোস্টেলে থাকিয়া মদ খাইয়া পড়শোনা করিতে পারিত না। কাজেই স্বয়ং পীর সাহেবেরও বিচার হওয়া দরকার বলিয়া কোনও-কোনও পত্র-লেখক বলিতে লাগিলেন।

অবশেষে এ দেশের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমনে মুবাল্লিগানের বিশেষ অধিবেশন এবং সম্ভব হইলে একটি ওলামা কনফারেন্স করিবার জন্য আঞ্জুমন কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইতে লাগিল। এই ধরনের বহু অনুরোধ পাইবার পর মওলানা শেরপুরী অগত্যা আঞ্জুমনের এক বিশেষ অধিবেশন ও নিখিল-বংগ ও আসাম ওলামা সম্মিলনীর আয়োজন করিলেন। সম্মিলনীর স্থান অবশ্য শেরপুরেই হইল। নিরপেক্ষ দিনদার পরহেয়গার মোতেবর আলেমদিগকে সেই সম্মিলনীতে দাওয়াত দেওয়া হইল। নিরপেক্ষ দিনদার আলেমের তালিকা প্রস্তুতও করিলেন শেরপুরী সাহেবই। সম্মিলনীর সভাপতিও হইলেন স্বয়ং শেরপুরী সাহেবই। তাঁরই উদ্যোগে তাঁরই বাড়িতে তাঁরই খরচে এই সম্মিলনী। সভাপতি তিনি হইবেন না তবে কে হইবে? চক্ষু-লজ্জাও ত একটা আছে!

সভাপতির ভাষণের ভূমিকায় ও উপসংহারে খুব জোরের সাথেই বলা হইল যে কারো প্রতি কোনও হিংসা-বিদ্বেষ বা আক্রোশে কিছু বলা বা করা হইতেছে না। শুধু শরিয়ত ও মুসলমানদের ঈমান-আমানের হেফায়ত করিবার সাধু উদ্দেশ্যে এই সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছে। অভিভাষণের বিশাল গর্ভে নাম না করিয়া ফতেপুরের পীরজাদা পীরসাহেব ও পূর্ব পুরুষের সত্য ও কল্পিত অসংখ্য পাপের কাহিনী বর্ণিত হইল। সম্মিলনীতে সমবেত ওলামায়ে-কেরাম নিতান্ত নিরপেক্ষভাবে শেরপুরী

চেরাগের আগুনে ঘর পুড়িল

সাহেবের প্রদর্শিত লাইনে ওজস্বিনী ভাষায় ফতেপুরের অনাচার হইতে সমগ্র মুসলমান-জাতিকে বিশেষভাবে ফতেপুরের মুরিদ-মোতেকাদদের রক্ষার জন্য সর্ব-শক্তিমান আল্লাহকে এবং শক্তিহীন জনসাধারণকে সমান জোরে অনুরোধ করিলেন।

ফতেপুরের পীরজাদার ও পীরসাহেব-কেবলার বিভিন্ন কবির-সগিরা গোনার তীব্র নিন্দা করিয়া উহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া এবং প্রতিকারের জন্য আঞ্জুমেনকে ক্ষমতা দিয়া এবং এই সব অনাচারের দিকে মুসলমানদের ও ওলামা সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় 'নেদায়ে ইসলামকে' ধন্যবাদ দিয়া এবং মুসলমানদিগকে দলে-দলে উহার গ্রাহক হইবার অনুরোধ করিয়া সর্ব-সম্মতি-ক্রমে বহু প্রস্তাব পাশ হইল।

ওলামা কনফারেন্সের সাফল্যে একদিকে শেরপুরীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। অপরদিকে ফতেপুরের দ্রুত পতন শুরু হইল। শেরপুরীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এই জন্য যে কথা উঠিয়াছিল ফতেপুরের পীর সাহেব এই কনফারেন্স হইতে দিবে না। হয় নিজস্ব আলেম ওলামা ও লোকজন আনিয়া সম্মিলন ক্যাপচার করিবেন নয়, লাঠিয়াল দিয়া সভা ভাঙিয়া দিবে। ফতেপুরের খলিফারা প্রায় সর্ব-সম্মতিক্রমে পীর সাহেব-কেবলাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। স্বয়ং পীর সাহেব বিভিন্ন যুক্তিতে এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু জনসাধারণ এটা জানিত না। তারা বিশ্বাস করিত, পীরসাহেব এই দুইটার যে কোনটা করিবার ক্ষমতা ও প্রভাব রাখেন। সেজন্য বাহাস দাংগা একটা হইবেই, জনসাধারণ এটা ধরিয়াই রাখিয়াছিল। সম্মিলনীতে যে অত লোক হইয়াছিল তা এই তামাশাটা দেখিবার জন্যই। ফতেপুরের পক্ষ হইতে দুইটার একটাও না হওয়াতে লোকেরা শুধু নিরাশই হয় নাই তারা ধরিয়া নিয়াছে ফতেপুর চেষ্টা করিয়াও শেরপুরীর বিরুদ্ধে আলেম বা লাঠিয়াল কিছুই যোগাড় করিতে পারে নাই।

এর ফলে ফতেপুরের দ্রুত পতন শুরু হইল এই জন্য যে অতঃপর ফতেপুরের প্রতি লোকের আস্থা কমিতে লাগিল। পীর সাহেব-কেবলার স্বাস্থ্যের দরুন খলিফাদের উপরই সভা-সমিতি ও প্রচারের দায়িত্ব পড়িয়াছে। কনফারেন্স ক্যাপচার বা ভাঙার প্রস্তাব পীর সাহেব অগ্রাহ্য করায় তাঁদের রাগও হইয়াছে, উৎসাহও অনেক কমিয়াছে। এঁদের উৎসাহ যত কমে শেরপুরীর মুবাল্লেগদের উৎসাহ তত বাড়ে। ফতেপুরের খলিফাদের সভা-সমিতি ও ওয়াযের মহফিলে নানারূপ প্রশ্ন হইতে থাকে। ওগুলিরও সদুত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ পীরজাদা সম্বন্ধে কথাগুলির তাঁরা প্রতিবাদ করিতে পারেন না।

এই পতনের স্পিড বাড়াইয়া দেয় স্বয়ং ফতেপুরের স্কুল-কলেজে পড়ুয়া আধুনিক-মনা ছাত্ররা। এরা সবাই ছিল হামিদের গোড়া সমর্থক। সবাই পীরগিরির বিরোধী। এ ব্যাপারে সবাই প্রাচীনপন্থী বাপ-চাচার বিরুদ্ধতায় হামিদেরই পথের অনুসারী। পার্থক্য এই যে এরা যার-তার বাপ-চাচার খাইয়া শুধু মুখে-মুখে বরং মনে-মনে পীরগিরির নিন্দা করিতেছিল। তারা ত জানিত না যে এক পীর ছাড়িয়া তারা আরেক পীরের পাল্লায় পড়িতেছে। ফতেপুরের ধ্বংসে যে শেরপুরের উত্থান, এটা তারা কল্পনাও করিতে পারে নাই। সামনের বিপদটাই মানুষ দেখে। পিছনের বিপদটা দেখে না। কাজেই ফতেপুর দারুল-উলুমের অনেক মুদাররেসও তলে-তলে ফতেপুর-বিরোধী অভিযানে গোপনে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মুদাররেসরা সকলেই টাইটেল পাশ-করা বড় বড় আলেম। ফতেপুরের খলিফাদের অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই। স্বয়ং পীর সাহেবই বা কি? পাণ্ডিত্যের স্বাভাবিক গর্বে এঁরা নিতান্ত ব্যথিত মনেই শুধু চাকরির

দায়ে ফতেপুর-দরবারে পিছনের কাতারের লোক হইয়াই অসন্তুষ্ট চিন্তে সন্তুষ্ট থাকিতেন। ফতেপুরের পীরগিরির অবসান হইলে দারুল-উলুম দিয়াই ফতেপুর অন্যান্য অঞ্চলের নেতৃত্ব করিবে। তাতে মুদাররেসদের সম্মান বাড়িবে।

এর সামগ্রিক কুফল দেখা দিল ওরসে-কুলের সময়। আগে-আগে যে ওরসে লোক হইত কয়েক লাখ, সেখানে এ বছর হইল মাত্র কয়েক হাজার। আগে যেখানে উৎসব চলিত এগার দিন, এখন সেখানে দ্বিতীয় দিনেই কয়েক শতে নামিয়া গেল; তৃতীয় দিনেই মাঠ খালি। নেয়ায-নয়রানা যা আদায় হইল তার খলিফারাই কি নিবেন, আর পীর সাহেবকেই বা কি দিবেন?

পর-পর তিন বছর এরূপ চলিতেছে। পরের বছর আগের বছরের চেয়ে খারাপ যাইতেছে। অসুস্থ পীর সাহেব-কেবলার অসুখ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। কি অসুখ কেউ বলিতে পারে না। কারণ পীর সাহেব ডাক্তারি ঔষধও খান না। ডাক্তারও ডাকেন না। হামিকী চিকিৎসাই তিনি করাইতেছেন। পীর সাহেব নিজেও কিছু-কিছু হাকিমী জানেন। ফলে মুরিদানে যাওয়া আস্তে-আস্তে কমাইয়া এখন একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছেন। অসুখ শরীর লইয়া দুবেলা দরবারও করিতে পারেন না। এখন বাদ-মগরেব এক বেলা দরবার করেন। তাও বেশিক্ষণ থাকিতে পারেন না। অল্পতেই শোয়া ঘুরে। বাম বুকে ও কাঁধে ব্যথা হয়। কথা বলিতে কষ্ট হয়। ঈদ-জুম্মার ইমামত ছাড়া তিনি ইদানিং বাড়ির বাহিরই হন না। গত ওরসের শেষদিন আসরের নমাজ পড়িয়া মুক্তাদিরা সব চলিয়া যাওয়ার পরও পীর সাহেব একলা মসজিদে তেলাওয়া করিতে থাকেন। এমন একা তিনি বহুদিন থাকেন নাই। কাজেই আপন মনে অনেক কিছু ভাবিলেন। অবশেষে তিনি যখন বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সুরুজ ডুবো-ডুবে। ওরসের মাঠ প্রায় খালি। শুধু পীর সাহেবের কামলারা ওরসের সরঞ্জামাদি স্টাইতেছে। তিনি ওরসের খালি মাঠের দিকে এক ধ্যানে চাহিয়া রহিলেন। মানুষের আনুগত্য ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রেমভালবাসার আয়ু কত অল্প! মানুষের মন কত চঞ্চল! তার স্মৃতি কত ভোতা। নইলে এটা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? যে ফতেপুর শরিফের নামে সারা দেশের মাথা নত হইত, যে ফতেপুরের পীর সাহেবের একটি ফরমান পোক-পাখালির মুখে গুনিয়া সারা দেশের লোক তা পালন করিত, যে ফতেপুরের পীর সাহেব-কেবলা পথ চলাকালে রাস্তার দু'পাশের শুধু মানুষেরাই নয়, গাছ-পালারাও তাযিম-ভরে শির নোওয়াইত; যে ফতেপুরের পীর সাহেব-কেবলার সম্বর্ধনার বিপুলতা ও আন্তরিকতা দেখিয়া লাট-বেলাট ও উয়ির-নাযিররা হিংসা করিতেন, সেই ফতেপুরের আজ এই দশা!

পীর সাহেব-কেবলা মাঠের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া অন্তগামী সুরুজের দিকে চাহিলেন। ঐ সুরুজের সাথে কি তবে ফতেপুরের কোরায়েশী খান্দানও ডুবিয়া যাইতেছে? চট করিয়া তাঁর মাথা ঘুরিয়া গেল। বাম বুকে ও কাঁধে ব্যথা করিয়া উঠিল। বুক-কাঁধ টিপিতে-টিপিতে তিনি বাড়ি ফিরিলেন। বিছানা নিলেন। মগরেবের নমাজ পীর সাহেব ঘরেই পড়িলেন। এশার নমাজে তিনি ওয়ু করিতেও পারিলেন না। তৈয়ম্মুম করিয়াই কাজ সারিলেন। কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িলেন।

শেষ রাত্রে বিশ বছর আগে-মরা বড়বিবিকে তিনি খাবে দেখিলেন। বড়বিবি হামিদের হাত ধরিয়া পীর সাহেব-কেবলার সামনে হাজির। বড় বিবি পীর সাহেবকে কমদ-বুসি করিলেন। হামিদও করিল। চোখের পানিতে গাল ভিজাইয়া হামিদকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বড়বিবি পাশে দাঁড়াইয়া মিঠা-মিঠা হাসিয়া বলিলেন: আমার নাড়ি ছিঁড়া এই রক্ত আপনার হাতে দিয়া গেছিলাম। আপনার অসাবধানতায় সে রক্ত আপনে হারাইছিল। আমি আবার সে রক্ত আপনার হাতে তুলিয়া দিয়া গেলাম।' তিনি হামিদকে ছাড়িয়া বড়বিবিকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁকে অবিরত চুমা দিতে লাগিলেন। ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি দেখিলেন কোলবালিশটাকে জড়াইয়া চুমা দিতেছেন। আসতাগফার পড়িতে-পড়িতে উঠিয়া বসিলেন। তিনবার কুলহু আল্লা পড়িয়া বুকে ফুঁ দিলেন। শেষ রাত্রের স্বপ্ন। তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিল।

সেদিন ফজরের নমাজে পীর সাহেবের অনেক সময় লাগে। অনেক বেলায় তিনি ঘরে ফিরিয়া দেখেন নাশ্তা রেডি করিয়া মাজেলা বিবি অস্থির হইয়া ঘরে-বাইরে আনাগোনা করিতেছেন। পীর সাহেব-কেবলাকে হাসি-মুখে ফিরিতে দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। নিজেও হাসিলেন। নাশ্তা ঠাণ্ডা হইয়া যায় বলিয়া তাগিদ দিলেন।

নাশ্তা খাইতে-খাইতে পীর সাহেব বলিলেন: আচ্ছা বিবি সাবু হামিদ যদি আমার পা ধৈরা মাফ চায়, তবে তারে কি আমার মাফ করা উচিত? আপনে কি কন?

মাজেলা বিবি সহসা নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। কোনও ব্যাপারেই বিবিসাহেবদের মত চাওয়া পীর সাহেবের অভ্যাস নয়। তাঁর উপর হামিদ সম্পর্কে! মাজেলা বিবি মাজেলা বিবি এমন কি নয়া বিবি পর্যন্ত পীর সাহেবের কত হাত-পা ধরিয়াছেন। পীর সাহেব-কেবলা অটল। তিনিই আজ এ ব্যাপারে বিবি সাহেবের সাথে কথা বলিতেছেন! তাঁর মত চাহিতেছেন? বিবি সর্বদা ধোঁকা গুনিলেন না ত? কেবলা তাঁর সাথে মশ্করা করিতেছেন না ত?

বিবি সাহেবকে নীরব দেখিয়া পীর সাহেব ব্যস্ততার সাথে আবার বলিলেন: না, না, আপনে মনে করবেন না, আমি নরম হইয়া পড়ছি। একটা কথার কথা আর কি? ধরেন যদি কম্বখতের মনে অনুতাপ আইসা থাকে, যদি খাস দিলে সে তওবা কৈরা আমার পায় আইসা পড়েই তবে কি করা?

এতক্ষণে মাজেলা বিবি বুঝেন, কেবলা সত্য-সত্যই হামিদকে মাফ করার কথা বলিতেছেন। পরম উৎসাহে আগ্রহ-ভরা সুরে তিনি বলেন: ওমা, হযুর এটা কি কন? নিজের ছেলে যতই অন্যায় করুক মাফ চাইলে তারে মাফ করবেন না? এটা কি একটা কথা হৈল হুজুর?

স্বামীকে 'হুজুর' বলিয়া সম্বোধন করা ফতেপুর পীর খান্দানের অনেক দিনের পুরানা দস্তুর। কারণ এখানে স্ত্রীকেও পীর সাহেব-কেবলার মুরিদ হইতে হয়। পীরের মুরিদ না হওয়া পর্যন্ত কারোর এবাদত-বন্দেগি আল্লার দরগায় কবুল হয় না।

মাজেলা বিবির সমর্থন পাইয়া পীর সাহেব খুশী হইলেন। একটু দম ধরিয়া বিবি সাহেবের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন: কিন্তু ধরেন, ছেলে মনে-মনে যার

পর-নাই অনুতপ্ত হৈছে। খাস দিলে তওবাতুন-নছুহাও করছে। আমার পায় ধৈরা মফ চাওয়ার জন্য ছুইটা আসতেও চায়। লেকেন চক্ষু-লজ্জার খাতিরে সেরেফ শরমের জন্য আমার কাছে আসতে পারতেছে না। সাহসই পাইতেছে না। সে অবস্থায় আমার কি করা উচিত?

মাজেলা বিবি নিতান্ত সোজা-সরল মানুষ। তিনি পীর সাহেবের মতলবের ধারে কাছে না গিয়া সহজ ভাবে বলিলেন: ওমা, এর মাঝে লজ্জা-শরমের কি আছে? বাপের কাছে আসব ছেলে, এতে ভাববার কি আছে?

মাজেলা বিবির নির্বুদ্ধিতায় পীর সাহেব বিরক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁর কথাটায় নির্বুদ্ধিতা কোথায় তাও ধরিয়া দেওয়া সহজ নয়। তাই পীর সাহেব কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন: শুধু লজ্জা-শরমের কথাই বা কই কেন? মান-ইয়যতের সওয়ালও ত আছে। আমার তরফ থনে কোনও ইশারা না পাইলে তার ওমানে চোট লাগতেও ত পারে? কোন্ খান্দানের কার ছেলে সে তাও বিচার করতে হবে? কি বলেন আপনে?

মাজেলা বিবি এমন তত্ত্ব-কথার কিছুই বুঝিলেন না। পীর সাহেব কোন ভুল কথা বলিতে পারেন না, এই বিশ্বাসে তিনি বলিলেন তা ত বটেই।

পীর সাহেব শুধু ঐটুকুতে সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন: শুধু তাই ত বটের ব্যাপার ইটা না বিবি সাব। কোরায়েশ বংশের লহু আছে ছেলের রঙে। লহু ত না, একেবারে আগুনের ফুরুংগি। মান-ইয়যতের সওয়ালে ছিইটা পড়ে। পড়ে না, বিবি সাব?

মাজেলা বিবি এবার সাবধানে বলিলেন: নিশ্চয়ই পড়ে হুজুর?

পীর সাহেব এবার খুশী হইয়া বলিলেন: ঠিক কইছেন বিবি সাব। তার উপরেও আরেকটা কথা আছে। পাঁচ-পাঁচটা বছর বাপ হৈয়া ছেলের প্রোজ-খবর লই নাই। মরল কি বাঁচল তার বার্তাটাও নিলাম না। সরকারী বিরুদ্ধি না পাইলে খাইতই বা কি লেখা-পড়াই বা করত কি দিয়া? কত কষ্ট-মেহনত কৈয়া বাছা আমার লেখাপড়া করতে আছে। এ অবস্থায় হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও সে যদি মফ চাবার লাগি আমার কাছে আসতে না পারে, তবে আমার কি করা উচিত বৈলা আপনে মনে করেন?

বিবি সাহেব মনে বল আনিয়া বলিলেন: হুয়ের কি করা উচিত না-উচিত আমি তা কৈয়া বেআদবি করতে পারি না। তবে আমি হৈলে লোক পাঠাইয়া ছেলেরে ডাইকা আনতাম।

পীর সাহেব সোজা হইয়া বসিয়া হাসি মুখে বলিলেন: এইবার একটা কথার মতো কথা কইছেন বিবিসাব। আমি তাই মনে করি। আমি জানি ছেলে শুধু আমার ডাকের এন্তেয়ার করতেছে। আমার কাছে মফ চাইবার সুযোগ তারে আমারই কৈরা দেওয়া উচিত। তওবা করবার সুযোগ দেওয়া হরেক মুসলমানের জন্য ওয়াজেব, শুধু বাপ-বেটার সওয়াল না ইটা।

বিবি সাহেব এবার নিঃসন্দেহ হইয়া পরম আগ্রহ-ভরে বলিলেন: আজই তবে লোক পাঠাইয়া দেন হুজুর। আর দেরি করবেন না।

খানিক আলোচনার পর উভয়েই একমত হইলেন যে বড় দুলামিয়াই এ ব্যাপারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাঁকেই ঢাকা পাঠান হইবে।

নাশতার খুটা বাসন-বরতন লইয়া মেজ বিবি ঘরের বাহির হইতেছিলেন। পীর সাহেব বলিলেন: আরেকটা কথা বিবিসাব।

মাজেলা বিবি বরতনাদি হাতে লইয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পীর সাহেব বলিলেন: এসব কথা যেন তিন কান না পায়। সাজলা বিবিরেও কইবেন না।

একটু থামিয়া: সবাইরে আতঙ্কা লাগাইয়া দিবার চাই। বুঝলেন ত কথা?

হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মেজ বিবি বলিলেন: বুঝলাম।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

৫

পাঁচ বছর পর পীরজাদা ফতেপুরে আসিতেছে।

পীর সাহেব-কেবলার অত সতর্কতা সত্ত্বেও কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল। আসল কথা এই যে অতবড় খুশির কথাটা মেজবিবি একা উপভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি অত স্বার্থপর নন। কাজেই তিনি প্রথম সাক্ষাতেই সেজ বিবি ও দাসী-চাকরানীদের মধ্যে এই সন্দেশ বন্টন করিয়া দিলেন। দাসী-চাকরানীদের প্রত্যেকে এক-একটি রয়টার। যোহরের নমাজের সময় দেখা গেল কথাটা সবারই মুখে। দু-এক জন মুসল্লি সাহস করিয়া পীর সাহেব-কেবলাকে জিগ্গাস করিয়া বসিলেন। ভাগিন্সি কথাটা এইভাবে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে পীরজাদাই মাফ চাইতে এবং তওবা করিতে আসিতেছেন। কাজেই এমন গোপন কথা রাষ্ট্র হওয়ায় পীর সাহেবকে তেমন দুঃখিত হইতে দেখা গেল না। তিনি শুধু বলিলেন: তোমরা দোওয়া কর কথাটা সত্য হউক।

এইটুকুই যথেষ্ট। সকলে বুঝিল পীরজাদা আসিতেছেন।

কিন্তু হামিদের ফতেপুর আসিতে বেশ মাস খানেক দেরি হইল। শেষ পর্যন্ত হামিদ যখন ফতেপুর পৌঁছিল সেদিন বাড়ি-ভরা লোক। চিলকান্ডার মুখে খবর পাইয়া অপর তিন বোন আগে হইতেই ফতেপুরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁদের স্বামীরাও একে-একে আসিয়া জমায়েত হইয়াছিলেন। বড়-বু ও বড় দুলাভাই উকিল সাহেব হামিদের সাথেই আসিলেন। এ অবস্থায় হামিদের শুভাগমনে ফতেপুর পীরবাড়িতে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। পীর সাহেবের সব মেয়েরা ও তাঁদের দুলারা এর আগে কোনও দিন একত্রে পীরবাড়িতে জমায়েত হন নাই। তাতেই হইল বাড়ি গুলয়ার। তার উপর পাঁচ বছর পরে একমাত্র ভাই হামিদের বাড়ি আসা। বোনদের আনন্দ দেখে কে? আশ্বাদের ত কথাই নাই।

স্বয়ং পীর সাহেব-কেবলার মনের অসীম আনন্দের খবর এঁরা কেউ জানেন না। যেদিন তিনি মাজেলা বিবির কাছে প্রথম মনের গোপন কথা ভাংগেন, সেই দিন হইতেই ছেলেকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে দিন গণিতেছেন। বড় দুলামিয়াকে এ কাজের ভার দেওয়ার পর প্রতিদিন তিনি ছেলের আগমনের আশা করিতেছেন। খবর পাওয়া মাত্র পরের টেনেই ছেলে রওয়ানা হইবে, এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ়। কাজেই এতদিন হামিদ কেন আসিতেছে না, তার কারণ তিনি খুঁজিয়া পান নাই। নিশ্চয় দুলামিয়ার শৈথিল্য। তিনিই খবর দেন নাই। মণ্ডক্কেলের কাজ নিয়া ব্যস্ত, এটা কোনও যুক্তিই নয়। পীর সাহেবের কাজের চেয়ে মণ্ডক্কেলের কাজ বড়, বড় দুলামিয়ার এমন মনে করার কোনও কারণ নাই। কাজেই পীর সাহেব লোক পাঠাইয়া দুলামিয়াকে তাকিদ

দিয়াছিলেন। প্রতিবার দুলামিয়া জবাব পাঠাইয়াছেন: হামিদকে লইয়া শিগ্গিরই আসিতেছেন। এটাকে শিগ্গির বলে নাকি? এইভাবে যায় প্রায় এক মাস।

এই এক মাসে পীর সাহেব কতবার কল্লনায় দেখিয়াছেন হামিদ আসিয়াছে। পীর সাহেবের পায়ে পড়িয়া অবুঝে সে কাঁদিতেছে। মাফ চাহিতেছে। পীর সাহেব মনে-মনে মাফ করিলেও মুখে সহজে মাফ করিলেন না। হামিদ আরও কাঁদিল। আরও মাফ চাহিল। এইবার তিনি ছেলের মাথায় হাত বুলাইলেন। হাত ধরিয়া তুলিলেন। বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। হাসিয়া বলিলেন: তোমারে মাফ না কৈরা কি পারি বাবা? অনেক আগেই মাফ কৈরা দিছি।

রোজ-রোজ এই একই কল্লনা। এই একই চিত্র। হাঁ, তিনি ঠিকই করিয়াছেন। চাওয়া মাত্র মাফ না করিয়া ভালই করিয়াছেন। ছেলের একটু শিক্ষা হউক। তার ভালর জন্যই এটা দরকার। সারাদিন এই চিন্তা। উঠিতে-বসিতে। এমনকি নমাজেও। সারাদিনেও যখন হামিদ আসে না তখন সন্ধ্যার দিকে বাম বুকে একটু বেদনা হয়। বেদনাটা ক্রমে বাম কাঁধে, পরে ঘাড়ে। প্রথমে চিনচিন। ক্রমে বেশ তীব্র। একটা হামিকী দাওয়াই খান। বিবির গরম সরিষার তেল মালিশ করিয়া দেন। তাতেই সারিয়া যায়।

কিন্তু বড় মেয়েটা বড় আদেখিলা মেয়ে। বাপের স্বাস্থ্যের লাগি তার চিন্তা কত! সে বেটি জামালপুরের এক সরকারী ডাক্তার ঠিক করিয়াছে। পীর সাহেবকে জোর করিয়া বাধ্য করিয়া প্রতি রবিবার তাঁকে দিয়া পীর সাহেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায়। সরকারী ডাক্তার হইলেই হইল? সে মরয-বিমারির জানে কি? বেটা বলে কি না পীর সাহেবের লহর চাপ বাড়িয়াছে! বুড়া মানুষের লহ এমনিতেই ঠাণ্ড। তার আবার চাপ? পাগল নাকি? তারপর বেটা আরও কয়, পীর সাহেব-কেবলার দিলের কমযোরি। মানুষ বুড়া হইলে তার উপর একমাত্র পুত্রের মুখ এক লাগাড়ে পিঠ বহর না দেখিলে, দিলের কমযোরি অমন সবারই হয়। এরই জন্য নাদার বুলে কি না, পীর সাহেব যেন বেশি চিন্তা না করেন যেন বেশি নড়াচড়া না করেন। করিলে নাকি পীর সাহেবের দিল বন্ধ হইয়া যাইবে! আফসোস! খিরিস্তানী বিদ্যা হাসিল করিয়া আজকাল ছেলেগুলি কি জাহান্নামে গিয়াছে! এই কুফরী বিদ্যাই শিখিতে গিয়াছিল কি না খোদ্ পীর সাহেবের ফরযন্দ! আল্লার দরগায় হাজার শুকুর সে তওবা করিয়াছে। এদেরে খোদা হেদায়েত করুক। পীর সাহেবের ফরযন্দকে আল্লা হেফায়ত করুক।

ব্যাপার এই যে বেশ কিছুদিন হইতে পীর সাহেবের স্বাস্থ্য চিন্তার কারণ হইয়াছে। প্রায়ই মাথা ঘুরে। অবসাদ বোধ করেন। বাম বুকে কাঁধে বেদনা হয়। অক্ষুধা ও অনিদ্রা লাগিয়াই আছে। সর্বদাই বিমর্ষ। মুখে হাসি নাই। সম্প্রতি উকিল দুলামিয়ার এক আত্মীয় জামালপুর হাসপাতালে বদলি হইয়া আসিয়াছেন। বড় মেয়ে শাহেদা একরূপ জোর করিয়াই এই ডাক্তার দেখাইতে বাপকে রাজি করিয়াছেন। কোন ঔষধ খাইবেন না, ইনজেকশন লইবেন না, এই শর্তে পীর সাহেব রাজি হইয়াছেন। কথা হইয়াছে ডাক্তার সাহেব প্রতি সপ্তাহে একবার পীর সাহেবকে দেখিয়া যাইবেন। তিনি পীর সাহেবের হাই ব্লাড প্রেশার ও এনজাইনার লক্ষণ ধরিয়াছেন।

হামিদের আসায় অনাবশ্যক ও অহেতুক বিলম্বে পীর সাহেবের এইসব উপসর্গ বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁর অবসাদ, বিষণ্ণতা ও অনিদ্রা বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু পীর সাহেব

মনে করেন এসবই হামিদের আসার বিলম্বের জন্য। সে আসিয়া পড়িলেই এসব দূর হইবে।

অবশেষে তিনি যেদিন শুনিলেন হামিদ আজই আসিতেছে সেদিন কিন্তু পীর সাহেবের বৃকে ধড়ফড়ানি কমার বদলে বাড়িয়া গেল। মাথাও ঘন-ঘন ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি তিনি কয়েকবার বাড়ির বাহির হইয়াছেন। পুকুর পাড়ে গিয়া ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তার দিকে এক ধ্যানে চাহিয়া রহিয়াছেন। দৃষ্টি-শক্তি বাড়াইবার জন্য তিনি চোখের উপরে হাতের ছাঁইচা ধরিয়াছেন। কিন্তু কই কাউকে ত দেখা যায় না। বেটা অত দেরি করিতেছে কেন? তবে কি টেনই লেট হইল? আজকাল টেনের যা অবস্থা! কতবার অমন গিয়াছেন আসিয়াছেন। আর পারেন না। পায়ে জোর পান না। মাথাটা বড় ঘুরিতেছে। তিনি গিয়া বিছানায় শুইয়াছেন। কিন্তু কানটা রাখিয়াছেন বাহির বাড়িতে।

বোধ হয় পীর সাহেবের তন্দ্রা আসিয়াছিল। হৈ-চৈ এ তাঁর তন্দ্রা ছুটিল। অন্দরে-বাহিরে হৈ-চৈ। ‘পীরজাদা আসছেন’ ‘হামিদ আসছে,’ এই ধরনের আওয়াজও তাঁর কানে গেল। তিনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। উশারায় জুতার আওয়াজ হইল। হামিদকে লইয়া বড় দুলা মিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সংক্ষেপে স্বস্তরকে কদম-বুসি করিয়া তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। হামিদ বাপের মুখের উপর এক নজর চাহিয়াই বসিল। তিনি খুব ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছেন। তার মনে খুব ব্যথা লাগিল। সে বাপের পায়ের কাছে বসিয়া লম্বা কদমবুসি করে। নিচের দিকে মুখ রাখিয়াই বলে, ‘আমারে মাফ করেন বাপজান।’

পীর সাহেবের পূর্ব সংকল্প মনে পড়ে। এক কথায় তিনি মাফ করিবেন না। সহজে তিনি মাথায় হাত বুলাইবেন না। চেষ্টাও করিলেন তিনি সংকল্প রক্ষার। কিন্তু মড়ার হাতকে তিনি ঠেকাইতে পারিলেন না। ডান হাতটা পীর সাহেবের অজ্ঞাতেই ছেলের মাথায় চলিয়া গেল। মুখ হইতেও চট করিয়া বাহির হইয়া পড়িল: খোদা তোমার ভাল করুক। তোমার হায়াত দরায় করুক।

হামিদ তাঁর পা ছাড়িয়া উঠিতেছেন না দেখিয়া তিনি বলিলেন: তুমি উঠ বাবা।

বলিয়া ছেলের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। বৃকে জড়াইয়া বলিলেন: যাও বাবা তোমার আশ্রয়ার কাছে যাও। তানরারে সালাম কর গিয়া। তারপর হাত-মুখ ধুইয়া নাশ্তা-পানি কর।

মেয়েরা, বিবিসাহেবরা এবং তাঁদের সাথে চাকরানীরা দরজায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পীর সাহেবের কথা শুনিয়া আর সবাই যাঁর তাঁর ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। শুধু বড় মেয়ে বাপজানকে সালাম করিবার জন্য ঘরে ঢুকিলেন। সালাম সারিতেই পীর সাহেব তাঁকে বলিলেন: মাতাজী, তুমিও যাও মা, হামিদের লাগি আর দুলা মিয়ার লাগি নাশ্তা-পানির ইন্তেযাম কর গিয়া।

জবাবে মাতাজী বাহির হইয়া না গিয়া বাপের পায়ের কাছে ঘেঁষিয়া পালং-এর কিনারায় বসিলেন। বলিলেন: নাশ্তা পানি যোগাড়ের ঢের লোক আছে বাপজান। আপনার তবিয়ৎটা কেমন আছে তাই কন।

পীর সাহেব হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন: খুব ভাল আছে মা। আজ আমার আর কোনও অসুখ নাই।

পীর সাহেবের জবাবে মাতাজী খুশী হইলেন বটে, কিন্তু বাবাজী হইলেন না। শ্বশুরের ভাব-ভংগি দেখিয়া তাঁর কথা শুনিয়া বরং দুলামিয়ার চোখেমুখে বিষণ্ণতা ও দুশ্চিন্তা ফুটিয়া উঠিল। আসিবার পথে দুলামিয়া জামালপুরে ডাক্তারের সাথে আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব হামিদ ও দুলামিয়া উভয়কেই খুব হুশিয়ার করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া হামিদের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিয়াছেন 'আপনে নিজেই ডাক্তার। আপনেই আর কি বলব? শুধু মনে রাখবেন পীর সাহেব-কেবলার সকল অসুখের কারণ একমাত্র ছেলের সাথে পাঁচ বছরের বিচ্ছেদ। রোগটা তাঁর হাই ব্লাড প্রেশারের সাথে এন্জাইনা। গত কয়েক সপ্তাহ ধৈর্যই ঘন-ঘন এন্জিনোপ্যাথম হৈতেছে। সামান্য উত্তেজনাতেই তাঁর এপিলেকটিক কন্ভাল্শান হৈতে পারে।' ডাক্তার সাহেবের কথায় হামিদ মাথা ঝুঁকাইতেছিল। তার চোখ ছলছল করিতেছিল। সে সব কথা মনে হওয়াতেই দুলামিয়ার এই দুশ্চিন্তা। না, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নাই। দুলামিয়া স্ত্রীর তাগাদায় নাশ্তা-পানি খাইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দুলামিয়া ও হামিদরে নাশ্তা খাওয়াইয়াই মাজেলা বিবি পীর সাহেবের কামরায় ঢুকিলেন। পীর সাহেব যেন তাঁরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। খুশী হইয়া বলিলেন: কেমন বিবি সব আমার কথা অক্ষরে-অক্ষরে মিলল ত? যা কইছিলাম তাই পাইলেন ত?

কি মিলিল, কি পাইলেন, মাজেলা বিবি কিছুই বুঝিলেন না। হামিদেবের কথায় পীর সাহেব বলিতেছেন নিশ্চয়। কিন্তু বাপ-বেটার মোলাকাতটা তিনি ভাল করিয়া দেখিতেই পান নাই। সকলের মুরুব্বি বলিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া ভিড়ের সামনে আসেন নাই। পিছনের কাতারেই ছিলেন। উঁকি-ঝুঁকি দিয়া ও দৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তবু কিছুই দেখেন নাই বলিয়া পীর সাহেব-কেবলার উৎসাহে পানি ঢালিতেও তিনি পারেন না। তাই দু'কূল রাখিয়া তিনি বলিলেন: দেখছি ত হজুর সবই। তবে আপনার নিজ মুখ থনে শুনে আমার আরও ভাল লাগবে।

পীর সাহেব খুশী হন। কোল বালিশটার উপর মুকিয়া পড়িয়া বিবি সাহেবের মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলেন: যা কইছিলাম বিবিসাব ছেলে আইসা আমার পা সাইপটা ধরল, আর ছাড়ল না। কইতে লাগল কাইন্দা কাইন্দা: আব্বাজান আমারে মাফ করেন। আমিও কথা কই না। ছেলেও পা ছাড়ে না। কি-করি? আখেরে কইলাম: যাও মাফ কৈরা দিলাম। পা ছাড়। মাফ না করলে পাও ছাড়ে না। সাবালেগ ছেলে অত লোকের সামনে শিশুর মতো কান্তে লাগল। ওর ইয়তের দিকেও ত চাইতে হয়। তাই মাফ কৈরা দিলাম। দেখলেন ত ছেলের মনে সত্যই অনুতাপ হৈছে। আর হবে না? কোন্ খান্দানের লোক, কার নুৎফার ছেলে, দেখতে হবে ত?

বিবি সাহেব হাসিমুখে হা করিয়া পীর সাহেবের কথা শুনিতেছিলেন এবং ঘন-ঘন শির ঝুঁকাইয়া সমর্থন দিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন সত্য সত্যই আজ পীর সাহেব-কেবলার তবিয়ৎটা অনেক ভাল হইয়াছে। নিশ্চিত হইয়া বলিলেন: যাই হজুর, দেখি গিয়া ছেলে-জামাইর খাবার-দাবার কি ইন্তেযাম করল ওরা।

পীর সাহেব উৎসাহ দিয়া বলিলেন: যান যান দেখেন গিয়া। আপনে না হৈলে ওরা কি পারব? আমার ছেলের যেন যত্নের কোনও তুরুটি না হয়, দেখবেন।

সারা দিনের মধ্যে বাপের সাথে দেখা করিবার হামিদের সময়ই হয় নাই। পাঁচ বছর পরে পীরজাদা বাড়ি আসিয়াছেন শুনিয়া চারদিক হইতে পাঁচ গাঁয়ের লোক

ভাংগিয়া পড়িয়াছে। পক্ষের লোকও আসিয়াছে। বিপক্ষের লোকও। দুষ্টও আসিয়াছে, দুশ্মনও। ফতেপুরের পতনে যারা শেরপুরী মওলানার দলে যোগ দিয়াছে তারাও আসিয়াছে কৌতূহল বশে অথবা খোঁজ-খবর লইতে। হামিদ কিন্তু নির্বিচারে সকলের সাথে সমান ভদ্রতা করিতেছে। হাসি-মুখে সকলের কুশল-মংগল পুছ করিতেছে। সকলের ছেলে-মেয়ের পরিবারের খবর, হাল-গিরন্তি ফসলের খবর, জিনিস-পত্রের দামের খবর, সবই জিগ্গাস করিতেছে এবং সহানুভূতি জানাইতেছে। এইভাবে সারা বিকাল এবং সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ পীর বাড়ি লোকে গমগম করিতে থাকে। হামিদ উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতে পারে না।

অবশেষে সে অন্দরে যায় পুনঃ পুনঃ রাতের খাবার তাগাদায়। পীর সাহেব কিছুদিন ধরিয়া নিজের বিছানায় বসিয়াই খানা খাইতে ছিলেন। রাতের খানা ছাড়িয়াই দিয়াছেন। শুধু এক পিয়লা দুধ। কাজেই হামিদ সব দুলাভাইদের লইয়া খানা খাইয়া উঠিল। তাঁর পর খানিক আলাপ-সলাপ করিয়া হামিদ বাপজানের কামরায় ঢুকিল। সব দুলামিয়রাই তার সাথে গেলেন। মেয়েরাও ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছিলেন। পিছে-পিছে এক দুই করিয়া সবাই পীর সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন।

খানিকক্ষণ এটা-ওটা আলাপ করার পরেই পীর সাহেব জামাই ও মেয়েদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন: বাবাজী মাতাজীরা আপনারা এখন যান, আমি আমার বাপজানের সংগে গোপনে দু'চারটা কথা কবার চাই।

পীর সাহেবের উদ্দেশ্য হামিদ তাঁর কাছে যে তওবা-তিল্লা করিবে, সেটা বহিন ও দুলাভাইদের সামনে না হওয়াই উচিত। অত লোকের সামনে তওবা-তিল্লা করাইলে ছেলের ইয়যত থাকে কই? যত-যাই হোক, ফতেপুরের খান্দান ত?

মেয়েরা ও জামাইরা বুঝিলেন ঘর-সংসারের ও কিসিয় সম্পত্তির ব্যাপারে পীর সাহেব হামিদকে যে সব ওসিয়ত করিবেন, সেটা শুধু তাঁর কানেই দিতে চান।

হামিদ বাপের সাথে কোনও বিশেষ আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার উপর পীর সাহেবের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় কোনও সিরিয়াস আলাপের সে ঘোর বিরোধী। আসিবার পথে জামালপুরের সরকারী ডাক্তারের হুশিয়ারিটা এখনও তার মনে তাজা আছে। সে ডাক্তারির ছাত্র হইলেও কলেজ-হাসপাতালের অনেক রোগী দেখিয়াছে। কাজেই বোন ও দুলাভাইদের বিদায় করিতে দেখিয়া পিতার ভাব-গতিক সম্পর্কে হামিদ আশঙ্কিত হইয়া উঠিল।

ওদিকে পীর সাহেব সারাটা দিন শুধু হামিদের সাথে তাঁর মোলাকাতের মহড়া ভাজিয়াছেন। হামিদকে তিনি কি কি কথা কি ভাবে বলিবেন, অনুতপ্ত হামিদ তার জবাব কি ভাবে দিবে, সে জবাবের জবাবে তিনি কোন্ কাজ কি ভাবে করিবেন, তার একটা পূর্ণ চিত্র তাঁর মনের পটে আঁকা হইয়াই আছে। এটা তাঁর এক মাসের মুসাবিদার ফাইনাল রূপ। গত একটা মাস ধরিয়া পীর সাহেব নিজের সাথে যে বুঝ-প্রবোধ করিয়াছেন, তাকে মোহন বিদ্যার আত্মসম্মোহন বলা যাইতে পারে। ইংরাজিতে যাকে বলা হয় অটোসাজেসশন। এই সম্মোহনে তিনি পরাজিত পরাভূত পুত্রের মোকাবেলায় নিজেকে একটা বিজয়ী পিতার বেশে খাড়া করিয়াছেন। আজকার সাক্ষাৎ সেই বিজয়ের সাক্ষী। পরাজিত পুত্রের নিজ মুখে সে বিজয়ের স্বীকৃতি শুনিবার জন্য পীর সাহেবের সারা অস্তিত্ব আজ উন্মুখ হইয়া আছে। সেই সংগে তাঁর দিলে আসিয়াছে

বিজয়ীর উদারতা। উদার দৃঢ়তার সংগে হাতের ইশারায় তিনি পুত্রকে বলিলেন: কুরসিটা আরো সামনের দিকে টাইনা কাছে আস। তোমার সাথে আমার গুটা কতক কথা আছে।

হামিদ যা আশঙ্কা করিতেছিল তাই হইতেছে দেখিয়া বিনয়ের সাথে বলিল: আজ থাক আব্বা। কাল সকালেই কথা হৈব। আজ আপনার তবীয়তটা ভাল নয়। আপনে আরাম করেন।

পীর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন: আমার শরীর খুব ভাল আছে বাবা, এত ভাল বহুদিন থাকি নাই। ইহাতক্কে তোমারে দেইখা আমার সব রোগ-আবিল সাইরা গেছে। তুমি কোনও চিন্তা কৈর না। আগাইয়া বস।

এর পরেও হামিদ বাধা দিবার বিভিন্ন চেষ্টা করিল। পীর সাহেব দৃঢ়তার সাথে বলিলেন: তুমি আগ বাড়। কথা কইও না। যা সওয়াল করি, শুধু তারই জবাব দেও।

হামিদ অগত্যা চেয়ার আগাইয়া বাপের আরও কাছে গেল। পীর সাহেব খুশী হইয়া দরদ-ভরা গলা ছোট করিয়া বলিলেন: আসল কথা বাবা, তুমি খালেস দিলে তওবা করছ ত?

হামিদ বিশ্বয়ে সোজা হইয়া বলিল: তওবা? কিসের তওবা? কেন তওবা করু'ম? কি করছি আমি?

হামিদ বুঝিল সে উত্তেজিত হইয়াছে। শরমিন্দা হইল। শোধরাইবার আশায় বলিল: আমি ত কিছু বুঝলাম না আব্বা? আপনে তওবার কথা তুললেন কেন?

পীর সাহেব সামনের কোল বালিশে কনুইর ভর দিয়া সওয়াল করিতেছিলেন। হামিদের কথায় চট করিয়া সোজা হইয়া বলিলেন: তওবা কর নাই তুমি? না-ফরমানির জন্য আল্লার কাছে পানা মাংগো নাই? বেঈমানির জন্য তাঁর দরগায় মাফ চাও নাই?

মূহূর্তের জন্য হামিদ ভুলিয়া গেল হৃদরোগী বাপের সাথে সে কথা বলিতেছে। সে দৃঢ় তেজস্বিতার সাথে বলিল: এসব কি কইতেছেন আব্বা? আমি কারো সাথে বেঈমানি-নাফরমানি করি নাই। এ কথা আপনে নিজেই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পীর সাহেবের ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। হাত মুষ্টিবদ্ধ হইল। তিনি তুংলাইয়া খুব জোরে কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। জড়ানো অস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন: তুমি যে এত সব কবির গোনা করছ, এগুলিরে তুমি বেঈমানি নাফরমানি মনে কর না? তবে কি তুমি সত্যই তওবা কর নাই! আমার কাছে মাফ চাইতে....। আয় খোদা।

পীর সাহেবের কণ্ঠস্বর অস্পষ্টতায় তলাইয়া গেল। তিনি বিছানায় হেলিয়া পড়িলেন।

'আব্বা' 'আব্বা' বলিয়া চিৎকার দিয়া হামিদ এক লাফে বিছানায় উঠিল। বাপকে জড়াইয়া সোজা করিবার চেষ্টা করিল। বুঝিল সব শেষ।

হামিদের চিৎকারে মূহূর্তে লোকে ঘর ভরিয়া গেল। কান্না-কাটির রোল পড়িয়া গেল। সারা গ্রাম ভাংগিয়া পড়িল।

পরদিন সকালে চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল: পাঁচ বছর বিচ্ছেদের পরে পুত্রকে দেখিয়া পীর সাহেব-কেবলা খুশির চোটে মারা গেছেন। হইবে না? বাপের বুক ত? বুড়া বয়সের একটি মাত্র ছেলে ত? কেউ-কেউ বলিল: অমন খুশির চোটে অনেককে

মরিতে তারা দেখিয়াছে। কেউ-কেউ বলিল: পীর সাহেব শুধু বুয়ুর্গ লোক ছিলেন না। গজকপালিয়াও ছিলেন। মেয়ে-জামাইদের সকলের সামনে হারাইয়া-যাওয়া ছেলের কোলে মাথা রাখিয়া শেষ দম ফেলিলেন। আর কেউ-কেউ বলিল: তিনি কামেল অলিআল্লা ছিলেন। নিজের মউতের দিন-তারিখ তিনি আগেই জানিতেন। তাই সবাইকে একত্র করিয়াছিলেন। মরিবার সময় কেরামতি দেখাইয়া গেলেন।

পীর সাহেব-কেবলার জানাযায় এত লোক হইল যা কেউ কল্পনাও করিতে পারে নাই। ফতেপুরের ওরসেও কোনও দিন এত লোক হয় নাই। ফতেপুরের এই পতনের যুগে তাও আবার পীর সাহেবের মৃত্যুর পর এত লোক সমাগম হইবে, এটা কে ভাবিতে পারিয়াছিল? এমন যে যাহেরী দুশ্মন শেরপুরী মওলানা সাহেব তিনিও কয়েকজন সাহাবা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া জানাযায় शामिल হইলেন।

কাফন-দাফন শেষ করিয়া পীরজাদাকে যথারীতি মাতম-পুঁরসি জানাইয়া সকলে যখন বিদায় হইলেন তখন হামিদ সর্বপ্রথম একটা শূন্যতা অনুভব করিল।

সে ঘরের বাহির হইল। একপা দুইপা করিয়া বাপের কবরের কাছে গেল। চারদিকের নীরব নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে তার মনে হইল এ কবর পুরাতনের সমাধি। যা-কিছু প্রাচীন যা-কিছু জরাজির্ণ সব কিছু বাবার সাথে ঐখানে সমাহিত।

হামিদ চমকিয়া উঠিল। তার চোখে পানি আসিল। কবর হইতে বাধা যেন বলিলেন: ছি, পুরাতনের জন্য কাঁদিতে নাই। নতুনের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিয়াছি। সেই নতুনকে প্রতিষ্ঠিত কর।

যন্ত্র-চালিতের মতো হামিদ ঈষৎ নুইয়া বাপের কবর হাত দিয়া তিনবার সালাম করিল।

যথাসময়ে পীর সাহেবের ফাতেহাখানি ও লিল্লাহ বিয়্যাহত বিপুল ধুমধামের সাথে হইয়া গেল। এক হাজার একজন আলেম সকল হইতে যোহরের ওকতক কোরআনখানি করিলেন। পঞ্চাশটি গুরু যবেহ করিয়া পাঁচ গাঁয়ের দশ হাজার লোককে খাওয়ান হইল। হামিদ নিজে দুলাভাইদের লইয়া দিনরাত খাটিয়া এতবড় ব্যাপারটি সুসম্পন্ন করিল। হামিদ নিজে কাতারে-কাতারে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া মেহমান-নেওয়াযি করিল।

পড়াশোনা ছাড়িয়া বিষয়-সম্পত্তি দেখা ও পীরগিরি চালাইবার প্রস্তাবটি হামিদ এক কথায় ডিসমিস করিয়া দিল। রেওয়াজ-মোতাবেক খলিফারা নয়া সাজ্জাদানশিনের সনদ নিতে আসিলেন। মুরিদরা নয়া পীরের হাতে বয়াত করিতে আসিলেন। হামিদ কোনটায় রাজি হইল না। বাপের আমলের সরকারকে বহাল রাখিয়া বড় দুলাভাইকে সুপারভাইস করিবার দায়িত্ব দিয়া হামিদ বিষয়-আশয়ের ঝামেলা মিটাইল। আম্মাদেরে তসল্লি ও ভরসা দিতে এবং বোনদেরে বিদায় করিতে হামিদের আরও সপ্তাহ খানেক ফতেপুর থাকিতে হইল।

অতবড় দেশ-বিখ্যাত পীরের এন্তেকালের প্রাথমিক উত্তেজনা কমিলে আস্তে-আস্তে ফতেপুরের পরিবেশ শান্ত হইল। এমন বড় ব্যাপারে মানুষ অত সহজে শান্ত হইতে চায় না। কাজের স্থান কথায় দখল করিল। কথায় কথা বাড়িল। এক কথার ডগায় আরেক কথা গজাইল। জীবনে-মরণে পীর সাহেবের সৌভাগ্যের ডগায় দুর্ভাগ্যের চারাও

জালাইল † মা-মারা পীরজাদার দজ্জালী যুলুমের ভবিষ্যদ্বক্তারা আবার মুখর হইয়া উঠিল। তারা বলিতে লাগিল: কইছিলাম না আগেই, এই মা-খোর দজ্জাল বাপেরেও খাইয়া ছাড়ব? কেমন দেখলা ত? পাঁচ বছর পরে কই থনে দৌড় মাইরা আইসাই বাপেরে ঘাড় মটকাইয়া মারল?

একজন বলিলে দশ জন মার-মার করিয়া প্রতিবাদ করে। তবু কথাটা চলে। এক মুখ হইতে দুই মুখ হইয়া শেষ পর্যন্ত হামিদের কানেও কথাটা আসে। সকলের প্রতিবাদের মধ্যেও হামিদের মন বলে:

হাঁ,হামিদই তার বাপকে হত্যা করিয়াছে।

চেরাগও পুড়িল কি?

১

অবশেষে হামিদ যেদিন কলেজে ফিরিয়া আসিল, ততদিনে তার পিতৃশোকের খবর সবাই জানিয়া ফেলিয়াছে। তার বাপ ছিলেন দেশ-বিখ্যাত পীর। তাঁর এন্তেকালের খবর সবিস্তারে খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছে। অনেক কাগজে সম্পাদকীয় লেখা হইয়াছে। নেতারা শোক-বাণী দিয়াছেন। তারও অনেকগুলি ছাপা হইয়াছে। টেলিগ্রামে তার অনেকগুলি হামিদ ফতেপুর বসিয়াই পাইয়াছে।

কাজেই হামিদ যখন হোস্টেলে পৌছিল তখন হোস্টেলাররা, যখন ক্লাসে গেল তখন সমপাঠী-সহপাঠী ও টিচাররা সকলে তাকে সমবেদনা জানাইলেন।

কিন্তু যার সমবেদনা সে সবচেয়ে বেশি আশা করিতেছিল, সেই রাযিয়ারই সে দেখা পাইল না। রাযিয়া ক্লাসেই আসে না। কারও কাছে তার কথা হামিদ জিগ্গাস করিতে পারে না। এমনিতে বন্ধুরা রাযিয়া-হামিদের কথা লইয়া কত ঠাট্টা-ময্যাক করে। তার উপর রাযিয়ার খোঁজ করিয়া সে তাতে ইন্ধন যোগাইতে পারে না। তাই মনের ব্যথা বুকে লুকাইয়া হামিদ ব্যগ্র আকুলতায় দিন কাটায়।

রাযিয়ার প্রতি হামিদের একটা বিশেষ টান আগে হইতেই ছিল। রশিদভাইর সাথে আলাপের পর সে আকর্ষণ একটা রূপ নেয়। তারপর এই দীর্ঘ দিনের অদেখা সেটা আকারে এবং তীব্রতায় এত বাড়িবে হামিদ আগে তা বুঝিতে পারে নাই। আজ হামিদ বুঝিতেছে তার জন্য রাযিয়ার খুব দরকার। বাপকে হুকুমি হামিদ যত শোক পাইবে আশঙ্কা করিয়াছিল আসলে পাইল তার চেয়ে অনেক বেশি। পিতার মৃত্যুর জন্য তার নির্বুদ্ধিতাই দায়ী, অথচ কেউ তা জানে না, এই চিন্তাটায় তার বুক দিন-রাত টাটাইতেছে এবং দিন দিন সে টাটানির তীব্রতা বাড়িতেছে। এই তীব্র ব্যথায় সান্ত্বনার মলম দিয়া জুড়াইতে পারে একমাত্র রাযিয়ার মুখের কথা ও দেহের স্পর্শ। হাঁ, দেহের স্পর্শ। হামিদ এবার রাযিয়ার দেখা পাইলে নিশ্চয় তারে স্পর্শ করিবে। শুধু স্পর্শ না। তাকে এমনি করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিবে। সে যেন সত্য-সত্যই রাযিয়াকে জড়াইয়া ধরিল। নিজের বুকে হামিদ রাযিয়ার উন্নত সুডৌল বুকোর উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিল। না, রাযিয়াকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। কেন কলেজে আসে না!? অসুখ-বিসুখ করে নাই ত?

হামিদ গুনিয়াছিল রাযিয়া তার চাচার বাসায় থাকে। চাচা উকিল। বাসা তাঁর আর্ম্যানিটোলা। কিন্তু রাস্তার নাম বাড়ির নম্বর কিছু জানে না হামিদ। রাযিয়াকে জিগ্গাসও করে নাই কোনও দিন। নিজের উপর তার বিষম রাগ হইল। রশিদভাই ঠিকই বলিয়াছেন, হামিদের বুদ্ধি লইয়া প্রেম করিতে যাওয়া মানুষের উচিত নয়। মন-মরা ভাবে হামিদের দিন যায়। সকলে ভাবে পিতার শোকেই হামিদ অমন মুহ্যমান। হইবে না? কত বড় পিতা ছিলেন হামিদের! আর তাঁরই একমাত্র ছেলে সে।

কয়েকদিন পরেই রাযিয়াকে ক্লাসে দেখা যায়। তার সাথে কথা বলিবার জন্য হামিদ উন্মত্ত হয়। কোনমতে ক্লাস করে। ক্লাস ছুটির পরেই ছুটিয়া যায় রাযিয়ার কাছে। দেখিয়া বিস্মিত হয়। রাযিয়ার চোহরায় নাই সজীবতা। মুখে নাই প্রসন্নতা। চোখে নাই জ্যোতি। চার দিকে পড়িয়াছে কালশিরা। হামিদের দৃষ্টিভ্রান্ত হইল। কিন্তু সে কথা বলিবার আগে রাযিয়াই বলিল: আপনি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানবেন। খবরের কাগজে আপনার শোক-সংবাদটা পড়ছি। কত বড় চোট লাগছে আপনার মনে সবাই তার আলোচনা করছি। আফসোস করছি কত। চাচাজীর ত আফসোসের সীমা নাই। তিনি পীর সাহেবের তারিফে শত-মুখ। মনে করছিলাম একটা টেলি করুম। কিন্তু তারই মধ্যে আমার মাথায় পড়ল বজ্রাঘাত।

হামিদ চমকিয়া উঠিল: বজ্রাঘাত? কি ব্যাপার?

রাযিয়া তখন সবিস্তারে তার মাতৃ-স্থানীয় চাচী-আম্মার মৃত্যু-সংবাদটা দিল। এক নাগাড়ে চৌদ্দটা দিন চাচী-আম্মাকে লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি। চাচাজী ও রাযিয়া পালা করিয়া রাত জাগিয়া তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে। চাচাজী পুরুষ মানুষ। রোগীর সেবা-শুশ্রূষার তিনি কি জানেন? তাঁর শুধু রাত জাগাই সার। রোগী-সেবার সব দায়িত্ব নিতে হয় রাযিয়ার একার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চাচাত ভাই-বোনরা সব ছোট-ছোট। মায়ের জন্য তারা কাঁদিয়া সারা। তাদেরও দেখিতে হয় রাযিয়ারই। চাকর-চাকরানীর কাছে ত ওদের ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

হামিদ দরদ-ভরা চোখে-মুখে কান ফেলিয়া রাযিয়ার কথা শুনে। সহানুভূতি জানায়। কথায়-কথায় অনেক দূরে চলিয়া যায়। পরের ক্লাসের ঘন্টা পড়িলে ফিরিয়া আসে। কথা হয় ছুটির পর আবার মিলিবে। হামিদ বুঝে গেল চাচী-আম্মার সেবা শুশ্রূষাতে কি কঠোর পরিশ্রমই না রাযিয়া করিয়াছে। সে তুলনায় হামিদ বাপের কি সেবাটা করিয়াছে? উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যেদিন হামিদের পিতার লিগ্গা হয়, ঠিক সেই দিন রাযিয়ার চাচী-আম্মা এতকাল করেন পোষকের এই নৈকট্য যেন দুই জনকে আত্মার দিক হইতেও আরো কাছে টানিয়া আনি।

হামিদের মনে হয় এই এক মাসে তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আর দশ জনের মতো সেও যেন ছাত্রী-বন্ধুদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতে, হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে পারিবে। আগের শরম-ভরম ও চক্ষু-লজ্জা যেন তার কাটিয়া গিয়াছে। সত্যই হইয়াছে কি না তার পরখ করে ছুটির পরেই। ক্লাস শেষ হইতেই সে রাযিয়াকে বলে: চলেন আজ ক্যানটিনে খাওয়া যাক। বড় ক্ষিধা লাগছে।

রাযিয়া অতটা আশা করে নাই। বিস্ময়ে হামিদের দিকে চাহিয়া বলিল: আপনি আমার সাথে খাবেন ক্যানটিনে বইসা? লজ্জা করব না?

রাযিয়ার এই ঠেস-মারা কথাটা অগ্রাহ্য করিয়া হামিদ সহজভাবে বলিল: লজ্জা কিসের? সবাই ত খায়।

রাযিয়া দুষ্টমিपूर्ण হাসি হাসিয়া বলিল: সবাই খাইতে পারে, আমিও পারি। তাই বৈলা কি ফতেপুরের পীরজাদা সৈয়দ আবদুল হামিদ কোরায়েশীও পারেন?

হামিদ: ও-খোটাটা আর দেন কেন? আবার এতেকালের পর আমার খান্দানের পীরগিরি শেষ। আমি সে কথাটা পাবলিকে ঘোষণা কৈরা দিয়াই আসছি।

রাখিয়া: তাই নাকি? তবে ত আমার সাথে খাইতেই পারেন। চলেন।

সেদিন ক্লাস খুব দেরিতে শেষ হইয়াছিল। ক্ষুধাও দুই জনেরই সমান লাগিয়াছিল। খাইলও চপ্ কাটলেট তোনা আগা পেট ভরিয়া। বিল উঠিল পৌণে চার টাকা। হামিদ সবটা দিল। রাখিয়া আপত্তি করিল না। চা খাইয়া রাস্তায় বাহির হইল।

তখন সন্ধ্যা লাগে-লাগে। হামিদ চারদিক তাকাইয়া বলিল: সন্ধ্যা হয়-হয়। নইলে কইতাম: চলেন রমনা পার্কে একটু বেড়াইয়া আসি।

রাখিয়া হামিদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল: সন্ধ্যা হৈছে ত কি হৈছে? সন্ধ্যার পরে আপনে বেড়ান না নাকি?

হামিদ: আমার কথা না। আপনার কথা। সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকলে আপনার চাচাজী কি কৈবেন?

রাখিয়া: চাচাজী অমন লোকই না। তিনি আমার চলা-ফিরার হিসাব নেন না। চাচী-আম্মা বাঁইচা থাকলে চিন্তা করতেন। তবে তিনিও আপত্তি করতেন না।

রাখিয়ার গলা ভারি হইয়া আসিল। হামিদ বুঝিল চাচী-আম্মার কথা মনে পড়ায় তার মনে কষ্ট হইল। ভাবান্তর ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বলিল: তবে চলেন পার্কে বেড়াইয়া আসি।

রাখিয়া: চলেন।

তারা রাস্তায় পড়িল। হামিদ বলিল: রিকশা-বেবী কিছু-একটা ডাকুম নাকি?

রাখিয়া হাসিয়া বলিল: আপনে ত বেড়াইবার কথাই কইছেন, গাড়ি দৌড়াবার কথা ত কন নাই।

উভয়ে যুক্ত গলায় হাসিল। পায়ে হাঁটিয়া আগা বাড়িল। রাস্তা পার হইয়া ইউনিভার্সিটি গ্রাউণ্ড, সেটা পার হইয়া আবাস রাস্তা, রাস্তা পার হইয়া একেবারে রেসকোর্সে। উদ্দেশ্য রেসকোর্স পাথালি রমনা পার্কে যাইবে।

আলাপে-আলাপে পথ চলিল। হামিদ তার বাবার অসুখ এতেকাল লিহ্লা হইতে বোন-ভগ্নিপতিদের পরিচয় বর্ণনা করিল। রাখিয়া চাচী আম্মার অসুখ চিকিৎসা মৃত্যু হইতে চাচাত ভাই-বোনদের পরিচয় দিল। পরিবারের ভিতরের কথা বলিবার মতো ঘনিষ্ঠতা ধাপে-ধাপে বাড়িয়া চলিল। শেষ পর্যন্ত ভাবটা যেন তারা একই পরিবারের লোক।

অনেকক্ষণ হাঁটিয়াও তারা রমনা পার্কে পৌঁছিল না। ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হইয়াছে। আন্দাজে বুঝিল রমনা পার্ক অনেক দূর। আরও বুঝিল আলাপে ডুবিয়া তারা একই জায়গায় চক্কর দিয়াছে। অসম্ভব নয়। ঘাসের মধ্যে কোনও দুপাইয়া পথ ত নাই।

রাখিয়াকে একটু ক্লান্ত মনে হইল। সে বলিল: একটু বসলে কেমন হয়?

হামিদ খুশি হইয়া বলিল: আমিও তাই ভাবতেছিলাম। আজ আর পার্কে গিয়া কাজ নাই। এখানে বৈসাই একটু বিশ্রামও করি, আলাপও করা যাবে। জায়গাটা খুব নির্জন। আশে-পাশে কেউ নাই। আসার সম্ভাবনাও নাই।

বলিয়াই হামিদ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তার বসার একটা জায়গা সাফ করিতে লাগিয়া গেল।

রাযিয়া রসিকতা করিয়া বলিল: এত অন্ধকারেও নির্জন জায়গা খুঁজেন? মনে হয় এখনো আপনার সংকোচ কাটে নাই।

হামিদ অপ্রস্তুত না হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল: তা না, নিরालা জায়গায় আনডিস্টার্বড আলাপ করা যায় এই আর কি?

রাযিয়ার কথার জবাব হইল না, তা উভয়ে বুঝিল। দুইজনই হাসিল। রাযিয়া বসিতে গেলে হামিদ তার হাত ধরিয়া টানিয়া তার-পাতা রুমালে বসাইল। নিজে তার পাশ ঘেঁষিয়া ঘাসের উপর বসিল।

কয়েকদিন আগের ইচ্ছার কথা তার মনে পড়িল। রাযিয়ার গা স্পর্শ করার সাধ আজ মিটিল। যা কল্পনা করিয়াছিল। রাযিয়ার বাহু কি দৃঢ় কোমল! চামড়া কি মসৃণ! হামিদের রোমাঞ্চ হইল।

পাশাপাশি বসিয়া উভয়ে পূর্ব কথার রেশ ধরিয়া আলাপ শুরু করিল। রাযিয়ার কথা শুনিতে-শুনিতে হামিদ রাযিয়ার বাঁ হাতটি নিজের কোলে টানিয়া নিল। ডান হাতে রাযিয়ার হাতটির কজি মুঠি দিয়া ধরিয়া বাঁ হাতে রাযিয়ার হাতের তালু পিঠ ও আংগুল মলিতে লাগিল। রাযিয়া আপত্তি করিল না। হাত টানিয়াও নিল না। বরঞ্চ যেন কিছু ঘটে নাই এমনভাবে পরম উৎসাহে সে কথা বলিয়াই যাইতে লাগিল। হামিদও যেন কত মনোযোগে রাযিয়ার কথা শুনিতে থাকিল। কিন্তু ঐ সংগে সে নিজের বাঁ হাতে রাযিয়ার বাঁ হাতের তালুমলার কাজ ও চালাইয়া গেল। তার উপর ডান হাত রাযিয়ার কজি ছাড়িয়া বাহু বাহিয়া বাজুতে উঠিল। বাজুর যেটুকু জামার আস্তিনে ঢাকা পড়ে নাই সেটুকুতে হামিদের হাত খেলা করিতে লাগিল। হাতাইয়া তার মসৃণতা ও টিপিয়া তার দৃঢ়তা দেখিতে এবং আংগুলের বেড়ে বাহুর পরিধি মাপিতে লাগিল। হাতের এতসব কাজেও হামিদের শোনা ও রাযিয়ার বলার কোনও বিঘ্ন হইল না। অতঃপর হামিদের হাতটি রাযিয়ার জামার আস্তিনের উপর দিয়া প্রথমে কাঁধে পরে গলায় আরও পরে পিঠের উদাম জায়গাটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে এবং মসৃণতা পরীক্ষা করিতে থাকিল। কোনও রূপ বাঁধা না পাইয়া হাতটি কাঁধের অপর পার্শ্বে গেল এবং রাযিয়ার গলা জড়াইয়া হামিদের দিকে টান দিল। হামিদের ডান কাঁধটি যেন আসন পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রাযিয়ার মাথাটি সেই আসনে আশ্রয় নিল। হামিদের বাম হাতটি রাযিয়ার বাম হাতটি ছাড়িয়া তার থুতিতে উঠিল। থুতি ধরিয়া রাযিয়ার বাম গালটি হামিদের মুখের কাছে আনিল। হামিদ রাযিয়ার গালে প্রথমে আলগোছে পরে গভীরভাবে চুমা খাইল। রাযিয়া কোমল অথচ সবল ঠেলায় হামিদের মাথা সরাইল এবং স্বাভাবিক গলায় বলিল: আজ আর না।

বলিতে-বলিতে রাযিয়া সোজা হইয়া বসিল। হামিদ ভয় পাইল। এটা তার নতুন অভিজ্ঞতা। কথা নাই বার্তা নাই বেগানা নারীর গালে চুমা? রাযিয়া নিশ্চয় রাগ করিয়াছে। এখনি গাল দিয়া উঠিবে। সে মনে-মনে অপরাধ স্বীকার করিল। উত্তেজনা-বশে সে অমানুষ হইয়া গিয়াছিল। রাযিয়ার কাছে কিভাবে মাফ চাইবে, ভাবিতেছিল।

কিন্তু রাযিয়া গাল দিল না। তার বদলে বলিল: প্রথম দিনের টেনিং হিসাবে এইটুকুই যথেষ্ট। কি বলেন?

হামিদ রাযিয়ার কথাই বুঝিল না। কথা বলিবে কি? মাফই চাইবে কি? কাজেই চুপ করিয়া রহিল। রাযিয়া উঠিয়া হামিদের রুমালটি বাতাসে ঝাড়া মারিয়া পরিষ্কার

করিল। পাট করিয়া ভাজ করিল। হামিদের দিকে বাড়াইয়া বলিল: চলেন, পথ চলতে-চলতে বাকি কথা হবে।

বাধ্য শিশুর মতো বিনা-বাক্যে হামিদ চলিল। পাশাপাশি চলিল রাযিয়া। কয়েক পা আগাইয়াই রাযিয়া মুখ খুলিল। বলিল: দেখেন হামিদ সাব, আপনি প্রেমের পথের নয়া পথিক। আইন-কানুন রুল্‌স্‌ রেগুলেশন কিছু আপনে জানেন না। সবই আপনারে আমি শিখামু। কিন্তু আস্তে-আস্তে।

হামিদ এবার সত্যই ভয় পাইল। গালাগালি করে নাই নিশ্চয়ই তার চেয়ে বড় একটা-কিছু করার জন্য। কি সেটা? পুলিশ ডাকিবে না কি?

রাযিয়া তার কথার রেশ ধরিয়া বলিয়া চলিল: প্রথম সাক্ষাতেই অতদূর যাইতে নাই। প্রথমে প্রেম-নিবেদন, আমি তোমারে ভালবাসি, তোমারে ছাড়া আমি বাঁচব না, এই সব কথার সীমার মধ্যে থাকতে হবে। গায় হাত দেওয়া চলবে না। দূরে থাইকা বলতে হবে। চুমা দেওয়ার ব্যাপারেও নিয়ম আছে। আগে হাতে চুমা। তার পর গালে। ঠোঁটে আরও পরের কথা। কিন্তু আপনে সীমা লঙ্ঘন করছেন। আইন ভাঙছেন। ধরেন, আমার গাল না হৈয়া এটা যদি অন্য কোনও মহিলার গাল হৈত, তবে সে এমনি কৈরা আপনার গালে একটা চড় মারত।

যেমন বলা, তেমনি করা। নিতান্ত আতঙ্ক মারিয়া রাযিয়া হামিদের গাল ঠাস করিয়া একটা চড় মারিল। হামিদের, গালটা টাটাইয়া উঠিল। বাপরে! এমন নরম হাতের এমন শক্ত চড়। আঘাতের জন্য না হইলেও আকস্মিকতার জন্য হামিদ বিমূঢ় হইয়া গেল। কিন্তু চড় মারিয়াই রাযিয়া হামিদের গালটি হাতাইতে হাতাইতে বলিল: আহা! খুব ব্যথা পাইছেন? অত জোরে মারবার ইচ্ছা আমার ছিল না। শুধু একটা নমুনা দেখাবার চাইছিলাম।

এতক্ষণে হামিদের অপ্রস্তুত ভাব কাটিল। বলিল: নমুনাই যার এত ভারি, তার আসলের ওজন না জানি কত!

সে এই ভাবিয়া মনে-মনে খুশী হইল যে, যাই হোক রাযিয়া তার উপর রাগ করে নাই। রাগ করে নাই তবে চড় মারিল কেন? চড় মারিল যদি তবে অত পরেই বা মারিল কেন? অপরাধের সংগে-সংগে মারিলই বা না কেন? তবে কি নারী সত্যই রহস্যময়ী?

ইতিমধ্যেই তারা কার্জন হলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। রিক্‌শা বেবির অপেক্ষায় এক জায়গায় দাঁড়াইল। হামিদ বলিল: রাত বেশ হৈয়া গেছে। আপনার একা যাওয়া ঠিক হবে না। চলেন আপনারে বাসায় দিয়া আসি। একা গেলে চাচাজী বকতে পারেন। কি কন?

রাযিয়া: হুঁম! মতলবখানা কি আপনার? চুরি-টুরি নয় ত? আমার বাসাটা চিইনা রাখতে চান বুঝি?

হামিদ: আমি যে মাল চুরি করতে চাই, তার জন্য বাড়ি চিনার দরকার নাই। সে চুরিতে সিঁধ কাটতে হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা ইটের দেওয়ালে না, মনের দেওয়ালে।

নিজের কবিত্বপূর্ণ রসিকতাটায় হামিদ খুশী হইল। কিন্তু তার চেয়ে বেশি খুশী হইল রাযিয়া। সে বলিল: পীরগিরি ছাইড়া কবি হৈলেন কবে থনে?

হামিদ তার সুন্দর চোখ দুইটা পুরাপুরি রাখিয়ার মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিল: রাখিয়া সুন্দরীর দেখা পাইছি যবে থনে।

রাখিয়া: বাহ, টিট্ ফর ট্যাট?

হামিদ: নো, টুথ্ ফর টুথ্।

উভয়েই এক সংগে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাখিয়া হামিদের দিকে ডান হাতটা বাড়াইয়া দিল! হামিদ সেটা সাপটিয়া ধরিয়া হাতের টানে রাখিয়াকে বুকের কাছে আনিয়া জড়াইতে চাহিল।

রাখিয়া বাধা দিয়া ধমকের সুরে বলিল: আবার আইন ভংগ?

হামিদ নিরস্ত হইল।

রাখিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেখাদেখি হামিদও হাসিল।

অদূরে রিক্শা দেখিয়া হামিদ চিল্লাইয়া ডাকিল। রিক্শা কাছে আসিলে রাখিয়া উঠিল। রিক্শাকে চলিতে বলিয়া হাত উঠাইয়া হামিদকে সালাম জানাইল। বলিল: ইনশা আল্লাহ কাল ক্লাসেই দেখা হবে।

যতক্ষণ রিক্শাটা দেখা গেল, হামিদ ঠায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া থাকিল। মনে হইল তার আত্মাটাও ঐ রিক্শায় চলিয়া যাইতেছে। রিক্শা অদৃশ্য হইলে সে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল। পথ চলিতে গিয়া মনে হইল পাখি-ছাড়া খালি দেহ-পিঞ্জরাটা নড়িতে চায় না। সে বুঝিল রাখিয়া ছাড়া তার চলিবে না।

২

তিন বছর পরের কথা। হামিদ ও রাখিয়া এখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আরেক বছর পরেই তারা ডাক্তার হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। কে কোন্ চাকরিতে যাইবে, কে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করিবে, এই সময় হইতেই ছাত্ররা কল্পনা-জল্পনা শুরু করে। হামিদ-রাখিয়াও তাই করিতেছে।

ইতিমধ্যে হামিদ-রাখিয়ার ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়াছে। তাদের মিলামিশা ও চলা-ফেরা এখন খোলাখুলি। সবাই ধরিয়া নিয়াছে তাদের মধ্যে বিয়া হইবে। কেউ বলে আক্দ্ হইয়া গিয়াছে। হামিদ বা রাখিয়া প্রতিবাদ করে না। শুধু মুচকি-মুচকি হাসে। কাজেই সবাই নিঃসন্দেহ।

কিন্তু হামিদ জানে, তাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা মোটেই বাড়ে নাই। তিন-চার বছর আগে যেখানে ছিল সেখানেই আছে। হামিদের কাছে এটা একটা পরম বিষয়। সে রাখিয়াকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। রাখিয়াও হামিদকে তেমনি ভালবাসে। হামিদ পুনঃপুনঃ বলিয়াছে, সে রাখিয়াকে বিয়া করিবে। তাকে ছাড়া আর কাকেও বিয়া করিবে না। রাখিয়া কোনওদিন 'না' বলে নাই। 'হাঁ' ও বলে নাই সত্য। কিন্তু নারী মুখ ফুটিয়া তা বলেই বা কবে? 'না' না করিলেই তার 'হাঁ' বলা হইয়া গেল। এটাই ত দস্তুর। মুসলমান শরিফ ঘরের মেয়েদের দস্তুরই তাই। কাজেই রাখিয়াও এ বিয়ায় সম্মতি।

দিয়াছে। অতএব শরিয়তের দিক হইতে না হইলেও অন্তরের দিক হইতে তারা এখন স্বামী-স্ত্রী।

অথচ রাযিয়া যেন কোনও এক জায়গায় একটা পর্দা খাড়া রাখিয়াছে। রাযিয়াকে একা পাইয়া বা অন্ধকারে হামিদ যখনই ঘনিষ্ঠ হইতে চাহিয়াছে, রাযিয়া প্রথম দিকে খুশী হইয়া উৎসাহ দিয়াছে, সহযোগিতা করিয়াছে। কিন্তু খানিকদূর আগাইয়াই বাধা দিয়াছে। আর আগাইতে দেয় নাই। তিন-চার বছর আগে সেই যে রেসকোর্সে এক সন্ধ্যায় রাযিয়া বলিয়াছে ‘বাস্ আর না’, আজও রাযিয়া হামিদকে সেখানেই খাড়া রাখিয়াছে। হামিদের বেশ মনে আছে, সে যখন রাযিয়ার নরম মসৃণ বাহু ও কাঁধ টিপিতেছিল, তখন রাযিয়া হামিদের হাতের পিঠে হাত দিয়া হামিদের টিপায় জোর দিয়াছে। কিন্তু হামিদ যখন তার হাত রাযিয়ার গলার সামনে আনিয়া নিচের দিকে নামাইতে চাহিয়াছে, তখন রাযিয়া হামিদের হাত সবলে সরাইয়া দিয়াছে। আর সেইদিনই হামিদ রাযিয়ার গালে চুমা দিয়াছিল বলিয়া বেশ খানিকক্ষণ পরে হইলেও হামিদের গালে চড় মারিয়াছিল। অথচ তার কিছুদিন পরে হামিদ রাযিয়াকে জোর করিয়া আরেকদিন চুমা দিয়াছিল এবং বেশ জোরেই দিয়াছিল। এটা করিয়াছিল সে রশিদ ভাইর পরামর্শে। রশিদ ভাই-ই ঠিক। দ্বিতীয়বার চুমায় রাযিয়া প্রতিবাদও করে নাই। চড়ও মারে নাই। তৃতীয়বার রাযিয়া হামিদকে জবাবী চুমাও দিয়াছিল। এরপর আরেকদিন হামিদ রাযিয়ার ঘাড়পিঠ বগলতলা সব জায়গায় হাত বুলাইয়া তাঁর বুকে হাত দিয়াছিল। কাপড়ের উপর দিয়া তার উন্নত সুডৌল স্তন টিপিয়াছিল। রাযিয়া ত বাধা দেয়ই নাই, বরঞ্চ হামিদের হাতের পিঠে নিজের হাত রাখিয়া সে টিপায় জোর দিয়াছিল। মুখে জিগ্গাস করিয়াছিল: খুব ভাল লাগে? উত্তরে হামিদ বলিয়াছিল: খুব। তোমার ভাল লাগে? হামিদ পুছ করিয়াছিল। রাযিয়া জবাব দিয়াছিল: হ্যাঁ। হামিদ রাযিয়ার স্তন টিপিতে-টিপিতে ঠোঁটে চুমা দিয়াছিল, ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ অনেকবার। রাযিয়াও জবাবে চুমা দিয়াছিল। কিন্তু যেই হামিদ রাযিয়ার জামার বুকের ত্রিকোণের ফাঁক দিয়া হাত ঢুকাইয়া রাযিয়ার নগ্ন স্তনে হাত দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, রাযিয়া তৎক্ষণাৎ হামিদের হাত সরাইয়া দিয়াছিল। রশিদভাইকে সে সব কথা বলিয়াছে। রশিদভাই বলিয়াছেন আস্তে-আস্তে সব হইবে। কিন্তু এই তিন চার বছরে আর এক পা আগাইতে পারে নাই হামিদ। কতবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আগের সব কাজ করিতে দিয়াছে। কোনও-কোনও কাজে নিজে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু এখানে রাযিয়া যেন হামিদের এলাকার খুঁটি গাড়িয়া দিয়াছে। এই তিন-চার বছর ধরিয়া হামিদ তার ভাবী স্ত্রীর খোলা স্তনে হাত দিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। কাপড়ের উপর দিয়া স্তনদ্বয়ের সূচ্যগ্র সুডৌলতা প্রথম দেখাতেই তার চোখে ঘা মারিয়াছিল। দুই-এক বছরেই সে দৃঢ় সুডৌলতা তার হাতের তলা দিয়া শিরা-ধমনীতে আগুন ছুটাইয়াছে, কিন্তু তার নগ্ন মসৃণতার স্পর্শ হইতে তাকে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছে। কাপড়ের উপর দিয়া নিজের ভাবী স্ত্রীর স্তন টিপিয়া হামিদকে আজ তিন-চার বছর ধরিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। এর বেশি আগ বাড়িতে চাহিতেই রাযিয়া বাধা দিয়াছে। কিন্তু সে বাধায় কোন রুদ্ধতা কঠোরতা অভদ্রতা বা বিরক্তি নাই। অতি ভদ্রভাবে স্নেহদরে কোমল মধুরতার সংগেই হামিদকে ওসব কাজে বিরত করিয়াছে। কামনা উন্মত্ত হামিদ রাগ করিয়াছে। প্রায় অমানুষের ব্যবহার করিয়াছে। পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করিতে

উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু রাযিয়া স্থির শান্ত স্নেহময় প্রেমময় স্নিগ্ধ মিঠা ফন্দিতে হামিদকে শান্ত করিয়াছে, মা যেমন করিয়া ক্ষিপ্ত শিশুকে নিরস্ত করে। হামিদের রাগ বাড়িয়াছে। তবে ঐ সংগে কামনাও প্রশমিত হইয়াছে।

কিন্তু হামিদের ধৈর্যের একটা সীমা আছে কিন্তু রশিদভাইর ফন্দির কোনও সীমা নাই। রশিদ হামিদের দরদী হিতৈষী বন্ধু। সাধারণভাবে প্রেম-ভালবাসা সম্বন্ধে সে হামিদকে অনেক তালিম ত দিয়াছেই, রাযিয়ার সাথে ব্যবহার সম্পর্কেও দিয়াছে। অন্য দশ জনের মতো সেও বিশ্বাস করে, রাযিয়ার সাথে হামিদের বিবাহ ঠিক হইয়াই আছে। এরা সুখী দম্পতি হোক এটা তারও কামনা। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে চরম ক্রিয়ায় দোষ নাই, এ মতেও সে হামিদকে দীক্ষা দিয়াছে। প্রাক-বিবাহ যৌন-অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে পশ্চিমা বড়-বড় পণ্ডিত বিজ্ঞানীদের মতবাদ রশিদ যুক্তি-তর্ক দিয়া হামিদকে বুঝাইয়াছে। বার্থ-কন্ট্রোলের যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিরাপদে তা করা চলে। ডাক্তারি-বিদ্যায় শিক্ষিত হামিদের এটা বুঝিতে কোনই অসুবিধা হয় নাই। এই জ্ঞানই হামিদ রাযিয়াকে দিয়াছে এবং চরম ঘনিষ্ঠতার প্রস্তাব করিয়াছে। রাযিয়া মিষ্টি-মধুর হাসিয়া হামিদকে বিরত করিয়াছে। হামিদের রাগ হইয়াছে সবচেয়ে বেশি এইজন্য যে রাযিয়া তার সব যুক্তি মুখে মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু কাজে মানে নাই। রশিদভাইর পরামর্শে হামিদ দুই-একবার জোরও করিয়াছে। কিন্তু রাযিয়া শক্তিশালী মেয়ে। সে-শক্তি খাটায় সে এমন মধুরতার সাথে যে হামিদের শক্তি সে-মধুরতার সোমনে অর্ধেক হইয়া যায়। ডাক্তারিটা পাশ করার পরে তাদের বিবাহ হওয়া উচিত। এ বিষয়ে উভয়ে একমত হইয়াছে। একমত হইয়াছে মানে হামিদ বলিয়াছে রাযিয়া নীরব সম্মতি দিয়াছে। বিবাহ যখন ঠিক, তখন চরম ঘনিষ্ঠতায় দোষ নাই, এ বিষয়েও রাযিয়া একমত। তবে সে বাধা দেয় কেন? রাযিয়ার কি অন্য মতলব আছে? অন্য কেউ কি তার নয়রে আছে? তা ত হামিদ বিশ্বাস করে না। ভাবের কথা কাজে হামিদ তার কোন আভাসও পায় না। পায় না বলিয়াই হামিদের দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতা আরও বেশি। তাই হামিদ এ ব্যাপারে একটা হেস্ট-নেস্ট করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। যদি বিবাহের আগে চরম ঘনিষ্ঠতা করিতে রাযিয়ার আপত্তি থাকে তবে রাযিয়া সে কথা বলুক। বিবাহই তবে হইয়া যাক। ডাক্তারি পাশ করার আগে বিবাহ করা যাইবে না তারই বা কি মানে আছে?

এইটাই চূড়ান্ত করিবার জন্য আজ হামিদ রাযিয়াদের বাড়িতে আসিয়াছে। চাচাজী কেস করিতে সিলেট গিয়াছেন। ফিরিতে চার-পাঁচ দিন লাগিবে। ছোট চাচাত ভাই-বোনগুলির দেখা-শোনা করিতে এ কয়দিন রাযিয়া কলেজে যাইতে পারে না। কাজেই হামিদই রাযিয়াদের বাড়িতে আসিয়াছে। এমন সে প্রায়ই আসে। চাচাজীর জানামতেই সে রাযিয়ার সাথে ড্রয়িং রুমে এমনকি রাযিয়ার বেড়রুমে বসিয়া আলাপ করে। চাচাজী কোনও আপত্তি করেন না। রাযিয়া ঠিকই বলিয়াছে, চাচাজী খুবই উদার মতের লোক।

কিন্তু আজকার সুযোগের নিরঙ্কুশ সুযোগ খুব কমই পাওয়া গিয়াছে। চাচাজী শুধু বাসা হইতেই না শহর হইতেই অনুপস্থিত। একটা ফয়সলা আজ করিতেই হইবে।

সোজা কথা আরম্ভও করিয়াছিল হামিদ দৃঢ় সংকল্প লইয়া। কিন্তু হামিদেরই ভুলে তর্কটা অন্য লাইনে চলিয়া গেল। দু-এক কথার পরেই হামিদ বলিয়া বসিল: আমি ছেলে বেলা থনেই নারী জাতিরে কুহকিনী মায়াবিনী মনে কৈরা আসতেছিলাম। বড়

হৈয়া, এই ধর, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হৈয়া আমার ধারণা সম্পূর্ণ ওলট-পালট হৈয়া যায়। নারী জাতিরে প্রেমময়ী ছর-পরী, বাগিচার-সুগন্ধি সুন্দর ফুল, মনে করতে শুরু করি। কিন্তু এখন আমি দেখতেছি আমার ছেলেবেলার মতই ঠিক। নারী-জাতি শুধু মায়াবিনী-কুহকিনী না, তারা ভগুও। পুরুষরে তারা ভেড়া বানায়।

রাযিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলে: বেশ ত। তাতে দোষটা কি? নারীরা যদি সত্যি-সত্যি পুরুষকে ভেড়া বানায়ও তবু সেটা করে তারা পুরুষকে ভালবাসার জন্য, সেবা করার জন্য, যবেহ কৈরা গোশত খাবার জন্য নয়।

হামিদ: নয় কেন? নারী কি পুরুষকে যবেহ করে নাই? তার গোশত খায় নাই? ইতিহাস কি কয়?

রাযিয়া: ইতিহাস কয় নারী রহিমা পুরুষ আইউব নবীর জন্য, নারী যুলেখা পুরুষ ইউসুফের জন্য, নারী বেহ্লা পুরুষ লখিন্দরের জন্য, নারী দময়ন্তী পুরুষ নলের জন্য সীমাহীন আত্মত্যাগ করছে।

হামিদ: রাখ ও-সব নয়ির। ও-গুলি ইতিহাস নয় উপকথা। সত্য ইতিহাসে কয়: সীতা লংকা পোড়াইছে। হেলেন ট্রয় ধ্বংস করছে। ক্রিওপেটা রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করছে। যয়নাব পয়গম্বর সাবের বংশ নির্মূল করছে। পদ্মিনী দিল্লির তখতে আগুন লাগাইছে। আর কত গুনতে চাও? দুনিয়ায় যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, যত খুন-খারাবি, যত মালি-মোকদ্দমা হৈছে, যত রাজ্য ধ্বংস হৈছে যত জমিদারি নিলাম হৈছে সবই হৈছে নারীর জন্য। পুরুষের যত আপদ-বিপদ, শুধু পুরুষেরই বা কিই কেন গোটা মানবজাতির যত শোক-দুঃখ ক্ষয়-ক্ষতি, সবই হৈছে নারীর কারণে।

হামিদের মুখে খই ফুটিতে লাগিল। তার সুন্দর বড়বড় চোখ দুইটা হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। রাযিয়া তার কথাগুলি কিসাবে গ্রহণ করিতেছে, তা বুঝিবার জন্য হামিদ একটু দম ধরিতেই রাযিয়া হাসিয়া বলিল: থামলা কেন? ষ্টক কি ফুরাইয়া গেছে?

হামিদের জিদ বাড়ে। সে গলা লম্বা করিয়া বলে: ষ্টক কি ফুরাবার? নারীর অনিষ্টের নজির অনন্ত-অফুরন্ত। অত নয়িরের দরকারই বা কি? এক বিবি হাওয়ার নয়িরই ত যথেষ্ট।

না বুঝার ভান করিয়া রাযিয়া বলে: বিবি হাওয়ার দোষটা কি?

হামিদ ক্ষেপিয়া যায়। বলে: বিবি হাওয়ার দোষটা কি? দাদা আদমের বেহেশতী সুখের জীবনটা নষ্ট করল কে? বেহেশতের অফুরন্ত সুখ-শান্তি থনে দুনিয়ার এই দুঃখ-যন্ত্রণায় আদমরে নামাইছে কে? অমর মৃত্যুহীন মানব-জীবনকে জরা মৃত্যুর ক্ষণস্থায়ী কষ্টের জীবনে পরিণত করেছে কে? বিবি হাওয়া। তিনি দাদা আদমরে বেহেশত থনে বাইর না করলে আমরা আজ-তক সেই অনন্ত সুখ-শান্তির জীবন যাপনই করতে থাকতাম। তবেই দেখ তোমরা নারীরা মানবজাতির অভিশাপ। শয়তানরে দোষ দেওয়া বৃথা। নারী নিজেই শয়তান। ইভিল জিনিয়াস।

হামিদ বক্তৃতা-মঞ্চের ভাষায় কথা বলিতেছিল। তার মুখে বিজয়ীর তেজ ফাটিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সে তেজে রাযিয়া পুড়িয়া গেল না। স্থিত হাস্যে সে বলিল: বিবি হাওয়া দাদা আদমরে বেহেশত থনে নামান নাই, মুক্ত করছেন। বিবি হাওয়া আদমের

মুক্তি-ধাত্রী। এই মুক্তির আগে আদম ছিলেন বন্দী। দুই রকম বন্দীখানা আছে: একটা সুখের বন্দীখানা, একটা কষ্টের বন্দীখানা। আসলে কিন্তু দুইটাই বন্দীখানা। আদম বেহেশতের অনন্ত সুখের বন্দী ছিলেন। বিবি হাওয়া তাঁরে আজাদ করছেন। তিনি আদমের ইভিল-জিনিয়াস নন, গার্ডিয়ান এঞ্জেল।

রাযিয়ার গলার জোর ও কথার তেজে হামিদ অবাক হয়। নারী জাতি সম্বন্ধে তার ঐ পুরান মতবাদ লইয়া কতদিন কত জনের সাথে তর্ক করিয়াছে। রাযিয়ার চেয়ে অনেক উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত লোক ছিলেন তাঁরা। নারীর পক্ষে অনেক বড়-বড় কথাও তাঁরা বলিয়াছেন। কিন্তু রাযিয়া আজ যে-কথা বলিল, যে-যুক্তি দিল এটা ত সম্পূর্ণ অভিনব। সে কৌতূহলে রাযিয়ার মুখের উপর তার জ্যোতির্ময় বড়-বড় চোখ দুইটার টর্চলাইট নিক্ষেপ করিল।

ও-দৃষ্টিতে রাযিয়া অভ্যস্ত। সে হাসিয়া বলিল: আমার মুখে কি দেখতেছ তুমি? বিবি হাওয়ার ছবি? যদি বিবি হাওয়া হৈতে পারতাম, ধন্য হইয়া যাইতাম। বিবি হাওয়ার ঋণ মানবজাতি কোনদিন শোধ করতে পারব না।

হামিদের মুখে বিদূষের হাসি লক্ষ্য করিয়া রাযিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল: হাস কেন? বেহেশতের অনন্ত সুখ-শান্তি হারাইছ সে দুঃখে ত কান্দা উদ্ভিত। আমি জানি কথাটা তুমি চিন্তা কৈরা কও নাই। কল্পনা কর ত একবার বেহেশতের অনন্ত সুখের কথা। বিনাকাজে বিনাশমে আদম-হাওয়া বেহেশতে গুইয়া বইস দিন কাটান। ভূক-পিয়াস লাগতেই পারে না। হা করলেই গাছ থনে থেকে-থেকে আংগুর গোটা-গোটা আপেল আইসা মুখে পড়তেছে। আর তাঁরা গিলতেছে ঠাণ্ডা শরবৎ মিঠা মধু আর দুধ ও শরাবের নহর বইতেছে চারদিকে। ইচ্ছা করলেই আইসা গলায় ঢুকে। এমনি চলে দিনের পর রাত। রাতের পর দিন। মেওয়া আর মধু। আংগুর আর আপেল। দুধ আর শরাব। নদী আর নহর। খাও আর ঘুমাও। ঘুমাও আর খাও। তারপর কি? তারপর আরও খাও, আরও ঘুমাও কতদিন? কয় বছর। কত যুগ? এই একঘেয়েমি, এই মনোটনি দাদা আদম কতকাল সইতে পারতেন? তুমিই কতদিন পার? তুমি ত বড় ঘরের মানুষ। যারে কয় সোনার চামচ মুখে লৈয়া তোমার জন্ম। তুমিই কও, এক নাগাড়ে পোলাও-কোর্মা-যর্দা-ফিরনি তুমি কয়দিন খাইতে পারবা? দুধ-শরবতের গামলায় যদি তোমার নাক-মুখ আমি এমনি কৈরা ডুবাইয়া রাখি, তবে তুমি কি করবা?

রাযিয়ার মুখের ও হাতের ভংগিতে হামিদের মনে হইল সত্যই যেন অমন করিবার জন্য সে হামিদের মাথার দিকে হাত বাড়াইতেছে। সে ভয়ে মাথাটা সরাইয়া নিল এবং হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ততক্ষণে হামিদের মনে হইল, রাযিয়ার নিকট হারিতে তার বিশেষ আপত্তি নাই। তর্কে রাযিয়া যেন জিতিতেছে এবং সে জিতে হামিদও যেন খুশী হইতেছে। সমঝদারির নজরে সে রাযিয়ার মুখের দিকে চাহিল।

রাযিয়া সেদিকে ভ্রূক্ষিপণ্ড করিল না। সে যেন অন্য জগতে চলিয়া গিয়াছে। সে আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিল: নিরবচ্ছিন্ন এক-ঢালা সুখ সুখই নয়। মাঝে-মাঝেই বিরতি দরকার। দুঃখ আছে বৈলাই আমরা সুখের স্বাদ বুঝি। অন্ধকার আছে বৈলাই আলোর মূল্য বুঝি। দুঃখের বোধ না থাকলে সুখের বোধও থাকে না। আমরা যখন

রোগীকে এনেসথেশিয়া করি, তখন শুধু তার কষ্টের অনুভূতিটাই যায় না, আরামের অনুভূতিটাও যায়।

হামিদ এবার উৎসাহের সংগেই বলিল: এটা ঠিক।

রাখিয়া: এটা যদি ঠিক হয়, তবে বিনাশ্রমের, বিনাকষ্টের নিরাধরা বিশ্রাম ও সুখের জীবন জীবনই নয়। মানুষের জীবনে দ্বন্দ্ব-সমস্যা সংঘাত-সংগ্রাম জয়-পরাজয় আছে বৈলাই তার জীবন অর্থপূর্ণ। তা না থাকলে জীবনের কোনও অর্থ থাকত না।

হামিদের মুখ হইতে তার অজ্ঞাতেই বাহির হইয়া গেল: তা ত বটেই।

রাখিয়া সে কথায় কোনও সাড়া না দিয়া বলিয়া চলিল: মানুষের জীবনে অশান্তি আছে বৈলাই শান্তি, বিরোধ আছে বৈলাই বন্ধুত্ব, বিচ্ছেদ আছে বৈলাই মিলন, ঘৃণা আছে বৈলাই ভালবাসা এত মধুর এমন সার্থক।

একটু দম নিয়া সে বলিল: বেহেশতের নিরবচ্ছিন্ন সুখে এসব কিছু থাকত না। বেহেশতের ঐ নিষ্ক্রিয় ভাব-দ্যোতনাহীন জীবন থনে বার কৈরা এই কর্ম-চঞ্চল প্রেম-ভালবাসার জীবনে মানুষের কে আনছে? নারী। তবু তুমি কৈতে চাও নারী পুরুষের ইভিল জিনিয়াস?

হামিদ দেওয়ালে পিঠ লাগাইয়া যুদ্ধ করার মতো দুর্বল সুরে বলিল: থিওরেটিক্যালি তোমার কথা সত্য ধৈরা নিলেও প্র্যাকটিক্যাল লাইফের এই সব দুঃখ-দুঃখিতির সান্ত্বনা কোথায়?

রাখিয়া সমান জোরে বলে: সান্ত্বনা এই যে সে দুঃখ-দুঃখিতির বেশির ভাগই সহিতেছে নারী নিজে। বিবি হাওয়া যদি সত্য-সত্যই কোনও অন্যায় কৈরাও থাকেন, তবে তার ফলভোগ করতেছে নারীরাই পুরুষের চেয়ে শতগুণে। পুরুষের দুঃখ-বেদনায় শান্তি প্রেম সেবা দিতেছে কে? নারী। সেই জন্যই নারী প্রেমই পুরুষের জীবনের আবে-হায়াত।

হামিদ চমকিয়া উঠিল। বলিল: আবে-হায়াত? এটা তুমি কই পাইলা?

রাখিয়া: তোমার কাছ থনে। তুমি কতবার আমারে কইছ নারীপ্রেমই পুরুষের আবে-হায়াত। কও নাই?

হামিদ: কইছি। কিন্তু তুমি তার ভুল অর্থ করছ।

রাখিয়া: কি ভুল করছি? কোথায় ভুল হইছে?

হামিদ: সে কথা আরেক দিন হৈব। আজ আমার অন্য কথা আছে। আলাপে-সালাপে আসল কথাই বাদ পৈড়া গেছে।

রাখিয়া: আসল কথাটা কি?

হামিদ: আজ আমি আসছি আমার বিয়ার দিন-তারিখ করতে।

রাখিয়া: তার অত তাড়াতাড়ি কি? ফাইনাল পরীক্ষার পরে বিয়া করবা, এটাই ত ঠিক করছিল।

হামিদ: বিয়া না হওয়া তক যখন আমি তোমারে ঘনিষ্ঠভাবে পামু না, তখন আমি বিয়াটা এখনি করতে চাই। তোমারে ঘনিষ্ঠভাবে এখনি পাইতে চাই।

রাখিয়া: ওতে অসুবিধা আছে।

হামিদ: কোনও অসুবিধা নাই। খরচ-পত্র সব আমার। আর খরচ করবই বেশি কি? শুধু-বন্ধু-বান্ধবের খাওয়ান। তোমার গয়না-গাটি কাপড়-চোপড়ের হিসাব আমি কৈরা খুইছি। টাকাও জমা আছে।

রাখিয়া: ওসব অসুবিধার কথা না। অন্য অসুবিধা।

আমি কোনও আপত্তি-অসুবিধার কথা মানি না। এক মাসের মধ্যে আমার বিয়া হবেই, এই নোটস তোমারে দিয়া গেলাম। চাচাজী আসলেই তাঁর কাছে তুমি বৈলা রাইখ। তুমি না কও আমিই কইমু।

দম-দম করিয়া হামিদ বাহির হইয়া গেল।

৩

সে রাতে রাখিয়ার ঘুম হইল না। সারা রাত বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কাটিল। চিন্তার কুল-কিনারা পাইল না। এখন সে করিবে কি? হামিদ তাকে ভালবাসে। সে নিজেও হামিদকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে বিয়া হইতে পারে না। কেন পারে না, গোড়ায় যদি রাখিয়া তা বলিয়া দিত, তবে ত ব্যাপার এতদূর গড়াইত না। অথচ রাখিয়া তা গোপন করিয়াছে। অন্যায় করিয়াছে। সে অপরাধী। একটা দৃষ্টান্ত নিরীহ নিষ্পাপী দরদী মন লইয়া এমন খেলা করা তার উচিত হয় নাই।

অনুশোচনার বেত্রাঘাতে নিজেকে জর্জরিত করার পর সে ভাবতে সান্ত্বনার মলমল দিতে চেষ্টা করিল। তার অপরাধ কি? সেও ত হামিদকে ভালবাসিয়াছে। এ ব্যর্থতার শাস্তি তাকেও ভুগিতে হইবে, এটা জানিয়াও ত সে তা করিয়াছে। সে শুধু হামিদকে প্রবঞ্চনা করে নাই, নিজেও করিয়াছে। কেন করিয়াছে গোড়াতে তাদের সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব দেয় নাই বলিয়াই সত্য কথাটা বলার প্রয়োজনই বোধ করে নাই। হামিদ সত্য-সত্যই তাকে ভালবাসে কি না, তাকে বিবাহ করিতে আগ্রহী কি না, এ সম্পর্কে স্থির-নিশ্চিত না হইয়া রাখিয়া কেমন করিয়া গলা বাড়াইয়া বলিতে পারিত: ওগো, তোমায়-আমায় বিয়া হইতে পারে না? সেটা বাড়াবাড়ি প্রগলভতা, এমন কি অভদ্রতা হইত না? অতএব গোড়াতে গোপন কথাটা প্রকাশ না করিয়া রাখিয়া অন্যায় করে নাই।

বলিলেই কি হইত? রাখিয়া যে অপরের বিবাহিত স্ত্রী, এ কথা হামিদ জানিতে পারিলেই কি সে রাখিয়াকে ভালবাসিত না? কেন বাসিত না? পরের স্ত্রীকে পুরুষ ভালবাসে না? বরঞ্চ পরের স্ত্রীকে ভালবাসাই ত পুরুষের সাধারণ প্রবৃত্তি। পরের স্ত্রীকে প্রেম করাই ত কাব্য উপন্যাসের আসল প্রেম! কিন্তু-রাখিয়া চিন্তা করিয়া দেখিল, ওর মধ্যে একটা বড় কিন্তু আছে। রাখিয়া পরের স্ত্রী জানিয়াও যদি হামিদ তাকে ভালবাসিত, তবে তার জন্য রাখিয়া দায়ী হইত না। সে অবস্থায় হামিদ তাকে বিয়া করিবার জন্য ভালবাসিত না। নিষ্কাম প্র্যাটনিক প্রেমের জন্য, নয় ত ব্যভিচারের জন্য ভালবাসিত। তাতে হামিদকে নিবৃত্ত করিবার অধিকার থাকিত রাখিয়ার। আর এখন? এখন রাখিয়া একা দায়ী। প্রকৃত ব্যাপার গোপন করিয়া সে হামিদকে আকর্ষণ করিয়াছে। উস্কানি দিয়াছে নিজে ভালবাসা দেখাইয়া।

রাখিয়া নিজের অন্তরে ডুব দিয়া দেখিল, সে নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়িয়াছে। হামিদকে তার ভাল লাগিয়াছিল। হামিদ তাকে ভালবাসুক, এটা সে চাহিয়াছে। এটাই

নারীর অহংকার। একা বা একাধিক পুরুষ তাকে ভালবাসুক, এটা সব নারীই মনে-মনে কামনা করে। কিন্তু বদলা তাদের ভালবাসিতেই হইবে এ বিবেচনা গোড়ায় তার থাকে না। হামিদের বেলাও রাযিয়ার মনোভাব গোড়ায় ছিল তাই। হামিদকে তার ভাল লাগার গোড়ার ইতিহাসটা সত্যিই অদ্ভুত। হামিদের মোল্লাকি কুসংস্কার লইয়া বন্ধুদের অহরহ ঠাট্টা-বিদ্রুপে ও-সবের সামনে হামিদের সলজ্জ অসহায় ভাবে, রাযিয়ার মনে প্রথমে যে ভাবের উদ্রেক হয়, সেটা ভালবাসা ছিল না, ছিল সেটা দয়া। অবলা জানোয়ারের উপর যুলুম হইতে দেখিলে সদয় মানুষের মনে যে ভাব হয়, সেই দয়ার ভাব। সেই দয়া হইতে সহানুভূতি, সহানুভূতি হইতে দরদ, দরদ হইতে মমতা, মমতা হইতে ভালবাসা। কেমন দ্রুত গতিতে যে এটা হইয়া গেল, রাযিয়া তা টেরও পাইল না। সাবধান হইতেও পারিল না। হাসিতে-খেলিতে রাযিয়া সেই যে প্রেমে পড়িল, উদ্ধার পাইল না। যেন 'হাসতে-হাসতে পাগল হৈলাম; আর ভাল হৈলাম না'-গোছের ব্যাপার। পাগল ছাড়া কি? হামিদকে বিয়া করিতে পারিবে না, জানিয়াই সে ভালবাসিয়াছে। এক দিন নয়, দুইদিন নয়, চার-চারটা বছর রাযিয়া এই ভালবাসার অভিনয় করিয়াছে। অভিনয় না ত কি? রাযিয়া নিজে জানিত, এ বিয়া হইতে পারে না। কিন্তু হামিদ ত তা জানিত না। কাজেই হামিদের জন্য না হইলেও রাযিয়ার জন্য ছিল এটা অভিনয়। কিন্তু অভিনয় হইবে কেন? সে ত হামিদকে অন্তর দিয়াই ভালবাসিয়াছে। ভালবাসার তার কেউ ছিল না বলিয়াই সে হামিদের মতো একটা ভালমানুষকে একটা প্রতিভাবান লোককে ভালবাসিয়াছে। মনের দিক দিয়া রাযিয়া ছিল নিতান্ত নিঃসঙ্গ অসহায় দুঃখী। জ্ঞান হইয়াছে অবধি ভালবাসা কাকে বলে সে জানিত না। ছেলেবেলা মা মারা যান। কাজেই মাতৃ-স্নেহও সে পায় নাই। মা মারা যাওয়ায় রাযিয়াকে লালন-পালনের জন্য বাবা নিজের বিধবা বড়-বোনকে নিজের বাড়ি নিয়া আসেন। তিনি সংগে নিয়া আসেন নিজের একমাত্র পুত্র ওয়াজেদকে। ওয়াজেদকেও লেখপড়া করান রাযিয়ার বাবা। বড় বোনের পীড়াপীড়িতে বাবা রাযিয়ার বিয়া দেন ওয়াজেদের সাথে। রাযিয়ার বয়স তখন মাত্র এগার। ক্লাস ফাইভে পড়ে। ওয়াজেদের উনিশ। সে তখন বি. এ. পড়ে। ওয়াজেদ বি.এ, পাশ করিয়া বিলাত যায় শ্বশুরের টাকায় বারিস্টারি পড়িতে। পাঁচ বছর বিলাত থাকিয়াও ওয়াজেদ বারিস্টারি পাশ করে নাই। ইতিমধ্যে রাযিয়ার ফুফু মারা যান। হয় বছর পরে ওয়াজেদ বারিস্টারি পাশ না করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। বলে: শ্বশুর ঠিকমতো টাকা-পয়সা না দেওয়াতেই সে বারিস্টারি পাশ করিতে পারে নাই। এই লইয়া শ্বশুরে-জামাই-এ ঝগড়া হয়। ওয়াজেদ চাকরি লইয়া কলিকাতা চলিয়া যায়। আর দেশে ফিরে না। রাযিয়াকে নেয়ও না। তালাকও দেয় না। শ্বশুর নাকি তার জীবন মাটি করিয়াছেন। তাই শ্বশুর ও তার মেয়েকে সে উচিত শিক্ষা দিবে, এই নাকি তার প্রতিজ্ঞা। সে আরেকটা বিয়াও করিয়াছে। এই দুঃখে রাযিয়ার বাবা মারা যান। ওয়াজেদের এমন ব্যবহারেও স্বামীর প্রতি একটা গোপন টান বাপ-চাচার অজ্ঞাতেই রাযিয়া পোষণ করিত। কিন্তু এর পর রাযিয়া মনের ওদিককার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শুধু ওয়াজেদের প্রতি নয় গোটা পুরুষজাতির প্রতিই তার একটা ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। তাই সে স্বাধীন জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ডাক্তারি পড়িতে আসিয়াছে।

বিবাহ হইবে না জানিয়াও লোকে ভালবাসে না? শুধু পুরুষই কি পর-স্ত্রীকে ভালবাসে? নারীও কি পর-স্বামীকে ভালবাসে না? নিশ্চয় বাসে। বিবাহের আশা না

থাকিলেও দৈহিক মিলনের আশা থাকে। তেমন মিলন হয়ও। কিন্তু রাযিয়ার সে আশা বা ইচ্ছা ছিল না। বস্তুত হামিদের সাথে ঘনিষ্ঠ হইবার আগে রাযিয়ার যৌন-বাসনা প্রশমিত হইয়াই গিয়াছিল। বিবাহের স্বামীর সাথে মিলনের আশা সম্পূর্ণ দূর হওয়ার পর হইতে প্রথমে রাযিয়ার মনে ও পরে দেহেও যৌন-চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল। পুরুষের সংশ্রবও তার মনে যৌন-চেতনা জাগাইতে পারিত না। কত নারীই ত অবিবাহিত থাকে। চিরকুমারীও থাকে। রাযিয়াও তাই থাকিতে মন ও দেহের দিক দিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল।

কিন্তু হামিদের সাথে ঘনিষ্ঠ হইবার পর হইতে রাযিয়ার মনে ও দেহে যৌন-চেতনা আবার জাগ্রত হইয়াছে। হামিদের উল্কানিতে রাযিয়ার মনের সাথে দেহও আকৃষ্ট হইয়াছে। বাসনা তীব্র হইয়াছে। অনেক সময় অদম্য হইয়াছে। রাযিয়ার অংগাদি স্পর্শ করিতে-করিতে হামিদ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। হামিদের উন্মত্ততা রাযিয়ার দেহ-মনে সংক্রমিত হইয়াছে। রাযিয়ার দেহ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিবার অধিকার হামিদের আছে, এ অনুভূতি তার সম্পূর্ণ ন্যায়-ও যুক্তি-সংগত। যাকে আজ-বাদে-কাল নিজের স্ত্রী করিবে তার দেহ ভোগ করিতে কোনও দোষ নাই, যুক্তিবাদী আধুনিকের কাছে ত এটা সাধারণ কথা। কলমা-পড়ার আগে বাক্-দত্ত নর-নারীর মিলন হইতে পারে না এটা হামিদও মানে না, রাযিয়াও বিশ্বাস করে না। নর-নারীর প্রাক-বিবাহ যৌন-অভিজ্ঞতা থাকা উচিত, এই মতবাদ আজ অনেকেই, বিশেষত মেডিক্যাল ছাত্ররা, প্রচার করিয়া থাকে। হামিদ এ মতবাদ প্রচারও করে। রাযিয়াও ও-মতের বিশ্বাসী নয়। বস্তুত: রাযিয়ার অনেক বন্ধু-বান্ধবী তার জানামতেই পরস্পরের দ্বারা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। গর্ভ-নিরোধের যন্ত্রপাতি ও ঔষধ-পত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ নিরাপদেই তা করিতেছে। কাজটা যে অন্যায় নয় তার প্রমাণ এই যে ভাষ্যের অনেকেই রাযিয়ার সাথে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। রাযিয়া তা শুনে সে জন্য রাযিয়া তাদের পাপী বলিয়া ঘৃণা করে না। তাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব অটুট হইয়াছে। বন্ধু-বান্ধবীদের বিশ্বাস, রাযিয়াও তা করিয়া থাকে। তাদের সে বিশ্বাস দূর করিবার কোনও চেষ্টা রাযিয়া করে না।

অথচ সত্য কথা এই যে রাযিয়া তা করে না। করিতে পারে না। যুক্তি হিসাবে ঐ ধরনের যৌন-অভিজ্ঞতাকে সে দোষের মনে না করিলেও নিজে তা করিতে পারে না। কেন পারে না? তার তেমন ইচ্ছাই হয় না। তার বিবেক যেন বাধা দেয়। কেন বাধা দেয়, কোন্ যুক্তিতে বাধা দেয়, তা রাযিয়া বলিতে পারিবে না। তবে মনের গহীনে ডুব দিয়া সে দেখিয়াছে তার মন বলে একমাত্র ভালবাসার পাত্র ছাড়া আর কাউকে দেহ দান করা যায় না। হামিদকে ভালবাসিয়া না ফেলিলে হয়ত সে তার বন্ধু-বান্ধবদের মতো বার্থ কন্ট্রোল করিয়া-যৌন-মিলন উপভোগ করিত। যাদের মন মুক্ত, যারা কাউকে ভালবাসে না, তারা যাকে-খুশী দেহ দান করিতে পারে সাময়িক পুলকের জন্য। কিন্তু যারা একজনকে অন্তর দিয়াছে, তারা তা পারে না। তাদের মন বন্দী। কিন্তু হামিদের বেলায়ও রাযিয়া তা পারে নাই। হামিদের সাথে ইচ্ছা হইয়াছে। সে ইচ্ছা খুব প্রবলও হইয়াছে। হামিদ জবরদস্তি করিয়াছে। বিফল হইয়া রাগ করিয়াছে। অভিমানে অশ্রু-পাত করিয়াছে। রাযিয়ার নিজেরও সর্বাংগে উত্তেজনার আগুন ছুটিয়াছে। তবু রাযিয়া ও-কাজ করে নাই। শুধু হামিদকে দমাইতে হয় নাই। নিজেকেও দমাইতে হইয়াছে। মন

ও দেহের সাথে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। শুধু হামিদের আক্রমণ হইতেই আত্মরক্ষা করিতে হয় নাই, নিজের উত্তেজিত বাসনার হাত হইতেও আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। কেন রাখিয়া এতসব করিয়াছে? কেন নিজেকে এবং প্রাণ-প্রিয় হামিদকে এভাবে বঞ্চিত করিয়াছে? রাখিয়া চিন্তা করিয়া দেখে এসব করিয়াছে হামিদকে ভালবাসে বলিয়া। কথাটা লইয়া রাখিয়া মনে-মনে অনেক তোলপাড় করিয়াছে। বেগানা পুরুষকে দেহ দান করে নাই তাকে ভালবাসে না বলিয়া। হামিদকে দেহ দেয় নাই তাকে ভালবাসে বলিয়া। স্পষ্টতই এর মধ্যে একটা অসংগতি আছে। সে অসংগতিটা কি? রাখিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে এটা তার মনের দুর্বলতা, সংস্কার। বিপক্ষে যতই যুক্তি থাকুক, সে যুক্তি যতই জোরদার হউক, বিবাহ ছাড়া যৌন-মিলনকে সে মন দিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। এটা অন্যায়, এটা পাপ। কেন অন্যায়, কেন পাপ রাখিয়া তা নিজেই বুঝে না। অপরকে বুঝাইবে কি? অপরের সাথে এই অন্যায় কাজ করা যাইতেও পারে, কিন্তু যাকে অন্তর দিয়া ভালবাসি, তাকে দিয়া এই পাপ করান যাইতে পারে না। রাখিয়া বুঝিয়াছে, যুক্তি ও লজিকের বাইরেও মানুষের একটা অনুভূতি আছে। এটা বাস্তব। এটা এক দিনে হয় নাই, ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক সভ্য-শিক্ষিত মানুষ এমন অনেক বস্তু খায় যা আমরা খাইতে পারি না। জোর করিয়া খাইলে বমি হইয়া যায়। বিবাহোত্তর যৌন-মিলন সম্বন্ধে রাখিয়ার অনুভূতিটা ঠিক এইরূপ। রাখিয়া ভাবিয়ার ছাত্র। সে জানে যতই অযৌক্তিক হউক মানুষ অভ্যাস ছাড়িতে পারে না। অভ্যাসের বিপরীত কাজ করিলে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, শরীর খারাপ হয়। স্বাধীনতা কথায় যাকে সতীত্ব বলে, যুক্তির ধোপে তা টিকে না। কিন্তু মনের অভ্যাস হিসাবে ওটা মানিতেই হইবে। না মানিলে মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। কাজেই হামিদের অত পীড়াপীড়িতেও রাখিয়া তাকে দেহ দান করে নাই বিবাহের যুক্তি দিয়া।

কিন্তু রাখিয়া নিজের যুক্তিতে আজ নিজেই বাঁধা খুঁজিয়াছে। হামিদের যুক্তি সোজা। সে রাখিয়াকে মনে-প্রাণে নিজের স্ত্রী করিয়া লইয়াছে। শরিয়ত-মোতাবেক ওটা আইন-সিদ্ধ করিয়া লইতে হামিদ এই মুহূর্তে প্রস্তুত। হয় রাখিয়া তাতে রাজি হউক। কোন অনিবার্য কারণে বিবাহে দেরি করিতে হইলে তাতেও হামিদ রাজি। কিন্তু পরস্পরের দেহদান কাজটা বাকি থাকিবে কোন যুক্তিতে? হামিদের কাছে সত্যই কোন যুক্তি নাই। কিন্তু রাখিয়ার কাছে আছে। সে জানে বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু কেন পারে না, তা না বলা পর্যন্ত হামিদ তা মানিবে কেন? তাই সে এই মুহূর্তে রাখিয়ার দেহ ভোগ করিতে চায়। পেটে সন্তান হইয়া গেলেও কোনও অসুবিধা নাই। হামিদ প্রসবের আগেই বিয়া করিয়া ফেলিবে। বিয়া না হইলেও হামিদ তাকে নিজের সন্তান বলিয়া মানিয়া লইবে। নিজে আলেম ও ভগ্নিপতি উকিল হওয়ায় নিজে উকিল না হইয়াও হামিদ জানে, শরিয়তে এ অবস্থার অনুমোদন আছে। রাখিয়াকে হামিদ যুক্তি-প্রমাণ দিয়া তা বুঝাইয়াছে। আর শারীরিক অসুবিধা ও পড়াশোনার ক্ষতির কথা যদি রাখিয়া বলে, তবে তাতেও হামিদ রাজি। সে উদ্দেশ্যে হামিদ বার্থ কন্ট্রোলের যন্ত্রপাতি পকেটে করিয়াই রাখিয়ার কাছে আসিয়াছে। আহা! বেচারার জন্য কষ্ট হয়। সে এ সব যন্ত্রপাতি ও ঔষধ-পত্র রাখিয়ার হাতে তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু রাখিয়া যখন তার প্রস্তাবে রাজি হয় নাই, তখন রাগে উন্মত্ত হইয়া ছোঁ মারিয়া রাখিয়ার হাত হইতে ও-সব ছিনাইয়া নিয়াছে। টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়াছে। পায়ের তলায় মাড়াইয়াছে। শিশুর মতো ফোঁৎফোঁৎ

করিয়া কাঁদিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। হইবেই ত! সে আসল ব্যাপারে কিছুই জানে না। রাযিয়া নিজে সব জানে বলিয়া গোড়া হইতেই তার মন প্রস্তুত। হামিদের ত তা ছিল না। এখনও নাই। অতএব রাযিয়া হামিদের সাথে যা করিয়াছে তাকে প্রবঞ্চনা না বলিয়া উপায় নাই। আর এ প্রবঞ্চনা চলিতে দেওয়া উচিত না। আজই সব কথা তাকে বলা উচিত ছিল। আগামী কালই তা করিবে কপালে যা থাকে।

রাযিয়ার মন এতক্ষণে শান্ত হইল। ক্লান্তি বোধ করিল। ক্লান্ত চোখের সামনে সে ঘুমের সুড়ং দেখিতে পাইল। আন্তে-আন্তে রাযিয়া সে সুড়ং-এ প্রবেশ করিল। শেষ রাত্রে রাযিয়া বিভোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

চাচাজী না ফিরা পর্যন্ত রাযিয়া বাড়ির বাহির হইতে পারে না। চাকরের হাতে স্লিপ দিয়া হামিদকে ডাকিয়া পাঠাইল। ব্যাকুল আগ্রহে তার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিভাবে কথাটা পাড়িবে, তা মনে-মনে ভাজ করিতে লাগিল।

স্লিপ পাইয়া হামিদ দেরি করিল না। রাযিয়া বিবাহের দিন-তারিখ করিতেই তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, এতে তার সন্দেহ থাকিল না।

কিন্তু রাযিয়ার মুখে বিবাহ না হওয়ার কারণের বিবরণ শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইল। রাযিয়া সব কথা বলা শেষ করিয়া উপসংহারে ব্যথিত ধরা গলায় বলিল: তবেই দেখতেছ, তোমার- আমার বিয়া হৈতে পারে না। আমি পর-স্ত্রী।

রাযিয়া যতটা আশঙ্কা করিয়াছিল, হামিদ ততটা বিচলিত হইল না। রাযিয়াকে কিছু না বলিয়া ওয়াজেদের উদ্দেশ্যে ‘আনকালচার্ড’ ‘ছোট-লোক’ ইত্যাকার গুটিকতক গাল-মন্দ পাড়িয়া শেষে বলিল: তুমি চিন্তা কৈর না। ‘ডিসলিউশন অব ম্যারেজের’ মামলা কৈরা সব ঠিক কৈরা ফেলুম। বেটা ইতরের স্বামী ইতর, ঘুঘু দেখছে ফান দেখে নাই।

হামিদ ঠোঁটে কামড় দিয়া ও হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নিজের সংকল্পের দৃঢ়তা জানাইল। সংকল্প তার সত্যই দৃঢ়। ‘ডিসলিউশন অব ম্যারেজ’ কথাটা সে দুলাভাইর কাছে শিখিয়াছে। দুলাভাইর বৈঠকখানায় বসিয়া কত বিয়া ডিসলিউশনের খবর পাইয়াছে। কথাটা যে নিজের জীবনে এমন কাজে লাগিবে, হামিদ তা কখনও ভাবে নাই।

কিন্তু হামিদের সমস্ত উৎসাহ ও দৃঢ়তায় এক ড্রাম পানি ঢালিয়া দিল রাযিয়া। সে বলিল: চাচাজী ডিসলিউশনের মামলা করছিলেন। ওয়াজেদের পক্ষে জবাব দেওয়া হৈছিল, রাযিয়া ইচ্ছা কৈরা স্বামীর বাড়ি যায় না, স্বামীর হাজার চেষ্টা ও অনুরোধ সত্ত্বেও। মিথ্যা সাক্ষী-প্রমাণ দিছিল ভাড়া করা লোক দিয়া। রাযিয়ার পক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ দিবার বিশেষ কিছু ছিল না। হাকিম ওয়াজেদের পক্ষে রায় দেন। চাচাজী আপিল করেন। আপিলে সাবেক রায় বহাল থাকে। মোটা দাগে খোরপোশ দাবি করলে ওয়াজেদ বেকায়দায় পৈড়া তালুক দিবে। এই আশায় চাচাজী খোরপোশের মামলা করেন। ওয়াজেদের পক্ষে জবাব দেওয়া হয়: রাযিয়া বিনা-কারণে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য পালন করে না বৈলা অন্যত্র বৈসা খোরপোশ পাইতে পারে না। রাযিয়া স্বামীর ঘর করলে ওয়াজেদ সব সময় তাকে ভরণপোষণ করতে রাজি। স্বামীর ঘর করলে ওয়াজেদ সব সময় তাকে ভরণপোষণ করতে রাজি। স্বামীর ঘর করতে রাজি আছে কি

না, হামিদ এ কথা জিগ্গাস করলে রাযিয়া স্পষ্টই বৈলা দিছিল, কখনই না। হাকিম রাযে শক্ত কথা বৈলা রাযিয়ার মামলা ডিস্মিস কৈরা দেন।

একদমে সহজভাবে রাযিয়া কথাগুলি বলিয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল, এরপর হামিদের আর কিছু বলিবার থাকিবে না।

কিন্তু তা হইল না। হামিদ ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু সে ক্রোধ ওয়াজেদের উপর হইতে গিয়া পড়িল আইন-আদালতের উপর। এটা কিসের আইন? কেমন আদালত? একটা এগার বছরের নাবালগ শিশুকে বিয়া দেওয়া হইল একটা লোভী চণ্ডালের কাছে। সে চণ্ডাল শ্বশুরের উপর রাগ করিয়া আরেকটা বিয়া করিল। তবু আইন বলে আগের বিয়া ঠিক আছে? তালাকের মামলাও ডিস্মিস করে, আবার খোরাকির মামলাও ডিস্মিস করে, এটা কেমন আদালত? অতএব হামিদ চিৎকার করিয়া বলে: মানি না এমন আইন। অগ্রাহ্য করি এমন আদালতের রায়। ওয়াজেদ শয়তানের সাথে তোমার বিয়া বিয়াই নয়। আমি তোমারে বিয়া করুমই।

রাযিয়ার ভাবুক মন খুশী হইল। কিন্তু তার বিষয়ী মন চিন্তিত হইল। একদিকে সে ভাবিল, হামিদটা কত মহৎ! সে একবারও জিগ্গাস করিল না, রাযিয়া এতদিন একথা কেন গোপন রাখিয়াছে? কেন হামিদকে জানায় নাই? কেন এভাবে হামিদকে প্রবঞ্চনা করিল? কি আশ্চর্য! একটি বার সে ও-সব কথা বলিল না। ও-সব কথা যে স্ত্রীর মনে পড়িয়াছে তাও মনে হইল না। এমন মহৎ লোক রাযিয়াকে ভালবাসে, এটা তার কম বরাতের কথা নয়। অপরদিকে ভাবিল এখন এ পাগলকে সে সামলাইবে কি দিয়া? তবু নিরাশ না হইয়া রাযিয়া বলিল: বল কি? তুমি জাইনা-গুইনা পর-স্ত্রীকে বিয়া করবা?

হামিদ সমান জোরে বলিল: বললাম ত আমি ও-বিষয় ডিস্মিস না।

-তুমি না মানলে কি হবে, ধর্ম আইন ও সমাজ ত মানবে।

-ধর্ম আমি মানি না সমাজের আমি ধর্ম ধারি না। আইনের খোড়াই তোয়াক্কা করি।

রাযিয়া এবার হাসি রোধ করিতে পারিল না। বলিল: তুমি আইনের তোয়াক্কা না করলেও আইন তোমার তোয়াক্কা করতে ছাড়বে না। পর-স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করার অপরাধে আইন তোমারে দণ্ড দিতে কসুর করবে না।

হামিদ হাতের ইশারায় রাযিয়ার কথাটায় ধাক্কা মারিয়া বলিল: রাখ তোমার পর-স্ত্রী। আসুক বেটা দেশে মামলা লাগাইতে। তার হাড় গুড়া কৈরা ফেলুম না? হামিদ মুখের ভংগিতেই অনুপস্থিত ওয়াজেদকে গুড়া করিয়া ফেলিল। রাযিয়া শেষ ও সর্বোত্তম যুক্তি দিয়া বলিল: ধর্ম মান আর না মান, সমাজ তোমাকে মানতেই হবে। সমাজ তোমার-আমার বিবাহকে শরা-মোতাবেক বিয়া বলবে না। তোমার-আমার সন্তানদের সমাজ জারজ সন্তান কইবে। তুমি তোমার সন্তানদের গলায় এই লান্নতের তখ্তি পরাইয়া দিবা?

রাযিয়ার গলায় বেদনা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু হামিদের মনে তার কোনও আসর হইল না। সে বলিল: যে সন্তানের বাপের ঠিকানা নাই, তারেই কয় জারজ সন্তান। আমার সন্তান জারজ হৈতে যাব কেন? আর সমাজের কথা কইতেছ? সমাজ আমার সন্তানদের জারজ বৈলা বিয়া-শাদি দিব না? এমন সমাজে আমার সন্তানদের বিয়াই

দিমু না। আমার সন্তানদের আমরা উচ্চ শিক্ষিত মানুষ রূপে গৈড়া তুলম। তার জন্য আমাকে সমাজের দ্বারস্থ হৈতে হবে না। আমার নিজের সে সংগতি আছে। আর কোনও আপত্তি আমি শুনুম না, তুমি বিয়ার দিন-তারিখ কর।

রাযিয়ার জবাবের অপেক্ষা না করিয়া হামিদ বাহির হইয়া গেল। ভাবটা এই যে তার এ আদেশ ফাইনাল।

৪

জাহানারা রাযিয়ার অন্তরংগ বন্ধু। থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। কিন্তু বয়সে প্রায় সমান। উপরের ক্রাসের ছাত্রী বলিয়া রাযিয়াকে 'রাযু আপা' ডাকে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হয়।

জাহানারা সুন্দরী। কোনও কোন দিক দিয়া রাযিয়ার চেয়েও সুন্দরী। দেহ-সৌষ্ঠব তবে রাযিয়ার দেহের মতো লোভনীয় নয়, কিন্তু আকর্ষণীয়। রাযিয়াকে দেখিলেই জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু জাহানারাকে দেখিলে চমৎকৃত হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। রাযিয়া পুরুষের ভোগের বস্তু। জাহানারা দেখিবার বস্তু। সারা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল জাহানারার রূপের প্রশংসায় মুখরিত।

ছিপছিপা পাতলা গড়নের মেয়ে জাহানারা। উঁচায় রাযিয়ার চেয়ে এক মুঠ বেশি। কথায়-কথায় হাসে। কত মিষ্টি সে হাসি। হামিদের সাথেও জাহানারার খুব খাতির। হামিদও মনে-মনে ভাবে: দেখিবার মতো চেহারা বটে।

রাযিয়া-হামিদের সম্পর্কের ভিতরের কথা জাহানারাই সবচেয়ে বেশি জানে। তাই হামিদকে সে হামিদভাই বলিয়া ডাকে। কিন্তু মনে মনে হামিদের প্রতি একটা বিশেষ টান অনুভব করে। অনেক সময় মনের গোপনে ভাবিত যদি রাযু আপা হামিদকে ভালবাসিয়া না ফেলিত তবে সে নিজেই তাকে ভালবাসিত। হামিদের মনের অবস্থাও তাই। রাযিয়াকে আগেই ভালবাসিয়া না ফেলিলে হামিদ প্রথম সাক্ষাতেই জাহানারাকে ভালবাসিত। এখন সে জাহানারাকে নিজের শালী মনে করে। শালীর মতোই ইয়াকি-মযাকও করে।

রাযিয়া অবশেষে জাহানারার কাছে নিজের অবস্থা এবং হামিদের সাথে তার শেষ পরিস্থিতি ভাংগিয়া বলে। আর কারও কাছে বলিবার উপায় নাই। কাজেই জাহানারাকেই এ ব্যাপারে রাযিয়ার পক্ষ লইতে হইবে। এখন উপায় একটা বাহির করিতেই হইবে।

জাহানারা স্বপ্নেও এটা আশা করে নাই। রাযু আপা না থাকিলেই হামিদ তার, একথা জাহানারা অনেক ভাবিয়াছে। কিন্তু রাযু আপাকে ঠকাইয়া হামিদকে পাইতে সে কখনো চায় নাই। একটা অসাধারণ আত্মত্যাগের ভাব লইয়া সে রাযিয়া-হামিদের শুভ কামনা করিয়াছে। সে আত্মত্যাগ জাহানারাকে একটা মহত্ত্ব দান করিয়াছে।

কিন্তু আজ বুঝিল, তার মনের কোণে একটা স্বার্থ-বুদ্ধি লুকাইয়া ছিল। রাযিয়া-হামিদের বিয়ায় শরিয়ত ও আইনের বাধা আছে শুনিয়া ছ্যাৎ করিয়া জাহানারার বুকটা পুলকে নাচিয়া উঠিল। সে পুলক স্থায়ী আশা-আনন্দে রূপান্তরিত হইল যখন রাযিয়া তার উদ্দেশ্যের কথা খুলিয়া বলিল। রাযিয়ার উদ্দেশ্য হামিদ-রাযিয়ার প্রেমকে বিপদ

হইতে উদ্ধার করা নয়, সে প্রেম চূড়ান্তরূপে ভাংগিয়া দেওয়া। রাযিয়ার পক্ষ হইতে এটা সম্ভব নয়। হামিদের তরফ হইতেই এটা ভাংগিতে হইবে। রাযিয়ার উপর হইতে হামিদের মনটা ফিরাইতে হইবে। অন্য দিকে তার মন ঘুরাইতে হইবে। অন্য দিক মানে অন্য নারী।

কথা-প্রসঙ্গে রাযিয়া বলিয়াই ফেলিল: তুমি যদি সে চেষ্টা কর বোন, তা হৈলে হৈতে পারে। আমি ছাড়া তুমিই একমাত্র নারী যার কথা হামিদ ভাবে।

জাহানারা মনে-মনে হাসিল। সে চেষ্টা সে করিয়া দেখিয়াছে। তখন সে মনে-মনে নিজেকে অপরাধী মনে করিয়াছে। তবু প্রাণের টানে তা করিয়াছে। প্রেমের ব্যাপারে মানুষ শুধু অন্ধ নয়, স্বার্থপরও। তবু সে হামিদের মন গলাইতে পারে নাই। রাযিয়ার জন্য হামিদের মন রিয়ার্ড। আর কারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই।

প্রকাশ্যে বলিল: না রায়ু আপা, অন্যের প্রেম হামিদ ভাইর অন্তরে তোমার স্থান দখল করতে পারব না। প্রেম প্রেমকে স্থানচ্যুত করতে পারে না! পারে শুধু একটা জিনিস।

রাযিয়া কৌতূহলে বলিল: সেটা কি?

-ঘৃণা।

ঠিক কইছ বোন। -একটু চিন্তা করিয়া রাযিয়া বলিল। কথাটা তার সত্যই পছন্দ হইল। কিন্তু ভালবাসাকে ঘৃণায় রূপান্তরিত করা যায় কেমনে?

দুই বন্ধু মাথা একত্রে করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া ফিস ফিস করিল। দুই বন্ধু সমস্বরে হাসিল। জাহানারার অন্তরও হাসিল। কিন্তু রাযিয়ার অন্তর কাঁদিল। তবে উভয়ে সিদ্ধান্তটায় একমত হইল।

এরপর কয়দিন রাযিয়া হামিদকে এড়াইয়া চলিল। হামিদ তার দেখাই পায় না। দেখা পাইলেও কথা বলিতে পারে না। রাযিয়া এত ব্যস্ত। কেবল দৌড়ের উপর আছে। কেন ব্যস্ত? কি বিষয় লইয়া এই ব্যস্ততা? জিগ্গাস করিতেও পারে না হামিদ। দেখা হইলেই একমত দৌড়াইতে দৌড়াইতে বলে: এখন মাফ করবা, বড়ই ব্যস্ত। একটু পরে নিজেই তোমার সাথে দেখা করব।

হামিদ কোনও সন্দেহ করে না। কারণ রাযিয়া কথা বলে বরাবরের মিষ্টি হাসি মুখে। কিন্তু কথাটা এতবার এতদিন বলিয়াছে যে ওতে হামিদের আর বিশ্বাস নাই। বিয়ার দিন-তারিখ চূড়ান্ত করারই কথা। কাজেই হামিদের এই তাড়া। কিন্তু রাযিয়া কি লইয়া এত ব্যস্ত যে এই পনের দিনেও এক মিনিট সময় করিতে পারিল না?

অগত্যা হামিদ একদিন জাহানারাকেই ধরিল। রাযিয়ার হইয়াছে কি? কোন বিপদ-আপদ? কোনও অসুবিধা? জাহানারা কি কিছু জানে?

হাঁ, জাহানারা সবই জানে। ব্যাপার কিছুর না। রাযিয়ার পার্সেন্টেজ লইয়া গোলমাল। তাই প্রফেসর-প্রিন্সিপালের কাছে ছুটাছুটি। ব্যাপার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর দুই-তিন দিনেই সব পরিষ্কার। হামিদভাইর চিন্তার কোনও কারণ নাই। দুষ্টামিপূর্ণ হাসি হাসিয়া সে হামিদকে তসল্লি দিল। তারপর সে আলগোছে অন্য ছাত্রীদের মধ্যে মিশিয়া গেল।

দুদিন পর রাযিয়া নিজেই হামিদকে খুঁজিয়া বাহির করে। হাসি মুখে বলে: ইস্, ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়ছে। সব গোলমাল মিইটা গেছে। এখন দুদণ্ড বৈসা আলাপ করা যাব।

হামিদ আগ্রহে বলে: কবে?

-তুমি যখন কও।

-কালই তবে? কোথায়?

-আমার বাসাতেই হৈতে পারে। চাচাজী আজই আবার মফস্বলে যাবেন।

-কখন যামু?

-এই ধর সন্ধ্যার পরে। সাতটা থনে আটটা। যখন তোমার সুবিধা। খাওয়া-দাওয়া আমার ওখানেই করবা। তারপর ন'টার শোতে সিনেমায় যাওয়া যাবে। রাজি?

-খুব। হামিদের গলায় উত্তেজনা ফাটিয়া পড়িল।

পরদিন ঠিক সাতটায় হামিদ রাযিয়াদের বাড়িতে হাজির। উকিল সাহেব নাই। কাজেই তাঁর চেম্বার বন্ধ। চেম্বারের পাশ কাটিয়া হামিদ ড্রয়িং রুমে ঢুকিল। এখানে হামিদ কতদিন আসিয়াছে। সবই তার চেনা। ড্রয়িং রুমটি সিলেটি বেতের সোফাসেটিতে সাজোনো। কয়েকখানা চেয়ারও আছে। তাও বেতের সেন্টার টেবিলটিও তাই। ওর উপরে কয়েকখানা খবরের কাগজ ও পুরাতন ম্যাপজিন ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। পর্দা ঠেলিয়া হামিদ ড্রয়িং রুমে ঢুকিল। কিন্তু কেউকে দেখিল না। কারও সাড়া-শব্দও পাইল না। সেজন্য অবশ্য হামিদের কোনও অসুবিধা হইল না। এ বাড়ির চাকর-চাকরানীরাও হামিদকে চিনে। বলিতে গেলে হামিদ এ বাড়িরই একজন।

কাজেই কোনও উদ্বেগ বা ব্যস্ততা দেখাইল না। কেবল ফর্মালিটির ধার ধারিল না। সুইচ টিপিয়া আরেকটা লাইট বাড়াইয়া একটা ম্যাপজিন টানিয়া নিল এবং সোফায় বসিয়া তার পাতা উল্টাইতে লাগিল। রাযিয়াকে স্বাভাবিক দিবার দরকার নাই। সে হয়ত পাকঘরে আছে। অবসর পাইলেই চলিয়া আসিবে। রাযিয়া শুধু ছাত্রী নয়, সংসারীও বটে। চাচী মারা যাওয়ার পর প্রায়ই সে রান্না-বান্নাও করিয়া থাকে। কত ভাল মেয়ে রাযিয়া। আদর্শ গিল্লী হইবে সে। হামিদ ত এমনি স্ত্রী চায়। অল্পক্ষণেই হামিদ একটা প্রবন্ধে ডুবিয়া গেল।

ইঠাৎ বারান্দায় জুতার মচমচ আওয়াজ কানে গেল। হামিদ বই হইতে মাথা তুলিল। পুরুষের জুতার শব্দ। কে আবার আসিল হামিদ-রাযিয়ার গোপন আলাপে ব্যাঘাত ঘটাইতে? হামিদ বিরক্ত হইল।

কিন্তু জুতার মালিক ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিল না। সমান তালে পা ফেলিয়া হনহন করিয়া ড্রয়িং রুম পার হইয়া অন্তরের দিকে চলিয়া গেল। পর্দার নিচে দিয়া হামিদ স্পষ্ট দেখিল চকমকা পালিশ-করা কাল অক্সফোর্ড শু। উল্টেড ফ্লানেলের প্যান্টের ফ্লাপ। পর্দার ফাঁক দিয়া আবছা দেখিল কাল-সুট-পরা হ্যাট-মাথায় লম্বা ছিপছিপা গৌরবর্ণ যুবক। রাযিয়াদের কোন নিকট-আত্মীয় হইবে নিশ্চয়। কিন্তু কে? উকিল সাহেব বাড়ি নাই। রাযিয়ার সাথে লম্বা আলাপ জুড়িয়া দিবে। তবে ত মুশ্কিল। রাযিয়া লোকটাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দেয় তবে ত? রাযিয়ার সে বুদ্ধি নিশ্চয় আছে।

হঠাৎ রাযিয়ার গলার আওয়াজ হামিদের চিন্তা-স্রোতে বাধা দিল। রাযিয়া বলিল: আশরাফ, তুমি হঠাৎ কই থনে? আজ ত তোমার আসার কথা ছিল না।

আশরাফ নামক অচেনা লোকটি সোহাগ-ভরা গলায় বলিল: তোমার কাছে আসুম তার আবার দিন তারিখ লাগব কেন? তুমিই বা এত সাজগোজ কৈরা কার পথ পানে চাইয়া আছ?

ব্যগ্রতাপূর্ণ গলায় রাযিয়া বলিল: হামিদ সাবের আসবার কথা আছে। তিনি বোধহয় আইসা পড়লেন। তুমি শিগ্গির পালাও।

কথার আওয়াজ অনুসরণ করিয়া হামিদ দেখিল ড্রয়িং রুম ও পাশের কামরার মধ্যে একটি চারপাল্লার জানালা আছে। ঐ কামরাটা রাযিয়ার বেড়-রুম হামিদ তা জানে। হামিদের সৌভাগ্যবশত: এই চার পাল্লার জানালার উপরের পাল্লা-জোড়ার একটি হা করা। তারই ভিতর দিয়া পাশের ঘরের আলাপের সব কথাই স্পষ্ট হামিদের কানে আসিতেছে।

আশরাফ গলার সোহাগ আরও বাড়াইয়া বলিল: যাও বল্লেই হৈল? চাচাজী বাড়ি নাই শুইনা ভাবলাম তোমার সাথে একটু ফুর্তি কৈরা যাই। আমাদের নিরাশ কৈরা ফিরাইতে পার না রায়ু, একটু দয়া কর।

ধমকের সুরে রাযিয়া বলিল: যাও বলছি। এক্ষুনি যাও। তোমার শখ মিটে না? কালই ত এক ঘন্টা ফুর্তি কৈরা গেলা। আজ আর না। হামিদ সব বোধ হয় এতক্ষণ আইসা পড়ল।

আশরাফ সোহাগ-ভরা নাকী সুরে বলিল: না গো না গো তোমার হামিদ নাগর এখনো আসে নাই। চাচাজীর চেম্বার বন্ধ। ড্রয়িং রুমে উঁকি দিয়া দেইখা আইছি কেউ নাই।

ইতিমধ্যে হামিদ তার দুর্নিবার কৌতূহল ঠেকাইতে পারে নাই। সমস্ত শালীনতা শরায়তি ও শিষ্টাচারের বাধা ঠেলিয়া প্রথমে দূর হইতে পরে কাছে আসিয়া হা-করা পাল্লাটার মধ্যে দিয়া উঁকি দিল। সে অর্ধেক দেখিল অর্ধেক অনুমান করিল। আশরাফ রাযিয়ার হাত ধরিয়া বলিল: বড় আশা কৈরা আসছি রায়ু, আমাদের বঞ্চিত কৈর না। বল রায়ু, তবে কাপড় খুলি? তুমিও কাপড় ছাড়। আজ বেশি লম্বা করুম না।

ছিটকানি লাগাইবার শব্দ হইল। লাইটটা নিবিয়া গেল। ঘর অন্ধকার হইল। কাপড় ছাড়ার খচখচ ও জুতা খোলার খটখট আওয়াজ হইল।

হামিদ অন্ধকারে কিছু দেখিল না। কিন্তু সরিলও না। সে চুচু শব্দ শুনিল। নিশ্চয় চুমা-চুমির শব্দ।

হামিদের ত্রুন্ধ কৌতূহল ফাটিয়া পড়িল। সেই ঘন অন্ধকারেও রাযিয়ার বেড়রুমের ভিতরের ব্যাপার নজর করিতে লাগিল। খাটের মচ্-মচ্ খট-খট, চুমা-চাপা অস্পষ্ট হাসাহাসি, ধাপুড়-ধুপুড়, আহা-উহু, অত জোরে না, কি মজা, আহু আহু ইত্যাদি হামিদের কানে আসিতে লাগিল। তার জ্যোতির্ময় চোখ দুইটা টর্চ লাইটের প্রখরতা লইয়া সে অন্ধকারে মাথা কুটিয়া মরিল। দেখিল না কিছু। কিন্তু অনুমান করিল সবই। ওদের কথাগুলি তগু-গলিত সীসার মতো হামিদের কান ভেদ করিয়া হৃদপিণ্ড দধ্ব করিল। রাযিয়া-আশরাফের ঘন-ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাস হামিদের সর্বাংগ জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ফেলিল।

“হৈল ত, এবার ছাড়।” রাযিয়ার এই কথায় হামিদের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। ‘তাড়াতাড়ি কাপড় পর, শীগগির ভাগ। সবই ফিস্‌ফিস্‌। কিন্তু হামিদের কানে তাই বোমার আওয়াজের মতো লাগিল।

হামিদ টলিতে-টলিতে কোনও মতে সোফায় গিয়া বসিল। রাযিয়ার ঘরের লাইট জুলিয়া উঠিল। কাপড় পরার খচ্‌খচ্‌ জুতা পরার খট্‌খট্‌ ছিটকানি খুলার টুক্‌-টাক্‌ সবই হামিদের কানে আসিল। তার সারা গায় ঘাম চুটিতে লাগিল। এ বাড়িতে আর এক মুহূর্ত থাকাও তার কাছে অসহ্য মনে হইল। সে ছুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। এমন সময় পাশের ঘর হইতে আশরাফের গদগদ কণ্ঠের ‘বড় মজা পাইলাম রাযু। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।’ শুনিতে পাইল। সংগে সংগে বারান্দায় জুতার মচমচ শুনিয়া হামিদ থমকিয়া দাঁড়াইল। একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া আশরাফ নামক ঐ শয়তানটাকে টুটি চাপিয়া ধরে এবং ওর ডানা-রান ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করে। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইল। পরের বাড়ি। এখানে মারামারি ও খুন খারাবি করিলে একটা কেলেংকারি হইবে। তার চেয়ে শয়তানটা বাহির হইয়া যাউক। রাস্তায় ওরে শায়েস্তা করাই ঠিক হইবে।

আশরাফকে কিছুদূর যাইবার সময় দিবার জন্য এবং নিজেকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে সে ফিরিয়া সোফায় বসিয়া হাপাইতে লাগিল। এমন সময় রাযিয়ার গলা শোনা গেল। সে চিল্লাইয়া চাকরকে ডাকিয়া বলিল: হামিদ সাবের আসবার কথা আছে। তুই একটু আগ বাইড়া দেখ। চেম্বারে বৈসা থাকলে ডাইকা আইনা ড্রয়িং রুমে বসা। বলিস্‌ আমি আসতেছি। আইসা না থাকলেও ওদিকে একটু মজর রাখিস। এখন আইসা পড়বেন।

হামিদ শুনিল চাকর জবাব দিল: আচ্ছা আপা, এই ঘাইতেছি।

চাকরটা আসিয়া পড়িবার আগেই হামিদ ড্রয়িং রুম হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে গিয়া পড়িল একেবারে চাকরটার সামনে। চাকরটাও হামিদকে দেখিয়া খুশিতে দাঁত বাহির করিয়া নুইয়া আদাব দিল এবং চিল্লাইয়া উঠিল আপা ডাক্তার সায়েব আইসা পড়ছেন।

হামিদের দিকে চাহিয়া বলিল: আপনে বসেন হুজুর। আমি আপারে এখনই পাঠাইয়া দিতাছি।

চাকর অন্তরের দিকে ছুটিল। হামিদ আর কি করে? এ অবস্থায় চলিয়া যাওয়া যায় না। চাকরটা কি মনে করিবে? অগত্যা ড্রয়িং রুমে আবার ঢুকিল। সংগে সংগে অপর দরজা দিয়া রাযিয়া ঢুকিল। তার হাতে একটা টার্কিশ তোয়ালিয়া। তাই দিয়া ভিজা চোখ-মুখ মুছিতে মুছিতে হাসিয়া বলিল: কিছু মনে কৈর না। তোমার লাগি এন্তেয়ার করতে-করতে ঘুমাইয়া পড়ছিলাম। তোমার এত দেরি হৈল কেন? এখন কয়টা বাজে?

মড়ার উপর খাড়ার ঘা! বদমায়েশির উপর মিথ্যা কথা! হামিদের রাগের আগুনটা আবার ফাৎ করিয়া জুলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল রাযিয়ার গালে একটা চড় মারিয়া তার গলা টিপিয়া ধরে। কিন্তু অতি কষ্টে রাগ দমাইয়া অন্যভাবে রাযিয়াকে শান্তি দিবার জন্য বলিল: মিথ্যা কথা বৈলা নিজের পাপ ঢাকবার চেষ্টা কৈর না। ড্রয়িং রুম থনে আধ ঘন্টা ধৈরা তোমার সতীপনার লীলা দেখছি। তুমি একটু প্রস্টিটিউট, তুমি একটা হোর।

-তোমার সাথে কথা বলা ত দূরের কথা তোমার মুখ দেখাও পাপ-শুধু এই কথাটা বলার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছি। আর না। আজ থেনেই তোমার সাথে সব সম্বন্ধ শেষ।

রাখিয়া কোনও কথা বলিবার আগেই হামিদ দমদম করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। সেদিকে চাহিয়া রাখিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে হাসি কান্নায় পরিণত হইল। চোখ দিয়া দরদর করিয়া পানি ছুটিল। সে শাড়ির আঁচলে চোখের পানি মুছিতে লাগিল।

ওদিকে হামিদ ভন-ভন্ করিয়া গেট পার হইতেই উকিল সাহেবের চেম্বার হইতে জাহানারা হাসিমুখে গলা বাহির করিল। হামিদ চলিয়া গিয়াছে, নিশ্চিত হইয়া সে বাহির হইল। তার হাতে একটি ছোট সুটকেস। সেটি লইয়া সে চটর-চটর স্যাণ্ডেলের আওয়াজ করিতে-করিতে ড্রয়িং রুমে ঢুকিল। জাহানারাকে দেখিয়া রাখিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল: ওয়াগারফুল। পারফেক্ট এ্যাক্টিং। হাতে-হাতে ফল। হামিদ রাইগা একেবারে আগুন। আমারে শুধু হাতে মারে নাই। আর সবই করছে। কিন্তু তুমি কও, এমন চমৎকার মানানসই সুট তুমি পাইলা কই?

জাহানারা হাতের সুটকেসটা দেখাইয়া বলিল: আমার মামাত ভাই আলতাফের সুটটা আমার গায় একদম ফিট করে। ওটা পৈরা আমি বাড়ির লোকেদের এমনকি খোদ আলতাফেরও অনেকবার ফাঁকি দিছি। হামিদ ভাই কোনও সন্দেহ করে নাই ত? ভাল কথা, তুমি ধরা পড় নাই ত? ঠিকমতো অভিনয় করতে পারছিলি? তুমি হাইসা ফেল নাই?

রাখিয়া ধরা গলা চেষ্টা করিয়া চপল করিবার জন্য বলিল: না, হামিদ নাই।

জাহানারা রাখিয়ার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল: হাস যে নাই তার প্রমাণ তোমার চোখ-মুখ। তোমার চোখ-মুখ এত লাল কেন? কান্ছ না কি?

রাখিয়া আর সামলাইতে পারিল না। জাহানারাকে জড়াইয়া ধরিল। তার কাঁধে মুখ রাখিয়া হাউ-মাউ করিয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল। কান্না থামাইয়া ধরা গলায় বলিল: জাহানারা বোন আমার, তুমি ত জান, একাজ করতে আমার কলিজা থাক হৈয়া গেছে। কি জিনিস আমি আজ হারাইলাম, তুমি ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

জাহানারা নিজের শাড়ির আঁচলে রাখিয়ার চোখ-মুখ মুছিয়া জোর করিয়া তাকে সোফায় বসাইল। নিজে তার গা ঘেঁষিয়া বসিল। কাঁধে বাঁ হাত রাখিল। ডান হাতে রাখিয়ার চিবুক ধরিয়া মুখ উঁচা করিল। বলিল: রাযু আপা, তুমি এমন এলাইয়া পড়লা কেন? তুমি যদি প্ল্যান বদলাইতে চাও, তবে ত এক মহূর্তে হামিদ ভাইর ভুল ভাংগান যায়। তুমি কও, আমি এক্ষুনি তার কাছে যাই।

রাখিয়া শাড়ির আঁচলে আবার উদগত আঁসু রোধ করিয়া বলিল: না, আমার প্ল্যান আমি বদলাইতে পারি না। তুমি কিন্তু যত শিগ্গির পার হামিদের কাছে যাও। তার ভুল ভাংগবার জন্য নয়। ওটাকে আরও ময়বুত করার জন্য। আমার প্রতি তার ঘৃণায় আরও ইন্ধন যোগাইতে।

জাহানারা জিজ্ঞাসু নজরে রাখিয়ার দিকে তাকাইল। রাখিয়া বলিল: পুরুষের রাগ ত। যেমন ধপ্ কৈরা জ্বলে, তেমনি ধপ্ কৈরা নিভে। তুমি দেখবা তা যেন না হয়। আমার উপর কোনও দুর্বলতাই যেন তার মনে না আসে। তুমিই একদিন কৈছিলি, এক

নারীর প্রতি ঘৃণাই পুরুষের মনে আরেক নারীর উপর ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারে। তুমি এমন ব্যবহার করবা যাতে আমার প্রতি ঘৃণার ফলে হামিদ তোমারে ভালবাসে। এই অমূল্য মানিক আমি অন্য নারীর হাতে দিতে পারি না। সকলে ওর মর্যাদা বুঝব না। যাও বোন। পারলে কাল সকালেই এটা কর। তুমি চেষ্টা কর। আমি আল্লার দরগায় মোনাজাত করি।

৫

মস্তিষ্কের ঝড় মনের বিপ্লব ও অন্তরের দাবাগ্নির সাথে তুমুল সংগ্রামে সারা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া ক্লান্ত দেহে ও অবসন্ন মনে হামিদ শেষ রাতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দরজার খটখটানিতে ঘুম ভাংগিল। শিয়রে রাখা টেবিল টাইমপিস্টায় তখন আটটা। উঠিবার চেষ্টা করিল। সারা গায় থেংলাইয়া যাওয়া বেদনা। একমত জোর করিয়া উঠিয়া বসিল। চেষ্টা করিয়া গলা সাফ করিয়া বলিল: কে?;

হোস্টেলের বয় চিল্লাইয়া বলিল: উঠেন সাব, আটটা বাইজা গেছে। নাশ্তা ঠাণ্ডা হৈয়া গেল।

একটু দম ধরিয়া বয় আবার বলিল: মেহমান আছে, সাব।

‘কে মেহমান?’ বলিতে-বলিতে হামিদ কাপড়-চোপড় সামলাইয়া তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডালে পা ঢুকাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। দরজা খুলিতেই এক হালকা হাসি হাসিয়া জাহানারা বলিল: আমি, হামিদভাই।

হামিদ সে হাসির জবাবে হাসিল না। কিন্তু দরজা আরও ফাক করিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। জাহানারা হামিদের দিকে চোখ রাখিয়া কক্ষের দরজা খুলিল।

জাহানারা এমনিতেই অপূর্ব সুন্দরী। তার উপর আজ সে ইচ্ছা করিয়াই একটি ডানা-কাটা পরী সাজিয়া আসিয়াছে। অন্য দিন হইলে হামিদ এ রূপে মজিয়া যাইত। আজ শুধু অবাধ বিশ্বাসে চাহিয়া রহিল।

হামিদের চোখ-মুখ দেখিয়া জাহানারা ব্যথিত অন্তরে বুঝিল, তার হাসিটা সময়োপযোগি হয় নাই। গত রাতের ঘটনার পর হামিদ খুবই মর্মান্বিত হইয়াছে, এটা জাহানারা ধরিয়া নিয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু তার দেহ-মনের ও চোখ-মুখের এমন বিশ্বয়কর অবনতি ঘটিয়াছে, এটা সে ধারণা করিতেও পারে নাই। হামিদের গোটা চেহারাটাই যেন ঝড়ে-তছনছ করা বাড়ি ঘরের মতো হৃদয়-বিদারক। জাহানারার সারা অন্তরে দরদ উথলিয়া উঠিল। সে দরদ-ভরা গলায় বলিল: হামিদভাই, আমি তোমার সাথে নাশ্তা খামু। সেজন্য আমি খালি পেটেই আসছি। আমার বরাত গুণেই তুমি এখনও নাশ্তা কর নাই।

পিছন ফিরিয়া অপেক্ষমান বয়কে বলিল: আমিও হামিদ সাবের সাথে নাশ্তা খামু বুঝলা? সবই ডবল কৈরা আনবা।

বয় হামিদের দিকে চাহিল। হামিদ মাথা কাত করিয়া অনুমোদন জানাইল। বয় চলিয়া গেল।

জাহানারা টেবিলের কোণা হইতে টুথপেস্ট-ব্রাশ ও আলনার উপর হইতে তোয়ালে নিয়া হামিদের হাতে তুলিয়া দিল। বলিল: তুমি ঝটপট বাথরুমের কাজটা সাইরা

আস। আমি ততক্ষণ একটা বই-এ নজর বুলাই। যাও হামিদ ভাই, দেরি কৈর না। আমার খুব ক্ষিধা লাগছে।

এতক্ষণে হামিদ একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিল। বলিল: আজ হঠাৎ আমার এত যত্ন কেন? আমার এসব ভাল লাগে না, জান?

-জানি গো খুব জানি। তুমি এখন আর কথা কৈও না। যাও, লক্ষ্মীটি আমার। নাশ্তা খাইতে খাইতে কথা হৈব। অনেক কথা আছে আমার।

আমার কোনও কথা নাই, বলিয়া হামিদ বাথরুমের দিকে চলিয়া গেল।

আধঘন্টা খানেক পরে হামিদ যখন বাথরুম হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে অনেকটা তাজা। কথাবার্তাও অনেকটা স্বাভাবিক। জাহানারার কাছে মাফ চাহিয়া ঝটপট চুলটা আচড়াইয়া লইল। চেহারা আরেকটু সজীবতা দেখা দিল।

বয় ইতিমধ্যেই নাশ্তা নিয়া আসিয়াছে। আগা পোচ্ ও মাখন টোস্ট। পড়ার টেবিলেরই এক কোণে টে বসাইয়া জাহানারা টোস্টে মাখন লাগাইতেছিল। সে হামিদকে তাগিদ দিল। হামিদ টেবিলের সামনে বসিল। বয়কে বলিল: যাও, কেটলিতে কৈরা দুই কাপ চা নিয়া আস।

বয় চলিয়া গেল। দুইজন নাশ্তা শুরু করিল। খাইতে-খাইতে জাহানারা যেন কতই দ্বিধা করিতেছে এমনি ভাবে বলিল: বড় আশা কৈরা এত সকালে আসিলাম একটা কথা বলব বৈলা। কিন্তু তোমার চেহারা দেইখা সাহস হৈতেছে কি?

হামিদ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল: কেন, আমার চেহারা কি দেখলা?

-কেন? তুমি আয়নায় নিজের চোহরাটা দেখ নাই? এই সাত ত আয়নার সামনে থনে আইলা।

-কই? আমি ত কোনও বেশকম দেখলাম না।

জাহানারা এক গলা দরদ লইয়া সোহাগ-ভরে বলিল: আমি তোমার পায়ে পড়ি হামিদভাই, আমার কাছে কিছু গোপন কৈর না। বল তোমার কি হৈছে? অসুখ-বিসুখ করছে? বাড়ি থনে কোনও খারাপ খবর আসছে? রায়ু আপার সাথে ঝগড়া হৈছে? একটা কিছু হৈছে নিশ্চয়। কিন্তু কি হৈছে আমারে বলতেই হবে। নইলে যে কথা আমি কইতে আসছি না কইয়াই রাগ কৈরা চইলা যামু। বল হামিদভাই।

রাযিয়ার নাম শুনামাত্র হামিদের মাথায় আগুন লাগিয়াছিল। কিন্তু মনের সমস্ত শক্তি দিয়া রাগ থামাইল। জাহানারা কিছু জানে নাকি! নইলে রাযিয়ার সাথে ঝগড়ার কথা বলিতে গিয়া জাহানারার মুখ-ভাবে অমন পরিবর্তন দেখা যাইবে কেন? হামিদ কি ভুলে তার নিজের মনের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছে? যাই হোক, হামিদ ধরা দিবে না। অতএব রাগও করিতে পারে না।

জাহানারা রাযিয়ার নাম করিয়াছে হামিদকে রাগাইবার জন্য। কই হামিদ ত রাগিল না। কি দুর্জয় মনের বল লোকটার। কিন্তু জাহানারার জিতিতেই হইবে। তাই সে বলিল: আর রায়ু আপার সাথে ঝগড়া যদি তোমার হৈয়াই থাকে, তবে সে জন্য তোমারে দোষ দেওয়া যায় না। সত্যই রায়ু আপাটা আজকাল কেমন যেন হৈয়া গেছে।

তবু হামিদ সাড়া দিল না। কিন্তু দাঁত কামড়াইয়া সে রাগের সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছে, জাহানারার চোখে তা ধরা পড়িল। তার আশা হইল আরেক আঘাতেই

দেয়াশলাইর কাঠি জুলিবে। হামিদের চোখে-মুখে নজর রাখিয়া জাহানারা আবার বলিল: কিন্তু সে যাই করুক আর তুমি যাই কও, রায়ু আপা তোমারে ছাড়া কিছু বুঝে না। জান হামিদভাই, একদিন আমি রায়ু আপারে কইছিলাম: রায়ু আপা, যদি কোনও দিন হামিদ ভাইর উপর খনে তোমার মন উইঠা যায়, তবে আমারে দিয়া দিও। হাজার বাসি হৈলেও আমি হামিদ ভাইরে লুইফা নিমু। উত্তরে রায়ু আপা কি কৈল জান হামিদভাই?

জাহানারার প্রশ্নসূচক দৃষ্টির উত্তরেও হামিদ কথা বলিল না। কিন্তু তার চোখে কৌতূহল ফাটিয়া পড়িল। জাহানারা হামিদের নীরবতা গায় না মাখিয়া বলিয়া চলিল: রায়ু আপা কয় কি? দেখ্ জানু তুই আমার সম্পত্তিতে হাত দিস না। হামিদ শুধু আমারই। আমিও শুধু তারই। আমরা এক-আত্মা এক-দেহ। কথাটা কিন্তু সত্য হামিদভাই।

হামিদ এবার ফাটিয়া পড়িল। বলিল: তোমারে সাবধান কৈরা দিতেছি জানু, ও-শয়তানের নাম আমার সামনে কৈর না। সে ভণ্ড, সে মিথ্যাবাদী, সে প্রতারক।

জাহানারা জিভ কাটিয়া চরম বিশ্বয় দেখাইয়া বলিল: তুমি এসব কি কইতেছ হামিদ ভাই? রায়ু আপার বিরুদ্ধে এসব কথা কৈতে তোমার জিভ খইসা পড়ল না?

টেবিলে থাপ্পড় মারিয়া হামিদ বলিল: নিশ্চয় কইমু। আরও একবার কইমু। সত্যই সে ভণ্ড প্রতারক।

-কেন, কি প্রতারণা করছে সে?

-সে বিবাহিতা। সে পর-স্ত্রী। সব কথা গোপন কৈয়া সে আমারে বিয়ার স্তোক দিছে।

-বল কি হামিদ ভাই? সে বিবাহিতা? তুমি নিশ্চয় জান তার স্বামী বাঁইচা আছে? তালাক দেয় নাই?

হামিদ তখন বিস্তারিতভাবে সব কথা বলিল। জাহানারা সবই জানে। কাজেই অতি কষ্টে আগ্রহী শ্রোতার ভাব দেখাইল। কিন্তু আসলে কিছু শুনিল, বেশির ভাগই শুনিল না। মনে-মনে অন্য ফন্দি করিতে লাগিল। হামিদ শেষ করিলে বলিল: কথায় বলে কারো সর্বনাশ, কারো ভদ্র মাস। আমারও হৈছে তাই। রায়ু আপার সর্বনাশে আমার ভদ্র মাস হৈল। আমি তোমারে চাই হামিদভাই। এতদিন এই স্বপ্নই আমি দেখতেছিলাম। কিন্তু তাই বৈলা হামিদভাই, তুমি আমারে ছোট মনের স্বার্থপর লোক মনে কৈর না। রায়ু আপার সাথে তোমার বিয়া হৈলে আমি সত্যই খুশী হৈতাম। তোমার সুখই আমার সুখ। রায়ু আপারে আমি ভাল বাসতাম সে তোমার ভালবাসার পাত্রী বৈলা। এখন তুমি আমারই। বল হামিদভাই তুমি আমারে বিয়া করবা না?

হামিদ গম্ভীর ভাবে বলিল: তোমার ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এ ভালবাসা তুমি ফেরৎ নাও। আমি তোমারে বিয়া করতে পারুম না।

-কেন?

-যেহেতু কোনও নারীকেই আমি বিশ্বাস করি না।

-কেন কর না? নারীর কি অপরাধ?

হামিদ গর্জিয়া উঠিল: সব নারীই অসতী, ব্যভিচারিণী।

হামিদ সবিস্তারে গত রাত্রের সব ঘটনা জাহানারাকে বলিল।

জাহানারা অনেক কষ্টে মনের হো-হো হাসিটা পেটে লুকাইয়া রাখিল। মুখে আসিতে দিল না। সত্য কথাটা বলিয়া ফেলিবার লোভ অতি কষ্টে দমন করিল। কতকটা নিজের স্বার্থে। কতকটা বাস্তব অবস্থা বিবেচনায়। কি লাভ সত্য কথাটা বলিয়া দিয়া? ওদের মিলনের ত কোনও সম্ভাবনা নাই। নাহক হামিদভাইর জীবনটাও মাটি করা। তাছাড়া হামিদের এই ভুল ধারণার উপরই জাহানারার স্বপ্নের সাফল্য নির্ভর করে। অতএব জাহানারা বলিল: ও, এই কথা? এতে আর হৈছেটা কি? রায়ু আপা আশরাফের সাথে একটু ফুটি করছে। তাতে কি হৈল? দেহটাই দিছে, হৃদয়টা আর দেয় নাই। ভাল ত বাসে সে একমাত্র তোমারেই।

হামিদ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল: একজনকে দেহ দান আরেক জনকে হৃদয় দান? বড় চমৎকার প্রেমের নজির সে দেখাইছে।

-কেন? এটা কি অসম্ভব? আর বিবাহোত্তর যৌন-মিলনের সমর্থক ত তুমিও। তুমিই ত কতবার কইছ বিয়ার আগে নর-নারীর যৌন অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

হামিদ ভাবিয়া বলিল: হাঁ, কইছি। কিন্তু সেটা বাক-দত্ত বর-কন্যার মধ্যে। আজ বাদে কাল যারা স্বামী-স্ত্রী হবে তারার মিলনে আপত্তি থাকতে পারে না।

জাহানারা দৃঢ় স্বরে বলিল: এ মত তোমার অযৌক্তিক অবাস্তব হামিদভাই। বাক-দানের পরেও অনেক সম্বন্ধ ভাইংগা যায়। তাছাড়া নারীর অঙ্গিমাটির উপর তোমরা পুরুষরা এত জোর দাও কেন হামিদ ভাই? বিধবা ও তনয়ী বউ বিয়া করতে ত তোমরার আপত্তি দেখি না। আমরা নারীরা ত তোমরার অঙ্গিমাটি নিয়া হৈচৈ করি না। আসল কথা, নারীর স্বাধীনতা তোমরা মান কি না?

হামিদ প্রতিবাদ করিয়া বলিল: আমি নারীর স্বাধীনতা অস্বীকার করলাম কবে?

জাহানারা হাত নাড়িয়া বলিল: এতদিন কর নাই। কিন্তু আজ করতেছ। শোন হামিদভাই, নারী তার যৌন-জীবন নিয়ন্ত্রণ করব পুরুষের হুকুম-মতো নয়, নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়।

হামিদ দুর্বল প্রতিবাদের সুরে বলিল: তাও ত আমি মানা করি নাই।

জাহানারা প্রতি কথায় জোর দিয়া বলিল: মানা যদি করও, আমরা নারীরা তা গুনব না। আমরা নারীরা আজ শুধু নিজেরার স্বাধীনতাই চাই না, প্রতিশোধও নিতে চাই এবং সেটা সুদে আসলেই।

হামিদ বিস্মিত হইয়া বলিল: কি রকম?

জাহানারা চোখে-মুখে বিজলি ছুটাইয়া বলিল: কি রকম জানতে চাও? শোন তবে। এতদিন পুরুষ নারীর দেহ নিয়া খেলা করছে, তার হৃদয় নিয়া কৌতুক করছে। আজ নারীরা পুরুষের দেহ-মন নিয়া তাই করব। স্ত্রীর ঘরের বন্দী কৈরা, তার কোমরে সতী-বেল্ট পরাইয়া স্বামীরা অবাধে পর-নারী ভোগ কৈরা বেড়াইছে। নারী আজ তারই প্রতিশোধ নিব। সেও আজ স্বামীর মুখে লাগাম দিয়া পর-পুরুষ ভোগ করব। একমাত্র বিপদ ছিল গর্ভ। আজ বার্থ-কন্ট্রোলের যন্ত্রপাতি ঔষধ-পত্র নারীর সে ভোগাধিকার

নিরাপদ করছে। তাই নারীরা আজ শিকল ছেঁড়া পাখির মতোই জীবনটা ভোগ করতে চায়।

অবিশ্বাসের ভাব লইয়া হামিদ জাহানারার কথা শুনিতেছিল। কিন্তু শেষ দিকে তার কথার জোর দেখিয়া হামিদের তাক লাগিয়া গেল। ধরা গলায় বলিল: এসব কি অসভ্য কথা কৈতেছ জানু?

জাহানারার মুখে এবার আগুন ঠিকরাইয়া পড়িল। বলিল: এসব কথা অসভ্য? পুরুষের জন্য যা সভ্য, নারীর জন্য তাই অসভ্য? এইমাত্র না গোটা নারী জাতিকেই তুমি ব্যভিচারী বললা।

একটু দম নিয়া জাহানারা বলিল: শোন হামিদ ভাই, নারী-প্রগতির যতই সমর্থন কর মুখে-মুখে, অন্তরে তুমি একটা নিষ্ঠুর পুরুষ। তোমার পক্ষে নারীর অন্তরের ব্যথা বুঝবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তোমার গায়ের প্রতি বিন্দু লহতে আছে নারীর প্রতি অবিচার। কিছু মনে কৈর না হামিদভাই। তোমার মরহুম ওয়ালেদ সাবেরই লহ তোমার রগ-রেশাতে। তোমার বাবা আমারও বাবা। তাঁর প্রতি অসম্মান দেখান আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু সত্য কথা বলতেই হবে। তিনি চার-চারটি নারীকে নিজের ভোগের পাত্রী কৈরা ঘরে বন্দী রাখছিলেন। লক্ষ মুরিদের তিনি ছিলেন পীর স্পিরিচুয়াল গাইড, রুহানী মুক্তিদাতা। কিন্তু নিজের ঘরের বন্দী চার-চারটা নারী-রুহের কথা তাঁর একদিনের তরেও মনে পড়ে নাই। নারীর রুহ আছে, এটাই তিনি বিশ্বাস করতেন না। এটা তোমার বাবার একার দোষ নয়। এটাই পুরুষ-চরিত্র। এবার নাম দিছ তোমরা পৌরুষ। এই পৌরুষই তোমার লহতে টগবগু করতেছে। নারীও যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, তারও যে একটা রুহ আছে, এটা তুমি বুঝতেছ না এই কারণে।

হামিদ অভিমান-ভরে প্রতিবাদ করিল: এটা তুমি আমায় অভিযোগ করলা জানু। আমার বাবার কাজ সমর্থন আমি কোনও দিন করিনাই। নারীর ব্যক্তিত্বের কথা আমি কতবার কইছি, তা তুমি জান।

-জানি। অনেকবার কইছ। কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের অর্থও তোমার মন-গড়া।

-তবে কি পুরুষের মতো বহু-ভোগেরই নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাপকাঠি বলতে চাও?

-নয় কেন?

-এই ভোগটা পুরুষের জন্যও দোষের। সে দোষের অনুকরণ করা নারীর উচিত নয়।

-আহা আমার গুরুদেব রে! নারীর জন্য ঐ নীতি কথাটা রিজার্ভ নাই বা রাখলা! তাছাড়া ওটা পুরুষের দোষ নয়, ওটা তার জৈবিক ক্ষুধা। নারীরও সে ক্ষুধা আছে। আর যদি ওটাকে পুরুষের দোষই বলতে চাও, তবে সে দোষ করবার অধিকার নারীরও আছে। পুরুষের পছন্দ-মতো নির্দেশী আমরা আর থাকতে চাই না। নিজের ভাল-মন্দ আমরা নিজেরা বিচার করতে চাই। আমরা দোষে-গুণে মানবী হৈতে চাই। সতী-সাক্ষী দেবী আর থাকতে চাই না। তাই আমরাও পুরুষের মতো দোষী হৈতে চাই। এতদিন একা পুরুষরাই ছিল বহু-ভোগী। আমরা নারীরাও আজ বহুভোগী হৈছি। এতে পুরুষরার আপত্তির কি আছে?

হামিদ মনে-মনে স্বীকার করিল জাহানারার কথায় জোর আছে। কিন্তু নিজের স্ত্রীর বেলা অত উদারতা সে মানিয়া লইতে পারিল না। তাই অসহায়ের মতো প্রশ্ন করিল: সত্যই তোমরা বহু-ভোগী হৈছ? তুমি নিজেও?

-হাঁ, আমি নিজেও।

-রাখিয়াও? -প্রশ্নটা করিয়াই হামিদ চমকিয়া উঠিল।

-সেটাত তুমিই ভাল জান? -জবাবটা দিয়া জাহানারাও চমকিয়া উঠিল।

একই সময়ে দুই ভিন্ন কারণে ভিন্ন রূপে দুই জনের মনে পড়িয়া গেল গতরাত্রের ঘটনাটা। কিন্তু হামিদও ওটা মনে করিয়া প্রশ্ন করে নাই। জাহানারাও ওটা মনে করিয়া জবাব দেয় নাই। প্রশ্ন ও জবাবের আগে ওটা কারও মনেই পড়ে নাই। জাহানারা জানে, হামিদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রায়ুআপা তার হাতে ধরা দেয় নাই এবং গর্ভস্থানের ঘটনা অভিনয় মাত্র। কাজেই হামিদের জানার কথা বলিয়া ফেলিয়া জাহানারার মনে পড়িল ওটা যে অভিনয় হামিদ তা জানে না। তার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। নিশ্চয় হামিদভাই মনে করিবে জাহানারা ওটা আগেই জানিত এবং সে দিকেই ইশারা করিয়াছে।

জাহানারার জবাব শোনা মাত্র হামিদের মনে পড়িয়াছে: জানত নাকি জাহানারা ব্যাপারটা?

উভয়ের সন্ধিগ্ধ দৃষ্টি বিনিময় হইল। উভয়ের মনে হইল: সে ধরা পড়িয়াছে। ধরা পড়িলে মানুষ দেখাইতে চায়, সে গোপন চায় নাই। এমনি বীরত্ব দেখাইতে গিয়া জাহানারা বলিল: আমরা সবাই করি। একা রায়ু আপার দোষ কি?

-তবে সে আমাদের ধার দেয় না কেন!

-তোমারে ভালবাসে বৈলা।

-তুমি আমাদের ধরা দিতে রাজি?

-না।

-কেন?

-আমিও তোমারে ভালবাসি।

হামিদ আজ এই প্রথম হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসির মধ্যে রসের চেয়ে কষ অনেক বেশি। বিদূপের সুরে বলিল: খুব কইলা জানু! কামাল করলা। তোমার ডাক্তার না হৈয়া উকিল হওয়া উচিত ছিল।

জাহানারা চটিল। বলিল: এতে ঠাট্টার কি আছে? অপরের সাথে যে অন্যায় করা যায়, প্রিয়জনের সাথে তা করা যায় না। এটা বুঝা কি এতই কঠিন?

-তবে কাজটা যে অন্যায় তা স্বীকার কর?

-কেন করব না? মুখে-মুখে আমরা যতই উদার হই, মনের দিকে সংস্কার-মুক্ত হওয়া সহজ না। এই ধর, বিয়ার আগে যৌন-মিলনের এতবড় সমর্থক হৈয়াও তুমি রায়ু আপার ও-কাজটা সহ্য করতে পারলা না। শুধু তুমি নও। কেউই পারে না। আমিও না। অতএব কাজটা অন্যায়। অন্যায় বৈলাই যাকে ভালবাসি, যাকে স্বামী রূপে পাবার চাই, তার সাথে ওটা করতে পারি না। ভালবাসার সম্বন্ধটা মনের, দেহের নয়।

হামিদ জাহানারার এ যুক্তি খণ্ডাইবার কিছু পাইল না। শুধু ঠ্যাটামি করিয়া জিতিবাবর আশায় তাই বিদ্রূপ করিয়া বলিল: তোফা যুক্তি! উকিল না হৈয়া তোমার বারিস্টার হওয়াই উচিত। দেহ-মনের কি অর্পূব ব্যাখ্যা। আহা!

জাহানারা অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল: দেখ হামিদভাই, নারীর মন লৈয়া তোমরা অনেক খেলা করছ। মানুষের মন লৈয়া আর তা কৈর না। মানুষের মন তার দেহের চেয়ে অনেক রহস্যময়। এনাটমি-ফিযিওলজি পৈড়া মানুষের দেহের বৈচিত্র্যেই কত বিস্থিত হই। কিন্তু সাইকলজির বৈচিত্র্য কি তার চেয়ে শতগুণে রহস্যময় নয়? আমরা ভাঙার। আমরা মাইক্রোস্কোপে দেহের বৈচিত্র্য ধরা পড়ে ঠিকই; কিন্তু মনের বৈচিত্র্য ধরবার জন্য কোনো সাইকোস্কোপ আজও আবিস্কৃত হয় নাই

-ফিযিওলজি-সাইকলজির ডিফারেন্সের উপর লেকচার দেওয়ার কারণটা কি ঘটল এখানে?

-ঘটছে নিশ্চয়ই। তোমরা পুরুষরা শুধু দেহটারই বিচার কর। মনের বিচার করতে তোমরা জান না। তাই নারীর দেহের সতীত্ব নিয়াই অত হেঁচকি কর। মনের সতীত্বের কোনও মর্যাদাই নাই তোমরার কাছে।

হামিদ জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল: জীবনটা ব্যবসাদারী নয় জানু। তাই এখানে মন ও দেহের রিটেল ব্যবসা চলে না। জীবনকে দেখতে হবে অখণ্ড রূপে। ঐ অখণ্ড নীল আসমানের মতোই। ফ্রেগ্‌ মেন্টস্ দেখলে জীবন দেখা হয় না। দেহ-মনকে বিচ্ছিন্ন কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা চলে না। মনকে টুকরা-টুকরা কৈরা বিচার করা সম্ভব নয়।

একটু দম নিয়া আবার বলে: আমরা পুরুষরা নারীর দেহেরই বিচার করি, মনের বিচার করি না, এটা তোমার ভুল। নারী-রূপের পূজা করি ঠিকই, কিন্তু সেটা শুধু চোখ দিয়াই করি না, অন্তর দিয়াও করি। সে রূপ আমরা ভাগ করি শুধু দেহ দিয়া নয় মন দিয়াও। পুরুষের কাছে নারীরূপ একটা রহস্য, একটা মিষ্টি, একটা বিস্ময়, একটা ওয়াগার। কারণ ও-রূপ বিশ্ব-রূপেরই অংশ।

জাহানারা সন্দ্বিগ্ন নয়নে হামিদের চোখে-মুখে চাহিয়া ভয়ে-ভয়ে বলিল: তোমার কথা বুঝতে পারলাম না হামিদভাই।

জাহানারা রসিকতা করিতেছে মনে করিয়া হামিদ উষ্ম হইয়া উঠিল। বলিল: তোমরা নারীরা দরকার মতো কঠিন কথাও বুঝতে পার, আর সহজ কথাও বুঝতে পার না।

বিনা-কারণে এই হামলায় জাহানারা চটিল। বলিল: আর তোমরা পুরুষরা দরকার মতো বলতে পার নারী শয়তানের ঘোড়া। আর দরকার মতো বলতে পার নারীর প্রেম আবে-হায়াত।

হামিদ চমকিয়া উঠিল। চোখ বড় করিয়া বলিল: আবে-হায়াতের কথা তুমি শুনলা কই?

-তুমি যারে শিখাইছ, সেই আমারে কইছে। কও নাই তুমি আবে-হায়াতের কথা?

-কইছি। কথাটা সত্য। আবে-হায়াত বৈলাই ত নারী-প্রেম দুর্লভ।

-দুর্লভ হৈতে যাব কেন? রাযু আপার কথা না হয় বাদই দিলাম। এই ত আমার প্রেম তোমার পায় লুটাপুটি খাইতেছে। তুমি ত আংগুল দিয়াও পুছতেছ না।

-কারণ তোমার ওটা প্রেম নয় মোহমাত্র। সত্য প্রেম মাণ্ডকের হৃদয়ের তারে আঘাত করবই। তোমার-আমার হৃদয়ে-হৃদয়ে তখন কথা হবে। মুখে বলতে হবে না।

-এই না তুমি বললা দেহ-মন বিচ্ছিন্ন কৈরা দেখা যায় না।

-ঠিকই কইছি। মানুষের মন ও প্রেম তার দেহ-নিরপেক্ষ নয়। আগুন যেমন সলতা-নিরপেক্ষ নয়। সলতার মৃত্যুতেই চেরাগের জীবন। দেহের মৃত্যুতেই তেমনি প্রেমের জীবন। শিরি-ফরহাদের প্রেমের শিক্ষা তাই। কিন্তু সেখানেই শেষ নয় জানু। মনও প্রেমের লাকড়ি। আমরার অপূর্ণতা এইখানেই। আমরার প্রেমে দেহ-মনকে পুড়তেই হবে। নইলে প্রেমের আগুন জ্বলব না। প্রেমের এই জ্বালা ও জ্বালানি শক্তিতে শান্তির শীতল মধুরতা ঢালতে পারে আবে-হায়াত। আবে-হায়াতে-ধোওয়া প্রেমে আগুনও জ্বলব লাকড়িও পুড়ব না।

জাহানারার এতক্ষণের সন্দেহ ভয়ে পরিণত হইল। রাযু আপার কথাটাতে হামিদ-ভাইর মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিয়াছে নিশ্চয়! হামিদের প্রতি তার ক্রোধ হইল। দিবে নাকি সত্য কথাটা বলিয়া? কিন্তু স্বার্থপরতা আবার তাকে বাধা দিল। হামিদকে পাওয়ার তার এই একমাত্র পথ। সত্য কথা বলিয়া সে নিজের গলা কাটিতে পারে না।

জাহানারাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া হামিদ বলিল: বিশ্বাস হয় না? না হবারই কথা। আগুনের তাপ ও রৌশনি, তার দাহ ও আলো অবিচ্ছেদ্য এটাই আমরা জানি। লাকড়ি না পুড়লে আগুন হয় না, এই আমরার অভিজ্ঞতা। কিন্তু বিজ্ঞান আজ আমাদের শিখাইছে সবচেয়ে বড় যে আগুনের কুণ্ড সুরুজ। তার লাকড়ি পুইড়া ছাই হয় না। সুরুজের অনির্বাণ আগুনের মতোই তার লাকড়িও অব্যয়। নূর ও নারের পার্থক্য ঐ খানে। সেই গুণে সুরুজ অমর। সুরুজের আগুনের ঐ গুণের নামই আবে-হায়াত। নর-নারীর প্রেম সেই আবে-হায়াত হাসিল করাই আমার সাধনা। আমার জীবনের লক্ষ্য।

একটু দম নিয়া আবার বলিল: তোমার উপর আমার কোনও রাগ নাই জানু। এমনকি রাযিয়ার উপরও না। তোমরা আমারে ভুইলা যাও। এখন বিদায় হও তুমি। আমার সাধনায় যদি কোনও দিন সফল হই, তবে আমি নিজেই তোমরার খোঁজ করুম। ততদিন

বাক্য শেষ না করিয়াই হামিদ একটা অস্বাভাবিক হাসি হাসিল।

কি করিতে কি করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিতে-ভাবিতে জাহানারা নিতান্ত অনিচ্ছায় বিদায় হইল।

হামিদ অতঃপর নিজের মন চোখ ও রুমের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া পড়াশোনায় মন দিল।

নার ও মিনার

১

“ডা. হামিদ, আপনি হাসপাতাল ও কলেজের শৃঙ্খলা ভংগ করতেন। তার চেয়ে বড় কথা আপনি প্রফেশনাল এথিক্সের খেলাফ কাজ করতেন।”

কথাগুলি বলিলেন মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ও হাসপাতালের সুপার নিজের কামরায় বসিয়া। বলিলেন তাঁর সহকর্মী ডা. হামিদকে। তিনি আজ বিচারক। আসামী কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর-অব-মেডিসিন এণ্ড সার্জারি ডা. আবদুল হামিদ এম. আর.সি.পি এফ.আর.সি.এস্। অভিযোগ, ডা. আবদুল হামিদ তার নিজের চেম্বারে বসিয়া সহকর্মীদের কাছে, ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে ঘুরিয়া রোগীদের কাছে এবং ক্লাসে লেকচার দিবার সময় ছাত্রদের কাছে বর্তমান চিকিৎসা-প্রণালীর নিন্দা এবং সহকর্মীদের কুৎসা করিয়া থাকে। এই সব অভিযোগের বিচার করিতেই কলেজের প্রিন্সিপাল ও হাসপাতালের সুপার ডা. হামিদকে নিজের কামরায় তলব করিয়াছেন।

ব্যাপার এই যে ফতেপুরের পীরজাদা সৈয়দ আবদুল হামিদ চার বছর আগে এই মেডিক্যাল কলেজ হইতেই কৃতিত্বের সহিত এম. বি. বি. এস. পাশ করে। তারপর সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাত যায়। সেখানে প্রশংসার সহিত এম. আর. সি.পিও এফ. আর. সি. এস. ডিগ্রি লইয়া মাত্র এক বছর আগে সে দেশে ফিরিয়াছে। বৃত্তির শর্তানুসারে সে সরকারী চাকরি নিয়াছে এবং এই কলেজেই এসোসিয়েট প্রফেসর-অব-মেডিসিন এণ্ড সার্জারি নিযুক্ত হইয়াছে। অধ্যাপনা ও চিকিৎসায় সে এরই মধ্যে ছাত্র-জীবনের সুনাম রক্ষা করিয়াছে। অধ্যাপনায় ছাত্রদের এবং চিকিৎসায় রোগীদের কাছে সে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে।

কিন্তু সেই সংগে দুর্নাম ও দুশ্মনি সৃষ্টি করিয়াছেও প্রচুর। সার্জারিকে কসাইগিরি, প্রেসক্রিপশনকে তেজারতি আখ্যা দিয়া গোটা চিকিৎসা-প্রণালীর নিন্দা ত করেই তার উপর সহকর্মী ডাক্তারদের বিরুদ্ধেও নানারূপ দুর্নীতির অভিযোগ করে। অভিযোগগুলি যুক্তি-প্রমাণ দিয়া সমর্থন করারও চেষ্টা করে। তাতে, রোগী ও ছাত্ররা বাহবা দেয়; আর ডাক্তাররা ক্রুদ্ধ হন। ডাক্তাররা প্রথমে জনে-জনে এবং অবশেষে সকলে মিলিয়া প্রিন্সিপাল-সুপারের কাছে নালিশ করেন। প্রিন্সিপাল-সুপার ফতেপুরের পীর সাহেবের একজন অনুরক্ত মুরিদ। হামিদ তাঁর এককালের প্রিয় ছাত্রও। এই দুই কারণে তিনি হামিদকে মৃদু হুঁশিয়ারি দিয়া বিচারে দ্বিধা ও সময় ক্ষেপন করিতে থাকেন। তাতে ডাক্তাররা ডিরেক্টর-অব-হেল্থ সার্ভিসের কানে কথাটা তুলেন। তিনি প্রিন্সিপাল-সুপারকে তদন্ত ও রিপোর্ট করিতে আদেশ দিয়াছেন।

প্রিন্সিপাল-সুপারের এই তলবের কারণ হামিদ জানিত। সে প্রস্তুত হইয়াই প্রিন্সিপালের কামরায় ঢুকিয়াছে। প্রিন্সিপালের নির্দেশ মতো বসিতে-বসিতে তাই সে

বলিল: সত্য কথা বলাকে আপনি শৃঙ্খলা ভংগ আর প্রফেশনাল এথিক্সের খেলাফ বলতে চান স্যার?

প্রিন্সিপাল হামিদের চোখে-মুখে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন: কোনটা সত্য কথা?

-আমি যা বলছি, সবই সত্য। আপনি শুনতে চান স্যার?

-কন শুনি।

-বিদেশী পেটেন্ট অমুখ-প্রস্তুতকারকর সাথে কমিশনের বন্দোবস্ত কৈরা ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন লেখেন। প্রাইভেট কল দিয়া মোটা ভিজিট না দিলে হাসপাতালে রোগী সীট পায় না। মোটা ভিজিটের রোগী না দেওয়া পর্যন্ত ছাত্ররা পাশ হয় না। নিজেরা ক্লিনিক খুইলা হাসপাতালের লেবার ওয়ার্ডের মেটর্নিটি কেস সেখানে নিয়া যান। ডেলিভারি কেস লেবার টেবিলে তুইলা ফিস দাবি করেন। যতক্ষণ টাকা আদায় না হয়, ততক্ষণ জননী প্রসব-বেদনায় চিৎকার করতে থাকে। আর কত শুনবেন স্যার? এসব অভিযোগ আপনার কানেও আসছে নিশ্চয়। আপনি এটারে চিকিৎসা আর এই অপকর্মকারীরা চিকিৎসক বলবেন স্যার? এঁরা চিকিৎসক না, এঁরা ব্যবসায়ী। সোজা ব্যবসায়ী না, কালাবাজারী মুনাফাখোর ব্যবসায়ী। তার চেয়েও জঘন্য। ওরা ব্যবসা করে জিনিস-পত্র নিয়া; আর এঁরা করেন মানুষের জীবন-মরণ নিয়া।

একদমে এত কথা বলিতে-বলিতে হামিদের বিশাল চোখ হইতে অশ্রু ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তা লক্ষ্য করিয়া প্রিন্সিপাল-সুপার মৃদু হাসিয়া বলিলেন: আপনি সাবধানে কথা বলবেন ডা. হামিদ। আপনার অভিযোগ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়, গোটা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। এর পরিণাম কি হতে পারে জানেন?

হামিদ দৃঢ়তার সংগে বলিল: জানি স্যার। অনেকই মানহানি ক্ষতিপূরণের ভয় দেখাইছে। অনেক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানির তরফ থেকে থানে লোভ ও ভীতি উভয়টাই দেখান হৈছে। কিন্তু স্যার আপনি আমার উদ্ভাদ, বাপের সমান, আপনিই বলেন ডাক্তারি শিখছি কি আমরা ধনী হৈবার জন্য? আপনিও জানেন স্যার টাকা-পয়সার অভাব আমার ছিল না। মোটা আয়ের পৈত্রিক পীরালি ব্যবসা ছাইড়া ডাক্তারি লাইনে আসছিলাম মানব-সেবার জন্য। এটাই কি সে মানব-সেবা?

প্রিন্সিপাল-সুপার ভূ কুণ্ঠিত করিয়া বলিলেন: কেন নয়। ডাক্তাররা ত দুস্থ মানবতার সেবাই করতেছে। নিত্য-নুতন আবিষ্কারের দ্বারা অস্ত্রচিকিৎসায় অচিন্তনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া মানব জাতিতে রোগ-ব্যাদি-মুক্ত করতেছে ত ডাক্তাররাই। আপনার মধ্যেও ত প্রতিভা আছে। বিলাতে সার্জারিতে এত নাম কৈরা দেশে আইসাই যে সার্জারি ছাইড়া দিলেন, এটাও কি প্রফেশনের দোষ?

কিছুমাত্র না দমিয়া হামিদ জবাব দিল: হাঁ স্যার, প্রফেশনের দোষ। সার্জারি আসলে চিকিৎসা নয়। পাবলিক যে ওটারে জল্পাদি বা কসাইগিরি বলে, তা নিতান্ত অন্যায় নয়। আমি ওটারে বলি মিস্ত্রিগিরি। হার্ট ব্রেন লাংস ইত্যাদি অর্গান ট্র্যানসপ্ল্যানটেশন যে-সবরে আপনারা চিকিৎসা-বিদ্যার উন্নতি বলেন ওগুলি আসলে মানুষের চিকিৎসা নয়, যন্ত্রের মেরামত। হার্ট-ব্রেন বদলাইয়া যারে আপনারা বাঁচাইয়া রাখেন, সে কি আগের মানুষটি থাকে? সে কি আগের ব্যক্তিত্ব ফিরাইয়া পায়? নিশ্চয়ই

পায় না কাজেই ও-কাজটা যন্ত্রের ওভারহলিং, মানুষের চিকিৎসা নয়। এই কারণেই আমি সার্জারি ত্যাগ করছি।

প্রিন্সিপাল-সুপার চেষ্টা করিয়া সুরে গাভীর্থ আনিয়া বলিলেন: ওসব দর্শন-ফিলসফির কথা চিকিৎসার ব্যাপারে আনবেন না। তবু সার্জারির বিরুদ্ধে আপনার ব্যক্তিগত রুচি-মর্জি আমরা মাইনা নিছি। কিন্তু আপনার ক্যাম্পেইন ত শুধু সার্জারির বিরুদ্ধে নয়, গোটা মেডিক্যাল প্রফেশনের বিরুদ্ধে। অথচ আপনার জানা উচিত যে মেডিক্যাল প্রফেশন মানবতার সেবার সবচেয়ে নোবল প্রফেশন।

প্রিন্সিপালের উৎসাহে যোগ না দিয়া হামিদ বলিল: হয়ত এককালে ছিল। এখন আর নাই।

-কেন নাই?

-চিকিৎসা আজ আর মানব-সেবার মিশন নাই। এটা হৈয়া গেছে পয়সা রোজগারের ব্যবসা। ঔষধ তৈরি আজ ধনিকরার বৃহৎ শিল্প। এই ধরেন স্যার, আজ দুনিয়াময় যে মেডিসিন ইণ্ডাস্ট্রি গৈড়া উঠছে, তারা যে লাখে-লাখে পেটেন্ট ঔষধ তৈরি করতেছে, এরার অস্তিত্বই কি নির্ভর করে না মানুষের রোগ-ব্যারামের উপর? দুনিয়ায় রোগ-ব্যামো না থাকলে একদিনে এসব ইণ্ডাস্ট্রি ধ্বংস হৈয়া যাব না? কাজেই মানুষের নিরোগ করা এরার স্বার্থ-বিরোধী। এটা ত গেল স্যার এর কমার্শিয়াল দিক। সায়েন্স ও ফিজিওলজির দিক থনেও কি এটা অবৈজ্ঞানিক নয়? রোগের জীবাণু ধ্বংসের নামে আমরা যেসব জীবাণু-নাশক এন্টিবায়টিক রোগীর পেটে ও ব্লাডে ঢুকাইতেছি, তার পরিণাম বিষ-ক্রিয়ার কথা কি কেউ চিন্তা করতেছেন? বিভিন্ন পেটেন্ট নামে পেনিসিলিন ও ক্লোরোমাইসেটিনে বাজার ছাইয়া গেছে। সে-সবের বিদ্রোহ ব্যবহারে মানুষের দেহের লাল রক্ত-কণিকা ধ্বংস ও নতুন কণিকা সৃষ্টি ব্যাহত হৈতেছে। তাতে পরিণামে মানুষ আপ্রাণ্টিক এনিমিয়াতে আক্রান্ত হৈতে পারে। তার অস্থি-মজ্জা পরিণামে রক্ত-কণিকা সৃষ্টির শক্তি হারাইতে পারে। এ সবই বিজ্ঞানের কথা। অথচ এসব কথা কেউ কৈতেছেন না। এ সবের ব্যবহার চলতে দিলে আমাদের দেশে অদূর ভবিষ্যতে অন্ধত্ব র্যাকাইটিস ও নিউর্যাটিক্স রোগীতে ভৈরা যাব। আরেকটা কথা স্যার। এই উপাদানে মেশিনে তৈরি একই পেটেন্ট ঔষধে দুনিয়ার যে-কোনও আবহাওয়ার যে-কোনো দেশের যে-কোনও রোগী সারতে পারে, এটা কি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত কথা? এটা হাতুড়িয়া চিকিৎসা হৈতে পারে কিন্তু সত্যিকার চিকিৎসকের চিকিৎসা হৈতে পারে না। কারণ এটা রোগের চিকিৎসা হৈতে পারে, রোগীর চিকিৎসা নয়। এমন চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের দরকার নাই; দোকানদারই যথেষ্ট।

প্রিন্সিপাল-সুপারের ভ্রূ কুণ্ঠিত হইল। মনে হইল, হামিদের কথার জোর নিতান্ত ফেলিয়া দিবার মতো নয় বলিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই নিজের দায়িত্ব ও পদ-মর্যাদার কথা ভাবিয়া তিনি বলিলেন: আপনি জানেন এইসব ফার্মাসিউটিক্যাল লেবরেটরিতে আমাদের চেয়ে বড়-বড় কত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর ব্রেন ওয়ার্ক করতেছে? তাঁরার গবেষণার ফল মানুষের অকল্যাণ করতে পারে না।

নিতান্ত আদবের সাথে হামিদ মৃদু হাসিল। বলিল: তাঁরার চেয়ে বড়-বড় বিজ্ঞানীর টাকার বিনিময়ে এটম বোমাও তৈয়ার করতেছেন।

প্রিন্সিপাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন: মেডিসিনের সাথে এটম বোমার তুলনা চলে না।

-চলে স্যার। এটমও মানুষের কল্যাণের জন্যই আবিষ্কৃত হৈছিল।

-আমিও তাই কই। ভাল জিনিস দুষ্ট লোকে খারাপ কাজে লাগায় বৈলাই ভাল জিনিস খারাপ হইয়া যায় না। গুটি কতক লোক খারাপ কাজ করে বৈলা তেমনি মেডিক্যাল প্রফেশনও খারাপ হইয়া যায় নাই।

-গুটি কতক লোক কইতেছেন কারে স্যার? সবাই ত চোখ বুইজা এন্টিবায়টিক প্রয়োগ করতেন। এন্টিবায়টিকে যা, ইনজেকশান ইনোকিউলেশানেও তাই। কল্যাণের নামে অকল্যাণই করা হৈতেছে। তারপর মেডিসিনে যা প্যাথলজিতেও তাই। ব্লাড স্ট্রুল ইউরিন ডাক্তাররা নিজেরা একযামিন করেন না। সে অবসরই তাঁর নাই। কম্পাউণ্ডার ট্রেইনি এমন কি বয়-বেয়ারা দিয়া পরীক্ষা করান। রিপোর্টও তারাই ফিল আপ করে। প্যাথলজিস্টরা শুধু সই করেন মাত্র।

প্রিন্সিপাল সাহেব উষ্ম হইয়া বলিলেন: আপনি একজন দায়িত্বশীল ডাক্তার। রাস্তার লোকের এসব উড়া কথা আপনার মুখে সাজে না।

-বিশ্বাস করলেন না স্যার? আপনি যে-কোনও একটা লোকের ব্লাড স্ট্রুল ইউরিন ভিন্ন-ভিন্ন প্যাথলজিস্টের কাছে পাঠান। আপনার লোক হিসাবে নয় স্যার, বোইরের লোক হিসাবে। দেখবেন, কোনও রিপোর্টের সাথে কোনওটার মিল নাই। এসবই আমার নিজের দেখা এমন কেন হয় স্যার? একমাত্র উত্তর: ব্যর্থতায়, তেজারতি, অর্থোপার্জন। ফলে আজ অবস্থা কি দাঁড়াইছে স্যার? বেআদবি মফি করিবেন স্যার। সেদিন মফস্বল থানে আমার এক আত্মীয় ডাক্তার আসলেন আমার বাসায়। অনেক দিন দেশের খোঁজ-খবর লই নাই। তাই বন্ধুরে জিগাইলাম: দেশের হাল-অবস্থা কি? বন্ধু উত্তরে বলল: বড় খারাপ, রোগী-পত্র মোটে নাই। বিশ্বাস করেন স্যার, আমি চমকিয়া উঠলাম। সত্যই ত মানুষের রোগ ব্যামোর উপরই ডাক্তাররার জীবিকা। এর আগে এক উকিল-বন্ধুর মুখে অবিকল এই কথাই শুনছিলাম: তারারও জীবিকা মানুষের হিংসা-বৃদ্ধি ঝগড়া-বিবাদ। অথচ দুইটাই নোবেল প্রফেশন স্যার।

-বড় শক্ত কথা কৈলেন ডা. হামিদ।

-যথেষ্ট শক্ত নয় স্যার। মানব-সেবার কথা বলেন স্যার? সে মানব কারা? বড়-বড় ডাক্তাররা ত গরিবের চিকিৎসা করেন না। তারার সে অবসরই নাই। গরিবরা তাঁরার ভিজিটও দিতে পারে না। বড়লোক রোগী নিয়াই তাঁরা ব্যস্ত। জনসাধারণের তুলনায় এই বড়লোক রোগী আর কয় জন? কাজেই বড় ডাক্তাররা কোনও কাজে লাগে না দেশবাসীর। অথচ মজা এই যে বড় ডাক্তার তৈরির জন্য সরকার বিপুল অর্থব্যয় করেন। আর গোড়াতে সব ডাক্তারই গরিবের চিকিৎসা করতে-করতেই তাঁরা বড় ডাক্তার হন। বড় ডাক্তার হইয়া তাঁরা বড়লোকের কল পান। তখন কিন্তু তাঁরা গরিবরারে দেখার সময় পান না। তবেই দেখেন স্যার, এ ব্যবসাই পচনশীল, গোটা প্রফেশনটাই সেল্ফ-কোরাপটিং।

একটু থামিয়া মৃদু হাসিয়া হামিদ আবার বলে: বেআদবি নিবেন না স্যার। পাড়া-গাঁয়ে একটা কথা আছে: শত রোগী মাইরা বৈদ্য হয়, আর হাজার রোগী মাইরা হয় বৈদ্যরাজ। কথাটা কিন্তু সত্য। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস। এত-এত গরিব রোগী মৈরা

যে-বড় ডাক্তার তৈরি করল, তার চিকিৎসা খনে বঞ্চিত হয় গরিবরাই সবার আগে। তারপর ধরেন স্যার বড় ডাক্তার তৈয়ার করার কাজে সরকারী খরচের কথাটা। সরকার যে বিপুল টাকা খরচ কৈরা উচ্চ শিক্ষার জন্য আমরা বিদেশে পাঠান, তার সব টাকাই ত গরিব জনসাধারণের। অথচ আমরা বিদেশ খনে বড়-বড় ডিগ্রি লৈয়া দেশে ফিইরাই এমন মোটা ফিস্ হাকি যে তা গরিবের নাগালের বাইরে।

আড়চক্ষে প্রিন্সিপাল-সুপারের মুখ-ভাব লক্ষ্য করিয়া হামিদ আবার বলে: আমার কি মনে হয় জানেন স্যার? কমসংখ্যক বড় ডাক্তার না বানাইয়া বেশিসংখ্যক ছোট-ডাক্তার বানানোই আমাদের উচিত। মেডিক্যাল স্কুলের বদলে সব মেডিক্যাল কলেজ করার আন্দোলন এই জন্যই আমি তখনও সমর্থন করি নাই। এখনও বর্তমান ব্যবস্থা আমি সমর্থন করি না।

এতক্ষণে প্রিন্সিপাল কথা বলিলেন। হামিদের কথার জবাবে মাথা নাড়িয়া তিনি প্রতিবাদ করিলেন: ওটা আপনার ভুল ধারণা। মানুষমারা হাজার হাতুড়িয়ার চেয়ে জ্ঞানী ডাক্তার দশটা অনেক ভাল।

হামিদ বিন্দুমাত্র না দমিয়া বলিল: কিসের জ্ঞান? কার দরকারে জ্ঞান? সে জ্ঞানের প্রয়োগ কোথায়? কত জনের উপকারে লাগে সে জ্ঞান? এই ধরেন স্যার, একটা হার্ট-ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের এক্সপার্ট তৈয়ার করতে কত গবেষণার, কত লেবরেটরীর, কত অর্থব্যয়ের দরকার হয়। কিন্তু কয়জনের কাজে লাগে সে গবেষণার ফলাফল? আরও দেখেন স্যার, এই এটম-হাইড্রোজেন বোমা খনে স্পেস গ্রহ-উপগ্রহে যাওয়ার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন সরকার যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছে এই টাকার দ্বারা কি দুনিয়ার দুঃখ-দারিদ্র্য-অশিক্ষা দূর করা যাইত না? দুনিয়ার মানুষের দুঃখ-অশিক্ষা দূর করবার আগেই যার তারার টাকা-পয়সা নিয়া শূন্য যাত্রার বিলাসিতা করিতেছে, তারা নিশ্চয়ই জনগণের হিতৈষী নয়।

প্রিন্সিপাল-সুপার সাহেব এতক্ষণ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া হামিদের কথা শুনিতেন। এবার তিনি বুক টান করিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন: দেখেন ডা. হামিদ, এতক্ষণ আমি ধৈর্যের সাথে আপনার কথা শুনলাম। এইবার আপনি তেমনি ধৈর্যের সাথে আমার কথা শুনবেন। আশা করি মনে কিছু নিবেন না।

-বলেন স্যার। হামিদের গলা শুকনা।

প্রিন্সিপাল-সুপার হাতে কলমটা রুটিং প্যাডের উপর রাখিয়া দুই হাতের দশ আংগুলের মাথা একত্রে টুকা দিতে দিতে বলিলেন: আপনার এইসব কথা শুনবার পর আমি সততার সংগে আপনাকে এই চাকরিতে রাখতে পারি না। আপনাকে সততার সংগে এ চাকরি আর করতে পারেন না। এ অবস্থায় আপনি বুঝতেই পারেন, আমার রিপোর্ট আপনার বিরুদ্ধে যাব। আরও স্পষ্ট কথায় বলা উচিত, আমি আপনার ডিসমিস্যালের সুপারিশ করব। আপনাকে আশা করি বিশ্বাস করবেন, এতে আমার মতো দুঃখ আর কেউ পাব না।

আপনাকে যা উচিত মনে করেন, তাই করবেন। হামিদের সুরে চেষ্টা-করা দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল।

প্রিন্সিপাল-সুপারকে একটু বিচলিত দেখা গেল। তিনি বলিলেন: আমাদের ভুল বুঝবেন না ডা. হামিদ। আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জও দিতেছি না; ছোটও করতেছি না।

কর্তৃপক্ষ আমার সুপারিশ গ্রহণ করবেনই, এমন কথা আমি বলতে পারি না। পীর সাহেব-কেবলার এন্তেকালের পরেও তাঁর নামের মর্যাদা এখনও কর্তৃপক্ষের অনেকের কাছেই আছে। আপনে তা জানেন আমি নিজে আজও তাঁকেই আমার পীর মনে করি। কিন্তু কি করি বলেন? কর্তব্যের খাতিরে অনেক অপ্রিয় কাজও আমার করতে হয়। উপরে তদবির কৈরা ব্যাপারটা শেষ করাইতে পারলে আমি তাতে বরং সুখীই হৈতাম। কিন্তু আপনে ত তা পারেন না। আপনার মধ্যে যে আগুন আছে।

-আপনে নিশ্চিত থাকতে পারেন স্যার। তদবির করতে আমি যামু না আমার মরহুম ওয়ালেদ সাহেবের দোহাই দিয়া নিজের ব্যক্তিগত কোনও সুবিধা আদায় করার ইচ্ছা আমার নাই। আর আমার মধ্যে আগুন আছে বৈলা আপনে যে মন্তব্য করলেন, সেটাকে যদি অহংকার মনে কৈরা কৈয়া থাকেন, তবে দোয়া করবেন অহংকার যেন কোনওদিন আমারে বিপথগামী করতে না পারে।

এতক্ষণে প্রিন্সিপাল-সুপারের মুখে হাসি ও সুরে ধীরতা ফিরিয়া আসিল। তিনি দরদ-মাখা হাসি মুখে ব্যস্ততার সংগে বলিলেন: না, না, আমি অহংকার মিন করি নাই। আপনার উপর সে বিশ্বাস আমার আছে। আপনে আমারে ভুল বুঝবেন না আপনে যখন সরলভাবে মনের কথা আমারে বললেন, তখন আমার মনের কথাটাও সরলভাবেই আপনে কই। আমার ইচ্ছা, আপনে এ চাকরিতে ইস্তাফা দেন। আপনার প্রতিভার মহত্তর সদ্যবহার করেন।

হামিদের মুখের চিন্তার কালিমা কাটিয়া গেল। সে হাসিয়াই বলিল: সিরাজগঞ্জের প্রিন্সিপাল সাহেবও আমারে একদিন এই অঙ্গনের কথা কইছিলেন। কিন্তু সে নারে যাতে আমি পুইড়া না যাই সে বিষয়েও চিন্তা করছিলেন। তিনি বলছিলেন সে নার যেন মিনার হয়।

প্রিন্সিপাল: আমি তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত।

হামিদ: আমিও ইস্তাফার কথাই ভাবতেছিলাম। কিন্তু স্যার, শর্তানুসারে আমি ত তিন বছরের আগে ইস্তাফা দিতে পারি না। দিলে যে স্কলারশিপের সব টাকা আমাকে ফেরত দিতে হবে।

প্রিন্সিপাল-সুপার পরম আত্ম-বিশ্বাসের সুরে বলিলেন: সেটা আপনে আমার উপর ছাইড়া দেন। আমিই সেটা ম্যানেজ করব।

-বেআদবি নিবেন না স্যার, আমি কি সেটা জানতে পারি?

-কেন পারবেন না? গেয়েটে বার হবে যে পদত্যাগ করছেন। সরকার আপনার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করছেন। রেকর্ডে থাকবে অবশ্য সহকর্মীদের অভিযোগের তদন্ত অথবা পদত্যাগ পথটাই বাইছা নিছেন।

একটু হাসিয়া বলিলেন: কেমন, এতে আপনি স্যাটিস্ফাইড?

-সম্পূর্ণ স্যাটিস্ফাইড। আপনে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার।

যথাসময়ে তাই হইল। ছাত্ররা আন্দোলন করিল। রোগীরা হৈচৈ করিল। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা খুব দৌড়াদৌড়ি করিলেন। কিন্তু নতুন কোনও কথা কেউ জানিতে পারিল না।

নারায়ণগঞ্জ শহরের চেম্বার রোডে একটি মাঝারি সাইয়ের ডাক্তারখানা। সাইনবোর্ডে লেখা আছে: 'ডা. হামিদুস স্কিনিক।' এটি আমাদের নায়ক ফতেপুরের পীরজাদা ডা. সৈয়দ আবদুল হামিদের ডিস্পেনসারি।

মেডিক্যাল কলেজের সাবেক প্রফেসর বিলাতের দুই-দুইটা ডিগ্রিধারী ডা. হামিদ ঢাকা ছাড়িয়া নিতান্ত হঠাৎ নারায়ণগঞ্জে ডাক্তারখানা খুলে নাই। অবস্থা-গতিকে চিন্তা-ভাবনা করিয়াই তা করিয়াছে। চাকরিতে ইস্তাফা দিয়া প্রথমে সে নবাবপুরে ডিস্পেনসারি খুলে। কিন্তু বেশি দিন সেখানে টিকিতে পারে না। কারণ চাকুরিতে থাকিতে স্বাধীনভাবে যা করিতে পারে নাই, এখন তাই সে শুরু করে। পেটেন্ট ঔষধের চেয়ে সে মিক্চারের ব্যবহার ত বেশি করেই, অধিকন্তু পেটেন্টের বিরুদ্ধে প্রচারও চালায় দ্বিগুণ জোরে। কাজেই ঔষধ-ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি, তাদের ডিলার ও ডাক্তাররাও লাগেন হামিদের পিছনে সমবেত ভাবে। 'আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা' এই নীতিবাক্য অনুসারে তাঁরা হামিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। হামিদের মতবাদ ভ্রান্ত, অবৈজ্ঞানিক ও রিয়েকশনারি। তার মাথা বিকৃত। সে আসলে সরকারী চাকরিতে ইস্তাফা দেয় নাই; মস্তিষ্ক-বিকৃতির দরুন সরকারই তাকে ডিসমিস করিয়াছেন; তার হাতে কোন রোগীর জীবনই নিরাপদ নয়। এমনি ধরনের বহু অধীনতা ও মিথ্যা বুকলেট-লিফলেট আকারে এত প্রচারিত হয় যে, হয় কোর্টে গিয়া মানহানির মামলা করা অথবা নীরবে ও-সব অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। অবস্থাগতিকে হামিদ দ্বিতীয় পন্থাই বাছিয়া লয়। একাধিক কারণে এই পন্থাই হামিদের জন্য ভাল হয়।

সরকারী চাকরিতে ইস্তাফা দেওয়ার নজির তখন দেশে খুব বেশি নাই। তার উপর হামিদের মতো বিলাত-ফেরত ডাক্তারের পদত্যাগের 'ভিতরের কথা' লইয়া খবরের কাগজে কল্লনা-জল্লনা ও ছাত্রদের বিক্ষোভ হামিদের জনপ্রিয়তা বাড়াইয়া দিয়াছিল। তা ছাড়া আমাদের দেশের জনগণের একটা বিশেষ গুণ এই যে বড়লোকেরা যার যত বেশি নিন্দা করে, পণ্ডিতেরা যাকে যত বেশি পাগল কয়, গরিবেরা তার মধ্যে তত বেশি গুণ দেখিতে পায়। বিশেষতঃ হামিদ নিজের যে পরিচয়টা সহজে গোপন রাখিয়াছিল, এই বিরুদ্ধ প্রচার-প্রপাগান্ডায় তা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ডা. হামিদ যে বিখ্যাত ফতেপুর শরিফের পীরসাহেব-কেবলার একমাত্র সাহেবজাদা, একথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া যায়। এতে হামিদের অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই হয় বেশি।

কিন্তু এই বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে হামিদের একটা দিক পরিষ্কার হইয়া গেল। এতে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মিত্র ও হিতৈষীর সংখ্যাও কম বাড়িল না। অচেনা অনাস্থীয় এমন কিছু সমর্থক হঠাৎ হামিদের জুটিয়া গেল, যারা হামিদের পক্ষ হইয়া শুধু তর্ক-বিতর্ক করে না। হামিদের জন্য তারা জান দিতেও প্রস্তুত। এরাই হামিদকে 'গরিবের ডাক্তার' 'ছদ্মবেশি দরবেশ' ইত্যাদি টাইটলে ভূষিত করিল। এদেরই জনকয়েকের পরামর্শে এবং শেষ পর্যন্ত চাপাচাপিতে সে ঢাকা ছাড়িয়া দীনমজুর ও মিলশ্রমিকদের উপকারের জন্য টংগি, ডেমরা বা নারায়ণগঞ্জে ডিস্পেনসারি সরাইতে রাজি হয়।

ডিস্পেন্সারি ও বাসাবাড়ির নৈকট্যের সুবিধার খাতিরে ভক্তদের সবাই মিলিয়া নারায়ণগঞ্জের এই সুবিধাজনক ঘোপের জায়গায় আনিয়া ডা. হামিদকে বসাইয়াছে। একজন বিলাত-ফেরত ডাক্তারের অভাব নারায়ণগঞ্জের বড়লোকেরাও বেশ কিছুদিন ধরিয়া অনুভব করিতেছিলেন। নারায়ণগঞ্জের বড়লোকদের অনেকেই ঔষধ-ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি সমূহের প্রভাবমুক্ত থাকায় ডা. হামিদের মতো একজন এম. আর. সি. পি. এফ. আর. সি. এসের নারায়ণগঞ্জে প্র্যাক্টিস শুরু করায় খুব খুশী হন এবং কল-টল দিতে শুরু করেন। কিন্তু অল্পদিনেই তাঁরা বুঝিতে পারেন যে হামিদের মাথায় সত্যিই ছিট আছে। নইলে তাঁদের কল ফেলিয়া গরিবরোগী লইয়া সে এত ব্যস্ত কেন?

পক্ষান্তরে হামিদ অল্পদিনেই আনন্দের সাথে এই অভিজ্ঞতা লাভ করে যে গরিব লোকেরা ধনী লোকের মতো ছোট লোক নয়। অবস্থা এদের ভাল নয় বলিয়াই যেন মনের দিক দিয়া আল্লা এদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়াছেন। স্টেশনের কুলি, মিল-কারখানার শ্রমিক, পাড়া-গাঁয়ের চাষী-মজুর যারা রোগী রূপে হামিদের কাছে আসে, তারা দারিদ্র্যের অজুহাতে হামিদকে কোনও ভিজিট না দিয়াই এমন কি অনেকে ঔষধের দাম না দিয়াও চিকিৎসা করাইতে পারিত। 'গরিবের ডাক্তার' এই সুনাম রক্ষার জন্য এমন কি নিজের মনের তৃষ্ণার জন্যও সে বিনা পয়সায় ওদের চিকিৎসা করিত্তে ও ঔষধ দিতে রাজি আছে। সে কথা এরা সবাই জানে। হামিদ বা তার সহকারীরা ঔষধের কাছে কোনও ভিজিট দাবিও করে না। কিন্তু হামিদ দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছে, এই গরিবের দল বিনা-পয়সায় তাকে দিয়া চিকিৎসা করায় না। বেশি টাকা তারা দেয় না। কিন্তু ফাঁকিও দেয় না। সকলেই দুই-এক টাকা করিয়া হামিদের টেবিলের উপর রাখিয়া যায়। এটা যেন পীরের নজর। বাঁধা ধরা কোনও পরিমাণ নাই। যার যেমন সাধ্য দিতে তারা বাধ্য, এটা যেন রোগীরা নিজেরাই ঠিক করিয়াছে। হামিদের মতামত জিগ্গাস করা যেন তারা আবশ্যক মনে করে নাই। সাবের মতো বড় ডাক্তারের, হুয়ের মতো বড় পীরজাদার ও দরবেশের উপযুক্ত ফিস ভিজিট বা দাম দিবার সাধ্য তাদের নাই। তারা শুধু অন্তরের ভক্তির নমুনা স্বরূপ সামান্য নজর দিয়া যাইতেছে। সাবের মতো বড় ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করিয়া যে উপকার করিলেন পিঠের চামড়া দিয়া জুতা বানাইয়া দিলেও তার ঋণ শোধ হইবে না। গরিব রোগীদের মনোভাব এই।

আর বড়লোকেরা? তারা কল দিয়া নতুন ডাক্তারদের প্রেটেনাইয করেন। রোগীদের ডাক্তারদের কাছে নয়, ডাক্তারদেরই রোগীদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আর ফিস ভিজিট ঔষধের দাম বড়লোকের সব তলব-তাগাদা বিলে ও পেমেন্ট সব চেকে। বছরের শেষে এক সংগে পাইবেন। অত তাগাদা করেন কেন?

ফলে বিলাত-ফেরত ডাক্তার হামিদ ও নারায়ণগঞ্জের গরিব রোগীদের মধ্যে উভয় পক্ষের অজ্ঞাতেই যেন একট ব্যবসা-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। বিলাত-ফেরত ডবল এম. আর. সি. পি. ডাক্তারকে দুই টাকা এক টাকা ভিজিট দিতে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানী লোকের হাত কাঁপিয়া উঠিত বুক না কাঁপিলেও। কিন্তু ডা. হামিদ এম. আর. সি. পি. ও এফ. আর. সি. এসকে তা দিতে তাদের হাতও কাঁপে না, বুকও কাঁপে না। এটা যে দেনাপাওনা সে বোধই যেন তাদের নাই। পক্ষান্তরে অন্য কোনও বিলাতফেরত ডাক্তার বিনা-পয়সায় চিকিৎসা করিতে পারিত, কিন্তু দুই টাকা এক টাকা ভিজিট কেউ

দিতে চাইলে অপমানে-লজ্জায়-ক্রোধে তার কানের গোড়াতক লাল হইয়া যাইত। কিন্তু হামিদের জন্য এটা কোনও লজ্জার বিষয় ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা তার মনের দিক দিয়া তুষ্ণিকর ও আনন্দ-দায়ক এবং অর্থনীতির দিক দিয়া লাভজনক প্রমাণিত হইল। সে হিসাব করিয়া দেখে দুইজন সহকারী লইয়া ক্লিনিকে বসিয়া দৈনিক গড়ে ষাট-সত্তর জন রোগী দেখিতে পারে। তারা গড়ে প্রতিদিন এক শ টাকা দেয়। মাসে তিন হাজার। বাইরের কলে সে যায় না। সেজন্য বড় লোক রোগীরা আস্তে-আস্তে তাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাতে হামিদের ভূক্ষেপ নাই। এক দিকে এত লোকের চিকিৎসা। অপরদিকে মাসে তিন হাজার টাকা আয়। দুইজন নয়া এম্. বি.বি. এসকে মাসে পাঁচ শ করিয়া এক হাজার টাকা বেতন দেয়। কাজেই রোগীর কাছে তারা ফ্রি। দুইজন কম্পাউণ্ডার প্রত্যেকে আড়াই শ করিয়া পায় পাঁচশ। বাড়ি ভাড়া সহ হামিদ বাসায় মাসে হাজার টাকার বেশি কিছুতেই খরচ করিতে পারে না। বিলাত হইতে আসিবার সময় একটি মরিস মাইনর নিয়া আসিয়াছিল। সেটি আজও গ্যালনে পঁয়ত্রিশ মাইল চলে। সব খরচ খরচা বাদ দিয়া আরামে থাকিয়া-খাইয়া হামিদের মাসে পাঁচ শ সেভিং হয়। এটা শুধু তার চিকিৎসা-ব্যবসায়ের আয়। বাড়ির সম্পত্তির সাথে এর কোনও সম্পর্ক নাই। তাই হামিদ চিন্তা করিয়া পায় না, এ দেশে ডাক্তারদের এত বদনাম কেন? কেন তাঁরা বত্রিশ-চৌষট্টি টাকা ভিজিট হাকিয়া বসেন? কেন তাঁরা ডেলিভারি-অপারেশনে অমন গলা-কাটা ফিস্ দাবি করেন? তলাহীন ক্ষুধার পেট না হইলে অত টাকা হাকিয়া কেউ করিতে পারে না। তবে হামিদের সহব্যবসায়ী ডাক্তাররা অত টাকা দিয়া করেন কি? ধানমণ্ডী-গোলশানে বাড়ির পর বাড়ি করাই কি তাঁদের এই মহৎ জীবনের উদ্দেশ্য?

মানুষের উচ্চাকাংখার পনর আনা টাকার পিছনে ধাওয়া করা। এই ধাওয়া বন্ধ হইলেই মানুষের মন দম নিবার একটু ফুরসৎ পায়। হামিদের আজ যেন তাই হইল। পাঁচ বছর পরে নারায়ণগঞ্জের চেম্বার রোডের ক্লিনিকে বসিয়া অত-অত রোগী দেখার ফাঁকে-ফাঁকেও যেন শান্ত মনে চিন্তা করিবার অবসর পায় সে। আজ তার মনে হয়, গত পাঁচটা বছর তার মন ও মস্তক একটা দৌড়ের উপর ছিল। ডান-বাঁয়ে না চাহিয়া সে যেন কেবল সামনের দিকে ছুটিয়াছে। দৃষ্টি ছিল তার উচ্চাকাংখার একটা পাহাড়-চূড়ার দিকে। প্রশংসার সহিত পাশ করার জন্য অথও মনোযোগে বই-এ ডুব দেওয়া, পাশ করার সংগে-সংগে বিলাত যাওয়া, সেখানে একটার পর আরেকটা ডিগ্রি লওয়া, বিলাতী ম্যাগাজিনে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য বড়-বড় লাইব্রেরিতে বন্দী হইয়া থাকা, ফলে প্রফেসারদের অজস্র প্রশংসা লাভ, বিলাতের বিচিত্র অভিনব ও অদ্ভুত জীবন, সবগুলি মিলিয়া তাকে যেন একটা ঘোর নেশায় পাইয়া বসিয়াছিল। সে নেশা কাটে মাত্র তখন যখন প্রশংসা সুনাম সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা লইয়া দেশে ফিরে। দেশে ফিরিয়া চাকরি লইয়া ভাবিয়াছিল, এবার সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবে। কিন্তু তা হয় নাই। ডাক্তারিতে ছাত্রজীবনের ও বিলাতের যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার যিদে সে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম শুরু করে। সর্বস্তরের অব্যবস্থা দূর করার চেষ্টা করে। তার সংস্কারী মন সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তার বাসনাকে দুর্নিবার করিয়া তুলে। বহুদিন-প্রচলিত সুপ্রতিষ্ঠিত দুর্নীতির দ্বারা উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক সহকর্মীদের হয় আচ্ছন্ন নয় উদাসীন দেখিয়া তার মন চিৎকার করিয়া উঠে। হামিদ প্রতিকারের চেষ্টা

করে। যেন ভিন্নরঙের চাকে ঘা। ঝংকার নয় হংকার। সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত অভিমুখ্য। অন্য বিষয়ে চিন্তা করিবে কি? অন্য কোন দিকে চোখ ফিরাইতেই পারে নাই।

কিন্তু আজ? আজ যেন হামিদের একটা স্বপ্ন-ভংগ হইল। স্বপ্নটা সুখ-স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন, সে হঠাৎ ঠিক করিতে পারিল না। কিন্তু তার জীবনের পাঁচ-পাঁচটা বছর ঘিরিয়া আছে এই স্বপ্নে। এই মুদুণ্টা তার পূর্ব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন। আজ যেন পাঁচ বছর পরে নিজের পূর্ব জীবনের গতিধারায় ফিরিয়া আসিল। পাঁচ বছরের আগের সব কথা, সব পরিবেশ, সব বন্ধু-বান্ধবী তার চোখের সামনে সজীব হইয়া দাঁড়াইল। কেউ কেউ তার দিকে চাহিল। কেউ কথা বলিল। এর মধ্যে রাখিয়া জাহানারা ও ললিতা এবং রশিদভাই প্রধান। রশিদভাই-ললিতা যেন কথা বলিয়া বা এক নজর দেখিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু রাখিয়া ও জাহানারা চলিয়া গেল না। হামিদের স্মৃতি-পটে আটকা পড়িয়া গেল।

হামিদ বাসাটি পাইয়াছে বড় ভাল। এটাও তার হিতৈষী ভক্তদের দৌলতে হইয়াছে। পাঁচ কামরার একটা সুন্দর মডার্ন প্যাটার্নের বাড়ি। ভিতরে-বাহিরে কুশাদা-বারান্দা। বেডরুমগুলির সবেই এটাচ্ছ বাথরুম। ড্রয়িং রুমটি বেশ বড়। এরই এক পাশে পর্দা ঝুলাইয়া ডাইনিং করা হইয়াছে। বাড়ির সামনে বেশ বড় একটা গাড়িবারান্দা। তার সামনে মাঝারি সাইজের একটি বাগান। আগে হইতেই ছিল। হামিদ এটাকে তাজা রাখিয়াছে।

হামিদের মতো একলা মানুষের জন্য এই বাড়িই অনেক বড়। এত বড় বাড়ি নিবার ইচ্ছা হামিদের ছিল না। কিন্তু এর চেয়ে ছোট আলাদা বাড়ি পাওয়া যায় না। ভক্তেরা বিলাত-ফেরত পীরজাদা অতবড় ডাক্তারকে ফ্ল্যাট-ফুটের বাড়িতে থাকিতে দিতেও নারাজ। এইসব কথা-বার্তা যখন চলিতেছিল তখন হামিদের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল। বাসাটি একজন বৃদ্ধা বুরঞ্জি না হইলে চলে না; কথাটা এতদিনে তার মনে খুব বড় হইয়া দেখা দিল। বড় আম্মাকে রাজি করিতে পারিলে তাঁকে আনার চেষ্টাই আগে করিবে। কাজেই হামিদ তেমন করিয়াই বাড়ি সাজাইয়াছে।

আজকাল হামিদ বেশ কিছুক্ষণ বাসায় কাটায়ও। চিন্তারও সময় পায়। বিশেষতঃ রাতের বেলা। গত পাঁচ বছরের স্মৃতিগুলি কখনও বিচ্ছিন্নভাবে, কখনও ঝাঁক বাঁধিয়া বায়স্কোপের ছবির মতোই তার মনের আকাশে ভাসিতে থাকে। রাখিয়ার কথাটাই সবার আগে মনে পড়ে। কারণ ইদানিং তার মুখের ছবিটাই প্রায় সর্বক্ষণ হামিদের চোখের পথ আগলাইয়া থাকে।

এই কয় বছরে হামিদ রাখিয়াকে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। সে কথা ভাবিয়া হামিদও আশ্চর্য হয়। মানুষের মন কত বেওফা, কত চঞ্চল, নির্ভরের কত অযোগ্য। আর যে যাকেই ভুলুক রাখিয়াকে হামিদ ভুলিল কেমন করিয়া? অথচ সত্য কথা এই যে রাখিয়াকে ভুলিতে হামিদের মোটেই কষ্ট হয় নাই। আশরাফের সাথে রাখিয়ার ঐ ঘটনাটায় সে সত্যই রাখিয়াসহ সমস্ত নারী জাতির উপরই ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। পরের একটা বছর পরীক্ষা ও তার ফলের চিন্তায় এমন ভুবিয়াছিল যে শুধু রাখিয়া কেন পুরুষ হিসাবে নারীর অস্তিত্বের কথাই তার মনে পড়ে নাই। তারপর বিলাত গিয়া তার মনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কত নতুন জ্ঞান, নয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। কত নর-

নারী বন্ধু জুটিয়াছে। কত নারীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে। নারী পুরুষের অত ঘনিষ্ঠতা আগে সে চিন্তাও করিতে পারে নাই। স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকারূপে ছাড়া দুইটি যুবক-যুবতী ঘনিষ্ঠ হইতে পারে, হামিদের তা ছিল কল্পনার বাইরে। বিলাতের অভিজ্ঞতায় হামিদের মনে হইয়াছে নর-নারীর সম্পর্কটাকে ওরা অত সিরিয়াসলি নেয় না। তিন বছর বিলাত থাকিয়া হামিদের নিজের মধ্যেও ক্রমে অমন মনোভাবের উন্মেষ ও প্রতিফলন হইয়াছে। সে নিজের অজ্ঞাতেই যেন নর-নারীর যৌন-সম্পর্কটাকে সাধারণ বন্ধুত্বের মতোই অগভীরভাবে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। সে ক্রমে ও ধীরে অনেক বান্ধবীর সাথে যৌনভাবে মিলিত হইয়াছে। তাতে প্রচুর পুলকানন্দও সে পাইয়াছে। নুতন অভিজ্ঞতা বলিয়া ওটাকে সাময়িকভাবে প্রেমের ক্রিয়া বলিয়াও মনে হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য! ঘটনার পরের সকালেই সব ভুলিয়া গিয়াছে। কোনও নারীর রূপ বা রতিরংগ হামিদের মনে দাগ কাটিতে পারে নাই। এক কথায় হামিদ কোনও নারীর প্রেমে পড়ে নাই। দেশে থাকিতে, মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে, নর-নারীর সম্পর্ককে হামিদ যতটা জটিল ও সমস্যা-সংকুল মনে করিত, বিলাতে তাঁর কিছুই পাইল না। কি সহজ সরল ও অকৃত্রিম সমাধান এরা করিয়াছে জীবনের। বিলাতের কত হোটেলে রাত কাটাইয়াছে, কত রেস্টরাঁয় খানা খাইয়াছে, কত নয়া-নয়া গাড়িতে চড়িয়াছে, কত সুন্দর শহর-বন্দরে বেড়াইয়াছে, কত ছাঁটের কত প্যাটার্নের পোশাক পরিয়াছে। তার একটাও যেমন তার মন বাঁধিতে পারে নাই, নারী সম্বন্ধেও হামিদের ঠিক ভাব হইয়াছে। রাত্রিবাসের হোটেলের মনোভাৱা সুসজ্জিত কামরা, আগের দিনের সুস্বাদু খানার টেবিল যেমন আলগোছে সে ভুলিয়া গিয়াছে। কি সহজ, কি কাণ্ডকারখানা, কি বাস্তববাদী দৃষ্টি-ভঙ্গি! কোনও জটিলতা নাই, কাজেই কোনও সমস্যাও নাই। কোনও কর্তব্য-চ্যুতি নাই, কাজেই কোনও সংকটও নাই। জীবন-পথের কি সরল সহজ গতি! জীবনকে ভোগ করার কি সহজ পন্থা! তাই এদের সকলের জীবনই এই সরল সহজ অগ্রগতি। তাই সারা দুনিয়ায় চলে এদের বাদশাহি। এদের জীবনের এই স্বচ্ছতায় হামিদ নিজের জীবনকে করে প্রভাবিত। সে প্রভাবের জের চলে দেশে ফিরারও এক বছর পর পর্যন্ত। চাকরিতে থাকিলে কিম্বা সহকর্মীদের সাথে বিরোধ জীবন্ত থাকিলে হয়ত চলিত আরও কিছুদিন।

কিন্তু হামিদ আজ মুক্ত। নিজের এলাকায় সে আজ বিজয়ী। কাজেই হামিদের মনও আজ মুক্ত পাখির মতোই চিন্তার আসমানে পাখা মেলিয়া উড়িতে শুরু করিয়াছে। তাতে করিয়া সে বহিয়া আনিতেছে রাযিয়ার চিন্তা। সংগে আসে জাহানারা। উঁকি মারিয়া দেখে রশিদ। দুহাতে ঠেলিয়াও দূর করা যায় না। বরঞ্চ এতদিনের জমা-করা বিপুলতা লইয়াই তারা হামিদের মনের দরজা-জানালায় আঘাত করে। তার সুখ-শান্তি তছনছ করিয়া ফেলে।

না, রাযিয়ার খোঁজ করিতেই হইবে। জাহানারাকে পাইলেও রাযুর খোঁজ পাওয়া যাইবে। কাজেই জাহানারার খোঁজও করিতে লাগিল হামিদ।

এই এক বছরের মধ্যে একবার মাত্র ঘটনাচক্রে জাহানারার সাথে দেখা। মেডিক্যাল কনফারেন্সে মেডিক্যাল এথিক্সের উপর হামিদের একটা প্রবন্ধ পড়িবার দিন। খবরের কাগজে আগেই খবরটা বাহির হইয়াছিল। জাহানারা কনফারেন্সের ডেলিগেটের ব্যাজ লাগাইয়া হামিদের সাথে দেখা করিতে আসে। হামিদ হাসি-মুখে

কথা-বার্তাও কয়। কিন্তু অতদিন পরের দেখা হিসাবে সেটা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। প্রবন্ধ পড়ার পূর্ব মুহূর্তে যখন এই সাক্ষাৎটা হয় তখন হামিদ মনের দিক দিয়া ছিল এক-রুখা। তাই সে জাহানারার সাথে যেমনটা উচিত ছিল, তেমনভাবে কথা বলিতে পারে নাই। সময়ের অভাব একটা যুক্তিই নয়। সে সচ্ছন্দে বলিতে পারিত: 'জানু, অনেকদিন পরে দেখা। অনেক কথা জমা আছে। এখন আমি ব্যস্ত। আমার পেপার পড়ার পরে অবশ্য আমার সাথে দেখা না কৈরা যাইও না। আল্লার কসম।' কথাটা বলিতে আধা মিনিটও লাগিত না। অথচ হামিদ তাও বলিতে পারে নাই। যুক্তি, সময়ের অভাব। হি! এমন বোকামিও মানুষ করে? নিজের উপর হামিদের রাগ হয়। লোকে যে তারে নির্বোধ কয়, নিতান্ত মিছা কথা নয়। জানু মনে করিয়াছে এটা হামিদের উদাসীন্য। কিন্তু হামিদ ত জানে এটা তার উদাসীনতা মোটেই নয়। আসলে অনেক দিন পরে হঠাৎ জাহানারাকে দেখিয়া হামিদের এমন চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় যে তার মুখে কোনও কথা সরে নাই। ফলে হামিদের ওটা উপেক্ষা ছিল না, ছিল অতি-চৈতন্য। ওটা ভুলিয়া যাওয়ার লক্ষণ নয়, ভালবাসার লক্ষণ। কিন্তু জাহানারা কি তা বুঝিবে? যদি না বুঝিয়া থাকে তবে জাহানারা নিশ্চয়ই রাগ করিয়াছে। তাই বোধ হয় সে আর হামিদকে দেখাও দেয় নাই, খোঁজও করে নাই। এইভাবে নিজের নির্বুদ্ধিতায় হামিদ রাযিয়ার খবর পাইবার একমাত্র সূত্র ছিন্ন করিয়াছে।

হাঁ, রাযিয়াকে তার পাইতেই হইবে। রাযিয়া ছাড়া হামিদের চলিবে না। তার আদর্শের জন্য সংগ্রাম, গরিব-শোষিতের মধ্যে তার এই জনপ্রিয়তা, বিদ্যাত-মার্কিনের মেডিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তার প্রবন্ধগুলির জন্য তার এই বিশ্ব-জোড়া নাম, সবগুলির মধ্যে কোথাও যেন ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে। একমাত্র রাযিয়াই যেন সে ফাঁক পূরণ করিতে পারে। এই অনুভূতিটা জাগিয়াছে তার সম্প্রতি এবং প্রতিদিন তার তীব্রতা বাড়িতেছে। আশরাফের সাথে রাযিয়ার ঘটনাটা আজ যেন কিছু না। ওটা হামিদ মাফ করিয়া দিয়াছে। লগুন-জীবনেই হামিদ এই মানসিক উদারতা লাভ করে। তার তখন মনে হইয়াছে সবাই যখন ওটা করে, সে নিজেও যখন অবশেষে তাই করিল, তবে আর রাযিয়ার দোষ কি? মন না দিয়াও দেহ দেওয়া যায়, এ অভিজ্ঞতা এখন হামিদের নিজেরই হইয়াছে। আগে হামিদ এটা বিশ্বাস করিত না। জাহানারা ঠিকই বলিয়াছিল: পুরুষরা যৌন-অংগকেই প্রেম-ভালবাসার একমাত্র কেন্দ্র মনে করে। হাঁ, হামিদ এখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে। রাযিয়াই আজো তার ভালবাসার একমাত্র পাত্রী। তাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

লাগিলও সে কাজে। মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মেম্বর-তালিকা এবং অবশেষে সরকারী গেজেট ঘাটিল। তাতে জাহানারার নাম পাইল। কিন্তু রাযিয়ার নাম পাইল না। সে চিন্তিত হইল। সে শুনিয়াছে মোটা বেতনের লোভে অনেক ডাক্তার বিদেশে চাকুরি নিয়াছে। তবে কি রাযিয়াও তাই করিয়াছে? তাকে ত দোষ দেওয়া যায় না। বেচারির নিজের বলিতে দেশে ত কেউ ছিল না। নিজের উপর হামিদের রাগ হইল। অনুসন্ধানের তীব্রতা ও ক্ষিপ্ততা বাড়িল। কিন্তু দিশাহারা হইল তারচেয়ে বেশি। রাস্তায়-রাস্তায় ত আর পুছ করিয়া বেড়ান যায় না। সম্ভব হইলে হামিদ তাও করিত। ধরা না দিয়া এদিকে যতটা করা যায় তা করিল। কৌশলে সহকারী ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, রোগী ও বন্ধুদের কাছে খোঁজ-খবর করিতে থাকিল। অবশেষে জাহানারার কাছে পত্র লিখিল।

কিন্তু সাবধানতা হিসাবে তাতে সোজাসুজি রাখিয়ার ঠিকানা চাহিল না। গত সাক্ষাতে ঘটনা-চক্রে সে জাহানারার সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই বলিয়া তারই অনুশোচনা প্রকাশের পন্থা হিসাবেই ঐ পত্রটা লিখিতেছে, পত্রের আসল উদ্দেশ্য তাই বলিয়া উল্লেখ করা হইল। তাতে প্রসংগক্রমে রাখিয়ার কুশল-সংবাদ জানিতে চাওয়া হইয়াছে মাত্র। হামিদ প্রবল আগ্রহে তার জবাবের অপেক্ষা করিতে থাকিল।

৩

হিসাব-মতো সময়ের মধ্যে জাহানারার জবাব আসিল না। হামিদের চিন্তা বাড়িল। দুপ্রাপ্যতাই জিনিসের অভাবের তীব্রতা বাড়ায়। রাখিয়ার সন্ধান যতই দুর্লভ হইতে লাগিল, হামিদের মনে তার তীব্রতা ততই বেশি হইতে লাগিল। অনেক দিনের ভুলিয়া-যাওয়া আবে-হায়াতের কথা তার মনে পড়িল। একদিন হামিদের বিশ্বাস হইয়াছিল, রাখিয়ার প্রেমই তার আবে-হায়াত। রাখিয়ার প্রেম না হইলে সে বাঁচিবে না। আজ তার মনে হইতেছে রাখিয়ার খবরটাই তার জন্য আবে-হায়াত। এত দুঃখেও তার হাসি পাইল। ছেলে বেলায় কল্পিত খেয়ালী এই 'আবে-হায়াতের' কি ধারণাটাই তার মাথায় ঢুকিয়াছিল, সারা জীবনই এটা তাকে তাড়া করিয়া বেড়াইতেছে।

এমনি সময়ে একদিন একটা অভাবনীয় বিশ্বয়কর ঘটনা ঘটিল। মিজের ক্লিনিকে বসিয়া হামিদ রাখিয়ার খবর পাইয়া গেল। একটা বিশাল মার্সেডিস ভেন গাড়ি আসিয়া হামিদের ক্লিনিকের সামনে দাঁড়াইল। একটি উর্দি-পরা আদালি গাড়ি হইতে বাহির হইয়া ক্লিনিকে ঢুকিল। ডা. হামিদ সাহেব আছেন কি না সেলিউট করিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বড়লোকেরা এ ক্লিনিকে আসেন না। সহকারী বিশ্বয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল: হাঁ আছেন।

আদালি আরেকটা সেলিউট করিয়া যেমন আসিয়াছিল, তেমনি বাহির হইয়া গেল। গাড়ির কাছে গিয়া এটেনশন হইয়া বলিল: ডা. সাব আছেন।

দামী কোট-টাই-পরা একটি সুন্দর লম্বা ভদ্রলোক গাড়ি হইতে বাহির হইলেন। লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া ক্লিনিকে ঢুকিলেন। সহকারী ডাক্তারদ্বয় ও কম্পাউণ্ডাররা সকলে দাঁড়াইয়া তাঁকে সালাম করিল। ভদ্রলোক হাসিমুখে সালাম লইয়া বলিলেন: আমি ডা. হামিদের সাথে দেখা করতে চাই। আমি তার ছাত্র-বেলার বন্ধু। আমার নাম

কথা শেষ করিতে পারিলেন না। গলার আওয়াজে তাকে চিনিতে পারিয়া হামিদ ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল। বলিল: রশিদভাই যে। কি আশ্চর্য! কোথা থনে আসলেন?

হামিদ দুই হাত বাড়াইয়া রশিদকে জড়াইয়া ধরিল। উভয় বন্ধুতে কোলাকুলি হইল। গলায় হাত রাখিয়াই হামিদ রশিদকে ঠেলিয়া চেম্বারে নিয়া গেল।

হামিদ: এক কাপ চা ত খাবেনই। আর কি, বলেন?

রশিদ: কিছু দরকার নাই। তবে এক কাপ চা না খাওয়াইয়া ত ছাড়বা না। তাই দেও।

হামিদ চা আর সিংগারার হুকুম দিল। তারপর বলিল: বলেন রশিদ ভাই খবর কি? কোথায় আছেন? কি করেন? কত যে খুশী হইছি আপনেরে দেইখা, তা আর মুখে প্রকাশ করতে পারি না।

রশিদ: হেঁ, আমার খবরটাই দিতে হয়। তোমার খবর ত সবাই জানে। তোমার বিলাত যাওয়া, সেখান থনে বড়-বড় ডিগ্রি নিয়া আসা প্রফেসারি নেওয়া আর ছাড়া, সবই আমি জানি। গর্বের সংগে তোমার সব কার্য-কলাপ লক্ষ্য করছি। কিন্তু দেখা করতে পারি নাই।

হামিদ: কেন পারেন নাই রশিদভাই?

রশিদ: তোমারে নিয়া খবরের কাগজে যখন হৈচৈ হয়, ঠিক সেই সময় আমি লণ্ডন চইলা যাই। ছয়মাস ইংলণ্ড আমেরিকা ও জাপান ঘুরি মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে দেশে ফিইরা আসছি।

বিস্ময়ে হামিদ বলিল: আপনি বিলাত-মার্কিন-জাপান টুওর কৈরা আসলেন? কি খুশির কথা! কিন্তু কেন?

রশিদ: বরাত ভাই বরাত। তোমরা জিনিয়াসরা বিদেশে যাও বিদ্যার জাহাজে চৈড়া; আমরা ডালার্ডরা যাই বরাতের জাহাজে চৈড়া।

এরপর রশিদ গরম সিংগারা চা ও সিগারেট খাইতে খাইতে যা বলিল তার মর্ম এই: কলিকাতা নিউ-মার্কেট ও লিওসে স্ট্রিটে রশিদের দাদার আমল হইতেই দুইটা ঔষধের দোকান ছিল। রশিদের বাবা মারা যাওয়ার পর তাঁর চাচাই ও -সব চালাইতেন। বিলাতের হলবেরি কোম্পানির তিনি ছিলেন সোল এজেন্ট। দেশ ভাগ হওয়ার পর হলবেরি কোম্পানির সাথে যুক্তভাবে খাম্বুরে এক ফার্মাসিউটিক্যাল লেবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন। রশিদের চাচাই এই লেবরেটরির ম্যানেজিং পার্টনার। কিন্তু বছর খানেক আগে তিনি পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হইয়া বিলাতি পার্টনারের সম্মতিক্রমে রশিদ তাঁর স্থলে ম্যানেজিং পার্টনার হইয়াছে। চাচার কোনও সন্তানাদি না থাকায় রশিদ একাই তার চাচারও ওয়ারিশ। এইভাবে ম্যানেজিং পার্টনার হইয়া বিলাতি পার্টনারের সংগে কোম্পানি সংক্রান্ত আলোচনার জন্যই রশিদ বিলাত যায়। ঐ উপলক্ষে মার্কিন ও জাপান যুক্তির সর্বাধুনিক মেডিসিন ম্যানুফেকচারিং দেখার উদ্দেশ্যে কোম্পানির খরচে সে ঐ সব দেশ সফর করিয়া আসিয়াছে। উপসংহারে রশিদ বলিল: তোমারে কেন্দ্র কৈরা যখন ঢাকায় অমন হৈচৈ হয়, তখন আমি তোমার কথা অনেক ভাবছি। চাচাজী ও অন্যান্য ডাইরেটরের সাথে আলোচনাও করছি। চাচাজী সহ সকলে একমত হৈছেন যে তোমারে আমার লেবরেটরির চিফ্ কেমিক্যাল এডভাইজারের পদ অফার করণম। কিন্তু সে প্রস্তাব তোমার কাছে দেওয়ার আগেই লণ্ডন থনে জরুরী তার পাইয়া আমাকে দেশ ছাড়তে হয়। আজ তোমার কাছে আসবার প্রধান উদ্দেশ্য তাই।

রশিদকে হামিদ সত্য-সত্যই বড় ভাইর মতো আপন জন মনে করিত। এতদিন রশিদের খবর-বার্তা লয় নাই বলিয়া কিছুটা লজ্জিত হইলেও রশিদের এই উন্নতি তার মনে যে আনন্দ দিল, তাতে সে লজ্জা চাপা পড়িয়া গেল। আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল: আমার চাকরির কথাটা পরে হৈব। আগে বলেন, আপনি ডাক্তারি ফেইলা অমুখ তৈরির কাজে গেলেন কেন?

রশিদ হাসিয়া বলিল: আমি যেকোন ছাত্র ছিলাম, তাতে আমার ডাক্তার হওয়ার আশাটা তুমিও নিশ্চয়ই কর নাই। কিন্তু তুমি জাইনা খুশী হৈবা যে চাচাজী আমারে ডাক্তারি লাইনে দিছিলেন অশুধের কারবারটা ভালরূপ চালাবার উদ্দেশ্যেই। পাশ করলেও তার উদ্দেশ্য যেমন সফল হৈত, পাশ না করাতেও তাই হৈছে।

হামিদ: তা হৈলে আপনে ফাইনালটা পাশ না কৈরাই কলেজ ছাইড়া দিছিলেন?

রশিদ: পাশ করতে না পাইরা কও। পাঁচ-পাঁচ বার পরীক্ষা দিছিলাম। আরও কয়েকবার হয়ত দিতাম। দিলেই যে পাশ করতে পারতাম তা বলা যায় না। বরঞ্চ পাশ করতাম না, এটাই বলা যায়। আমার মতো ডাল্ ছাত্রের কথা বাদ দেও। রাযিয়ার মতো ভাল ছাত্রও দুই-দুইবার পরীক্ষা দিয়া ফেল করল।

রাযিয়ার নজিরটা দিয়াছিল রশিদ সরলভাবেই। হামিদের সাথে রাযিয়ার ঘনিষ্ঠতার কথা রশিদের জানা বলিয়াই সেভাবে ওটাই হইবে হামিদের কাছে বরাতে-জোরে পাশ করার সবচেয়ে দামী নজির। তাই সে ওর কথাটা ও-ভাবে তুলিয়াছিল।

কিন্তু হামিদ কথাটা লুফিয়া নিল। সে সরলভাবে স্বীকার করিল রাযিয়া সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। রশিদের কাছে শুনিতে চায়।

রশিদ: কেমনে জানবা? সে ত আমার সাথে ঐ বছর পরীক্ষা দেয় নাই। ঠিক পরীক্ষার সময়টাতেই রাযিয়ার চাচা গুরুতর অসুস্থ হন। সেই অসুখেই ঐ বছরখানেক ভুইগা তিনি এন্তেকাল করেন। চাচাজীর সেবা রাযিয়াকেই করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অত কৈরাও রাযিয়া পরের বছর আমার সাথে পরীক্ষা দেয়। তাতে পরীক্ষা সে নিশ্চয়ই খারাপ দিছিল। কিন্তু আমরা আশা করছিলাম, সবাই বলাবলিও করত যে রাযিয়ার অবস্থা বিবেচনা কৈরা শিক্ষাসররা তারে পাশ কৈরা দিব। কিন্তু কি নিষ্ঠুর বেটার। দিল না বেচারিরে পাশ কৈরা। মোটা ফিসের রোগী দিতে পারে নাই ত? আমার ধারণা ছিল এ সব কথাই তুমি জান।

অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে হামিদের হৃদপিণ্ডটা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছিল। কি অমানুষিক হৃদয়হীন রাগই না সে করিয়াছিল রাযিয়ার উপর। এতসব ঘটনার একটাও তার কানে আসে নাই। সহপাঠীরা হোস্টেলবাসীরা কেউ তারে বলে নাই? জাহানারাও না? বলিয়াছিল নিশ্চয়ই। হামিদ কানে তুলা লাগাইয়া ছিল বলিয়াই সে শুনে নাই। কি লজ্জা! কত বড় অন্যায়!

নীরব গম্ভীর হামিদের চোখে-মুখে চিন্তা দেখিয়া রশিদ সান্ত্বনা দিয়া বলিল: আর জানবা কেমনে? পরীক্ষায় ফাস্ট হওয়ার লাগি তুমি যেভাবে দরজা-জানালা বন্ধ কৈরা দিছিল, তাতে বাসাতও ত তোমার কামরায় ঢুকতে পারে নাই।

হামিদের মুখভাবে কোনও পরিবর্তন না দেখিয়া রশিদ বলিয়া চলিল: পরের বারের পরীক্ষার সময় তুমি ত বিলাতে। সেটা তোমার জানবার কথা না। সে পরীক্ষায় রাযিয়া নিশ্চয় আরো খারাপ করছিল। কারণ উকিল সাব মারা যাওয়ায় ঢাকার বাসা ছাইড়া দিয়া সিলেট গাঁয়ের বাড়িতে চৈলা যাইতে হৈছিল। নাবালক চাচাত ভাইগুলির পড়াশুনার বিধি-ব্যবস্থা করতেই তার অনেক সময় নষ্ট হৈছিল। পরীক্ষার মাত্র দুই-এক মাস আগে হোস্টেলে সীট নিয়া পরীক্ষার জন্য তৈরি হৈছিল। ওতে কি আর এম. বি. বি. এস পাশ করা যায়?

রশিদের এই সব হৃদয়বিদারক বর্ণনার ঘন-ঘটার মধ্যেও হামিদ একটা আলোক-রশ্মি দেখিতেছিল: রশিদের নিকট হইতে রাযিয়ার শেষ ঠিকানাটা জানিতে পারিবে। তাই রশিদের কথা শেষ হওয়ামাত্র হামিদ প্রশ্ন করিল: তা হৈলে রাযিয়ারা এখন গ্রামের বাড়িতেই থাকে?

রশিদ সরলভাবে বলিল: তা আমি বলতে পারি না। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার সাথে তার আর দেখা নাই। বোধ হয় আর পরীক্ষাই দেয় নাই। দিলে আমি জানতাম। আমি আরও দুইবার দিছি।

এরপর রশিদ আলোচ্য বিষয় বদলাইয়া বলিল: কই আমার অফার সম্বন্ধে ত তুমি কিছু বললা না? তোমার কাজ খুব ভারি হবে না। লেবরেটরির ডাক্তার ও কেমিস্টরা দরকার মতো তোমার উপদেশ চাইব। আর বোর্ডের মিটিং-এ প্রয়োজন-মতো তোমার উপস্থিত থাকতে হবে। এই আর কি? খানপুর খুব কাছেই।

রাযিয়ার খবর পাইবার পর হামিদের মন অস্থির চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। অন্য আলোচনায় তার মন বসিতেছিল না। তবু রশিদের কাছে সে ভাব গোপন রাখিবার আশায় বলিল: কমার্শিয়াল স্কেলে পেটেন্ট ঔষধ তৈরির এই শ্রেণীর লেবরেটরির সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত আপনে মনে করেন?

রশিদ: হাঁ মনে করি। তোমার মতবাদ জানি বৈলাই আরও বেশি মনে করি।
হামিদ: কেমনে?

রশিদ: আমরা লেবরেটরিতে শুধু দেশী গাছ-গাছড়া ও স্থানীয় উপাদানে ঔষধ তৈরি হয়। সে জন্য আমরা পূর্ণাঙ্গ রিসার্চ লেবরেটরি আছে। তোমার সাহায্যে আমরা সম্পূর্ণ নতুন ফার্মাকোপিয়া রচনা করতে চাই।

অন্য সময় হইলে হামিদ এ কথায় উৎসাহে লাফাইয়া উঠিত এবং রশিদের প্রস্তাব লুফিয়া লইত। কিন্তু আজ কিছুতেই সে আর উৎসাহ পাইতেছিল না। অথচ রশিদের প্রস্তাবটা সোজাসুজি অগ্রাহ্যও করিতে পারিতেছিল না। তাই বিষয়টার আলোচনা শুধু পিছাইয়া দিবার মতলবে বাত-কি-বাত বলিল: আমার কি মনে হয় রশিদ ভাই, আমাদের দেশের জনসাধারণের অবস্থা বিবেচনা কৈরা এলোপ্যাথিক ঔষধ তৈরির চেয়ে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তৈরির দিকেই আপনার মন দেওয়া উচিত। আয়ুর্বেদ ইউনানী ঔষধ তৈরির সম্ভাবনাও প্রচুর আছে বৈলা আমি মনে করি।

রশিদ 'হুর্রা' বলিয়া টেবিলে একটা বড় থাপ্পড় মারিল এবং হামিদের দিকে লম্বা হাতটা বাড়াইয়া দিল। বলিল: আমার চিন্তাধারার সাথে তোমার চিন্তাধারা একদম মিইলা গেল। তুমি শুইনা খুশী হবা যে আমি ইতিমধ্যে একটি হোমিওপ্যাথিক ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ খুলবার প্রস্তাব লণ্ডনের পার্টনারের নিকট দিছি। মার্কিন মুল্লুকের ফিলাডেলফিয়ার বরিক এণ্ড ট্যাফেল আমি পরিদর্শন কৈরা আসলাম এই উদ্দেশ্যেই।

হামিদ তার উৎসাহ আর চাপিতে পারিল না। রশিদের বাড়ান হাতটা নিজের মুঠিতে রাখিয়াই বলিল: সত্যি নাকি?

রশিদ: সত্যি নয় ত কি ইয়ার্কি করতেছি? তুমি ত জান আমি যেটা ধরি, তা সহজে ছাড়ি না। এখন কও দেখি, আমার অফার তুমি এক্সেপ্ট করলা কি না? তোমার না আমি শুনুম না, সে কথা কিন্তু আগেই বৈলা রাখলাম।

হামিদের মুখে নিজের অজ্ঞাতেই হাসি আসিয়া পড়িল। বলিল: আপনার অফার আমি রিজেক্ট করলাম না, আজকার মতো এইটুকুই কি যথেষ্ট নয়? আমারে একটু চিন্তা করবার ফুরসৎ দিবেন না?

রশিদ দৃঢ়তার সংগে বলিল: চিন্তা করবার এতে কিছু নাই। পরামর্শ করবারও তোমার কেউ নাই। বরঞ্চ তোমার পাওনা-দেনাটা সম্পর্কে বোর্ডের মেম্বরদের সাথে আমারই আলোচনার দরকার আছে। সেটা ঠিক কৈরা কয়েক দিনের মধ্যেই আমি আবার আসুম।

৪

রশিদকে তার গাড়ি পর্যন্ত আগাইয়া দিল হামিদ। রশিদের গাড়ি মোড় না ফিরা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়াইয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। রশিদ আজ হামিদকে অনেক খবর দিয়া গেল। মাটির দিকে নজর রাখিয়া সে নিজের চেয়ারে ঢুকিল। চেয়ারে বসিল। পর মুহূর্তে চেয়ার ছাড়িয়া কোণের ইযি-চেয়ারটায় লম্বা হইল। না, রাযিয়ার ব্যাপারে আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলে না। কিছু দিন ধরিয়া যে পন্থার কথা ধীরে-সুস্থে ভাবিতে ও পড়াশোনা করিতেছিল, আজ সেটা সংকল্পে পরিণত হইল। হাঁ ঐ লাইনই ঠিক। ওটা শুরু করিতে আর এক লম্বা দেরি করা উচিত না। আশু জরুরী মাত্রা মনে একটা তাকিদ অনুভব করিল হামিদ। গায়েও যেন তার ধাক্কা লাগিল। না আর বিলম্ব করা যায় না। কালই।

হঠাৎ হামিদের মন যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। কেন দিকে যাইতেছে হামিদ? সাময়িক প্রয়োজনে সে ভুল পথে চলিতেছে না ত? মুক্তি-যুদ্ধে সে কি পরাজয় স্বীকার করিতেছে? মনের দিক দিয়া সে কি প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতেছে? সে কি তার আশৈশব বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বিসর্জন দিতেছে?

কিন্তু-কিন্তু তা কেন হইতে যাইবে? রাযিয়াকে সে ভালবাসে। দেহ-মনে তাকে সে একান্তভাবে পাইতে চায়। এটা নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়। তাকে পাওয়ার যে পন্থা সে গ্রহণ করিতেছে সেটা কি তবে প্রতিক্রিয়াশীল কুসংস্কার? ওটা কি বিজ্ঞান-বিরোধী? কেন হইবে? প্রেম যদি অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার না হয়, তবে হৃদয় অন্তর আত্মা রুহও অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার নয়। তা যে নয় বিলাতের বড়-বড় বিজ্ঞানীরাও তা স্বীকার করিতেছেন। অনেকে ও-বিষয়ে অনেক গবেষণাও ত করিতেছেন।

হাঁ, এটা সত্য যে রাযিয়াকে পাওয়ার প্রচলিত সাধারণ অন্য উপায় থাকিলে হামিদ এই পন্থা অবলম্বন করিত না। রাযিয়াকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু বাহির করাটাই ত শেষ কথা নয়। যে নিষ্ঠুর সমাজ-ব্যবস্থায় সে বন্দি, সে বন্ধন হইতে মুক্ত করাটাই বড় কথা। প্রচলিত নিয়মে সে মুক্তি সম্ভব হয় নাই। হইবে না। কাজেই বাধ্য হইয়াই হামিদ এই অভিনব পন্থা ধরিতে যাইতেছে। কিন্তু রাযিয়ার মুক্তি সাধনের জন্য এই পন্থার প্রয়োজন না হইলেই কি হামিদ স্পিরিচুয়াল সাধনার পথে যাইত না? তা কেন? তার সারা জীবনই ত স্পিরিচুয়াল সাধনার চেষ্টা। আবে-হায়াতের খাজে খেয়েরের তালাশ। হামিদ অনিচ্ছাতেও একটু হাসিয়া লইল। পরক্ষণেই গম্ভীর

হইয়া উঠিল। সে যে আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে সেটা ত এই আধ্যাত্মিক সাধনারই জন্য। সে আনুষ্ঠানিক ধর্ম না মানুক কিন্তু আত্মা পরমাত্মা রুহ রুহুল কুদ্দুস সুপ্রিম বিং ও মেজর পার্সনালিটিতে ত সে বিশ্বাস হারায় নাই। বস্তুত: আধ্যাত্মিক জীবনের ধারণা ও সাধনাকেই ত সে মানুষ ও জানওয়ারের পার্থক্যের মাপকাঠি মনে করে।

না, হামিদ মুক্ত বুদ্ধির পথ বিসর্জন দেয় নাই। সে প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ ধরে নাই। বরঞ্চ বিজ্ঞানের বাহ্য চাকচিক্যে সে যে আধ্যাত্মিক দিকটা ভুলিয়া যাইতেছিল রাযিয়ার আকর্ষণ তাকে সেই ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরাইয়াছে। একটা নারীর প্রেম তাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এটা তবে ঠিক নয়। বরঞ্চ রাযিয়ার প্রেম তাকে বিপথ হইতে ঠিক পথে আনিয়াছে।

সে পরম উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল। ফুর্তিতে রুমময় পায়চারি করিতে লাগিল। মনের আনন্দে গুণ্-গুণ্ করিয়া গান ধরিল। দু এক দিনের মধ্যেই ফতেপুর যাইবে ঠিক করিয়া ফেলিল। সহকারী ও কম্পাউণ্ডাররা কিছু বুঝিতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে শান্ত মুহূর্তে নিতান্ত প্রসংগক্রমে কথাটা তাদের কাছে প্রকাশ করিল। তারা জানিল, ডা. সাহেব সাংসারিক বিষয় কর্মের জন্যই দেশের বাড়িতে যাইতেছেন।

পীর সাহেবের এন্তেকালের পর এই পাঁচ বছরে হামিদ আর দুইবার ফতেপুর গিয়াছে। একবার বিলাত যাওয়ার প্রাক্কালে আমরা ও বোন-বোনাই অস্বীয়-স্বজনের নিকট বিদায় লইতে। আরেকবার বিলাত হইতে ফিরিয়া। দুইবারই হামিদ দেখিয়া খুশী হইয়াছে উকিল সাহেবের তত্ত্বাবধানে ও সরকারের পরিচরিত্য সবই ঠিক মতো চলিতেছে। আমরা, বোনেরা এমন কি ভাগ-চাষীরা সবাই সন্তুষ্ট। দ্বিতীয় বার হামিদ দেখিতে পায়, উকিল সাহেব নিয়মিতভাবে হামিদের নামে ব্যাংকে টাকা জমা করিতেছেন। হামিদের নামে মাসিক বরাদ্দ-মতো প্রকল টাকা এবং বিলাতে যাওয়ার জন্য যে টাকা ধার্য হইয়াছিল, বিলাতে কোনও টাকা পাঠাইবার দরকার না হওয়ায় সে সব টাকা, উকিল সাহেব মাসে মাসে ব্যাংকে জমা করিয়াছেন। হামিদ তখন এ ব্যবস্থায় আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু চাকরি যাওয়ার পর এখন মনে হইতেছে দুলাভাই কাজটা ভালই করিয়াছেন। চাকুরি যাওয়ার পরও টাকা-নারায়ণগঞ্জে বাসা-খরচের জন্য হামিদ বাড়ি হইতে কোনও টাকা নেয় নাই। ফলে এখনও তেমনি জমা করা হইতেছে।

অন্যান্য বার হামিদ ট্রেনে গিয়াছিল। তাতে প্রথমবার পথে নৌকা ও গরুর গাড়ি লাগিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার ময়মনসিংহ হইতে উকিল সাহেবের মোটরে চড়িয়া এক দৌড়ে সোজা ফতেপুরে গিয়াছিল। তখন ময়মনসিংহ হইতে ফতেপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তা হইয়া গিয়াছে।

কাজেই এবার সে ঠিক করিল ময়মনসিংহ না হইয়া সোজা টাংগাইল-জামালপুর হইয়া নিজের মোটরে যাইবে। ময়মনসিংহে উকিল সাহেবকে এবং ফতেপুরে আমাদের সেই মর্মে টেলিগ্রাম করিয়া দিল। নির্ধারিত সময়ে বোনদের আনিবার সাধ্যমতো চেষ্টা করিতে বলা হইল।

নির্ধারিত দিনে ফতেপুর গিয়া হামিদ দেখিল বোনদের সকলে বোনাইদের অনেকে সেখানে আগেই পৌছিয়াছেন। বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নয়া মেহমান আসার উপযুক্ত

করিয়া সাজান-গুজান। হামিদের পৌছাখবরে গাঁয়ের ছোট-বড় সবাই ভাংগিয়া পড়িয়াছে। হামিদ সকলের সাথে হাসি-মুখে আলাপ করিল। সকলে ভাল-মন্দ খবর-বার্তা লইল। অন্দর মহলে আশ্মাদের ও চাকরানীদের মধ্যে উৎসাহ ও কর্ম-চাঞ্চল্যের সীমা নাই। রান্না-বাড়ার হট্টগোল। কাটিল কয়দিন খুব ধুমধামেই।

আলাপ-আলোচনার বিশেষ কোনও বিষয় ছিল না। শুধু দেখা সাক্ষাৎ মাত্র। কাজেই দু'চারদিনের মধ্যেই একে-একে সব বোন ও ভগ্নিপতিরা বিদায় হইলেন। হামিদ এবার নিজের কাজে মন দিল। সে এবার যে বিশেষ মতলব লইয়া ফতেপুরে আসিয়াছে, সে কাজ শুরু করিল।

সরকারকে দিয়া নানাজী শাহ রমযান আলী ফকির সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইল। খবর পাওয়া মাত্র শাহ সাহেব চলিয়া আসিলেন।

হামিদ যেন তাঁরই আগমনের অপেক্ষায় বসিয়াছিল। শাহ সাহেবকে দেখিয়া আগ বাড়িয়া গেল। উপস্থিত সকলকে এবং খোদ শাহ সাহেবকে বিম্বিত করিয়া হামিদ তাঁর কদমবুসি করিল।

-কি কর নানাভাই? -বলিয়া শাহ সাহেব চমকিয়া উঠিলেন এবং বোধ হয় এক পা পিছাইয়া গেলেন।

-আপনে আমার মুরুবি না, নানাজী?'- হামিদ হাসিয়া বলিল।

-নানাই হই যেই হই ফতেপুরের সালাম পাবার কাবিল না। আমরা গোনাগার করলাম। নিজেও গোনা করলাম।

হামিদ উচ্চস্বরে হাসিয়া বলিল: আমি ফতেপুরের পীর সাহেব আপনার নাতি মাত্র। যতদিন ফতেপুরে পীরগিরি ছিল ততদিন আপনার কথা ঠিক থাকলে থাকতেও পারে। এখন আর ও কথা ঠিক না।

বুড়ার কাঁধে হাত দিয়া তাঁকে অন্দর মহলের দিকে ঠেলিয়া নিতে নিতে বলিল: আজ রাতে ত আপনে এখানে থাকবেনই, দরকার হৈলে আরও দু-একদিন থাকতে হবে।

-তোমার হুকুম হৈলে যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারি। তোমার আসার খবরটা পাইছি অবধি আসবার লাগি মনটা আনুচান করতে আছিল। তোমারে দেখবার লাগি আমার মন কেন যে এমন হৈয়া যায় কৈতে পারি না। কিন্তু দুলাভাইরা আইসা বাড়ি ভর্তি হৈয়া গেছে বৈলা আসতে পারি নাই।

একটু বেলা হইয়া গেলেও মাজেলা বিবি চাচার জন্য চা-নাশতার ব্যবস্থা করিলেন। নাশতায় শরিক না হইলেও হামিদ চাতে হইল। চা নাশতার পরে হামিদ নানাজীকে নিয়া নিজের কামরায় গিয়া বসিল। এবার কোনও ভূমিকা না করিয়াই হামিদ বলিল: আজ রাতে ত এখানে থাকতেই হবে আপনার। কয়েকদিনের জন্য নারায়ণগঞ্জে আমার বাসায় যাইতে হবে।

বুড়ার বুকটা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। একে ত ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে যাওয়ার ব্যাপার। তার উপর বিলাত-ফেরত সাহেব ডাক্তারের মেহমান হওয়া। বহুদিন তিনি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে যান নাই। শুনিয়াছেন বহুৎ আজিব-আজিব কল-কারখানা ও আলিশান-আলিশান বালাখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। দেখিবার বড় শখ হয়। কিন্তু

তংগদস্তির জন্য হইয়া উঠে না। এই একটা সুযোগ। মহা সুযোগই বলিতে হইবে। কিন্তু শাহ সাহেব বহুদর্শী বিষয়ী বুদ্ধিমান ব্যক্তি। মনের কৌতূহল তার পুলকানন্দ ছাপাইয়া উঠিল। শাহ সাহেবের মতো একটা উম্মি নোংরা ময়লা-পোশাকওয়ালা দূর সম্পর্কের নানাজীয়ে সাহেব-সুবা বন্ধু-বান্ধবকে দেখাইবার মতলবে হামিদ নিশ্চয়ই তাঁকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে নিতেছে না। নিশ্চয় এর মধ্যে কোনও ভেদ আছে। মনের ভাব গোপন করিয়া শাহ সাহেব বলিলেন: কেন নানাভাই? তুমি বড় লোক। থাক সাহেব-সুবা বড় লোক বন্ধু-বান্ধব নিয়া। ওর মধ্যে আমাদের টান কেন? তাছাড়া না আছে আমার শহরে যাবার উপযুক্ত পোশাক-পাতি, না আছে বাড়ি ছাইড়া দু'চার দিন বাইরে থাকবার অবসর। দিন আনি দিন খাই ত আমি।

-সে চিন্তা আপনে করবেন না নানাজী। হামিদ আসিয়া বলিল। -আপনে আগে রাজি হন। আমি ও-সব ব্যবস্থা করুম। আপনের যে কয়দিন নারায়ণগঞ্জে রাখুম সে কয়দিনের বাসা খরচা আমি আগেই নানীর হাতে দিয়াই যামু। আর পোশাক-পাতির কথা? ফকির-দরবেশের যে-সব পোশাকে মানায়, এই ধরেন লম্বা কল্লিদার কোর্তা, সদরিয়া, একটা খুব লম্বা পাগড়ি, নাগরা জুতা, আর কি বলেন, নানাজী, সবই জামালপুর থানে এক দিনে কিনা যায়। যায় না নানাজী?

ডা. হামিদ তাঁকে নিয়া ঠাট্টা-বিদূপ করিতেছে না ত? এত-এত দাম্য পোশাকের কথা বলে কেন তবে? শাহ সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নাতির দিকে চাহিলেন। না, ওখানে কোনও মশ্করার আলামত ত দেখা যায় না। তবে ব্যাপারটা কি? শাহ সাহেবের কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন: মতলবটা কি নানাভাই? বিয়ার ঘটকালি করা লাগব নাকি?

হামিদ চমকিয়া উঠিল। নিজের চাঞ্চল্য গোপন করিতে গিয়া খুব জোরে হাসিল। বলিল: এক রকম তাই। কিন্তু আপনে তা বুঝলেন কেমনে? সেই নেসবতে-বায়নান্নাস নাকি?

শাহ সাহেব খুশি হইয়া বলিলেন: বিলাত গিয়াও তুমি ও-সব ফকিরী কথা ভুল নাই দেখি।

হামিদ: বিলাত সম্বন্ধে আপনার অনেক ভুল ধারণা আছে নানাজী। ওরা সবাই নাস্তিক দুনিয়াদার এটাই আপনার ধারণা। বিলাত যাওয়ার আগে আমার ধারণাও তাই ছিল। আপনে শুইনা খুশী হবেন তারা সব নাস্তিক ত নয়ই, অনেকেই রুহে বিশ্বাস করে, রুহানী বিষয়ে পড়াশোনা করে।

শাহ সাহেব উৎসাহিত হইয়া বলিলেন: সত্য নাকি?

হামিদ: নিশ্চয়ই সত্য। আপনারা যারে নেসবতে-বায়নান্নাস কন তারা সেটারে কয় টেলিপ্যাথি। এসব শিখাবার লাগি সেখানে সাইকিক স্কুল-কলেজও আছে।

শাহ সাহেব ঠোঁটের তুড়ি মারিয়া বলিলেন: রাইখা দেও ভাই ওরার টুলিপাতি। টুলিপাতি খেইলা কেউ রুহের তরফি করতে পারে? আর ঐ যে সাইকেলের স্কুলের কথা কইলা, ও সবই ধাপ্পা। ওতে কি কামটা হৈব তুমিই কও। সাইকেলে চৈড়া কেউ আল্লার দিদারে যাবার পারে? এটা একটা কথা হৈল?

হামিদ নানাজীর অজ্ঞতায় উত্যক্ত না হইয়া হাসিয়া বলিল: টুলিপাতি খেলা না, নানাজী, ওটার নাম টেলিপ্যাথি। এই যেমন টেলিগেরাফ। টেলিগেরাম পাঠাই আমরা যন্ত্রের সাহায্যে তারের মারফত। টেলিপ্যাথি পাঠায় তারা এক রুহের মারফত অন্য রুহের কাছে। এটা করে তারা পার্সনালিটি একস্টেনশন অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব প্রসারণ দ্বারা। ব্যক্তিত্ব প্রসারণ মানে বুঝলেন না নানাজী? এই রুহ কুশাদাকরণ আর কি?

হামিদ অন্য দৃষ্টান্তের অভাবে নিজের দুই হাত দুইটিকে বাড়াইয়া বুকটা টান করিয়া নানাজীকে ব্যক্তিত্ব প্রসারণের কাজটা হাতে-কলমে বুঝাইবার চেষ্টা করিল।

নানাজী জীবন-ভর এমন ব্যবসা করিয়াছেন যাতে কোনও বিষয়ই না বুঝিলে চলে না। তাই তিনি অনেকটা বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, এরূপ ভাব দেখাইয়া বলিলেন: তাই যদি সত্য হয়, তবে সেখানে সাইকেলের কাজটা কি?

হামিদ এবারও হাসিল। সদয় হাসি মুখে বলিল: সাইকেল না নানাজী, কথাটা সাইকিক্যাল। রুহানী কথাটারই ওটা ইংরাজি শব্দ।

শাহ সাহেব এবার সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ সত্য-সত্যই এবার কথাটা বুঝিলেন। বলিলেন: ও তাই কও। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলাম।

হামিদ সুযোগ বুঝিয়া তার প্রস্তাব দুহরাইল। বলিল: এইসব কথা আলোচনার জন্যই আপনাদের আমার বাসায় কিছুদিন রাখতে চাই। আপনার কাছে শিখতে চাই।

জিভে কামড় দিয়া শাহ সাহেব বলিলেন: তওবা আস্তাগ্‌ফার কও। তুমি ফতেপুরের পীরজাদা, বড় আলেম। বিলাত-ফেরত ডাক্তার। আমি রুহানিয়াত শিখামু তোমারে? আমি উম্মি মানুষ। যা-কিছু সামান্য শিখছিলাম তোমার দাদা মিয়া মানে তোমার ওয়ালেদের মতো দাদা পীর সাহেব কেবলা আমারে বেশর মুমরাহ উম্মি বৈলা হেকারত করতেন না। আমারে সব সময় তালবিলেম কৈরা সাথে রাখতেন। তাঁরই জুতা-বোচকা বইয়া বইয়া তাঁর যহুরাও অনেক দেখছি। রুহের ষ্টপ অবস্থার খুঁটিনাটি তাঁর পাক মুখ খেনেই শুনছি।

হামিদের কৌতূহল বাড়িল। বলিল: রুহের চার অবস্থা কি কি নানাজী?

শাহ: নাসুৎ মালাকুৎ জাবারুৎ ও লাহুত। যারা রুহানী ফয়েয হাসেল কৈরা ফালাহ্ লাভ করতে চায়, তারার এই চার অবস্থার মধ্য দিয়া আসতেই হবে।

হামিদ: ও তা হৈলে এ চার তরিকা বুঝি শরিয়ত তরিকত হকিকত মারফতেরই অন্য নাম?

শাহ সাহেব একটু ভেবাচেকা খাইয়া গেলেন। একটু দ্বিধা করিয়া বলিলেন: আমাদের ঠেকাইলা নানাভাই। আমাদের অথই পানিতে ফেইলা দিলা। আমি তরিকা কই নাই, কইছি তবকা। এরই লাগি আমরা আলেমরারে ডরাই। তারার সাথে কথা কই না। আমরা ফকিররা উম্মি মানুষ। মুরশিদের কিরপায় ডিংগিতে চৈড়া সমুদুর পার হই। পীরের কাছে ডিংগি বাওয়া শিখছি কিন্তু সাঁতার শিখি নাই। যতক্ষণ ডিংগিতে আছি বেশ বাইতে পারি। ডিংগি থনে ধাক্কা মাইরা ফালাইয়া দিলেই ডুইবা মরি। বুঝলা নানাভাই? ফকিরের কারবার ঈমান ও বিশ্বাস লৈয়া। আর তোমরা আলেমরার কারবার ইলিম আর মুনতেক লৈয়া। রুহানী বস্তু তর্কের বিষয় না। তুমি ত শুনছই: বিশ্বাসে লভয়ে খোদা তর্কে বহুৎ দূর।

বুড়ার কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে ত! হামিদ বিশ্বাসে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিল। শাহ সাহেব হামিদের ঠোঁটের কোণের হাসি দেখিয়া ভুল বুঝিলেন। তাঁর মনে হইল হামিদ তাঁর কথায় বিশ্বাস করিতেছে না। তাই বড়লোক নাতির মন-রাখা গোছের কথা বলিলেন: বিজ্ঞানীর পক্ষে খোদা বিশ্বাস করা কঠিন, একথা আমি অনেকের মুখেই শুনিছি। যারা খোদায় বিশ্বাস করে না, তারা রুহে বিশ্বাস করব কেমনে?

-বিজ্ঞানীর উপর আপনি আমভাবে বেইনসাফ করিতেছেন নানাজী। সব বিজ্ঞানী খোদায় অবিশ্বাস করে না। জানেন নানাজী, হাল জমানার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নিজেই খোদায় বিশ্বাস করেন।

-তিনি কে?

-তাঁর নাম আলবার্ট আইনস্টাইন।

-আইন-টাইন দিয়া খোদারে বুঝা যাব না। তুমি যতই কও।

আইন-টাইন না আইনস্টাইন। এটা তাঁর নাম। আইনের কথা না।

-তা তিনি কি কইছেন?

-তিনি কইছেন: দুনিয়ার আসমান-যমিন গাছ-দরখত যদিকে নজর কর শুধু মাজেয়া আর মাজেয়া। এত মাজেয়ার মধ্যেও আল্লার কুদরত ও হেকমত ঘাসা দেখে না, তারার মন মুর্দা, তারার চোখ অন্ধ।

-বাহ্‌বাহ্‌, বড় খাঁটি কথা কইছে তোমার আইনদ্দি।

নানাজীর মুখে মহামতি আইনস্টাইনের এই নামকরণে খুশী হইয়া হামিদ বলিল: এর চেয়েও বড় মারফত কথা তিনি কইছেন।

-সেটা আবার কি?

-তিনি কইছেন দুনিয়া-জাহানের রুহের মধ্যেই খোদা নিজেই বিকাশ করিতেছেন। ইটা আইনদ্দি কৈব কেন? ইটা কালামুল্লার কথা। তুমি ত জানই: আল্লাহ নুরুস সামাওয়াতে ওয়াল আর্য।

এই উম্মি ফকিরের মুখে অতবড় কথা শুনিয়া হামিদ পুলকিত হইল। উৎসাহিত হইয়া বলিল: জানেন নানাজী এই বিজ্ঞানী নিজে বিজ্ঞানী নিজে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কি কইছেন?

-কি কইছে?

-তিনি কইছেন: দুনিয়া-জাহানের সৃষ্টি-কৌশলের মধ্যে অর্থাৎ এই হেকমত-ছনরের মধ্যে যে মহাজ্ঞান জাহির হৈতেছে তার এক অনুপরিমাণও আমরা বিজ্ঞানীরা জানতে পারি না। কাজেই সেই মহাজ্ঞানীর ধ্যানেই আমাদের ডুইবা থাকা উচিত।

-ইটা বিজ্ঞানীর কথা না, নানাভাই। আইনদ্দি যদি ইটা কৈয়া থাকে, তবে তিনি বিজ্ঞানী না। তিনি দরবেশ। অলিআল্লা।

সে রাতে অনেকক্ষণ ধরিয়া হামিদের চোখে ঘুম আসিল না। নানাজীর সাথে তার আলাপটাই বিভিন্ন আকারে তার মন তোলাপাড় করিতে থাকিল। কি আশ্চর্য! নানাজীর সাথে কথা বলিতে-বলিতে কেমন চট্ করিয়া বহুদিন আগে-পড়া ভুলিয়া-যাওয়া আইনস্টাইনের কথাটা তার মনে পড়িয়া গেল। কি মূল্যবানই না কথাটা! কিন্তু হামিদ

কি নানাজীকে ঠিকমতো কথাটা বলিতে পারিয়াছে? মনে-মনে সে আইনস্টাইনের ভাষাটা ঠিক-ঠিক দুহরাইবার চেষ্টা করিল। ঠিকই ত আইনস্টাইন ত সত্যই বলিয়াছেন 'সেই রহস্যময় সর্বজ্ঞকে যে ব্যক্তি নিজের সারা অস্তিত্ব দিয়া অনুভব করে না, তার মাজেয়ার সামনে যে স্তম্ভিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়ায় না, তার মন মৃত, তার চোখ অন্ধ।' না, হামিদ নানাজীকে ঠিকই বুঝাইয়াছে। নানাজীর মতো, বিজ্ঞান খোদা-বিরোধী। বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতাই তাঁর এই ধারণার মূলে। বিজ্ঞান আল্লা-বিরোধী হইতে যাইবে কেন? আল্লা যে রহস্যময়। রহস্য ভেদ করাই ত বিজ্ঞানের কাজ। বিজ্ঞান তার কতটুকু করিয়াছে? আইনস্টাইন কি বলেন? 'যে সদা-চেতন সত্তা অনাদি-অনন্তের মধ্যে নিজেকে বিকাশ করিতেছে, যে মহাজ্ঞান দুনিয়াজাহানের সৃষ্টি-কৌশলের মধ্যে প্রকটিত, যে অসীম অনন্ত কৌশলের এক অণু-পরমাণুও আমরা জানিতে পারি নাই, সেই মহাজ্ঞানের ধ্যানে নিমগ্ন হইতে পারাটাই আমার জীবনের সার্থকতা।' কি সাংঘাতিক কথা! এর সমর্থনে উম্মি নানাজীই বা কি দামী কথাটাই না বলিয়াছেন: 'আল্লাহ নুরুস সামাওয়াতে ওয়াল আর্থ'। অনেকদিন পরে আজ হামিদের মনে পড়িল বাপজানও একদিন কোরানে-কথিত আল্লার নূরের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছিলেন। বাপজানকে হামিদ যতটা মোল্লা মনে করিত, ততটা মোল্লা তিনি তবে ছিলেন না! মরহুম বাপের প্রতি আজই তার প্রথম শ্রদ্ধা হইল। তিনি তবে শুধু স্নেহময় পিতাই ছিলেন না, জ্ঞানী আলেমও ছিলেন।

শেষ রাতে হামিদ ঘুমাইয়া পড়িল। মৃত্যুর পর আজই বাপকে হামিদ প্রথম খাবে দেখিল। হামিদের সাথে পথে তাঁর দেখা। খুব খুশী লাগিল বাপজানকে। তিনি হামিদের প্রথমে কাঁধে পরে মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া বলিলেন: কইছিলি না বাবা, লংগর শক্ত হৈলে হাজার তুফানেও নাউ ডুবে না। বুনিয়াদী তালিমটা পোখতা হৈলে হাজার বিজ্ঞানও ঈমান নষ্ট করতে পারে না।

ইঠাৎ স্বপ্নের মোড়টা ফিরিয়া যাওয়ায় হামিদ বাপজান সম্পর্কে আর কিছু দেখিল না। ঘুম ভাংগার পরে বিছানায় শুইয়া-শুইয়া অনেকক্ষণ বাপের কথা ভাবিল।

যতবার ফতেপুরে আসিয়াছে ততবারই সে বাপজানের কবরটা জিয়ারত করিয়াছে। কিন্তু এবার যতক্ষণ ধরিয়া করিল, ততক্ষণ আর কোনও দিন করে নাই।

৫

পরদিন সকালের আলাপে নানা-নাতির সব কথাতেই পটাপট ঐক্যমত হইয়া গেল। নানাজী হামিদের সাথে তার বাসায় যাইতে রাজি হইলেন। দিন-তারিখও ঠিক হইয়া গেল। নানাজীর জন্য ভদ্রলোক পীর-দরবেশের পোশাক কিনিতে-বানাইতে জামালপুরে লোক পাঠান হইল।

একটা মতলব হাসিল হইয়া যাওয়ায় হামিদ তার দ্বিতীয় মতলবটার দিকে মন দিল। কিছুদিন ধরিয়া তার মনে প্রায় বিনা-কারণে ছোট আশ্মার কথাটা কাঁটার মতো বিধিতেছে। তার প্রবল ইচ্ছা হইতেছে ছোট আশ্মাকে তার বাসায় নিয়া আসিবে। ছোট আশ্মাকে ঘেরিয়া সে এই কয়দিনে কল্পনার চিত্র আঁকিতেছে। ছোট আশ্মার মাতৃত্বের মুরগুবিয়ানাই এ চিত্রের মূলবস্তু। এর কতকটা ছোট আশ্মার প্রতি বাপজানের অবিচারের কাফ্যারা। আর কতকটা তার নিজের মনের মাতৃস্নেহের বুভুক্ষা। কিন্তু

দুইটা বিষয় তার মনের মধ্যে এমন জট পাকাইয়া গিয়াছে যে কোনটা বড় আর কোনটা ছোট নিজেই তা ঠিক করিতে পারে নাই। জ্ঞান হইয়াছে অবধি হামিদ নানা জনের মুখে ছোট আত্মা সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়াছে। বয়স্ক হইয়া বাপজানের সহিত অভিমান করিয়া বাড়ি ছাড়া পর্যন্ত এই শোনার কাজ চলিয়াছে অবিশ্রান্ত। কত জনের মুখে বিশেষতঃ পাড়ার মেয়েলোক ও ফকিরনীদেবের মুখে, আরও বিশেষ করিয়া ইব্রাহিম সর্দারের কাছে, ছোট আত্মার কত তারিফ শুনিয়াছে। পক্ষান্তরে আত্মাদের সকলের এবং দাসী চাকরানীর অনেকের মুখে শুনিয়াছে ছোট আত্মা আওরত ছিলেন না। তিনি ছিলেন ডাইনী-রাক্ষসী। তিনি আঠার হাত লম্বা জিহবা দিয়া হামিদের গায়ের রক্ত শুষিয়া খাইতেন। শৈশবে এসব কথা শুনিয়া সে ভয় পাইত। একটু জ্ঞান হওয়ার পর যখন যার কথা শুনিত, সেটাই বিশ্বাস করিত। আপন-পর জ্ঞান তখনও তার হইয়াছে। কাজেই বাড়ির মুরুব্বদের কথাতেই সে বেশি এতবার করিত। কিন্তু এ সকল পরস্পর-বিরোধী কথার মধ্যেও হামিদের মন তার অজ্ঞাতেই ছোট আত্মার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করিত। এটা শেষ পর্যন্ত ছোট আত্মাকে নিজ চোখে দেখার ইচ্ছায় পরিণত হয়। শাহ সাহেবের সহায়তায় এবং তাঁরই সাথে একবার বাপজানের অজ্ঞাতে ছোট আত্মাকে দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু সে অভিজ্ঞতাটা বড় অপ্রিয় ও ভয়াবহ। ছোট আত্মা হামিদের কথা শুনিয়াই পাগলিনী বেশে ছুটিয়া আসিয়া হামিদকে জড়াইয়া ধরেন। ‘বাপজান, আমার বাপজান’ বলিতে-বলিতে তিনি হামিদের চোখে-মুখে কপালে চুমা দিতে থাকেন। হামিদের বয়স তখন পাঁচ ছয় বছরের বেশি হইবে না। সে এই পাগলিনীর বিবস্ত্র অবস্থা, তাঁর কংকাল হাত-পা এবং কোটর-গ্রন্থ চোখ দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সকলে টানিয়া-হেঁচড়াইয়া পাগলিনীর কবল হইতে হামিদকে উদ্ধার করিয়াছিল। শাহ সাহেব নিজে ভয় পাইয়াছিলেন। এই দৃশ্যে হামিদের জ্বর হইতে পারে, সে আশঙ্কাও তিনি করিয়াছিলেন। তিনি তাড়াহুড়ি হামিদকে লইয়া সে বাড়ি হইতে একরূপ পলাইয়া যান। পীর সাহেবের নিকট হইতে ঘটনাটা গোপন রাখিবার সকল চেষ্টা-তদরিব করেন। হামিদের যাতে জ্বর-টর না হয়, সেজন্য নিজের সাধ্যমতো যাদু-টোনা ও দোওয়া-কালামের পানি-পড়া খাওয়াইয়াছিলেন। শাহ সাহেবের বরাত শুণে হামিদের জ্বর-টর কিছু হয় নাই। কিন্তু কেমন করিয়া না জানি পীর সাহেবের কানে কথাটা যায়। তিনি শাহ সাহেবকে যা-ইচ্ছা -তাই বলেন এবং ফতেপুর যাওয়া নিষেধ করিয়া দেন। হামিদ সে কারণে বহুদিন শাহ সাহেবের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। মাজেলা আত্মার অনেক অনুরোধে-উপরোধে বহু কাল পরে পীর সাহেব-কেবলা তাঁর এই নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া নেন।

তারপর কৈশোরে ও যৌবনে পদার্পণ করিয়া হামিদ অনেক সময় ছোট আত্মার কথা এক-এক ঝলক মনে করিয়াছে। ঐ ঝলকের মধ্যে কখনও কখনও তার মনে হইয়াছে, ঐ পাগলিনীর মধ্যে একটা মাতৃ-রূপ, ঐ কংকালের স্পর্শের মধ্যে একটা স্নেহ-শীতলতা, ঐ কোটর-গ্রন্থ চোখের মধ্যে একটা মাতৃ-জ্যোতি যেন হামিদ অনুভব করিয়াছিল। তখন সে ও-সব বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এখন যেন তা প্রথমে আবহা-আবহা এবং ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ছোট আত্মাকে দেখিবার ও তাঁর কাছে যাইবার বাসনা তার প্রায়ই হইয়াছে। কিন্তু যতদিন পীর সাহেব বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন হামিদ সাহস পায় নাই। বাপের এন্তেকালের পরে সময় পায় নাই। তারপর

নিজের মন ও জীবনের ঘটনা-প্রবাহের প্রবল স্রোতে সে ছোট আশ্রয়-কথা একদম ভুলিয়াই গিয়াছিল। মাত্র গত কয়েকদিন যাবৎ হঠাৎ তাঁর কথাটাই যেন মাটি ফাটিয়া হামিদের সামনে হাজির হইয়াছে। বাপজান ছোট আশ্রয় উপর অবিচার করিয়াছেন, এতে হামিদের এখন আর কোনও সন্দেহ নাই। ডাইনী-রাক্ষসীর গল্প হামিদ এখন আর বিশ্বাস করে না। কিন্তু আশ্রয়দের কাছে তেমন মনোভাব সযত্নে গোপন করিয়া রাখে। তাঁদের মনে আঘাত দেওয়াও তার ইচ্ছা নয়। তাছাড়া মাজেলা আশ্রয়কে সে সত্যই নিজের গর্ভধারিনী রূপেই মান্য করিয়া থাকে।

কিন্তু তাঁকে বাসায় নিয়া যাইতে হামিদ মনের দিক হইতে উৎসাহ পায় না। তিনি প্রাচীনপন্থী, পাড়াগেঁয়ে সরল নির্বিশেষ মানুষ। তিনি শহরীয়া জীবনে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে ছোট আশ্রয় কথা হামিদ যা শুনিয়াছে, তাতে তিনি সুস্থ থাকিলে হামিদের বাসাবাড়ি আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারিবেন। বর্তমান মানসিক অবস্থায় হামিদ এটাই চায়। কিন্তু কাথাটা শাহ সাহেবের মুখ দিয়াই কওয়াইতে হইবে।

এসব কথাই হামিদ ভাবিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এবার ফতেপুরে আসিয়া তার চিন্তায় একটু ওলট-পালট হইয়া গেল। মাজেলা আশ্রয় মানে বর্তমানে বড় বিবি সাহেবা শাহ সাহেবের ভাতিজী। প্রধানতঃ এরই জোরে শাহ সাহেব আগে ফতেপুর পীর বাড়িতে আসিবার অধিকারী ছিলেন। পীর সাহেবের এন্তেকালের পরে বাড়ির মুরক্বি হিসাবে মাজেলা বিবির প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে। তাঁর সংগে-সংগে শাহ সাহেবের প্রভাব ও যাতায়াত এ বাড়িতে বেশি হইয়াছে। তাতে মাজেলা আশ্রয় ও নানাজী ঘনিষ্ঠতাও আগের চেয়ে অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া হামিদের মনে হইল।

হামিদের ধারণা হইল তাতে তার কাজটা বেশ কঠিন হইয়াছে। মাজেলা আশ্রয়কে নিজের বাসায় না নিয়া ছোট আশ্রয়কে নিবার প্রস্তাব দিলে আশ্রয় ও নানাজী দুই জনই অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কারণ হামিদের বাসায় যাওয়ার ব্যাপারটা শুধু পুত্রের উপর মায়ের অধিকারের প্রশ্নই নয়, হামিদের পক্ষ হইতে পক্ষপাতিত্ব ও মর্যাদা দেখানোর প্রশ্নও বটে। হামিদ সহজেই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিল। এ ব্যাপারে আর যারেই হোক শাহ সাহেবকে সে অসন্তুষ্ট করিতে পারে না। এ ব্যাপারে আর যারেই হোক শাহ সাহেবের স্থান খুবই জরুরী। প্রধানতঃ তাঁকে নিতেই হামিদের আসা। ভালয়-ভালয় তার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তাতে ব্যাঘাত ঘটে, হামিদ তেমন কিছু করিবে না। তাছাড়া ছোট আশ্রয় মোটেই বাসায় যাওয়ার লায়েক আছেন কি না সেটা আগে জানা দরকার। তারপর ছোট আশ্রয়কে নিতে হইলেও যাতে নানাজীই সে প্রস্তাব দেন সুকৌশলে কথা বলিয়া হামিদেরই তা করিতে হইবে।

পেট ভরিয়া ভারি নাশতা খাওয়ার পরে কিন্তু চা খাওয়ার আগে তোয়ালিয়ায় মুখ মুছিতে-মুছিতে হামিদ বলিল: নানাজী, আপনারে ত দাওয়াৎ কৈরা বসলাম। কিন্তু এখন ভাবতেছি সেখানে আপনার খাতির যত্ন করব কে? আমার বাসায় ত মেয়েলোক বলতে কেউ নাই। মাত্র একটা বাবুঁচি একটা বয়। এরা আপনার যত্ন-আত্তি করব কি? এখন কি করা যায় নানাজী?

সবগুলি দাঁত বাহির করিয়া কান পর্যন্ত গাল পাশ করিয়া বুড়া হাসিলেন। চোখ ঠারিয়া বলিলেন: আমি ত দুইদিন ধৈরা এই কথাটাই কইতাছি। তোমার হুকুম পাইলেই রাংগা টুকটুককা শিংগাউলি একটি নাতি-বউ লৈয়া আসি।

হামিদ জানে যুবতী-নারীর পোশাক ভেদ-করা উন্নত স্তনকে শিং বলা এ অঞ্চলের সঙ্গোপন রসিকতা। রাখিয়ার উপর এ রসিকতাটা হুবহু খাটে, ভাবিয়া হামিদের রোমাঞ্চ

হইল। কিন্তু ও-ভাবটা গোপন করিবার চেষ্টা করিল। পারিলও সহজেই। সে দেখিয়া খুশী হইল যে দশ বছর আগে নানাজীর সামনের যে দুইটা দাঁত পড়া দেখিয়াছিল, আজও ঠিক তাই আছে। এই দশ বছরে আরেকটা দাঁতও পড়ে নাই। অন্তত: সামনের দাঁত না। হাসিয়া হামিদ বলিল: সময় হৈলেই সে হুকুম পাবেন?

-সময়? সময় আবার কি? বয়স কি তোমার কম হৈছে?

-সময় আমার না, আপনার?

-আমার আবার সময় কি?

-এই ধরেন আপনার দুইটা দাঁত। দশ বছর আগে পড়ছে। এই দশ বছরে আর একটা দাঁতও যখন পড়ে নাই, তখন দাঁত দুইটা বাঁধান কি আপনার উচিত ছিল না? এবার বাসায় নিয়াই পয়লা কাজ আপনার দাঁত বাঁধান। তারপর মুখ-ভরা দাঁত লৈয়া আপনে নাতি-বউ আনবার ঘটকালি করবেন। কেমন?

শাহ সাহেব উচ্চস্বরে প্রাণ খুলিয়া হাসিলেন। হাসির তালে-তালে তাঁর প্রশস্ত ভুড়ি নাচিতে লাগিল। হাসি থামিলে বলিলেন: দাঁত বাঁধাইয়া বাড়ি ফিরলে তোমার নানী আমারে ঘরে ঢুকতে দিব না। তোমার নানীর প্রায় সবগুলি দাঁত পৈড়া গেছে। মাথার চুলও সাদা। বয়সে তার এক কুড়ি বছরের বড় হৈয়াও আমার দাঁত কেন পড়ল না, তার লাগি যত রাগ আমার উপর।

একটু থামিয়া চোখ ঠারিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন: বুঝতেই পার না নানাভাই, পড়া দাঁত বাঁধাইয়া যদি ঘটকালি করতে যাই, তবে তোমার নানী মনে করবে তোমার বিয়ার ঘটকালি করতাই না, করতাই আসলে নিজের বিয়ার পড়া বয়সে আমারে ঘর-ছাড়া করতে চাও নানাভাই?

হামিদ সত্য-সত্যই ভাবিয়াছিল এবার বাসায় ফিরিয়াই নানাজীর দাঁত বাঁধাইয়া দিবে। তাঁর কথা শুনিয়া এখন সত্য-সত্যই ঠিক করিল, ওকাজ কখনও করিবে না। মুখে বলিল: আপনার দাঁত বাঁধানের কথা না হয় সাদাই দিলাম। কিন্তু এ মুহূর্তে আপনে একটা নাতিবউ পাইতেছেন কই? বাসায় ত আপনার ভারি অসুবিধা হৈব।

এই যুক্তিতে হামিদ শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাসায় নেওয়াটা পিছাইয়া দেয়, সে আশঙ্কায় বুড়া বলিলেন: কি যে কও নানাভাই? তুমি বড় লোক আমির মানুষ। তোমার যেখানে অসুবিধা হয় না সেখানে আমার মতো একটা নেংটিওলা ফকিরের অসুবিধা হৈব, ইটা কি একটা কথা হৈল? বাদ দেও ও-সব কথা।

শাহ সাহেবের কথা মানিলে হামিদের সংকল্প ব্যর্থ হয়। তাই সে বলিল: এটা আমির-ফকিরের কথা না। জোয়ান-বুড়ার কথা। আমি জোয়ান মানুষ। সবই করতে পারি নিজ হাতে। আপনে বুড়া মানুষ তা পারবেন কেন? তাছাড়া আমার বাসায় মেহমান হৈয়া আপনে তা করবেনই বা কেন? আচ্ছা নানাজী একটা কাজ করলে হয় না।

-কি কাজ?

-আম্মারার একজনকে নিলে হয় না?

শাহ সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন: আম্মারা মানে আমার ভাস্তিটা ত? তোমার-আমার যত্ন-আস্তির দিক দিয়া মন্দ হৈত না। কিন্তু সে বেটি শহরে গিয়া এক রাতও

থাকতে পারব না। দম আটকিয়া মৈরাই যাব। এমন খোলা-মেলা ঘর-দরজা, গোসলের তালাব, দুনিয়ার হাওয়া-বাতাস শহরে পাব কই?

একটু থামিয়া বুড়া আবার বলিতে লাগিলেন: ইটাও আমার আসল আপত্তি না। আসল আপত্তি অন্য দিকে। আমার ভাস্তিটা বড়ই সিধা শান্ত মানুষ। বুদ্ধি-সুদ্ধিও কম। লেখাপড়াও বেশি-কিছু জানে না। তোমার আত্মা ফতেপুরের পীর সাহেবের বিবি তোমার বাসায় গেছে এ খবর শুনলে তোমার দুষ্ট-এগানারা বাসায় ভাইংগা পড়ব তারার বউ বেগমরারে লৈয়া। ও সবই বি.এ-এম. এ পাশ করা মেম সাব। আমার ভাস্তি ওরার সাথে কথাই কইতে পারব না। দেখাই করব না। বেপর্দা মেয়েরারে সে আওরতই কয় না। ওরা নাকি মরদ। তাতে তোমার মেহমানরার সাথে তোমার আত্মা দেখাই করব না। তুমি কইলেও না। কি শরমের কথা হৈব সেটা একবার ভাইবা দেখ।

এই বুড়া উম্মি হইলেও কত জ্ঞানী, কত আকেলমন্দ। আধুনিকের মতোই সব কথা তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছেন। নানাজীর প্রতি তার শ্রদ্ধাভক্তি বাড়িয়া গেল। সে ব্যাকুল ভাবে বলিল: তবে কি করা যায় নানাজী? আর কাউকেও নেওয়া যায় না?

-আর কারেও মানে সাজেলা আত্মা ত? তার কথাই উঠতে পারে না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শাহ সাহেব আবার বলিলেন: হেঁ থাকত যদি আজ ছোট-মা। তারে তুমি চোখ বন্ধ কৈরা বাসায় নিবারও পারত। মানাইত। কিন্তু সবই বরাত। সাঁইএর ইচ্ছা।

হামিদ এতক্ষণ ধরিয়া এই কথাটার জন্যই একরূপ ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। শাহ সাহেবের মুখে কথাটা বাহির হওয়া মাত্র সারা দেহে পুলকের চাঞ্চল্য বহিয়া গেল। কিন্তু অতি কষ্টে সে ভাব গোপন করিয়া বলিল: ভাল কথাই মনে করছেন নানাজী। আচ্ছা, ছোট আত্মা এখন আছেন কেমন? কোথায় আছেন?

বুড়া আড়চোখে হামিদের মুখের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন: আছে ত তিনি ভাইএর বাড়িতেই। ভাইটাও বছর দুই মারা গেছে। কেমন আছে তা ত তুমি আন্দাজই করতে পার। ভাইস্তারা সব পিরথক হৈয়া গেছে। ফুফু কার ভাগে পড়ছে কেউ জানে না। তার দরকারও নাই। সারা দিনে একবেলা পাইলে খায়, না পাইলে না খায়।

-বলেন কি নানাজী? ছোট আত্মা উপাস থাকেন?

-উপাস থাকে না। রোয়া করে। বার মাস রোয়া।

-তবু ত রাতে খাইতে হয়। এফতারি-সেহরি?

-চেলা যায় এক মতো। পাড়ার মেয়েরা এটা-ওটা দেয়। তারার এটা-ওটা সিলাই কৈরা দেয় ত?

-ছোট আত্মা সিলাই করতে পারেন? তিনি না শুনছি পাগল?

-কেটা কৈছে পাগল? পাগলামি তার শুধু একটা। রাতদিন কেবল 'বাপজান' 'বাপজান' জপনা। আগে জোরে-জোরে কৈত। ইদানকি বিড়-বিড় কৈরা কয়।

হামিদের মুখের উপর নজর ফেলিয়া বলিলেন: বাপজান কে জান নানাভাই? তুমি। এই বিশ-পচিশ বছরেও সে তোমারে ভুলে নাই।

হাতের গামছাটা দিয়া বুড়া চোখ মুছিলেন। হামিদের অন্তরাখ্যা চিৎকার করিয়া উঠিল। তারও চোখ ঠেলিয়া পানি আসিতে লাগিল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া আস্তিন দিয়া চোখ মুছিল।

ধরা গলায় হামিদ বলিল: আমি ছোট আন্মারে দেখতে যাব। আপনে আমারে লৈয়া যাবেন?

মুহূর্তে শাহ সাহেবের চোখের পানি শুকাইয়া গেল। হাসি মুখে তিনি বলিলেন: তুমি যাবা তারে দেখতে? কি দরকার? তোমার হুকুম পাইলে আমি গিয়া তারে নিয়া আসি।

হামিদ মাথা নাড়িয়া বলিল: সেটা ভাল দেখায় না নানাজী। তিনি মা। আমি তাঁর সন্তান। মাকে সন্তানের কাছে না আইনা সন্তানেরই উচিত মার কাছে যাওয়া।

শাহ সাহেব ও-কথার সোজা অর্থ করিলেন না। তিনি বুঝিলেন বাপের স্মৃতি ও সৎমাদের মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হামিদ ছোট আন্মাকে ফতেপুরের বাড়িতে আনায় আপত্তি করিতেছে। কিন্তু তাতে তিনি দুঃখিত হইলেন না। হামিদের প্রতি বেজারও হইলেন না। বরঞ্চ ভাবিলেন, হামিদ ঠিকই করিয়াছে। তাই বলিলেন: আচ্ছা। তাই চল। কবে যাবার চাও?

-আজই চলেন না। বাড়ি তক গাড়ি যাব ত?

-রাস্তা ভাল। গাড়ি চলব। কিন্তু আজ যাওয়া চলব না। আগে খবর দিয়া যাইতে হৈব।

-কেন?

-তোমার মতো বড়লোক বিনা খবরে ওরার বাড়ি গেলে বেচারারা ভারি বেকায়দায় পড়ব। তাছাড়া আরেক কারণে আগে খবর দেওয়া উচিত। আর যাওয়া দরকার আমার নিজেরই।

-আপনের নিজের যাওয়ার দরকার কি?

-হঠাৎ বিনা-খবরে এতকাল পরে তুমি গেলে মাইয়ার একটা অঘটন ঘৈটা যাবার পারে। তুমি ডাক্তার মানুষ। তোমারে কওয়ার দরকার করে না। আমি ছাড়া অন্য কেউরে দিয়া খবর পাঠাইলেও চলব না।

হামিদ বুড়াব কথার অর্থ বুঝিল। রাজি হইল।

প্রস্তাব-মতো শাহ সাহেব চলিয়া গেলেন। সেখান থনে খবর পাইবার পর দুইজন সাথী লইয়া হামিদ ছোট আন্মাকে দেখিতে গেল।

বাতাসে খবর রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। হামিদ যখন সে বাড়িতে পৌছিল, তখন আংগিনা লোকে ভর্তি। গাড়ির আওয়াজে আরও লোকজন ভাংগিয়া পড়িতে লাগিল। সমবেত লোকজনকে দু'চার কথায় সমুষ্টি করিয়া হামিদ শাহ সাহেবের পিছনে-পিছনে বাড়ির মধ্যে ঢুকিল।

শাহ সাহেবের আগে যাওয়ার সত্যই সুফল হইয়াছিল। বহুকাল কেউ কাউকে দেখে নাই। তবু যেন মা ও সন্তানের মধ্যে আত্মায়-আত্মায় পরিচয় হইয়া গেল। হামিদ যখন 'ছোট আন্মা' বলিয়া তাঁর কদম-বুসি করিতে উদ্যত হইল শুধু তখনই ছোট আন্মা 'বাপজান গো' বলিয়া হামিদকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিয়া

ফেলিলেন। কিন্তু শাহ সাহেবের ধমকে মোটরের ব্রেক চাপার মতোই তড়িতে তিনি কান্না থামাইয়া ফেলিলেন।

বোধ হয় শাহ সাহেবের পরামর্শে ঐদিন ছোট আম্মাকে তাঁর ভাতিজা-বৌ এরা একটা পরিষ্কার জামা-কাপড় পরাইয়াছিল। শাহ সাহেবের ইশারায় হামিদ যখন মার কাঁধে হাত দিয়া নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকিল, তখনও বোঝা গেল, একটি চৌকিতে সাধ্যমতো পরিষ্কার বিছানা-বালিশ পাতা হইয়াছে।

বড় লোকের আপ্যায়নে গরিবের সাধ্যমতো পিঠা-টিটা নাশতার আয়োজন করা হইয়াছিল। হামিদের আপত্তি সত্ত্বেও সেগুলি বিছানায়-পাতা দস্তরখানে এক-এক করিয়া সাজান হইতে লাগিল। দরজার ও-পাশ হইতে বোধ হয় বৌ এরা সরবরাহ করিতে থাকিল। আর ভাতিজারা সেগুলি দস্তরখানের উপর বসাইতে লাগিল। এ ধরনের ব্যাপারে পাড়াগাঁয়ের মেহমানদারি হাস্যকর রূপে বেআন্দায্য। দুইজন লোকের জন্য যে নাশতা আনা হইল তাতে অনায়াসে দশ বার জনের খাওয়া হইতে পারিত। তাছাড়া হামিদ ঐ শ্রেণীর খাদ্য খাওয়ায় মোটেই অভ্যস্ত নয় বলিয়া শুধু ভদ্রতার খাতিরে ছুইয়া-ছুইয়া রাখিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু ওরই মধ্যে ছোট আম্মা বাহিয়া-বাহিয়া-কিছু হামিদের হাতে দিলেন, হামিদ দেখিল, সেগুলি খাওয়া চলে। ছোট আম্মা যে ফতেপুরের পীর বাড়ির রীতি ভুলেন নাই, হামিদ তা বুঝিতে পারিয়া পুলকিত হইল। শাহ সাহেবের খোঁজে এটাও বুঝা গেল যে হামিদের সংগী দুইজনকে বাহির বাড়িতে নাশতা দেওয়া হইয়াছে। কাজেই কোন দিক দিয়াই যত্নের ত্রুটি হইল না।

নাশতা-শেষে শাহ সাহেবের হুকুম-মতো সবাই বাহির হইয়া গেল। শাহ সাহেব হামিদ ও ছোট আম্মার মধ্যে অল্পক্ষণ গোপন আলাপ হইল। হামিদ বুঝিল শাহ সাহেব নাহক আগের দিন আসেন নাই। বৌ বলিয়া কহিয়া আম্মাকে রাজি করিয়াই রাখিয়াছেন।

অল্পক্ষণ পরেই শাহ সাহেব ঘোষণা করিলেন যে পীরজাদা ডা. হামিদ তার অসুস্থ ছোট আম্মাকে চিকিৎসার জন্য শহরে নিজ বাড়িতে নিয়া যাইতেছেন। এতে কারও কোন আপত্তি থাকিলে সে পীরজাদাকে জানাইতে পারে।

কারও পক্ষ হইতে কোনও আপত্তি হইল না। বরঞ্চ সকলেই উৎসাহের সংগে সম্মতি জানাইল। অবশেষে দিন-তারিখ ঠিক করিয়া ছোট আম্মার জন্য মানান-সই জুতা-জামা-শাড়ি কিনিবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা এবং বাড়ির বৌ-দের প্রত্যেকের জন্য এক জোড়া শাড়ি-জামা কিনিবার টাকা দিয়া হামিদ সন্ধ্যার দিকে বিদায় হইল। ঠিকমতো সব ব্যবস্থা করিবার জন্য শাহ সাহেব রহিয়া গেলেন।

ফতেপুরে ফিরিয়া হামিদ আম্মাদের কাছে এবং বাড়ির ও পাড়ার আর সব লোকজনের কাছে সুকৌশলে কথাটা প্রচার করিল। ভিন্ন-ভিন্ন কারণে সকলেই এ ব্যবস্থার সমর্থন করিলেন।

ছাই-এ রতন

১

আজ তিন দিন হয় হামিদ ছোট আশ্মা ও নানাজীকে লইয়া বাসায় ফিরিয়াছে। কিন্তু এই তিন দিনেও সে নানাজীর সাথে তার মতলবের কথা বলিবার সুযোগ পায় নাই। কারণ এ তিন দিনই সকাল-বিকাল হামিদের বাসায় লোকের ভিড় ও ধুমধাম। উপকৃত জনসাধারণ ও শ্রমিকনেতাদের মধ্যে হামিদের ভক্ত অনুরক্তের সীমা নাই। বন্ধু-বান্ধব হিতৈষীর সংখ্যাও কম নয়। নিজের মা ও নানাকে বাসায় আনিয়াছে এবং সে মা রুগণ অসুস্থ, এ খবর পাইয়া কতজন আদর করিয়া ফল-মূল এটা-ওটা লইয়া দেখা করিয়াছে। কারও বাগানের আনারস, গাছের কলা-ডালিম, পুকুরের মাছ। হামিদ দুহাতে এত মানা করিয়াছে। কেউ মানে না। ছোট আশ্মা এসব কথাই জানিতেছেন। এতেই তিনি অর্ধেক সারিয়া উঠিয়াছেন। তাঁর মুখে বহুদিন আগের মিষ্টি হাসি ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাছাড়া হামিদ এই তিন দিনে ছোট আশ্মার সকল প্রকারের ফিজিক্যাল ও প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা শেষ করিয়াছে। দেখিয়া ও জানিয়া সে নিশ্চিত ও আনন্দিত হইয়াছে যে ছোট আশ্মার শরীরে যান্ত্রিক বা বৃত্তিক কোন রোগ নাই। তাঁর যা কিছু শীর্ণতা ও স্বাস্থ্যহীনতা সবই ঘটিয়াছে পুষ্টিকর খাদ্য ও নিয়মিত বিশ্রাম ঘুম গোসলের অভাবে। আশ্মাকে হামিদ নিজে এসব কথা বলিয়াছে এবং বুঝাইয়াছে। ভাল হইবার জন্য হাত ধরিয়া আদব করিয়া অনুরোধ করিয়াছে। হামিদ দেখিয়া পুলকিত হইয়াছে যে ছোট আশ্মা সবতাতেই প্রায় বিনা-আপত্তি ও বিনা-প্রতিরোধে রাজি হইয়াছেন। লোক-মুখে তাঁর কথা শুনিয়া নিজে না দেখিয়া হামিদ ছোট আশ্মার যে ছবি কল্পনায় আঁকিয়াছিল, এতদিনের অসুখের কথাটা বাদ দিয়া তার সবটুকুই সে তাঁর মধ্যে পাইয়াছে। গর্ভধারিণী মা সম্বন্ধে হামিদের কোনও অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু বই-পুস্তক পড়িয়া মা সম্পর্কে হামিদের যে ধারণা হইয়াছে, সে যেন এই নারীর মধ্যে সে মাতৃত্বের পূর্ণ ছবি দেখিতে পাইল। হামিদ অনুভব করিল তার নিজের মধ্যেও ইতিমধ্যে নতুন করিয়া একটা সন্তানত্বের উন্মেষ হইয়াছে। এ অনুভূতি বড় মধুর।

আসলে ছোট আশ্মা পয়লা দিনই চারি আনি ভাল হইয়া গিয়াছিলেন। জীবনের প্রথম মোটরে চড়া, সুদীর্ঘ পথ মোটরে বেড়ান, দু'পাশের গাছ পালা ও খোলা দিগন্তের রূপ প্রাণ ভরিয়া দেখা, নিজের প্রাণ-পুতুলি বাপজানকে বাতাসের আগে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানো দেখা, এ সব ছোট আশ্মার বুকে মুহূর্তে-মুহূর্তে যে ভাব-পরিবর্তন হইয়াছে, তাতেই যেন তাঁর বহু দিনের মরিচা-ধরা মরা প্রাণে একটা সরসতা আসিয়া পড়িয়াছিল। হাত-পা হীন এই যন্ত্র-দানবটাকে তার কলিজার টুকরা বাপজান শুধু হাতের জোরে হাওয়ার বেগে চলাইয়া নিতেছে, সামনের ডাইনের গাড়ি-ঘোড়ার সাথে ধাক্কা লাগে-লাগে করিয়া কেমন কৌশলে চট করিয়া ভোঁ করিয়া পাশ কাটাইয়া নিয়াছে,

এসব দেখিয়া অনেক বার তাঁর দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, চোখ আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এত সব বিপদ কাটাইয়া বাপজান যখন নিরাপদে অক্ষত দেহে একটা বাড়িতে ঢুকিল এবং বলিতে গেলে ঘরের মধ্যেই গিয়া মোটর থামিল, তখন ছোট আন্নার ঘাম দিয়া যেন জ্বর ছাড়িল। তিনি মন ও দেহের দিক দিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন।

প্রথম দিনই হামিদ ছোট আন্নার নিজস্ব একটি চাকরানী রাখিয়া দিয়াছে। তাতে নানাজীও মোটেই বেজার নন। তিনি হামিদের কাছে খোঁজ খবর নিয়া, ক্লিনিকের দারওয়ান-কম্পাউণ্ডারের সাহায্য লইয়া, নারায়ণগঞ্জ শহর, জাহাজ ঘাটার টার্মিনাল, নদীর ধার ও পাট-কল দেখিয়া বেড়াইয়াছেন। হামিদ যদি আরও অনেক দিন তাঁকে না ডাকে, তাতেও শাহ সাহেবের ঠেকা নাই। এত জিনিস তাঁর দেখিবার আছে। খরচ পত্রের তাঁর কোনও অভাব নাই। এখানে পৌছিয়াই হামিদ তাঁর হাতে পঁচিশটা টাকা গুঁজিয়া দিয়াছে। তার খুব কমই তিনি খরচ করিয়াছেন। খরচ তাঁর করিতেই হয় না। যান-বাহনে তিনি চড়েনই না। পায়দল হাঁটিয়া বেড়ান। তাই তাঁর সারা জীবনের অভ্যাস। ফকিরের পায় লক্ষ্মী। খরচের মধ্যে রাস্তা-ঘাটে দুচার পয়সার পান, আর দুই এক কাপ চা।

ওদিকে হামিদ দিনের বেলা বেশিক্ষণের জন্য ক্লিনিকে যাইতে পারেন না। বলিয়া রাতের দিকে অনেকক্ষণ সেখানে থাকে। বাদ মগরেব ছোট আন্মাকে ঘুমাইতে পথ্যাদি খাওয়াইয়া হামিদ ক্লিনিকে চলিয়া যায়। ছোট আন্মাকে বলিয়া যায় ঘুমাইতে। ছোট-আন্মা কিন্তু ঘুমান না। তিনি জায়-নমাজে বসিয়া নমাজ ও তসবীহ তেলাওতে সময় কাটান। শান্তি-হেতু অনেক সময় সিজদায় গিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। চাকরানী বানুর মা অদূরে বসিয়া-বসিয়া নজর রাখে। বিছানায় গিয়া ঘুমাইতে আন্মাকে অনুরোধ করে। আন্মা জবাব দেন, তার ঘুম লাগে নাই। তিনি সিজদায় পড়াছিলেন মাত্র।

অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিয়া হামিদ যখন বাবুর্জিকে চুপেচুপে খানাকামরায় তার খানা দিতে বলে, তখন বিস্মিত হইয়া দেখে, ছোট-আন্মা তখনও সজাগ। আর নানাজী নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। হামিদের আপত্তি তখি-তিরস্কার সত্ত্বেও রোজ এটা চলে। হামিদের খাবার সময় আন্মা পাশের চেয়ারে বসিয়া ‘এটা নেও ওটা নেও’ বলেন। সেজন্য হামিদ সকাল-সকাল বাসায় ফিরিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু উঠি-উঠি করিয়াও ক্লিনিকের চেয়ার ছাড়িতে পারে না। রোগীর এত ভিড়। দিনের ভিড়টা রাতে যেন বাড়িয়াছে। হামিদের রোগীদের বেশির ভাগের যেন দিনের চেয়ে রাত্রেই বেশি সুবিধা।

রোজই হামিদ মনে করিয়াছে, সেই রাত্রেই সে নানাজীর সাথে তার মকসুদের আলোচনা করিবে। নানাজী ঘুমাইয়া পড়ায় রোজই হামিদের সংকল্প ব্যর্থ হইয়াছে। পরে বুঝিয়াছে ওটা ভালই হইয়াছে।

এবার হামিদ ফতেপুর কুতুবখানা হইতে বাছিয়া-বাছিয়া কয়েকখানা কিতাব আনিয়াছে। এর দুই একখানা বাংলা উর্দু কিন্তু বেশির ভাগই আরবী-ফারসী। এগুলি পীর সাহেবের খাস কিতাব। সকলের পড়া নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই ছেলেবেলা হামিদ বাপজানের অজ্ঞাতে এই সব কিতাব পড়িবার চেষ্টা করিত। পড়িতে পারিত খুব কমই। বুঝিত তার চেয়ে কম। তবু অজ্ঞাত কারণে এইসব বইএর প্রতি হামিদের একটা

অনির্বচনীয় আকর্ষণ ছিল। সামান্য বুঝিয়া বেশির ভাগ না বুঝিয়া এইসব কিতাবের মধ্যে একটা ঐন্দ্রজালিক কুহকের পরিবেশ অনুভব করিত। এর মধ্যে বড় পীর সাহেবের 'গুনিয়াতুত্তালেবিন' ইমাম গায়যালীর 'এহিয়াউল উলুম' হুসেন আমির সুহরাওয়াদীর 'নুযহাতুল আরওয়া' খাজা গেসু দারায়ের 'আস্মাউল আসরার' ইত্যাদির কথাই তার বেশি মনে পড়িত। এবার ফতেপুর হইতে এই সব কিতাবই সংগে আনিয়াছে। অথ্যে কিতাবগুলির কিছু-কিছু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কীটেও কাটিয়াছে। হামিদ দিনের বেলা এগুলিতে গ্যামাস্ট্রিন ছড়াইয়া রোদে দিয়াছে। রাতের বেলা এর একটু ওর একটু পড়িয়া-পড়িয়া নানাজীর সাথে আলাপ করিবার জন্য তৈয়ার হইয়াছে। নানাজী অবশ্য এসব কিতাব কোনও কালে পড়েনও নাই। খবরও রাখেন না। কিন্তু দাদাজীর কাছে নানাজী যদি সত্যি কিছু শিখিয়া থাকেন, তবে তা এইসব কেতাবের কথাই হইবে নিশ্চয়। হামিদের এসব পড়া থাকিলে তা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

চৌথা দিনে দুপুরে খানা খাইবার সময় হামিদ বলিল: নানাজী, আজ রাতে আপনার ঘুম নষ্ট করতে চাই। কিছু মনে করবেন না ত?

নানাজী হাসিয়া জবাব দিলেন: নানাভাই যে কি বলে? আমার আবার ঘুম নষ্ট কি? আমার কি আর ঘুম হয়? বুড়া চোখে কি ঘুম আছে? তা যত ঘুমই থাক, তোমার কথাটা ত শোনাই লাগব। তোমারই কাজে ত আমি আসছি।

হামিদ ব্যস্ততার সাথে বলিল: এ কথা কইবেন না নানাজী। আমি আপনার আশ্রিত আছি। বৈলাই আমার কথা শুনবেন? নইলে শুনতেন না?

-না না তা হৈতে যাব কেন? আমি সব সময় তৈয়ার আছি। এখন কও ত এখনই রাজি।

-জি না। আজ রাতেই আমরা বসব। আপনে তা হিলে দিনের বেলা এক-আধটু ঘুমাইয়া লন।

ঠিক হইল সেইদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁরা গল্প-গোয়ারি করিতে বসিবেন।

২

হামিদের কথা শুনিয়া শাহ সাহেব বলিলেন: আমি মনে করছিলাম একটা বিয়ার ঘটকালি করুম, তা না এসব কি কথা তুলছ নানাভাই? তুমি ডাক্তারি ছাইড়া আবার পীরগিরি ধরবা নাকি?

হামিদ হাসিয়া বলিল: তাতে আপনার ভয় হয় নাকি? আমি পীরগিরি ধরলে আপনার মুরিদ কইমা যাব? বাপজানের এন্তেকালের পর আপনার মুরিদ বাড়ছে কিছু নিশ্চয়?

-কি যে কও নানাভাই? দামাদ মিয়ার লাইন আর আমার লাইন দুইটা আলাদা লাইন। তানি থাকতে আমার কোনও ক্ষতি আছিল না। তানি চৈলা যাওয়ার পর আমার কোন লাভও হয় নাই।

-তবে আর আপনার আপত্তিটা কি?

-আমার আপত্তি আছে কই কইলাম? আপত্তি আসলে তোমার। তুমি কেন যাবা পীর হৈতে? তুমি কি আবার ধার্মিক হইয়া উঠছ নাকি? আমরা শূন্যতাম তুমি আল্লা-খোদা দিন-ধরম কিছু মান না, তবে কি ওটা ঠিক কথা না?

-শুনছেন আপনারা ঐ রকমই তবে। ওর সবটুকুন সত্য না। আমি দিন-ধর্ম মানি না ঠিকই, কিন্তু আল্লা-খোদা মানি।

বিস্ময়ে শাহ সাহেব চোখ বন্ধ করিয়া বলিলেন: সেটা আবার কেমন কথা? দিন-ধরম না মাইনা আবার আল্লা মানে কেমনে?

হামিদ: নানাঙ্গী, আপনিই ত একদিন কৈছিলেন: আল্লা এক ধর্ম অনেক। কাজেই আল্লা মানা যত সহজ ধর্ম মানা অত সহজ না। কইছিলেন কি না?

শাহ: দেখ ত পোলাপানের মোচড়ের কথা। আমি কইছিলাম ওটা ফকিরির কথা! শরিয়তের কথা ত আমি কই নাই।

হামিদ এবার হাসিয়া উঠিল। হো হো থামাইয়া শেষে বলিল: আপনার কাছে শরিয়তের কথা শুনতে চাইল কে? আপনি ফকির মানুষ, ফকিরিতেই এক্সপার্ট।

শাহ: ফকিরিতেও আমি এস্পারও না ওস্পারও না। ফকিরিরই বা আমি কি জানি?

হামিদ: আর কিছু জানেন বা না জানেন নেসবতে-বায়নানাস আপনাকে খুব ভাল জানেন। সেইটাই শিখান আমারে।

শাহ: তাও ত তুমি জানই। একজনের রুহের সাথে আরেক জনের রুহের কথা কওয়ার নামই নেসবতে-বায়নানাস। এটা ত তোমারই মুখের কথা।

হামিদ আবার হাসিল। বলিল: আমার জ্ঞান ঐ পর্যন্তই নানাঙ্গী। তার পরে কি, তাই বলেন। রুহে-রুহে কেমনে কথা কওয়ান যায় তাই আমারে শেখান।

শাহ সাহেব একবার মাথা চুলকাইলেন, আরেকবার ছাদের দিকে চাইলেন। তারপর হামিদের দিকে আরকটু আগ বাড়িয়া বলিলেন: মানুষের মন দুইটা: একটা যাহেরী, আরেকটা বাতেনী। একটা জেসেমী আরেকটা রুহানী। একটারে কই আমরা বুদ্ধি, আরেকটারে কই বিবেক।

বুড়ার কথাগুলি হামিদের পছন্দ হইল। মাথা ঝুকাইল ত বটেই। মুখেও তার সমঝদারি ফুটিয়া উঠিল। মুখে শুধু বলিল: ঠিক।

শাহ সাহেব উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন: দুনিয়াতে আমরা যে-কিছু করি সবই এই বুদ্ধির মানে যাহেরী মনের কাজ। এতে বাতেনী মনের বা বিবেকের কোনও হাত নাই। মাঝে-মাঝে বিবেক যদিও মাথা উচা করবার চায়। কিন্তু যাহেরী মনের ধমকে সে পিছাইয়া পড়ে। কারণ দুনিয়াবী কাজে যাহেরী মনেরই বাদশাহি।

হামিদের মনে পড়িল বিলাত থাকিতে কৌতূহল-বশে সে লণ্ডন সোসাইটি-অব-সাইকিক্যাল রিসার্চ-এ যাতায়াত করিত। ওদের বই-পুস্তকও কিছু-কিছু পড়িয়াছিল। দু-এক খানা সে কিনিয়াও ছিল। ওদের লেকচারে ও বই-পুস্তকে সাবজেকটিভ মাইণ্ড ও অবজেকটিভ মাইণ্ড বলিয়া দুইটা মনের কথা জানিতে পারিয়াছিল। ওখানকার লোকেরা উচ্চ শিক্ষিত বড়-বড় পণ্ডিত লোক। ওঁদের রিসার্চের কোনও খবর জানা বা ওঁদের বই-

পুস্তক পড়া এই অর্ধ-শিক্ষিত পাড়া-গেঁয়ে ফকিরের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু এই দুই মতবাদের মধ্যে কি অদ্ভুত মিল! নানাজী এসব কথা নিশ্চয়ই দাদাজীর মুখে শুনিয়াছেন। দাদাজী নিশ্চয়ই হামিদের-আনা এইসব কিতাবেই পড়িয়াছিলেন। তবেই দেখা যায় কথাটা নতুন নয়। তা যদি না হয়, তবে নিশ্চয় এর মধ্যে অনেক সত্য আছে। হামিদের মুখে আনন্দের হাসি ফুটিল।

হামিদ তাঁর কথা বুঝিতেছে বলিয়াই তার মুখে হাসি। শাহ সাহেব উৎসাহিত হইলেন। বুঝিবে না? যতই নাসারার বিদ্যা পড়ুক, বিজ্ঞান পড়িয়া যতই নাস্তিক হউক, কোন্ খান্দানের ছেলে বুঝিতে হইবে ত? ফতেপুরের পীর বংশের লহু ত? তিনি গলায় জোর বাড়াইয়া কিন্তু সুর চাপাইয়া বলিলেন: ঠিক তেমনি রুহানী ব্যাপারে বাতেনী মনের বাদশাহি।

হামিদ: সেটা হয় কেমন কৈরা?

শাহ: রুহের স্থান-কাল নাই। তার কোনও অজুদ নাই। যাহেরী মন মানুষের শরিলের বাইরে যাবার পারে না। কিন্তু বাতেনী মন আমরার শরিল ফেইলা সারে-জাহান ঘুরা আসবার পারে।

হামিদ: এটা সম্ভব নাকি?

শাহ: শুধু সম্ভব না। সোজা। আব-আতশ-খাক-বাদ এই চার চিজই যেমন দুনিয়া জোড়া আসলে এক বস্তু, তেমনি দুনিয়ার সব মানুষের রুহই আসলে এক রুহ। দুনিয়ার যেখানে যত পানি আছে সব পানির গোড়া যেমন সমুদ্রের, সব রুহের গোড়া তেমনি রুহুল কুদ্দুস, পরমাত্মা, অর্থাৎ আল্লা। সব মানুষের রুহই সেই রুহুল কুদ্দুসের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

হামিদ একটু বাঁকা হাসিয়া বলিল: এটা কি শরিয়তের খেলাফ কথা না, নানাজী? চিশতিয়ারা না শরিয়ত মানেন!

শাহ: হেঁ মানিই ত। কোন্টা শরিয়তের খেলাফ কথা কইলাম?

হামিদ: এই যে কইলেন সব মানুষের রুহই আল্লার রুহের অংশ?

শাহ: কথাটা শরিয়তের খেলাফ হৈল কেমনে? কেউর মরার খবর পাইয়া আমরা সাথে-সাথে কি কথাটা কই?

হামিদ: ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন।

শাহ: এর মানে আল্লার থনে আসছে, আল্লাতেই ফিইরা যাব। তাই না, নানাভাই?

হামিদ: জ্বি হাঁ।

শাহ: এই কথাটার সাথে যোগ কর রসুলুল্লাহ সেই মহামূল্য কথাটা। যাতে তানি কইছেন: কুল্লু শাইয়েন-শাইয়েন-কি কথাটা না নানাভাই? উম্মি মানুষ আমি, তাছাড়া আরবীটা আমার স্মরণ থাকে কম।

হামিদ: কুল্লু শাইয়েন ইয়ারজুউ আস্লেহি।

শাহ: হাঁ, হাঁ ভাই, ঐ হাদিসটা। ওতে ত রসুলুল্লাহ সাফ্ সাফ্ কৈয়া দিছেন সব বস্তুই তার আদিতে গিয়া মিশব। তা হৈলে খোদ রসুলুল্লাহ কৈছেন সব মানুষের আদি। বস্তু খোদা। খোদাই যে সব রুহের আদি-অন্ত কালামুল্লায়ও সে কথা বলা হৈছে।

একটু-দম নিয়া শাহ সাহেব আবার বলেন: আর বলা হৈবই না বা কেন? মানুষের রুহ আলাদা-আলাদা অজুদে বাস করে বৈলাই যে তারা আলাদা, তা না। পিরথক পিরথক লাকড়িতে আগুন জ্বলে বৈলাই আমরা মনে করি ও-সব আগুন বুঝি পিরথক। লাকড়ি পুইড়া শেষ হৈলে আগুনটা নিইভা যায়। কিন্তু নিইভা সেটা যায় কই? দুনিয়া-আসমান জোড়া যে মহা-আগুন জ্বলতেছে, কালামুল্লায় যারে কইছে নুরুস সামাওতে-ওয়াল আর্য, সেই আগুনেই মিইশা যায়। সে নূরটা কি? আল্লা। তেমনি এক অজুদ শেষ হৈলে রুহের আগুন নিইভা যায়। তারেই কই আমরা মউত। কিন্তু শুধু অজুদটারই মউত হয়, রুহের মউত হয় না। ইটা ত কোরআন হাদিসের কথা। সব ধর্মের শাস্তরের কথা। ঠিক না নানাভাই?

হামিদ অবাক বিষ্ময়ে এই অর্ধ-শিক্ষিত ফকিরের মুখে এই উচ্চাংগের কথা শুনিতেছিল। সে শুধু বলিল: জ্বি হাঁ।

উৎসাহিত হইয়া বুড়া বলিয়া যাইতে থাকিলেন: তবে, অজুদের মউতের পর রুহটা যায় কই? ঐ নিভা আগুনের মতোই সে রুহ মিইশা যায় মহা রুহ ঐ রুহুল কুদ্দুসের মধ্যে।

নানাজীর কথাগুলির কতক বৈজ্ঞানিক কতক অবৈজ্ঞানিক, কতক দার্শনিক কতক অদার্শনিক, কতক জ্ঞানের কতক অন্ধ অজ্ঞানের, কতক শরিয়ত-সম্মত, কতক শরিয়ত-বিরোধী। আলেমের পুত্র আলেম, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানী হামিদের কাছে তা স্পষ্টই ধরা পড়িল। কিন্তু এটাও সে অন্তর দিয়া বুঝিল যে সব কথা তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিবার মতো নয়। আবার গ্রহণযোগ্যও নয়। মুখে এই মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া শুধু কৌতূহল দেখাইয়া বলিল: রুহ যদি এতটুকু শক্তিশালী তবে মানুষের যাহেরী মনের জায়গা সে দখল করে না কেন? তা হৈলে ত মানুষ আরও অনেক বেশি জ্ঞানী হৈত। মানুষের মধ্যে এমন অজ্ঞতা মূর্খতা থাকত না। কাজেই অত দুঃখ-কষ্ট, যুলুম-সেতমও থাকত না।

শাহ সাহেব বুয়ুর্গির হাসি হাসিয়া বলিলেন: এই খানেই ত কুদরতে এলাহি। সে ভেদ বুঝা কি সহজ নানাভাই? রুহানী ব্যাপারে অত যবরদস্ত হৈয়াও বাতেনী মন দুনিয়াবী ব্যাপারে একদম দুর্বল নাজুক বোকা নাবালক মাত্র। অনেক বড়-বড় বিজ্ঞানী পণ্ডিত-আলেম যে দুনিয়াবী ব্যাপারে শিশুর মতোই নির্বোধ আছিলেন, সে সব গল্প ত তুমি জানই। আমরা বাতেনী মনটা ঠিক সেই রকম আর কি?

হামিদ তাঁর কথায় বিশ্বাস করিতেছে না দেখিয়া শাহ সাহেব বলিলেন: বাতেনী মনের দুনিয়াবী বুদ্ধি-শুদ্ধি শুধু নাই না, বুদ্ধিরে সে ডরায়। তর্ক করতে জানে না। কথাই কয় না। নিতান্ত অসহ্য হইলে যাহেরী মনরে দূর থনে এক-আধটু নসিহত করে। যাহেরী মন যদি বাতেনী মনের কথা না শুনে তবে আর কিছু কয় না। চুপ কৈরা যায়।

হামিদকে কথাটা সহজে বুঝাইবার আশায় একটা নজির দিলেন। বলিলেন: তুমি ত জান, আমরা যখন কোনও অন্যায় পাপের কাজ করতে রুজু হই, তখন দিলের এক কোণ থনে বিবেক কয়: ওটা কৈর না। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি অর্থাৎ যাহেরী মন যখন ধমক দিয়া কয়: কাজটা করলে আমার লাভ হৈব, তখন বাতেনী মন তর্ক না কৈরা চুপ মাইরা যায়। এর কারণ কি জান নানাভাই?

হামিদ শুধু বলিল: কি?

শাহ: রুহ বড় শান্ত-সিধা। ঝগড়া-ফসাদ সে পছন্দ করে না। কেউ তারে অবিশ্বাস করলে সে আর কথাই কয় না। তর্ক করা ত দূরের কথা।

হামিদ: তাই নাকি?

শাহ: ঠিক তাই। তোমার মনে আছে আমারে তুমি কতবার কইছ পাড়া-গাঁ ছাইড়া শহরে আইসা বর্তির তিরকিচ্ছা করতে। শহরের লোক ধনী, বেশি ফিস দিব। কত না লোভ আমারে দেখাইছ। আমি তোমার কথা রাখি নাই। পাড়া-গাঁ ছাইড়া শহরে আসি নাই।

আড়চক্ষে হামিদের মুখ-ভাব লক্ষ্য করিয়া শাহ সাহেব বলিতে থাকিলেন: তুমি মনে করছ আমার ও-সব বুয়ুর্গি সবই ধাপ্পাবাজি। পাড়াগাঁয়ের উম্মি লোকেরে ঠকাইয়া খাই। শহরে শিক্ষিত লোকের কাছে সব ধাপ্পা ধরা পইড়া যাব। তাই আমি শহরে আসি না।

নানাজী হামিদের মনের গোপন কথা ধরিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া হামিদ লজ্জা পাইল। এমন অবস্থায় সত্য স্বীকার করিয়া লওয়া হামিদের ছেলেবেলার অভ্যাস। সে লজ্জা-মিশ্রিত হাসিমুখে বলিল: আমারে মাফ করবেন নানাজী। সত্যই আমার বিশ্বাস তাই ছিল।

হামিদের মাফ চাওয়াটা হাতের ধাক্কায় ঠেলিয়া দিয়া শাহ সাহেব বলিলেন: মাফের কিছু নাই এতে। তুমি ঠিকই করছ। ঐ কারণেই আমি শহরে আসি নাই। আসলে শহরের লোকেরা সত্যই আমার বুয়ুর্গি ধৈরা ফেলত। আমারে ভণ্ড প্রতারক বৈলা পুলিশে দিলেও তারার অন্যায় হৈত না।

বিশ্বয়ে হামিদ বলিল: কন কি নানাজী?

শাহ সাহেব প্রতি কথায় জোর দিয়া বলিলেন: ঠিকই কই। শহরে বর্তি বসাইয়া আমি কোন মতেই রুহ নাখিল করতে পারতাম না।

হামিদ: কেন পারতেন না?

শাহ: শহরের লোকেরা রুহে অবিশ্বাসী বৈলা।

হামিদ: সকলে ত আর অবিশ্বাসী না। বিশ্বাসী দু'দশ জন নিশ্চয়ই শহরেও আছে।

শাহ: তাতে হৈব না। মজলিসের হাজার লোকের মধ্যে যদি একটা লোকও অবিশ্বাসী থাকে, তবে সে মজলিসে রুহ নাখিল হবে না।

হামিদ: পাড়া-গাঁয়েও ত সবাই আর অন্ধ-বিশ্বাসী না। সেখানেও অবিশ্বাসী লোক দু'চারজন আছে।

শাহ: মজলিসের সকলের বিশ্বাসী হওয়ার দরকার নাই। শুধু অবিশ্বাসী না থাকলেই হৈল। কারও মন যদি আগে থনে অবিশ্বাসী থাকে, তবে তারে কিছু শিখানও যায় না, দেখানও যায় না। এমন লোক সম্বন্ধেই কালামুল্লায় কইছে: এরার মনে মোহর মারা, এরা চোখ থাকতে দেখে না, কান থাকতে শুনে না।

হামিদ: বুঝলাম। তা হৈলে বিশ্বাসও করে না, অবিশ্বাসও করে না, এমন মনের সামনে রুহ আসতে রাজি?

শাহ: না, তাও না। যারা অবিশ্বাস করে না, তারার মনের দরজা খুলা। এরাই আমরা বিশ্বাসী বানাইয়া লই।

হামিদ: কেমনে করেন?

শাহ: গান গাইয়া। গানের মহিমা তোমারে কি কইমু নানাভাই। আমরা চিশতিয়া তরিকার লোকেরা তাই গানের অত পক্ষপাতী।

হামিদ: জ্বি হাঁ। আমিও তা স্বীকার করি। ইংরাজিতে একটা কথা আছে: মিউজিক ইজ দি ল্যাংগুয়েজ অব দি সোল। তার মানে গান আত্মার ভাষা।

শাহ: কি কইলা মিউজিক? ইংরাজরাও মিউজিক কয় নাকি? লফ্যটা আসলে মুযিকি। ওটা মুসলমানী লফ্য। চিশতিয়া তরিকার সব কিতাবেই এলমে-মুযিকির তালিম দেওয়া হৈছে।

হামিদ: তাই নাকি? এটা ত জানতাম না।

শাহ: তুমি জানবা কই থনে? দামাদ মিয়া ত সব গান মানা কৈরা দিছিলেন। কিন্তু দাদাজীর আসলে এলমে-মুযিকির চল আছিল। তোমরার কুতুবখানায় ও-বিষয়ের অনেক কিতাব থাকবার কথা।

হামিদ মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল: গানের দ্বারাই বুঝি আপনার অবিশ্বাসী মনের বিশ্বাসী কৈরা নেন?

শাহ: গান একটা নিশা। এতে গানেওয়ালাও বিভোর হয়, শুনেওয়ালাও হয়। মজলিসের সবাই মিইলা গাইলে সে নেশা সহজে জমে। এমন মজলিসই রুহ নাযিলের সবচেয়ে ভাল জায়গা। মোহাম্মদীরার জমাতে জোরে আমিন কওয়া, হানাফীরার মিলাদে কিয়াম করা, হিন্দুরার সংকীর্তন, ক্রিস্তানরার গির্জায় সকলে মিইলা গান গাওয়া, এসবেই গানের মাহাত্ম্য পরমান করে।

হামিদ বুঝিল তাদের আলাপ খুব জমিয়াছে বটে, এবং তাতে তার জ্ঞানও অনেক বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তার আসল কথা হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। এখান হইতে আসল কথায় ফিরিতে হয় ত অনেক ঝাড়-জংগল পার হইতে হইবে। তাই হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল: আপনার কাছে অনেক জ্ঞান শিখলাম নানাজী। আজ অনেক রাত হৈয়া গেছে। আগামী কাল আমরা আবার বসব।

৩

পরের রাত। নানা-নাতিতে আবার আলোচনায় বসিয়াছেন। গত রাতের মতো আলোচনা লাইন-চ্যুত না হয়, সেদিকে আজ বিশেষ নজর রাখিবে, হামিদ সে সংকল্প লইয়াই বসিয়াছে।

কাজেই বৈঠকের শুরুতেই হামিদ বলিল: নানাজী আজ আমারে নেসবতে-বায়নান্নাসের সবক দিবেন।

শাহ সাহেব হাসিয়া বলিলেন: তোমার আর কওয়া লাগব না, আমি নিজেই মনে-মনে ঠিক কৈরা রাখছি। তুমি তখন মোরাকেবায়-বায়নান্নাসে বসবার লায়েক হৈছ, সে পরখ আমার করা হৈয়া গেছে।

হামিদ কৌতূহলে বলিল: সে পরখটা করলেন কখন?

শাহ: গত কয়েকদিন ধৈর্যই আমি খালি এই কথাটাই চিন্তা করতে আছি। তুমি যেদিন ফতেপুরে পরথম বায়নান্নাস শিখবার চাইলা, সেইদিন খনেই আমার ভাবনা শুরু হৈছে।

হামিদ: অত ভাবনাটা কিসের?

শাহ সাহেব হামিদের মুখের উপর নজর রাখিয়া দরদ-ভরা গলায় বলিলেন: তুমি কিছু মনে কৈর না নানাভাই। তুমি মোরাকেবায়ে-বায়নান্নাসে বসবার লায়েক আছিল। না। তোমারে দিয়া বায়নান্নাস হৈত না। হামিদের কৌতূহল আরও বাড়িল। বলিল: কেন?

শাহ সাহেব হাত জোড় করিয়া বলিলেন: আমারে মাফ কর নানাভাই। কারণটা কইয়া তোমার দিলে রনজ্ দিবার চাই না। কইবার এখন আর দরকারও নাই। তুমি খুব বড় একটা আহসান আমল ভাল কাজ কৈরা ফেলছ। তোমার উপর থাইকা কালা আবার কইটা গেছে। খান্দানের উপর খনে একটা মস্ত বড় আয়েব দূর হৈয়া গেছে। তোমার রুহ এখন আজাদ। তোমার রাস্তা একদম সাফ।

শাহ সাহেবের এসব হেয়ালির একটা কথাও হামিদ বুঝিল না। বুঝিল না বলিয়াই মনে-মনে ত্যক্ত এমন কি বেশ একটু গরমও হইল। বুড়া নাহক এসব বুঝুর্গি কথা কহিতেছেন। হামিদ তাঁকে অতিরিক্ত মান-মর্যাদা দিয়াছে বলিয়াই কি তিনি এতটা লাই পাইয়া গিয়াছেন? রাখিয়ার খাতিরে বায়নান্নাসের জন্য সে এই বুড়ার কাছে ঠেকা না থাকিলে শুনাইয়া দিত সে আজ বুড়াকে দুচারটা উচিত কথা কিস্তি সবই তার সহ্য করিতে হইবে। হামিদ নিরুপায়।

শাহ সাহেব তাঁর ঝোপের মতো বিশাল ভুরু কুচকাইয়া আড় চক্ষে হামিদের মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন: তুমি মনে দাগা নিও না নানাভাই। তোমার দিলে রনজ্ না দিবার লাগিই কথাটা কবার চাই নাই। এখন দেখতে আছি, কথাটা কৈলে যা কষ্ট পাইতা না কৈয়া তার দশগুণ কষ্ট দিলাম। না, কথাটা কৈয়াই ফেলি।

হামিদের অন্ধকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শাহ সাহেব বলিতে লাগিলেন: কথা আর কিছু না, এই ছোট মার ব্যাপারটা। দামাদ মিয়া সারা যিন্দিগিতে একটাই মহাপাপ কৈরা গেছেন। তা ছোট মার উপরে ঐ বেইনসাফিটা। ওটা আছিল ফতেপুরের পীর খান্দানের একটা কলংক। খান্দানের সকলের উপরই একটা আয়েবের আবার পৈড়া গেছিল। খাস কৈরা তোমার উপর।

এটা হামিদেরও মনের কথা। কাজেই সে মাথা বুকাইয়া নানাভীর মতে সায দিল। শাহ সাহেব বলিয়া চলিলেন: ছোট মার উপর এই জুলুমের একটা কিনারা করা শুধু তাঁর খাতিরেই দরকার ছিল না, ফতেপুর খান্দানের ভালার লাগিও দরকার আছিল। কাজেই এটা একটা নেক কাজ। কালামুল্লায় এই কাজকেই বলা হৈছে আহসান আমল, আমলে সালেহাত। আল্লার এবাদত-বন্দেগির কথা না এটা নানাভাই, এটা মানুষের ভাল করা। এই কাজটাই তুমি করছ। এই কারণে তুমি আজ মোরাকেবায়ে-বায়নান্নাসে বসবার লায়েক হৈছ।

খুশী হইয়া হামিদ বলিল: এ কথা তবে আগে কন নাই কেন?

শাহ সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন: আমি আগে কৈলে হৈত না। তোমারই আগে কওয়া দরকার আছিল। আহসান আমলের ভেদই হৈল এই। করনেওয়ালার ইচ্ছা হাওয়া চাই। অন্যে কৈয়া করাইলে তার পুরা মরতবা হয় না।

হামিদ: কেন হৈত না? ছোট আমার ত উপকার হৈত।

শাহ: ছোট মার উপকারটা এখানে বড় কথা না। তোমার রুহের আয়েব কাটাটাই বড় কথা। তোমার মনে আপনা থনে এই ইচ্ছাটা না জাগলে এ কাজ কৈরাও তুমি রুহের দিক দিয়া কোনও বরকত পাইতা না। দামাদ মিয়ার পাপের আবর তোমার উপর থনে সরত না। সেদিন ফতেপুরে যেদিন তুমি বায়নান্নাসের কথা পরথম কইলা, সেদিন থনেই ছোট মার কথাটা কইবার লাগি আমার মন আনচান করতে থাকে। তবু মুখ খুইলা কই নাই। তোমার মুখ দিয়া বার হওয়ার এন্তেয়ার করতে আছিলাম। ছোট মার কথাটা কয় না কেন? আল্লার কাছে শুধু এই মোনাজাত করতে আছিলাম। আখেরে যখন তুমি কইলা, আহ! মনটায় যে আমি কি আরাম পাইলাম, তা আর তোমারে কি কইমু?

হামিদ ভাবিতে থাকে অথচ নানাজীর ভয়েই কিনা সে ছোট আমার কথাটা বলিয়া তাঁর ভাতিজী মাজেলা আমার কথা এমন কি সাজেলা আমার কথা বলিয়াছিল।

শাহ সাহেব হামিদের দিকে নজর না দিয়া নিজ মনেই যেন বলিয়া যাইতে থাকিলেন: তার পর এই পাঁচটা দিন ছোট মার প্রতি তোমার আদর-যত্ন তত্ত্ব-তালাফির দিকে নজর রাখছি। রোয-রোয তুমি আমার নজরে উচা হৈয়া উঠতে আছ। আমি দেখতে আছি তোমার রুহ কুশাদা হৈতে আছে; তোমার কুওতুল-কলব বাইড়া যাইতেছে।

নানাজীর মুখে নিজের অত তারিফে হামিদ সজ্জা পাইতেছিল। অত তারিফের কি সে হকদার? সে ত ছোট আমার প্রতি নিতান্ত কর্তব্যটাই করিয়াছে। তাই সে বিনয়ের সাথে বলিল: আমার যা ফরয কর্তব্য ছিল তাই ত আমি করছি। তাতে অত তারিফ আর মরতবার কি আছে?

শাহ: আছে, নানাভাই আছে। তুমি তোমার ফরজ আদায় করছ ঠিকই, কিন্তু যার হক্কে করছ তানি কিভাবে সেটা নিছেন, সেইটাই বড় কথা। আমি এই কয়দিন রোজ একবার ছোটমার সাথে দেখা করছি। তানি কত সুখী! দিলে তাঁর কত শান্তি! তানি দিন-রাত খোদার কাছে তোমার লাগি দোওয়া করতে আছেন। তুমি ত জান ভাই মানুষের এক একটা মন আল্লার এক-একটা মস্জিদ। একটা মনে কষ্ট দিলা না একটা মস্জিদ ভাংলা। তেমনি একটা মনে শান্তি দিলা না একটা মস্জিদ বানাইলা। দুঃখীর মনে শান্তি আর ভুকার মুখে রুটি দেওয়ার মতো আমলে সালেহাত আর হৈতে পারে না। আউলিয়াবাবা দিন-রাত যে গানটি গাইতেন তা এই:

মিকোশ কে রাহতে বেজান ব-রসাদ

ইয়া দস্তে শিকাস্তা নান ব-রসাদ।

আমরা ফকিররা এর থনে বাংলা গান বানাইছি:

চেষ্টিও ব্যথিতপ্রাণে সান্দ্রনা দানিতে

অথবা আহত হাতে রুটি পৌছাইতে ।

হামিদ নানাজীর ফারসী-জ্ঞান দেখিয়া অবাক হইল । এতদিন নানাজীকে সে একটা অর্ধ-শিক্ষিত ভণ্ড ফকির বলিয়াই জানিত । এখন দেখিল তিনি শুধু ফারসী বয়েতই আবৃত্তি করিলেন না, মখরোজ-তালাফযুযও ঠিকমতো উচ্চারণ করিলেন । নানাজীর প্রতি সে আরও আকৃষ্ট হইল । নানাজীর জন্য সে গর্বও বোধ করিল । সে খুশী হইয়া বলিল: তা হৈলে নানাজী আমি এখন মোরাকেবায়-বায়নান্নাসে বসবার লায়েক হৈছি?

উৎসাহে প্রতি কথায় জোর দিয়া শাহ সাহেব বলিলেন: আলবৎ হৈছ । এক শ বার হৈছ । আমার চেয়ে বেশি লায়েক হৈছ ।

হামিদ হাসিয়া বলিল: আপনার চেয়ে লায়েক হৈছি, একথা কইয়া কি আপনি সরবার মতলবে আছেন? এখন বলবেন না ত আমারে আর শিখান লাগব না? আপনার চেয়ে বড় ফকির হইয়া গেছি?

শাহ সাহেবও সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিলেন: না তা কৈমু না । বায়নান্নাসের তরকিব তোমারে আমি এখনই শিখাইতে আছি ।

তিনি চারদিক তাকাইলেন । বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন । কামরার দরজা জানালাগুলি বন্ধ করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিলেন । কাজটা এত ক্ষিপ্ততার সাথে করিলেন যে করিবার আগে হামিদ বুঝিতেই পারে নাই, নানাজী কি করিলেন । তাই হামিদ বলিল: এর জন্য আপনি তকলিফ করবেন কেন? আমারে কইলোই পারতেন ।

হাতের ইশারায় হামিদকে চুপ করিতে বলিয়া তিনি এক হাতে কোল বালিশটা কোলে তুলিয়া হামিদের দিকে আরও একটু আগাইয়া বসিলেন । গলাটা আরও লম্বা করিয়া হামিদের খুব কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন: রুহের ক্ষেত্রে কথা কওয়া যায় দুই রকমে । একটা বর্তি ধৈরা, আরেকটা বান মাইরা । বর্তি ধরারে আমরা কই মোহন বিদ্যা । তোমরা ইংরাজিনবিসরা কও মেষ-মারা যম, আর বান মারাটা আমরা ফকিররা করি মোরাকেবায় বৈসা । মোরাকেবারে হিন্দুরা কয় যোগাসন । বান মারারে তোমরা ইংরাজি-নবিসরা কও অত-সাজের সং ।

ইংরাজি শব্দকে বিকৃত করিবার নানাজীর অদ্ভুত ক্ষমতায় হামিদ মুচকি হাসিতেছিল । কিন্তু শাহ সাহেব তার অন্য রূপ অর্থ করিয়া বলিলেন: মশকরা কৈরাই কও আর না বুইঝাই কও, এই মোরাকেবাটা মোহন বিদ্যার খনে বেহতের । তবে বুঝতেই পার ও-কাজটা কঠিন । কঠিন বৈলাই আমরা সাধারণ ফকিররা মোরাকেবায় না বৈসা বর্তির মারফত রুহের সাথে কথা কই । কিন্তু দাদা পীর সাব মোরাকেবামোশাহেদায় খুবই কামেল আছিলেন । তানার কাশ্ফ আর কেরামত আমি নিজের চোখে দেখছি । দামাদ মিয়া বাবাজী মানে তোমার বাপজান অতটা কামেল হবার পারেন নাই । আমিও-কথা কইতাম বৈলাই তিনি আমার উপর ভ্রাতৃ খাশ্কা আছিলেন ।

হামিদের বাবাকে খোঁচা দিবার কোনও সুযোগই শাহ সাহেব ছাড়েন না হামিদ তা জানে । তাই সে ওদিককার কথা বন্ধ করিবার জন্য বলিল: বাপজানের কথা এখন থাক । আপনি আমারে কোনটা শিখাবেন তাই কন । মেষ-মারা যম, না অত-সাজের সং?

কথা দুইটা শাহ সাহেবের মুখে স্বাভাবিক শুনাইলেও হামিদের মুখে বিদূষের মতই শুনাইল। শাহ সাহেব ব্যথা পাইলেন বোধ হয়। কিন্তু সেটা চাপা দিবার মতলবেই বলিলেন: আমি ত ভাই আগেই কইছি মোরাকেবা-মোশাহেদায় বসাটা খুব কঠিন। কিন্তু যতই কঠিন হোক বর্তিতে তোমার মকসুদ পুরা না হৈলে বান মারতেই হবে। মোরাকেবায় না বৈসা বান মারা যায় না। কাজেই নানাভাই আগে কও তোমার মকসুদটা কি? নেসবতে-বায়নান্নাস দিয়া কারে বান মারতে চাও?

হামিদ: বান মারতে যাব কেন নানাজী? আমি এক জনের রুহের সাথে কথা কইতে চাই।

শাহ: কেন কথা কইবার চাও? তারে বশ করবার লাগি ত? তারে দিয়া কোনও কাজ করাবার লাগি ত?

হামিদ একটু ভাবিয়া বলিল: জি হাঁ, তাই।

শাহ সাহেব হাসিলেন। বলিলেন: ওটারেইকয় বান মারা। বশীকরণ মন্তরও কয় অনেকে। অবশ্য বশীকরণ দুইটাই। কাছে বৈসা গায় হাত বুলাইয়া চোখে ফু দিয়া কেউরে বশ করলে সেটা হয় মোহন বিদ্যা। আর দূরে থনে বশ করলে সেটারে কয় বান মারা।

হামিদ: দুই রকমেই কি একই ফল পাওয়া যায়? মোহন বিদ্যায় বর্তিকে দিয়া যা-তা বলানও যায় করানও যায়, তা জানি। আপনেনেও করতে দেখছি। বই এ-পুস্তকেও পড়ছি। কিন্তু বান মাইরাও কি তাই করা যায়?

শাহ: নিশ্চয়। মোহন বিদ্যায় বর্তিরে যেমন খালি পাখি উড়া গাছে তোলা যায়, পানির উপর দিয়া হাঁটান যায়, বান মাইরাও ঠিক তেমনি করান যায়।

হামিদ: তাই নাকি?

শাহ: মোহন বিদ্যাই কও আর বান মারাই কও, দুইটাই কলব কুশাদা করা। কলব আর রুহকে এক কৈরা ফেলা।

হামিদ: সেটা কেমনে হয়?

শাহ: আব আতশ খাক বাদ, এই চার চিজ দিয়া দুনিয়ার সব মানুষ তৈরি এটা সবাই জানে। ঐ চার চিজের যেটা যেখানে যে আকারেই থাকুক, তারা আসলে একই। ঠিক তেমনি দুনিয়ার সব রুহই এক। সব পানির গোড়া যেমন সমুদ্র, তেমনি সব রুহের গোড়া রুহুল কুদ্দুস। পরমাত্মা। দুনিয়ার যত ক্যা-ইন্দারা, খাল-বিল নদী-নালায় সব পানি যেমন এক সমুদ্রের পানির অংশ; তেমনি, সব মানুষের আত্মাই সেই পরমাত্মা রুহুল কুদ্দুসেরই অংশ। আলাদা-আলাদা অজুদে আছে বৈলাই রুহগুলি আলাদা না। তারা একই বস্তু।

হামিদ হাসিয়া বলিল: নানাজী, আমারে অত তাসাওয়াফের ইলিম দিবার চেষ্টা করবেন না। দিলে আমার মাথাটা গুলাইয়া যাব।

শাহ: এটা তাসাওয়াফের কথা না নানাভাই। এটা বায়নান্নাসের কথা। মানুষের সব রুহ গোড়ায় এক বৈলাই এক রুহ আরেক রুহের সাথে কথা কৈতে পারে।

হামিদ: দূরে হৈলেও পারে?

শাহ: রুহের কাছে দূরত্ব বৈলা কোনও কথা নাই। সময় বৈলাও কোনও জিনিস নাই। দুনিয়ার যে কোনও জায়গা থনে যে কোনও জায়গার রুহের সাথে যে কোন জমানার রুহ অন্য যে কোনও জমানার রুহের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে কথাবার্তা কৈতে পারে।

কথাবার্তা লম্বা হইয়া পড়িতেছে, আসল কথায় কিছুতেই আসা যাইতেছে না, দেখিয়া হামিদের চোখে-মুখে চিন্তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল বোধহয়। শাহ সাহেব সেই জন্যই বলিলেন: বায়নান্নাসের তালিম দিতে তিনটি বৈঠক লাগে। তার কমে হয় না। বেশিও লাগান যায় না। কাজেই আজকার বৈঠকে আমি শেষ করুম না। কিন্তু আগামী বৈঠকে আমার শেষ করতেই হৈব।

হামিদের চিন্তা দূর হইল। তার মুখ উজ্জ্বল হইল। পরের রাত্রেই জন্য বৈঠক মূলতবি হইল।

8

তিন বৈঠকেই বায়নান্নাসের তালিম নিতে হইবে, হামিদ এ ধরনের তুচ্ছতাকে বিশ্বাস করে না। তার ব্যস্ততা অন্যদিকে। বিষয়টা পরীক্ষা করিয়া দেখার আশঙ্কা যেমন বাড়িতেছে, বিলম্ব ততই তার অসহ্য হইতেছে। কাজেই তিন বৈঠকে বিশ্বাসী শাহ সাহেব এবং অবিশ্বাসী হামিদ উভয়েই সমান তাকিদ লইয়া আজিকার বৈঠকে বসিয়াছেন।

তবু হামিদই আগে কথা বলিল। নানাজীকে বেলাইনে রাখিতে না দিবার মতলবে বলিল: মোহন বিদ্যায় আমার কাজ নাই। বর্তি দিয়া আমার কাজ হবে না। আমি চাই নিজে আরেক জনের রুহের সাথে কথা কইতে। কাজেই আমারে মোরাকেবায়ে-নেসবতে-বায়নান্নাসের তরকিবই শিখান।

শাহ সাহেব কান পর্যন্ত গাল পাশ করিয়া নিঃশব্দে হাসিলেন। বলিলেন: আমারে আর কৈতে হৈব না। আমি বুঝতে পারছি। তুমি এক সুন্দরীর এশ্কে পড়ছ। সে রাজি হৈতেছে না। নেসবতে-বায়নান্নাসে তারে বশ করতে চাও এই ত? নিশ্চয় সে রাজি হৈব। হৈব না আবার? তার নানী রাজি হৈব।

হামিদ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল: না নানাজী, সুন্দরীকেই আমি চাই। তার নানীর আমার দরকার নাই।

হাসি থামাইয়া বলিল: আসল কথা কি নানাজী, কোনও সুন্দরীও না তার নানীও না। আমি একজন পুরুষের রুহকেই বশ করতে চাই।

শাহ সাহেব অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন: আমার কাছে গোপন করার কোন দরকার নাই। তুমি আওরত ফেইলা মরদের এশ্কে পড়ছ, এ কথা আমারে বিশ্বাস করাইতে পারবা না। আসল কথাটা কি তাই কও?

হামিদ: কিন্তু ধরেন নানাজী, আমার লক্ষ্য যদি আওরত না হইয়া মরদ হয়, তবে কি নেসবতে-বায়নান্নাসে কোনও তারতম্য হইব?

শাহ: না, তা হবে না। মরদের উপরও বশীকরণের বান মারা যায়। তবে বান মারনেওয়ালার রুহের তেজ অন্য মরদের রুহের তেজের চেয়ে বেশি হওয়া দরকার।

হামিদ: আপনে কি তবে মনে করেন আমার রুহের তেমন তেজ নাই?

জিভে কামড় দিয়া শাহ সাহেব বলিলেন: তুমি ফতেপুরের পীরজাদা। খান্দানী তাসির ত একটা আছেই। তাছাড়া আমলে-সালেহা দ্বারা তোমার কুওতুল-কলব যে দরজায় গেছে তাতে যে-কোনও আম লোকের রুহকে সহজেই কবজা করতে পারবা। কিন্তু আমার মন তসল্লি মানতেছে না। তুমি আওরতের এশ্কে না পৈড়া মরদের এশ্কে পড়তে গেলা কেন?

হামিদ এরপর রাযিয়া-ওয়াজেদের ব্যাপারটা সবিস্তারে না বলিয়া পারিল না। সব কথা বলিয়া উপসংহার করিল: এখন বুঝলেন নানাজী? ওয়াজেদের রুহকে বশ কৈরা আমি তার কাছ থনে রাযিয়ার তালাক আদায় করতে চাই।

হামিদের সব কথা শাহ সাহেব পরম আগ্রহে শুনিতেছিলেন। হামিদের বিবরণের আগাগোড়াই ক্ষণে-ক্ষণে শাহ সাহেবের মুখে হৃদয়বান সমঝদারের সহানুভূতি ফুটিয়া উঠিতে ছিল।

হামিদের কথা শেষ হইলে শাহ সাহেব নীরবে পর্যায়ক্রমে একবার মাথা ঝুকাইলেন, আরেকবার নাড়িলেন, আরেকবার ঝুকাইলেন। যেন তাঁর দুইটা মন বিষম তর্ক করিতেছে। বেশ খানিকক্ষণ এইরূপ করিয়া অবশেষে তিনি বলিলেন: বড় কঠিন এশ্কে পড়ছ নানাভাই। ঐ এশ্কের মউত নাই। কারণ ইটা দেখতেই এশ্কে মেজাজী। আসলে ইটা এশ্কে-হকিকী। এই এশ্কে যারা জান দিছে তারা ই অমর হৈয়া গেছে। আমরা চিশ্তিয়া তরিকার ফকিররা বিশ্বাস করি:

কুশ্তেগানে খন্জরে তসলিমেরা

হর যমান আয গায়েবে জানে দিখাই

এইটাই আমরা বাংলায় গাই:

এশ্কের ছুরিতে জান হুইল যাহারা

গায়েবের জান সদা পাইল তাহারা।

এবার হামিদ নানাজীর ফারসী-জ্ঞানে বিস্মিত হইল না। তার বদলে সে ভয় পাইল নানাজীর এশ্কের ব্যাখ্যায়। চিন্তিত হইল নানাজীর সম্ভাব্য পরবর্তী উপদেশ। বুড়া এরপর বলিয়া বসিবেন না ত: 'ছাড়িয়া দাও রাযিয়ার ভাবনা। ঝুলিয়াপড় এশ্কে-হকিকীর দড়িতে?' মনের ভয় গোপন করিবার জন্য হামিদ হাসিয়া বলিল: কিন্তু নানাজী আমি ত মৈরা অমর হবার চাই না। রাযিয়ার এশ্কে-মেযাজীর বদলে এখনি আল্লার এশ্কে-হকিকী পাবার চাই না। ওটা পাবার চাই আমরা দুজনা একত্রে মিইলা।

শাহ সাহেব হাসিলেন। খুশির হাসি। বলিলেন: ঠিক কইছ নানাভাই। বড় দামী খাসা কথাটা কইছ। আওরৎ ছাড়া এশ্কে হকিকীর সাধনা হয় না, আমরা ফকিররার একদলও তাই বিশ্বাস করে। দেখ নাই একজন বৈরাগনী না লৈয়া বৈরাগীরা সাধনা গুরুই করে না?

হামিদ হাসিয়া বলে: আমারে নানাজী ঐ দলের একজন ধৈরা নেন।

শাহ সাহেব ডান হাতটা উঁচা করিয়া অভয় দিয়া বলিলেন: তোমার চিন্তা নাই। সেটা তোমারে আমি আগে থনেই ধৈরা নিছি। তাই ত আমি আমার বৈরাগী নানাভাইর

লাগি একটি বৈরাগিনীর তালাশ করতে ছিলাম। এখন যখন সন্ধান পাইছি, তখন দুজনের মালা বদল করানই লাগব।

হামিদ উৎসাহিত হইয়া বলিল: পারব না নানাজী, ওয়াজেদের কাছ থনে রাখিয়ার তালাকনামা আদায় করতে? কি কন আপনে?

শাহ: কেন পারবা না? নিশ্চয় পারবা। ওয়াজেদের যে বিবরণ শুনলাম, তাতে পষ্ট বুঝা যায় সে গোয়ার-গোবিন্দ গোছের যিদ্দী স্বার্থপর লোক। এই ধরনের লোক আসলে খুব ভীৰু হয়। তারার রুহানী তাকত খুব কম থাকে। এদেরে বশ করা খুবই সহজ। এলা শোন, মোরাকেবায় কেমনে বসবা। পয়লা কথা রাতে বসবা। একটু বেশি রাত হৈলে আরও ভাল।

হামিদ: রাত কেন?

শাহ: রাত হৈল ঘুমের সময়। ঘুমের মধ্যেই মানুষের বাতেনী মন ছুটি পায়। এই সময় মানুষের যাহেরী মন অচেতন থাকে বৈলাই বাতেনী মন স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করতে পারে। রাতে তুমিও ঘুমে থাকবা। ওয়াজেদও ঘুমে থাকব। তোমার রুহ গিয়া ওয়াজেদের রুহেরে পাকড়াও করব। বশ করব। যা কৈয়া আসব, ওয়াজেদ সজাগ হৈয়া ঠিক তাই করব।

হামিদ: ঘুম না হৈলে এটা হয় না?

শাহ: না হয় না। দেখ নাই মোহন বিদ্যায় আমরা বর্তিরে নকল ঘুম পাড়াইয়া লই। নকল ঘুমের থনে আসল ঘুমে ফল বেশি পাওয়া যায়।

হামিদ: বেশ বুঝলাম। কিন্তু আমি ঘুমাইয়া পড়লে আমার রুহ যে ওয়াজেদের রুহের কাছেই যাব, তার নিশ্চয়তা কি?

শাহ: এরই নাম ত নেসবতে-বায়নান্নাস। তুমি ঘুম যাবার আগে ধ্যান করবা। নমাজে বসার মতো বৈসা কিছুক্ষণ লতিফায়ে নফসী থনে লতিফায়ে সেররী, সেখান থনে লতিফায়ে খুফী ও আখ্ফা তক টানবা। তুমি ত ভাই পীরের ছেলে, এসব লতিফার জায়গা ত জানই। তবু ভুল হবার পারে। অনেকদিন ত এসবের আমল নাই। তাই দেখাইতেছি।

শাহ সাহেব নিজের বুক কপাল ও তালুর বিভিন্ন স্থান দেখাইয়া দিলেন। উপসংহারে বলিলেন: আসল কথা হৈল যাহেরী মনটারে বাতেনী মনের মধ্যে ধ্যানের দ্বারা ফানা কৈরা দেওয়া।

এ সবই হামিদের জানা কথা। বহুদিন এ সবের আমল করে নাই। বিশ্বাসও এখন করে না। তবু কিন্তু সে ভুলিয়া যায় নাই। শাহ সাহেব একটু বলাতেই সব কথা ঝর-ঝরা মনে পড়িয়া গেল। হামিদের বিজ্ঞানী মন আগেকার বিশ্বাস লইয়া এসব বিচার করিল না। কিন্তু এটা বুঝিল যে কাজটা আসলে কন্সেন্‌টেশন-অব-মাইণ্ড ছাড়া আর কিছু না। এটা মনোবিজ্ঞানের কথাও। দর্শন-ইন্দ্রিয়কে বাহিরের দিক হইতে ভিতরের দিকে নিবদ্ধ করিতে পারিলেই এই কন্সেন্‌টেশন হয়, তা সে মনোবিজ্ঞানেও পড়িয়াছে। সুতরাং এতে বিশ্বাস করিতে তার বাধিল না।

হামিদকে নীরব থাকিতে দেখিয়া শাহ সাহেব বলিলেন: ধ্যানের ফায়দা বুঝতে সুফী-দরবেশ মুনি-ঋষি হওয়ার দরকার নাই। এটা আমরা রোজই পরীক্ষা করতে পারি।

হামিদ: কেমনে?

শাহ: ধর, মনে খুব আদেশা লৈয়া তুমি রাত তিনটার গাড়ি ধরবার ইচ্ছায় যদি ঘুমাও তবে ঠিক ঘড়ির কাটা ধৈরা তোমার ঘুম ভাইংগা যায়। এটা ত কতবার দেখছ। এটা কেমনে হয়? ঐ ধ্যানের ফল। ধ্যান কৈরা যেই তুমি শুইলা তোমার বাতেনী মনরে তুমি চৌকিদার রাইখা ঘুমাইলা। সে ঠিক সময়-মতো তোমারে জাগাইয়া দিব।

হামিদের জীবনেও অবশ্য এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। কিন্তু এটা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। এর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক কিছু আছে তা কোনও দিন তার মনেই পড়ে নাই। সে খুশী হইয়া নানাজীর কথায় সায় দিল: ঠিকই কইলেন নানাজী।

শাহ: শুধু তাই না। তুমি যদি বাতেনী মনের উপর একান্তভাবে নির্ভর না কর, তবে কিন্তু বাতেনী মন তোমারে জাগাইব না। তুমি যদি ধ্যানও কর আর নিশ্চিত হবার আশায় অন্য কাউরে ডাইকা দিতে বল, কিম্বা যদি এলারম্ ঘড়িতে দম দিয়া রাখ, তবে কিন্তু বাতেনী মন কিছু করব না। অর্থাৎ নিজে খনে তোমার ঘুম ভাংগব না। যারে ডাইকা দিতে কইলা সে যদি ঘটনাচক্রে ডাইকা না দেয়, কিম্বা তোমার ঘড়িটা যদি বিকল হয় তবে সেদিন তোমার গাড়ি ধরাই হৈব না। কেমন ঠিক কি না নানাভাই?

হামিদ স্মরণ করিয়া দেখিল নানাজীর এসব কথাও সত্য। তার নিজের জীবনেই এমন অনেকবার হইয়াছে। হামিদের চোখে-মুখে আস্থার ভাব ফুটিল। শাহ সাহেব তা লক্ষ্য করিলেন। খুশী হইলেন। বলিলেন: তা হৈলে দেখতেছ নানাভাই, ধ্যানটাই আসল কথা। নেসবতে বায়নান্নাসের ধ্যানটা আরও গাঢ় হওয়া দরকার। লতিফার দিকে মন তাওয়াজ্জু হওয়া জরুরী। নমাজে বসার আসনটাই একাজে সসমুদ্রে মাকুল। আসনের একটা মাহাত্ম্য আছে। সেইজন্য সব ধর্মেই উপাসনা-পূজা-অর্চনার একটা আসন আছে।

নমাযের আসনের কথা শুনিয়া হামিদের মুখ বিস্ময় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া শাহ সাহেব তাড়াতাড়ি সংশোধন করিয়া বলিলেন: নমাজের আসনে বসবার কথা কইলাম বৈলা তুমি মনে কৈর না আমি অযুর কথাও কৈতে আছি। অযু-টয়ুর দরকার নাই। তোমরা বড় লোক সাহেব-সুবা। তার উপর ডাক্তার। সাফ-সুতরা ত তোমরা থাকই। শুধু মনটা সাফ-সুতরা থাকলেই হৈল। ধ্যান শুরু করার লাগি ওটা দরকার।

হামিদ হাসিল। নানাজী জানেন না, হামিদ যে কাজে আজ সারা জীবনের বিদ্রোহী মতবাদের খেলাফ আধ্যাত্মিক সাধনায় সে পা বাড়াইয়াছে, তার খাতিরে সে অযু কেন, তার চেয়ে কঠিন কাজও করিতে রাজি। তবু নানাজী নাহক ব্যস্ত হইয়া অযু হইতে রেহাই দিলেন। এই জন্যই হামিদের হাসি।

শাহ সাহেব বুঝিলেন, অযুর দায় হইতে রক্ষা পাইয়াই হামিদ খুশী হইয়াছে। সত্যই আজকালের মডারেন পোলাপানরে খাস করিয়া হামিদের মতো বিলাতফেরতা বড় লোকেদের নমাজের আসনের কথা না বলাই উচিত ছিল। তাই শাহ সাহেব আগের কথা সংশোধন করিয়া বলিলেন: ধ্যানের লাগি আসল দরকার লতিফার দিকে তাওয়াজ্জু করা। এটা বৈসাও যেমন পারা যায়, শুইয়াও তেমনি পারা যায়। লতিফার জায়গাগুলো জানা থাকলেই হৈল। তুমি তবে শুইয়াই ধ্যান শুরু করবা।

হামিদ: কি ধ্যান করুম?

শাহ: কেন? ওয়াজেদের চেহারার।

ছাই-এ রতন

হামিদ: আমি যে তারে কোনদিন দেখি নাই, নানাজী।

শাহ: না দেখলা, ক্ষতি নাই। তার ফটো-টটো দেখছ ত? তাতেই চলব।

হামিদ: তার ফটোও কোন দিন দেখি নাই।

শাহ সাহেব যেন একটু ভাবনায় পড়িলেন। খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন: রাযিয়ার মুখে তার চেহারার বয়ান শুইনা তাঁর সম্বন্ধে তোমার মনে একটা ছবি আছে ত?

হামিদ: রাযিয়ার মুখে যতটুকু শুনছি, তাতে একটা মানুষের আকৃতির সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব না। করলেও সেটা ভুল হৈতে পারে।

শাহ সাহেব ভুরু কুচকাইয়া আংগুলে কপাল টিপিয়া বলিলেন: আচ্ছা, থাক সব কিছু। তার বাড়ি-ঘর চিন ত? সে কি রকম বাড়িতে, কি রকম ঘরে রাতে শোয়, তা জানলেই হৈব।

হামিদ লজ্জিত অপরাধীর সুরে বলিল: তাও ত জানি না, নানাজী। আসলে তার ঠিকানাই জানি না আমি। শুনছি, সে কলিকাতায় একটা বিলাতী ফার্মের ম্যানেজার। তার বেশি কিছু জানি না।

নিমজ্জমান লোকের ঘাসের কুটা ধরিবার মতোই শাহ সাহেব বলিলেন: ওয়াজেদের পুরা নাম ও তার বাপের নাম, মৃত কি জীবিত, তা জান ত?

শেষ পর্যন্ত ডুবিতে-ডুবিতে কূল পাওয়ার আনন্দে-উচ্ছ্বসিত সুরে হামিদ বলিল: জি হাঁ, তা জানি।

শাহ: তাতেই হৈব।

ধুমকেতু

১

পর-পর দুইদিন হামিদের মোরাকেবা নিষ্ফল হইয়াছে। সে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছে। মোরাকেবার তরকিবে তার ভুল হয় নাই। শুধু নানাজীর তালিমের উপর সে নির্ভর করে নাই। তিনি বিদায় হওয়ার পর তিন দিন ধরিয়া সে মোরাকেবা শুরু করে নাই। এই তিন দিনে সে ফতেপুর কুতুবখানা-হইতে-আনা আরবী-ফারসী কিতাবগুলি মূল ভাষায় ও তাদের উর্দু-তরজমায় বিভিন্ন তরকিব-তরতিব গভীর মনোযোগের সাথে পড়িয়াছে। যেখানে-যেখানে নানাজীর সাথে ঐসব কিতাবের বেমিল হইয়াছে, সেখানে নানাজীর কথা বাদ দিয়া কিতাবের নির্দেশিত তরকিবগুলি ইস্তেমাল করিয়াছে।

কাজেই তরকিবে ভুল নাই। তবে তার মোরাকেবা সফল হইতেছে না কেন? দ্বিতীয় রাতের ব্যর্থতা তাকে খুবই নিরাশ করিয়াছে। তার মনটাই খারাপ হইয়া গিয়াছে। ঈমানে কমজোরি দেখা দিয়াছে। নানাজীকে আবার ডাকিয়া পাঠাইবে না কি? তিনি বলিয়া গিয়াছেন, খবর পাইলেই চলিয়া আসিবেন। আসিবেন তিনি নিশ্চয়। হামিদ সেটা বিশ্বাস করে। কিন্তু তিনি আসিয়া করিবেনটা কি? বেচারার গরিব মানুষ। আট-দশ দিন থাকিয়া এই গেলেন মাত্র পাঁচ-ছয় দিন আগে। এত ঘন-ঘন তাকে টানা হেঁছড়া করিলে তাঁর সংসার চলিবে কেমন করিয়া? অবশ্য হামিদ নানাজীর হাতে যে পরিমাণ টাকা দিয়া আসিয়াছে এবং বিদায়ের দিনে নানাজীর পকেটে যে পরিমাণ টাকা গুঁজিয়া দিয়াছে, হিসাব করিয়া খরচ করিলে তাতে নানাজীর ঋণস্বত্ব দুইমাস চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু নানাজীব ছেলেগুলি ত একটাও মানুষ হয় নাই। নানাজীর অবর্তমানে মাকে তারা কি হিসাব করিয়া খরচ করিতে দিবে? নানাজীরও সেই ভয়। তাই তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বে এস্ত-ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। হামিদ জোর করিলে তিনি আরও দু'এক দিন থাকিতেন নিশ্চয়। কিন্তু তাঁর ঐ মানসিক অবস্থায় তাঁকে আটকাইয়া রাখা হামিদ উচিত বিবেচনা করে নাই। তা ছাড়া তাঁর কাজও ত শেষ হইয়াছিল। এখনও তাঁকে ডাকিয়া আনা ঠিক হইবে কি না, হামিদের নিজেই আগে তা স্থির করা উচিত। সেটা ঠিক করিতে গেলে হামিদের বুঝা দরকার, কোথায় কি তরকিবে তার ভুল হইয়াছে। হামিদ দুই রাতের মোরাকেবা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া পর্যালোচনা করিল।

শুরু করিয়াছিল সে নমাজে বসার আসনেই। এক ঘন্টাকাল, হাঁ পুরা এক ঘন্টাই হইবে, সে লতিফার দিকে তাওয়াজ্জু হইবার চেষ্টা করিল। কোনও লতিফাতেই সহি যরব করিতে পারিল না। লতিফা ও কলবের সাথে নানাভাবে সে ঝাকাঝাকি করিল। কিছুতেই সে ধ্যানস্থ হইতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত সে চিৎ হইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া কন্সেনট্রেশন অব মাইণ্ড করিবার অনেক চেষ্টা করিল। কন্সেনট্রেশনের আগেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

তারপর দ্বিতীয় রাতের কথা। যদিও সে অযু-টযুতে বিশ্বাস করে না, তবু দ্বিতীয় রাতে অযুর সব খুটি-নাটি আহকাম-আরকাম পালন করিয়া অযু করিল। কওয়াত যায় না, কি কারণে তার মোরাকেবা নিষ্ফল হইতেছে। এতই যখন করিতে পারিল, তখন অযুটা আর বাদ থাকে কেন? এই ভাবে মোরাকেবায় বসিয়া দ্বিতীয় রাতে খুব নিখুঁত ধারাবাহিকতার সাথে লতিফায়ে নফস্, লতিফায়ে সেররী, লতিফায়ে খুফী ও লতিফায়ে আখফা এবং তথা হইতে লতিফায়ে কলবে যরব করিবার চেষ্টা করিল। সেটা ব্যর্থ হওয়ায় সে উল্টা দিক হইতে শুরু করিয়া যথাক্রমে লতিফায়ে কলব হইতে লতিফায়ে নফস্ পর্যন্ত মনকে দৌড়াইল। কিন্তু কোথাও কনসেনট্রেন্ট করিতে পারিল না। তার বদলে আজও দুই চোখ ভাংগিয়া ঘুম আসিতে লাগিল। ঘুম তাড়াইবার জন্য সে উঠিয়া বাথ রুমে গেল। চোখে-মুখে জোরে-জোরে পানির ছিটা দিল। তোয়ালিয়া দিয়া ভাল রূপে চোখ-মুখ রগড়াইয়া মুছিয়া আবার বিছানায় উঠিল। আসন করিয়া বসিল। ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করিল। কনসেনট্রেশন-অব-মাইণ্ড ত এত কঠিন হওয়ার কথা না। সে সাইকলজিতে পড়িয়াছে দর্শন-ইন্দ্রিয়কে বাহির হইতে অন্তরে নিবদ্ধ করিতে পারিলেই কনসেনট্রেশন-অব-মাইণ্ড হইয়া গেল। হামিদের ত এমন কতদিন হইয়াছে। ডাক্তারি বা বিজ্ঞানের একটা বিষয়ে এমন কি রাযিয়ার সম্বন্ধে কোনও একটা ব্যাপারে চিন্তা করিতে-করিতে সে এমন বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া গিয়াছে যে সহপাঠী বন্ধুরা তিন ডাক দিয়া তবে তার ধ্যান ভংগ করিয়াছে। ও-সব ক্ষেত্রে তা হইয়াছে হামিদের অনিচ্ছায় অজ্ঞাতসারে। আজ সে ইচ্ছা করিয়াও কনসেনট্রেশন আনিতে পারিতেছে না কেন? চোখে-মুখে পানি দেওয়ায় তার চোখের ঘুম দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু মনটা আরও বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। কনসেনট্রেশন হইবে দূরের কথা, এখন তার মনে হইতেছে তার ইমোশনাল ইনস্টেবিলিটি ও হাইপার টেনশন দেখা দিতেছে। এক বড়ি লিব্রিয়াম খাইবে কি? না, ওতে বরঞ্চ ঘুমের ভাব বাড়িয়া যাইবে। তার চেয়ে একটা সিগারেট খাওয়া যাক।

ইঠাৎ হামিদের মনে হইল তার পিয়াস লাগিয়াছে। বাথ রুমে-রাখা সুরাহি হইতে এক গ্লাস পানি লইয়া এক চুমুকে খাইয়া ফেলিল। তার পর একটা সিগারেট ধরাইয়া মনের সুখে ও গালের জোরে টানিতে এবং বৃন্দা-বৃন্দা ধূয়া ছাড়িতে লাগিল। এবার তার ঘুমের ভাব সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। সে বুঝিয়া নিশ্চিত হইল যে খানিক আগে যে-ইমোশনাল অস্থিরতার জন্য লিব্রিয়াম খাইবার কথা চিন্তা করিতেছিল সে ভাবটা এখন সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে। একটা সিগারেট শেষ হওয়ায় সে আরেকটা ধরাইল। সে চেয়ারে বসা ছিল। এবার দুইটা পা বিছানায় লম্বা করিয়া তুলিয়া চেয়ারে হেলান দিল। ছাদের দিকে নজর করিয়া অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানিতে লাগিল।

ইঠাৎ তার মনে হইল, সে এসব কি করিতেছে? মূর্খ নির্বোধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস-প্রবণ লোকের মতোই কি সেও একটা ভগ্না ফকিরের পাল্লায় পড়িয়াছে নাকি? নইলে সে এই সব অবৈজ্ঞানিক তুক-তাকে বিশ্বাস করিতেছে কেমন করিয়া? হামিদের মনে পড়িল এই ধরনের চিন্তা আরও কয়েকবার করিয়াছে। দৃশ্যত ব্যাপারটা অবৈজ্ঞানিক অবাস্তব এটা জানিয়াও সে এই পথে পা বাড়াইয়াছে। তার বিজ্ঞানী আধুনিক মন প্রতিপদে একাজে তাকে বাধা দিয়াছে। সে মনের কাছে সরলভাবে স্বীকার করিয়াছে রাযিয়াকে পাওয়ার সমস্ত প্রচলিত পন্থা ব্যর্থ না হইলে এ পথে সে পা

বাড়াইত না। কেউ ত তারে এ পথে আসিতে পরামর্শ দেয় নাই। নানাজী ছাড়া এ কথা আর কেউ জানেও না। আর নানাজীই বা তার সাথে তৎপরতা করিবেন কেন? তিনি ত হামিদকে এ পথে আসিতে পরামর্শ দেন নাই। হামিদ নিজেই ত নানাজীকে ধরিয়া আনিয়াছে। নিজে এ পথ ধরিবে আগে তা ঠিক করিয়াই ত সে নানাজীর কাছে গিয়াছে। নানাজী তার কাছে আসেন নাই। তারপর পথের কথাটা। সত্য বটে রাখিয়ার ব্যাপারে নিরুপায় হইয়াই সে স্পিরিচুয়াল পন্থার কথা ভাবিয়াছে। কিন্তু সে কথা ভাবিতে গিয়া সত্য-সত্যই কি সে পাঁচ ইন্ড্রিয়ের বাইরে ও উর্ধ্বে আরেকটি ইন্ড্রিয়ে বিশ্বাসী হইয়া পড়ে নাই? সে বিশ্বাস হইবার যথেষ্ট বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তিও কি তার নজরে পড়ে নাই? কেন তবে হামিদ মাঝে-মাঝেই এমন সন্দেহবাদী, এমন কি অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে? এটা কি তার বিজ্ঞানী মন? না তার চিত্তের দুর্বলতা? না, মানসিক ধৈর্যের অভাব? সেটা সত্য হইলে হামিদ ত তবে আত্ম-বিশ্বাসই হারাইয়াছে। কেন হইবে তার আত্ম-বিশ্বাসের অভাব? কেন তার মনে ঢুকিবে এই সন্দেহবাদ? মোরাকেবায় দুইদিন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া? ব্যর্থতা-অসাফল্য কি কোনও কাজের গুণাগুণের মাপকাঠি হইতে পারে? কত ব্যাপারেই ত হামিদ দেখিয়াছে, ছাত্র-জীবনেই ত হামিদের কত বার এমন হইয়াছে। ছেলে বেলার বাল্য শিক্ষায় পড়া সেই অতি পুরাতন কথা: একবারে নাই পার দেখ শতবার।

হামিদ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কামরার মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। সমস্ত ব্যাপারটা আবার পর্যালোচনা করিল। না, দুই রাতের অসাফল্যকেই সে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া নিতে পারে না। সেটা শুধু কাপুরুষতা হইবে না; নিরুশীলতাও হইবে। সে আবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু আজ আর পারিবে না। ব্যাপারটা আসলে কনসেনটেশন-অব-মাইণ্ড। ওটা করার মতো মনের গতিক হামিদের আজ আর নাই। কিন্তু ঘুমও ত তার হইবে না। সে শিয়রের কাছের ছোট টেবিলটিতে রাখা হাত ঘড়িটি টানিয়া লইল। দেখিল দুইটা। না, এখন ঘুমাইবার চেষ্টা বৃথা। ঘুমাইয়া পড়িলে আর সময় মতো উঠা হইবে না। সাতটার সময় ক্লিনিকে যাইতেই হইবে। ছয়টার সময় না উঠিতে পারিলে তা সম্ভব হইবে না। কাজেই তার শোবার আশা ত্যাগই করিতে হয়। তবে কি করিবে?

হামিদ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। শিয়রের দিকে দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটি বুক কেস, আরেকটা আলমারি। সে আলমারিটা খুলিল। এক দুই তিন করিয়া কয়েকখানা কিতাব বাহির করিল। সেগুলি কোণের রাইটিং টেবিলটায় রাখিল। টেবিলের উপরস্থ রিডিং ল্যাম্পটা সুইচ-অন করিয়া পড়িতে বসিল। সব কয়টির পাতা উল্টাইয়া কি কি মিলাইল। শেষ পর্যন্ত বড় পীর সাহেবের 'গুনীয়াতুং তালেবিন' ও খাজা গেসুদরাযের 'আসমাউল আসরার' পাশাপাশি খুলিয়া একবার এটিতে আরেকবার ওটিতে নজর বুলাইতে লাগিল। খানিক পর-পর কিতাব হইতে মুখ তুলিয়া দেওয়ালের দিকে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল।

ইচ্ছা তার গভীর বিষণ্ণ চিন্তাযুক্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কি কথা যেন মনে পড়ায় আবার প্রথমে একটি পরে অপরটি কিতাবের উপর গভীর মনোযোগ দিল। তার পর পাশে-রাখা বন্ধ-করা কিতাবগুলিও এক-এক করিয়া খুলিল। এবার যেন সে একটা সমাধান পাইল। খানিকক্ষণ আগেও যা-যা তার কাছে অস্পষ্ট ছিল, সে সব যেন তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। নতুন আলোকে যেন সব কথার তাৎপর্য তার কাছে ধরা

পড়িল। বিশ্বয়ের সহিত সে উপলব্ধি করিল এইসব মহামহাপণ্ডিত সাধকের কথার সাথে নানাজীর অনেক কথাই মিল আছে। নানাজীর মতো উষ্মি লোকের পক্ষে এই সব বড়-বড় আরবী-ফারসী কিতাব পড়া সম্ভব নয়। তবে তিনি এইসব আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্ব শিখিলেন কই? অতি সহজেই তার মনে পড়িল, নানাজী হামিদের দাদাজীর কাছেই রুহানী সবক লইয়াছেন দাবি করিয়া থাকেন। সে দাবি তবে মিথ্যা নয়। দাদাজীর কাছে মুখে-মুখে শুনিয়া যদি নানাজী এতটা শিখিয়া থাকিতে পারেন, তবে দাদাজী যে সত্যই কামেল লোক ছিলেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। এইসব কিতাবে ঐ ধরনের লোককেই ইনসানে কামেল মর্দে-খোদা বলা হইয়াছে। দাদাজীর প্রতি হামিদের শ্রদ্ধা বাড়িল।

২

পরের রাতে হামিদ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করিল। সে-রাতে একটা দৃঢ় সংকল্প, একটা জিদের ভাব লইয়াই সে মোরাকেবায় বসিয়াছিল। আগের রাতের চিন্তা ও অধ্যয়ন তার মধ্যে নতুন করিয়া আত্ম-বিশ্বাসও জাগাইয়াছিল। মোরাকেবায় বসিয়া কাজেই সে একের পর এক করিয়া বিভিন্ন লতিফায় যরব করিতে হাতের শক্তি অতিরিক্ত ব্যবহার করিল। এর ফলে ক্লান্ত হইয়াই হোক, বা অন্য কারণেই হউক সে অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত হইয়া পড়িল। চোখ ভরিয়া ঘুম আসিতে লাগিল। হামিদ কিন্তু আজ ঘুমের সহিত ধন্যধন্য করিল না। জোর করিয়া মোরাকেবায় বসিয়া থাকিবার চেষ্টা না করিয়া ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করিল। সে মোরাকেবার আসন হইতে আলগোছে বিছানায় লম্বা হইয়া পড়িল।

হামিদ ইতিমধ্যে অনেক দিন ভাবিয়া-ভাবিয়া মরহুম হামিদর আলির পুত্র ওয়াজেদ আলির একটা কাল্পনিক চেহারা মনের পটে আঁকিয়া ফেলিয়াছিল। আজ বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়াই চোখ বুজিয়া কলিকাতায় তার জননী একটা মহল্লার একটা কল্পিত বাড়িতে ওয়াজেদের কল্পিত চেহারার সম্মুখীন হইল। চেহারাটা প্রথমে আবছা ধূয়াটে হইতে ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় হামিদের মুখামুখি হয় আর কি? অমনি ওয়াজেদের মুখটা পিছাইয়া দূর হইতে আরও দূরে যাইয়া এবং আবছা হইতে আরও আবছা হইয়া অবশেষে অস্পষ্টতায় মিলাইয়া গেল। হামিদ নিশ্চয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ওয়াজেদ এইরূপ রহস্যজনকভাবে লুকাইয়া পড়ায় হামিদের ঘুমটা হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। দেখিতে-দেখিতে হামিদের চোখের সামনে পট-পরিবর্তন হইয়া গেল। পটটাই হামিদের দিকে আসুক, আর হামিদই পটটার দিকে এক-পা দুই-পা করিয়া আগে বাড়ুক, সে এক অদ্ভুত পরিবেশের অংশ হইয়া গেল। সে যেন এক বিচিত্র ঐন্দ্রজালিক নতুন দেশে আসিয়াছে। এক সুউচ্চ বিশাল তোরণের সামনে যেন সে দাঁড়াইয়া আছে। তোরণের বিরাট লৌহ-কপাট যেন অতি ধীরে নিঃশব্দে ফাঁক হইতেছে। কপাটের সেই ফাঁক দিয়া হলুদ রং এর আলো দেখা যাইতেছে। হলুদ রং এর সে আলোর ছটাটা আস্তে-আস্তে সবুজ, সবুজ রং ক্রমে নীল হইয়া ধীরে-ধীরে নিভিয়া গেল। আলো নিভিয়া যাওয়ায় হামিদের মনটাও বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সে তীব্র দৃষ্টিতে সেই আলোকের জায়গাটার দিকে চাহিয়া রহিল। কি আশ্চর্য, আলোটা আসলে নিভে নাই। আলোর তেজের ছটা তখনও আগের মতোই সেই

জায়গাতেই আছে। কিন্তু সে আলোটার রং অন্ধকারের চেয়েও গাঢ় কাল। অন্ধকারের চেয়েও কাল কোনও রং ও হইতে পারে, হামিদের তা জানা ছিল না। এখন দেখিল তাই। দেখিতে-না-দেখিতে সে মিশ কাল রংটাই হইয়া উঠিল পূর্ণিমার চান্দের আলোর মতো সাদা। সেটা দেখিয়া না সারিতেই সেই সাদা আলোটা উঠন্ত সুরঞ্জের রং এর মতো সোনালী লাল। এই বিভিন্ন রং এর আলোর ছটা এতক্ষণ আসিতেছিল ছুরির ফলার মতোই ক্ষীণ পাতলা আঁশে। কপাটের সুস্থ ফাঁক দিয়া ওর বেশি আর কিছু দেখা যাইতেছিল না।

কিন্তু আলোর রং সোনালী লাল হওয়ার সাথে-সাথে কপাট ফাঁক হইয়া গেল। কপাটের অপর পাশে আলোকোজ্জ্বল এক রহস্যপূরী হামিদের নজরে পড়িল। সে নিজের অজ্ঞাতেই একপা-দুইপা পিছনে বিশাল কপাটটা নিঃশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু হামিদ তাতে ভয় পাইল না। সে সামনের দিকে আগ বাড়িতেই থাকিল।

চলিতে-চলিতে হামিদের মনে হইল একটা বিরাট শহর। তারই এক কুশাদা রাস্তায় সে সামনের দিকে চলিতেছে। রাস্তা জনশূন্য। কিন্তু দু'পাশে তিন-চার-পাঁচ তলা উঁচা সুন্দর-সুন্দর দালান। উভয় পাশের এই সব দালান-ইমারত দেখিতে-দেখিতে সে পথ চলিল। কিন্তু শহর বা রাস্তার নাম তার মনে পড়িল না। তবে ছেলেবেলা আব্বাজানের সাথে কলিকাতা বেড়াইতে গিয়া যেন এমনি একটি রাস্তার একটা দূতলা বাড়িতে কিছুদিন বাস করিয়াছিল বলিয়া আবছা-আবছা মনে পড়িল। এর বেশি কিছু মনে পড়িল না।

এই রাস্তায় চলিতে-চলিতে হামিদ একটি নারী-কণ্ঠে থমকিয়া দাঁড়াইল। আওয়ায অনুসরণ করিয়া সে দেখিল একটি দূতলার বেলকনি হইতে একজন সুন্দরী মহিলা আকুল কণ্ঠে হামিদকে বলিল: আপনি ডাক্তার না? মেয়েবানি করে জলদি ভেতরে আসুন। আমার স্বামী বড্ড অসুস্থ।

হামিদ বিশ্বয়ে ঠাঁয় দাঁড়াইয়া পড়িল। মাথা তুলিয়া মহিলার দিকে চাহিয়া বলিল: আমি ডাক্তার, তা আপনি জানলেন কেমন কৈরা?

মহিলা জোর করিয়া বলিল: আপনি নিশ্চয় ডাক্তার, নইলে গলায় স্টেথসকোপ ঝুলিয়েছেন কেন? নিন আর ইয়ার্কি করবেন না। জলদি গেটে ঢুকে বাঁ হাতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে আসুন। আমি সিঁড়ি-মুখে আপনার অপেক্ষা করছি। দোহাই আল্লার আপনি শিগগির আসুন।

গর-গর করিয়া মহিলা এইসব কথা বলিয়া ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইল। মহিলাটি যুবতী, সুন্দরী। তার মুখখানি ও গলার সুর হামিদের বড় ভাল লাগিয়াছিল। সে হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ায় এতক্ষণে হামিদের চৈতন্য হইল। সে হাতে ও চোখে দেখিল সত্যিই তার গলায় স্টেথসকোপ ঝুলিতেছে। শুধু কি তাই? তার হাতে একটা মেডিক্যাল ব্যাগও।

তার বিশ্বয়ের ভাব কাটিলে মহিলার প্রতি তার দয়া হইল। তার স্বামী ভয়ানক অসুস্থ। সে জন্যও বটে আর মহিলার মুখটি তার খুব ভাল লাগিয়াছে কতকটা সেজন্যও।

মহিলার-দেখানো সদর রাস্তা দিয়া বাড়িতে ঢুকিল হামিদ। বাম দিকে সতাই সিঁড়ি। সিঁড়িও মোজাইক করা। সেই সিঁড়ি দিয়া এক প্যাচ উঠিতেই হামিদ দেখিল;

সিঁড়ির মাথায় মহিলা দাঁড়াইয়া আছে। হাসি মুখে সে হামিদকে অভ্যর্থনা করিল। বলিল: আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব? আপনি আমার ধড়ে প্রাণ এনেছেন। কি বিপদেই না পড়েছিলাম। আসুন।

মহিলা হামিদকে পথ দেখাইয়া আগে-আগে চলিল। একটা কামরার সামনে গিয়া থামিল। দরজার হাতল ঘুরাইয়া আস্তে-আস্তে দরজা খুলিল। নিজে কামরায় ঢুকিল। হামিদকে ইশারা করিল। হামিদ ঢুকিলে তেমনি আস্তে-আস্তে দরজাটা ভিড়াইয়া দিল। তারপর হামিদের হাত ধরিয়া একটি বিছানার কাছে নিয়া গেল। বিছানায় শোওয়া একজন রোগী। সে হয়ত ঘুমন্ত। নয় অচেতন। তার চোখ বন্ধ। মহিলা ব্যাকুল চোখের ইশারায় যেন বলিল: এই আমার রোগী। আপনি দেখুন।

হামিদ নিজের গলা হইতে স্টেথসকোপ খুলিয়া রোগীর বুক বগল পরীক্ষা করিল। ব্যাগ হইতে স্কিগমোমেনোমিটার বাহির করিয়া রোগীর ব্লাড প্রেশার দেখিল। বাহু বন্ধনী বাঁধিবার সময়েই রোগী একটু নড়াচড়া করে। পাল্পের চাপ পড়ার সময় সে দুই-এক বার আহ-উহু করে। আর কিছু না। হামিদ গম্ভীর মুখে সব পরীক্ষা করে। পরীক্ষা শেষে আরও বেশি গম্ভীর হয়। মহিলা সব সময় হামিদের হাত ও মুখের দিকে ব্যগ্র ব্যাকুলতার সহিত নজর করিতেছিল। পরীক্ষা শেষ হইলে আশঙ্কাকম্পিত সুরে বলিল: কেমন দেখলেন ডাক্তার সাব?

হামিদ দরদ-ভরা গলায় বলিল: রোগীর অবস্থা জটিল। কিন্তু ঘাবড়াবার মতো কিছু না। একে আজই হাসপাতালে রিভুড করান। এখানে ঐরু চিকিৎসা হইতে পারে না।

মহিলা আগ্রহ-ভরে বলিল: কোন্ হাসপাতালে দেব? আপনি কোন্ হাসপাতালের ডাক্তার?

হামিদ: আমি কোনও হাসপাতালের ডাক্তার নই।

মহিলা: তা হলে আমি কোনও হাসপাতালেই দেব না। আপনাকে দিয়েই চিকিৎসা করাব। আর কাউকে দিয়ে নয়।

হামিদ: আপনি আনরিয়নেবল হইবেন না। বরঞ্চ আপনার স্বামীকে জিগ্গাস করেন।

হামিদ হাতের ইশারায় মহিলার দৃষ্টি রোগীর দিকে আকর্ষণ করিল। ইতিমধ্যে রোগী চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল। মহিলা সেদিকে চাহিয়া রোগীর বিছানায় বসিল। হেলিয়া রোগীর মুখের কাছে মুখ নিয়া কি যেন বলিল। তারপর উঠিয়া আসিয়া হামিদকে বলিল: আমার স্বামীও আমার সাথে একমত।

হামিদ: কিন্তু আমার পক্ষে এখানে ওঁর চিকিৎসা করা ত সম্ভব নয়।

মহিলা আকুল ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল: কেন এখানে সম্ভব নয়? কোথায় সম্ভব? আপনি যেখানে যেতে বলবেন, আমরা সেখানেই যাব। আমার স্বামীর চিকিৎসা আপনার করতেই হবে। আমি আপনার হাত ধরে অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করুন।

মহিলা সত্য-সত্যই দুই হাত বড়াইয়া হামিদের দুই বাজু চাপিয়া ধরিল। জোরে-জোরে ধাক্কা দিতে-দিতে সে বলিতে লাগিল: বলুন আপনি রাজি?

হামিদ চমকিয়া উঠিল। তার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। হাঁ তন্দ্রাই ত। সত্য-সত্যই কে যেন তার দুই বাজুতে দুই হাত চাপিয়া পুনঃ-পুনঃ ধাক্কা মারিতেছে। সে যেন কথাও শুনিতে পাইল। সত্যই কে যেন কথা বলিতেছে। হামিদ গুনিল: বাপজান, বাপজান, কি হৈছে তোমার?

এটা আশ্মার গলা না? হামিদ চোখ মেলিয়া চাহিল। ঘরে জিরো পাওয়ারের মৃদু সবুজ লাইট জ্বলিতেছিল। তারই আবছা আলোতে হামিদ দেখিল আশ্মা হামিদের মশারির ভিতরে অর্ধেক ঢুকিয়া তার বুকের উপর ঝুকিয়া দুই হাতে হামিদের দুই বাজু ধরিয়া ঠেলিতেছেন।

‘কি হৈছে আশ্মা?’ বলিতে-বলিতে হামিদ ধৎপৎ উঠিয়া বসিল। বলিল: কেন ডাকতেছেন আমারে? কোন অঘটন ঘটছে? চোর-টোর--?

আশ্মা হাত বাড়াইয়া বালিশের-কাছে-ঝুলানো বেড-সুইচটা টিপিয়া দিলেন। ঘর আলোকিত হইল। তিনি হামিদের মাথা ও বুকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন: ও-সব কিছু না বাপজান। তুমি খাবে কি দেইখা কেমন যেন করতে আছিল। আমার ঘর খনে তোমার গলার আওয়াজ পাইয়া ছুইটা আসছি।

স্বপ্নের কথা হামিদের মনে পড়িল। আশ্মার কাছে গোপন করিবার আশায় বলিল: তাই নাকি? আমি তবে স্বপ্নের ঘোরে বকতেছিলাম? হৈতেও পারে। ভাল ঘুম হয় নাই তা হৈলে। না হওয়ারই কথা। পেটটা একটু ফাঁপা লাগতেছিল।

ছোট আশ্মা সমর্থন করিয়া বলিলেন: নিশ্চয় তাই হৈছে। আশ্মা সে সন্দেহ আগেই হৈছিল। আজকার মাছটা বেশ নরম আছিল। আমি বাবুর্চিটারে কৈছিলাম বাপজানকে এ মাছটা দিও না। বাবুর্চি কইল, মাছ ঠিকই আছে। বরফ দেওয়া মাছ অমন হৈয়াই থাকে। তুমি নাকি অমন মাছ আরও কত খাইছ।

হামিদ আলাপের গতিতে খুশি হইয়া বলিল: বাবুর্চি ঠিকই কইছে আশ্মা। মাছের কোনও দোষ ছিল না। অন্য কিছু হবে হয় ত।

ছোট আশ্মা এতেও হামিদের সমর্থন করিলেন। বলিলেন: তাও হৈতে পারে। এবারের তেলটাও ভাল। সন্ধ্যার তেল বৈলা মনেই হয় না। খাঁটি তেল কোথাও পাওয়া যায় না, বাপজান? তেলটাই বদলাইতে হৈব। এখন বুঝলাম তেলেরই দোষ। এবারের তেলটা খাবার পর থাইকাই তোমার পেটটা বোধ হয় ঝরাপ হৈছে।

হামিদ: তা আপনি বুঝলেন কেমনে? আমি ত পেটের অসুখের শেকায়েত করি নাই।

আশ্মা: তুমি কোনটারই বা শেকায়েত কর। যা দেওয়া যায়, নাকে মুখে তাই গুঁইজা ডিস্পেনসারিতে ছুইটা যাও। তুমি না কৈলেও আমি জানি তোমার পেট কয়দিন ধৈর্যই ঝরাপ যাইতেছে।

হামিদ কৌতূহলে বলিল: তা জানলেন কেমনে?

আশ্মা: গত দুইদিনই নতুন চালানের তেলটা খাইতাছি। গত দুই রাতেও তোমার ঘুম হয় নাই। প্রায় সারারাতই হয় বিছানায় গড়াগড়ি করছ। নয় ত বিছানায় উঠানামা করছ। আমি জানালা দিয়া পহরে পহরে খোঁজ রাখছি। তাই আজ মধ্যের দরজাটা বন্ধ

না কৈরা খোলা রাখিলাম। হাজার শুকুর আল্লার। ওটা খোলা না রাখলে এখন কি হৈত বাপজান? কেমনে তোমার কাছে আমি আসতাম?

হামিদ এতক্ষণে অতি বিলম্বে বিস্মিত হই। তাই ত? এতক্ষণ এ কথাটা সে ভাবে নাই কেন? আশ্চর্য্য তার বেডরুমের ঢুকিলেন কেমন করিয়া? এ চিন্তা এতক্ষণ তার মনে হয় নাই কেন?

যাহোক হামিদ মায়ের-দেওয়া পেটের অসুখের অজুহাতটাকে সম্বল করিল। তৎক্ষণাৎ একটা হজমী বড়ি খাইবার ওয়াদা করিয়া আশ্চর্য্যকে বিদায় করিল। আশ্চর্য্য বিদায় হইবার পর সে বিছানায় চিৎ হইয়া একমাত্র দেখা স্বপ্নটার খুঁটিনাটি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল। আশ্চর্য্য আসিয়া তার ঘুমটা ভাংগাইয়া না দিলে সে শেষতক স্বপ্নটা দেখিতে পারিত। আশ্চর্য্যর কথাটা মনে পড়ায় অন্যদিক দিয়া তার বুকটা তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। নতুন করিয়া আজ আবার মনে হইল যার ঘরে মা আছে তার সবই আছে। যার ঘরে মা নাই, তার ঘরেও কিছু নাই, বুকোও কিছু নাই। সেই মা-ই আজ হামিদের ঘর আলো করিয়াছেন। বুক ভরিয়াছেন। তিনি না থাকিলে হামিদের ঘুম ভাংগাইবার কেউ থাকিত না ঠিক, কিন্তু ঘুম ভাংগাইয়া তিনি মায়ের যে কাজটি করিলেন, সন্তানের প্রতি যে মাতৃস্নেহটি দেখাইলেন এবং তাতে হামিদের বুকটা যে রসে ভরিয়া গেল, সেটি হামিদ কোথায় পাইত? তাছাড়া আশ্চর্য্য তার ঘুমটা না ভাংগাইলেও যে স্বপ্নটা ওখানে শেষ হইত না বা মোড় ফিরিত না, তারই বা নিশ্চয়তা কি? হামিদের স্বপ্নে কতবারই অমন মোড় পরিবর্তন হইয়াছে।

কিন্তু যতটুকু স্বপ্ন সে দেখিয়াছে তারই বা মানে কি? এটি কি তার মোরাকেবার ফল? তবে কি সে স্বপ্নে ওয়াজেদেরকেই দেখিয়াছে? ওয়াজেদের ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে সাজেসশান দিতে তার সাবজেকটিভ মনকে প্রভাবিত করিতে ওয়াজেদের পার্সন্যালিটির উপর নিজের সুপিরিয়র পার্সন্যালিটি প্রজেক্ট করিতেই হামিদ ঘুমের আগে ধ্যানস্থ হইয়াছিল। পার্সন্যালিটি প্রজেকশনের ক্রিয়ায় সে বিশ্বাস করে। শুধু নানাজীর কথায় বিশ্বাস করে নাই। কথাটা মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য। বিলাত থাকিতে সে এটার সাফল্য দেখিয়াছে। হামিদের চেষ্টাও সফল হইতে বাধ্য। সফল হইয়াছে কি তা? ওয়াজেদের চেহারার যে কল্পনা করিয়া সে ধ্যানস্থ হইয়াছিল, স্বপ্নে-দেখা রোগীটার চেহারা ত তেমন নয়। তবে কি স্বপ্নে দেখা লোকটাই আসল ওয়াজেদ? ওটাই কি তবে ওয়াজেদের ঠিক চেহারা? মহিলাটিও কি তবে ওয়াজেদের স্ত্রী? দুইটি চেহারাই ত হামিদের চোখে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিতেছে। তা যদি হয়ও, তবু হামিদের উদ্দেশ্য সফল হইল কেমন করিয়া? রাখিয়ার কথাটা ত তাকে বলাই হইল না।

অতএব স্বপ্নে-দেখা ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিয়া তার মধ্যে কোনও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য আবিষ্কার করা যায় না হামিদ তাই ভাবিতে লাগিল। স্বপ্নের আবার ব্যাখ্যাটা কি? মোরাকেবার ফলে যা ঘটবার কথা তা ঘটবে স্বপ্নের আকারে একথা নানাজীও কোনও দিন বলেন নাই। হামিদও কোন দিন ভাবে নাই। সে নিজে ছেলেবেলা পয়গম্বর সাহেব ও খাজে খেজেরকে খাবে দেখিবার চেষ্টা করিত। সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। সেদিন হামিদ নিজের বাপকে খাবে দেখিয়াছে। ওটাও মোরাকেবার ব্যাপার নয়। মনোবিজ্ঞানীরা স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করেন তাও হামিদের মনে পড়িল।

হামিদের বিজ্ঞানী মন ও বিশ্বাসী মনের মধ্যে আবার বাদ-বিতণ্ডা বাঁধিয়া গেল। যদি মোরাকেবায়-বায়নান্নাসের ফলে আজকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে তবে আর এ ব্যাপারে মোরাকেবা করা চলিবে না। নানাজী সাবধান করিয়া গিয়াছেন। তবে ত হামিদকে অপেক্ষাই করিতে হয়। হামিদ ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

পরদিন হামিদের দেহিতে ঘুম ভাঙিল। উঠিয়াই জানিতে পারিল আশ্মা চাকর-চাকরানীদের হামিদের ঘুম ভাঙাইতে মানা করিয়া দিয়াছিলেন। ডিস্পেনসারি হইতে দুই-দুইবার লোক আসিয়াছিল হামিদকে নিতে। আশ্মা তাদেরও ফেরৎ দিয়াছেন।

হামিদের উঠার আঁহট পাইয়া আশ্মা তার নাশতা তৈয়ার লইয়া বাবুর্জিকে উপদেশ দেওয়ায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকালের বাথ রুমের কাজ সারিয়া হামিদ বাহিরে আসিতেই আশ্মা হাসিমুখে বলিলেন: ভাল ঘুম হৈল বাপজান? পেটের অবস্থা কেমন? পায়খানা কেমন হৈল?

রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া হামিদ হাসিমুখে জবাব দিল: আপনার লুকুম-মতো হজমীটা খাওয়ায় সব সাইরা গেছে। ঘুমও ভাল হৈছে! পায়খানাও সাফ হৈছে।

‘আলহামদুলিল্লাহ’। আশ্মা দুই হাত তুলিয়া মুখে মলিলেন। বলিলেন: রাতে আমার কি ভাবনাটাই যে হৈছিল। নাশতাটা খুব পাতলাই করছি বাপজান। একটা দিন সাবধান থাকা ভাল।

খানা কামরায় গিয়া হামিদ দেখিল: সত্যিই পেটের পীড়ার রোগীর পথ্য। কলা পঁপে আপেল কমলালেবুতে টেবিল ভর্তি। চিড়ার মণ্ড ও দুই মাল্টার রস বেলের শরবৎ ইত্যাদির গ্লাস কাতার করিয়া সাজানো।

হামিদ আশ্মার দিকে চাহিয়া বলিল: রোগীর পথ্য বটে তবে রোগেরও পথ্য। যে সব খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন, তাতে আগে পেটের অসুখ না হৈয়া থাকলেও এবার নির্ঘাত হবেই।

আশ্মা খুশী হইয়া বলেন: বাপজানের যে কথা। এ আর বেশি কি? তোমরা জোয়ান মানুষ। অসুখ করছে বৈলাই ত আর পেট খালি রাখা যায় না। গোশত-পরাটা-আঙাও ত আর দিতে পারি না। তাই কিছু ফল-মূলের আয়োজন করছি।

পেটের পীড়া-টীড়া ত কিছু না। কাছেই হামিদ খাইলও প্রচুর। অনেক দিন পরে গোশত-আঙা-পরাটা ছাড়া নতুন কিছু খাওয়ার স্বাদও খুব। হামিদ কতবার মনে করিয়াছে সকালের নাশতায় নতুন কিছু খাইবে। বলি-বলি করিয়াও বলা হইয়া উঠে নাই। ধন্যবাদ গতরাত্রের পেটের অসুখকে। এই অজুহাতে তা হইয়া গেল। পরম তৃপ্তির সংগে নাশতা খাইতে লাগিল। তার হাত ও মুখের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া খুশী হইয়া আশ্মা বলিলেন: চা করুম কি বাপজান? পেটের অসুখটার পর-পরই চা খাওয়া কি ঠিক হৈব?

আশ্মার বিশ্বাস পাকা করিবার অপূর্ব সুযোগ। হামিদ কথাটা লুফিয়া লইল। বলিল: ঠিকই কইছেন আশ্মা। চা এ বেলা আর খাওয়া উচিত না।

মনে মনে বলিল: দরকার হয় ক্লিনিকে গিয়াই খাব।

নাশতা শেষ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া-মুছিয়া অফিসের সাজ করিয়া হামিদ আম্মাকে কদম-বুসি করিয়া গাড়িতে উঠিল।

এই অভ্যাসটা হামিদ আম্মাকে বাসায় আনা অবধি রক্ষত করিয়াছে। বাহিরে যাইতে একবার বাহির হইতে ফিরিয়া আসিতে একবার আম্মার কদম-বুসি করে। তা যত বারই যাওয়া-আসা করুক। হামিদের এই অভ্যাসে নানাজী খুব খুশী হইয়াছেন। শুধু বারে-বারে তারিফই করেন নাই। এই আদতের বহুত মরতবার কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু ও-সব কোনও কারণে নয়। হামিদ এটা করে তার ভাল লাগে বলিয়া। হামিদ অনুভব করিয়াছে আম্মারও যেন এটা ভাল লাগে। এত ঘনঘন কদম-বুসিতে তিনি কোনও দিন আপত্তি ত করেন নাই-ই; বরঞ্চ হামিদের মনে হইয়াছে, এতে আম্মা খুশীই হন। হামিদের নিজের দিক হইতেও অমনি ভাব। তার আদর্শবাদী রোমান্টিক মনে একাজের একটা রোমাঞ্চকর পুলকও আছে। সে দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, বই-পুস্তকেও পড়িয়াছে, প্রেমিক-প্রেমিকারা সুখী স্বামী-স্ত্রীরা বাইরে-যাওয়া আসার সময় পরস্পরকে চুমা দিয়া থাকে। বিলাতে সে দেখিয়াছে, দাম্পত্য সম্পর্কের এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ। ওখানে এটা শিষ্টাচারে পরিণত হইয়াছে। তবু ওর মধ্যে রোমাঞ্চ আছে। সে মনে-মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, নিজের দাম্পত্য জীবনে সে এ নিয়ম কড়াকড়ি ভাবেই মানিয়া চলিবে। দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবিতেই রাযিয়ার সুন্দর মুখখানা তার মনে পড়িয়াছে। তার গালে ঠোঁটে সে কল্পনায় চুমা খাইয়াছে। ওটা ছিল এতদিন হামিদের কল্পনা। এখন আম্মার কদম-বুসি করিবার সময় হামিদ যেন অমনি ধরনের ঠিক ঐ রকমের না হইলেও প্রায় সেই রকম একটা ঈষদুষ্ণ গরম পুলক-প্রবাহ তার নিজের মধ্যে অনুভব করে। হামিদের বিজ্ঞানী চোখ ও ডাক্তারী হাত আম্মার পায়ের মধ্যে তাঁর সর্বাংগের একটা পুলক-প্রবাহের প্রতিবিম্ব যেন দেখিতে পায়। এটা তার বড় ভাল লাগে। সেজন্য হামিদ মামুলি কদম-বুসির চেয়ে অনেক বেশি সময় আম্মার পায়ের উপর হাত রাখে। তিনবার পা ছুঁইতে বেশ কয়েক সেকেণ্ড কাটিয়া যায়। মায়ের চরণ-স্পর্শের এই পুলকানন্দ হামিদের বুকে বেশ কয়েক মিনিট শিহরণ জাগাইয়া রাখে। হামিদের বিজ্ঞানী মনের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনেকবার তার মনে প্রশ্ন করিয়াছে: এটা মায়ের স্পর্শ না নারীর স্পর্শ? কোনও উত্তর পায় নাই সে।

হামিদ প্রফুল্ল মনে ক্লিনিকে পৌছিয়াই রোগী লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দেরি হওয়ায় অনেক রোগী আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অন্য দিকে রোগীর সংখ্যা বাড়িয়াও গিয়াছে খুব। বিলম্ব শোধরাইবার জন্য সে যতই ব্যস্ত হোক, এরই মধ্যে একবার রাইটিং প্যাডের উপর বড়-বড় হরফে রেড-ব্লু পেনসিলের লাল কালিতে লেখা একটা স্লিপের দিকে তার চোখ পড়িয়া গেল। নিচে রশিদ নামটা দেখিয়া সে স্লিপটা না পড়িয়া পারিল না।

রশিদ জরুরী কথা বলিতে হামিদের কাছে আসিয়াছিল। তারই কথা মতো বাসায় লোক গিয়াছিল। হামিদ তখন উঠে নাই খবর পাইয়া রশিদ ফিরিয়া গেল। কাল এমনি সময়ে আবার আসিবে।

হামিদ সহকারী ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারদের নিকট পুছ করিয়া জানিতে পারিল রশিদের কোনও অযত্ন হয় নাই। রশিদকে তারা সবাই চিনে। কাজেই আদর-আপ্যায়ন করিয়াছে খুব। তাকে বসাইয়া দুই-দুইবার বাসায় লোক পাঠান হইয়াছিল।

তথাপি হামিদ হাতের রোগীগুলি শেষ করিয়াই রশিদকে টেলিফোন করিল। প্রথম চেষ্টাতেই তাকে পাইল। বিনা-খবরে একটা রিং না করিয়া কেন আসিয়াছিল, হামিদ তার কৈফিয়ৎ চাহিল। এভাবে হামিদকে বেকায়দায় ফেলা রশিদের উচিত হয় নাই। রশিদের উত্তর পাইল, অনেক দিন, প্রায় মাস খানেকই হইবে, বাইরে কাটাইয়া রশিদ মাত্র গতকালই করাচি হইতে নারায়ণগঞ্জে ফিরিয়াছে। সকালে হামিদের সাথে দেখা করা সহ কয়েকটা কাজ নিয়া বাহির হইয়াছিল। মনে করিয়াছিল সব কাজ শেষ করিয়া হামিদের সাথে দেখা করিবে। তাতে সময়ের দিক দিয়া ঠিক ছিল না বলিয়া সে যাইবার আগে টেলিফোন করে নাই। যাহোক অনেক আলাপ আছে। আগামী কালই সব কথা হইবে। হামিদ যেন হাতে সময় রাখে। রশিদের কথা শুনিয়া হামিদ সময়ের একটু ওদলবদল করিয়া টাইম ঠিক করিল। রশিদ তাই মানিয়া নিল।

পরের দিন নির্ধারিত সময়ে রশিদ আসিল। গোপনে খাতিরজমা হইয়া কথা বলিবার অজুহাতে রশিদ হামিদকে লইয়া হামিদের পছন্দ-মতো কোনও জায়গায় যাওয়ার প্রস্তাব দিল। হামিদ রাজি হইল না। এক কথায় সে রশিদকে বুঝাইয়া দিল। সাধারণ অবস্থায় কোনও রোগী তাদের ডিস্টার্ব করিবে না বটে কিন্তু ইমার্জেন্সি কেসের জন্য তার চেম্বারেই হাজির থাকিতে হইবে। ইমার্জেন্সি কেস যে বেজিই আসে তা নয়। তবে শিডিউল আওয়ার্কে ক্লিনিকে হাযির থাকা ডাক্তারের প্রক্সেনাল এথিক্সের কথা। ইমার্জেন্সি রোগী যে আসিবেই, তার কোনও মানে নাই। তবু আগে হইতে নোটিস না দিয়া হামিদ ক্লিনিক হইতে অনুপস্থিত থাকিতে চায় না। রশিদ খুশী হইয়াই হামিদের যুক্তি মানিয়া নিল। রশিদ নিজেও ইদানিং খুবই নিয়মবর্তী হইয়াছে।

গোপনীয়তা ও নির্জনতা নিশ্চিত করিবার জন্য ভিতরের দিককার বারান্দা-কোঠায় বসার ব্যবস্থা হইল। দুই বন্ধু আলাপে বসিল। রশিদ গত একটা মাস চাটগাঁ, কলিকাতা, করাচি ও লাহোর ঘুরিয়া আসিয়াছে। সবই বৈষয়িক ভ্রমণ। বিনা-কাজে একদিনও নষ্ট করে নাই। সে সব সফরের ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া রশিদ আসল কথায় আসিল। বলিল: বোর্ডের যে দুই-একজন মেম্বর তোমার সম্বন্ধে কিছু-কিছু আপত্তি করতেছিলেন। তাঁদের আপত্তির একমাত্র যুক্তি ছিল তোমার সাথে সরকারী লোকের সম্পর্ক ভাল না। তোমারে নিলে সরকারী লোকের সাহায্য-সহানুভূতি থনে আমরা বঞ্চিত হৈতে পারি। তাঁরার আপত্তি খণ্ডাবার লাগিই আমার এই সফরে বার হওয়া। সবাই আমারে আশ্বাস দিছে কারও কোনও আপত্তি নাই। দুচারজন বরঞ্চ বলছেন, তোমারে নিলে তাঁরা খুশীই হবেন। কোম্পানিরও ভাল হবে। শুনলা ত তুমি সব? এখন তুমি কও কবে থনে আমরা তোমারে পাব?

হামিদ: আচ্ছা রশিদ ভাই, আপনে এমন একটা বুদ্ধিমান লোক হৈয়াও এমন নাহক অগ্রিম খাটুনিটা খাটলেন কেন?

রশিদ বিশ্বয়ে বলিল: কোনটা অগ্রিম? আর কোনটাই বা নাহক?

হামিদ: আমি আপনার কোম্পানিতে চাকরি নিমু কি না তা না জাইনাই আপনে দুনিয়াময় ছুটাছুটি করলেন, এটাই অগ্রিম খাটনি। আর আমি আপনার বৈলা দিলাম, আপনার চাকরি করার আমার অসুবিধা আছে, তার পরেও আপনার এই পরিশ্রম ও অর্থব্যয়, এটাই নাহক।

রশিদ: বরঞ্চ আমার বিবেচনায় তুমি আমার কোম্পানির এডভাইয়ার হৈতে রাজি আছ, এটা ঠিক হৈয়াই আছে। তুমি আপত্তি করছিল, এটা ঠিক। আর আমি তোমার আপত্তি অগ্রাহ্য করছি তাও ঠিক। কাজেই আমার এ পরিশ্রম অগ্রিমও হয় নাই, নাহকও হয় নাই। এখন কথাটা পরিষ্কার হৈল ত? তাছাড়া, তুমি এটাকে চাকরি কও কেন? তোমারে চাকরি নিতে ত কখনও বলি নাই। এডভাইয়ার হৈতেই ত বলছি।

হামিদ হাসিয়া বলিল: ওটা ত একই কথা হৈল।

রশিদ খুব জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল: না এক কথা হৈল না। কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এই রশিদ শুদ্ধা সব ডাইরেক্টররাই তোমারে মুরুব্বিই মনে করব। ফতেপুরের পীরজাদারে পীর সাহেব বৈলাই সম্মান করব। শোন ভাই হামিদ, তোমার কাছে বলতে বাধা নাই, কোম্পানির ডাইরেক্টরর কাছে তোমার বিলাতী ডিগ্রির চেয়ে ফতেপুরের পীর হওয়ার দাম অনেক বেশি।

হামিদ রশিদের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল: তাতে কোম্পানির লাভ?

রশিদ: কোম্পানির লাভ-লোকসান কোম্পানি দেখব। কোম্পানির ডাইরেক্টররা সবাই পাক্কা ব্যবসায়ী লোক। তারার লাভ-লোকসানের হিসাবের মাপকাঠিটা তারার উপরই ছাইড়া দিতে পার।

হামিদ: কিন্তু এতে আমার যে প্রিন্সিপলে বাধে আপনে ত জানেন, আমি ও ধরনের মেডিসিন ম্যানুফেকচারিং শিল্পের বিরোধী। ওটা আমার কাছে একটা প্রিন্সিপলের প্রশ্ন।

রশিদ: কিন্তু তোমার-দেওয়া শর্ত ত আমি আগেই মাইনা নিছি। দেশী গাছ-গাছড়া ও দেশী ধাতব-খনিজ খনাই মেডিসিন তৈরি করব, বিদেশী দ্রব্য আমদানি করব না, এটা ত ঠিকই হৈয়া আছে। এরপর তোমার প্রিন্সিপলের কথা আর রইল কই? ওটা ঠিক হওয়ার পরই ত তুমি আমার এডভাইয়ার হৈতে রাজি হৈছ। এখন আবার কথা বদলাও কেন?

হামিদ: না রশিদ ভাই, ওর সাথে আরেকটা শর্ত ছিল।

রশিদ: সেটা আবার কি?

হামিদ: ও:, এরই মধ্যে ভুলিলা গেছেন? আপনি যে এ দেশে একটা বরিক এণ্ড ট্যাফেল খুলবেন, তার কি হৈল?

রশিদ বেশ একটু বিব্রত হইয়া বলিল: তা কইছিলাম ঠিক। স্থিরও করছিলাম ওটা করব বৈলা। কিন্তু আমার বিলাতী পার্টনাররা শক্ত আপত্তি কৈরা বসল। তারার আপত্তি খণ্ডন কৈরা ফেলছিলাম প্রায়। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার নিজেরই মত-পরিবর্তন হৈয়া গেছে। আমি নিজেই আর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীতে বিশ্বাস করি না। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে আমি বেশ-কিছু পাড়শোনা করছি। সর্বাবধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান

হোমিওপ্যাথিরে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-প্রণালী স্বীকারই করে না। ওটারে তারা বলে তুচ্ছ চিকিৎসা বা ফেইথ কিওর।

হামিদ: আপনেও তাই বিশ্বাস করেন নাকি?

রশিদ: আগে করতাম না। এখন করি। তুমিই কও ভাই হোমিওপ্যাথিতে অশুদ্ধ কই? ডাইলিউশন করতে-করতে ওর থাকে কি?

হামিদ: রশিদ ভাই, পাশ না করলেও আপনে একজন ডাক্তার। শিক্ষা-দীক্ষায় আপনে বিজ্ঞানী। মনের দিক দিয়া আপনে বিপ্লবী। তার পরেও আপনে বলতে পারলেন ডাইলিউশন সাকশন ও ট্রাইচুরেশনে ঔষধির নিরাময়-শক্তি কইমা যায়? এই এটমিক যুগেও এমন কথা আপনে বলতে পারলেন? আশ্চর্য! আপনে ত জানেন বস্তু যত বিভক্ত হয়, অণু যত সূক্ষ্ম পরমাণু হয়, শক্তি তার তত বাইড়া যায়।

রশিদ: না, তা আমি অস্বীকার করি না। আমি শুধু বলি যে বিভাজনটা হৈতে হবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে। শুধু পানির পর পানি ঢাললেই অশুদ্ধের শক্তি বাড়ে না। এ সম্পর্কে তোমারে কলিকাতার সেই প্রবচনটির মাহাত্ম্যের কথা শুনতে-শুনতে একজন শ্রোতা বলছিল: তা হলে আর কি? হাওড়া ব্রিজের নিচে এক ফোটা ঔষধ ফেলে দেব। আর ডায়মণ্ড হার্বার থেকে এক চৌল পানি তুলে নিয়ে গিলে ফেলব। ব্যাস! কোটি ডাইলিউশন হয়ে যাবে।

রশিদ নিজের রসিকতায় হাসিল। হামিদও তাতে যোগ দিল। হামিদ বলিল: ঐ রসিকতায় রস আছে প্রচুর। কিন্তু ওতে হোমিওপ্যাথির সত্যতা অপ্রমাণিত হয় নাই। কারণ এনালজিটা খাটে না। সেটা যাই হোক আপনে আপনার মত পরিবর্তনের কথা বললেন। আপনেরে জানান দরকার যে আমিও ইতিমধ্যে আমার মত পরিবর্তন করছি।

রশিদ কৌতূহলী হইয়া বলিল: সেটা কি?

হামিদ: আমি ঠিক করছি, এলোপ্যাথি ছাইড়া দিয়া আমি এরপর শুধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করব।

বিশ্বয়ের ভাবটা অতি কষ্টে গোপন করিয়া রশিদ বলিল: দেখ হামিদ, তুমি শুধু হোমিওপ্যাথিকের মায়ায় তোমার এতবড় লুক্র্যাটিভ রোরিং প্র্যাকটিসটা ছাইড়া দিবা, এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় আমার কারখানায় যোগ না দেওয়ার একটা বাহানা বার করবার লাগিই তুমি এলোপ্যাথিক প্র্যাকটিস ছাড়তেছ। নিজের ও দেশের এ সর্বনাশটা তুমি কৈর না। শুধু এই বাহানার লাগিই যদি তোমার প্র্যাকটিস বদলাবার দরকার হইয়া থাকে, তবে সে বাহানার তোমার দরকার হবে না। আমি তবে আমার অফার উইথড্র করলাম।

হামিদ নরম হইয়া বলিল: আপনে আমারে ভুল বুঝবেন না রশিদ ভাই। আমি শুধু বাহানার তালাশে এলোপ্যাথিক প্র্যাকটিস ছাড়তেছি না।

রশিদ: তবে কি তুমি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সন্দিহান হইয়াই এ লাইন ত্যাগ করতেছ?

হামিদ: তা হবে কেন? এলোপ্যাথিও হোমিওপ্যাথির মতোই বৈজ্ঞানিক। দুইটাই মানব জাতির উপকারী। তবে আমার বিবেচনায় হোমিওপ্যাথি এলোপ্যাথির চেয়ে শ্রেষ্ঠ সকল দিক দিয়াই। নিকৃষ্টটা ছাইড়া উৎকৃষ্টটা ধরা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। উচিতও।

রশিদ: তুমি আমারে অবাক করলা হামিদ। কোন্ কোন্ দিকে তুমি হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠত্ব দেখলা আমারে কইতে পার?

হামিদ: কেন পারব না? নিশ্চয় পারব। বলব ত আপনেনেই সবার আগে। আপনেনেই আমি আমার ফাস্ট কন্ভার্টরুপে দেখতে চাই।

রশিদ এবার তাজিলের হাসি হাসিল। বলিল: বলই না আগে শ্রেষ্ঠত্বের কথাটা। শুইনাই নেই।

হামিদ: হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠত্ব অনেক দিকে। তবে একটা ফাণ্ডামেন্টাল শ্রেষ্ঠত্বের দিকে আপনার দৃষ্টি-আকর্ষণ করলেই যথেষ্ট হবে বৈলা আমি মনে করি। কারণ আপনি নিজেও ডাক্তার।

রশিদ ভাষায় একটু বিদ্রুপের পোছ দিয়া বলিল: সেটা কি?

হামিদ: এলোপ্যাথির ফ্রন্টিং ও এক্সপেরিমেন্ট হয় গিনিপিগ জাতীয় মানবের জ্ঞানোয়ার ও প্রাণহীন জড় পদার্থের উপর। আর হোমিওপ্যাথির ফ্রন্টিং ও এক্সপেরিমেন্ট হয় সুস্থ নীরোগ স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ মানুষের উপর। স্বয়ং ডাক্তারের নিজের দেহ-মনের উপর। এই দিক খনে হোমিওপ্যাথিক অসুখের প্রযুক্ত্যতা ও নির্ভরশীলতার পরিমাপ আপনি নিজেই করতে পারেন।

রশিদ মনের চাঞ্চল্য সাধ্যমতো গোপন করিয়া বলিল: তুমি ত আমার সত্যই ভাবাইয়া তুললা হামিদ।

হামিদ: তারপর আরও একটা দিক দেখেন। এলোপ্যাথি রোগের চিকিৎসা। কিন্তু হোমিওপ্যাথি রোগীর চিকিৎসা। এর ভিতরের মূলগত পার্থক্যটা বুঝতে চেষ্টা করেন রশিদ ভাই। রোগী মানে এখানে গোটা মানুষটি, একটা ব্যক্তি। শুধু তার দেহ নয়। শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ত নয়ই। পক্ষান্তরে এলোপ্যাথি শুধু রোগের চিকিৎসা করে না। বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন চিকিৎসা করে। মেশিনের মতো রিপেয়ার করা আর কি? সত্যি রশিদ ভাই, এলোপ্যাথি রোগীকে মানুষ হিসাবে চিকিৎসা করে না। মেশিন হিসাবেই করে। তাই সেখানে তারা দেহের চিকিৎসা করে, মনের চিকিৎসা করে না। দেহের চিকিৎসাও করে তারা খণ্ড-খণ্ড বিভক্ত ভাগে: কেউ চোখের, কেউ বুকের, কেউ দাঁতের, কেউ বাতের। ব্যক্তির চিকিৎসা কেউ করে না। মানুষের যে একটা ব্যক্তিত্ব পার্সন্যালিটি আছে, তাই তারা স্বীকার করে না। স্বীকার করে না মানে জানেই না। মানুষের আত্মার ত কথাই নাই।

হামিদের লম্বা বক্তৃতার সময় রশিদ মুচকি-মুচকি হাসিতেছিল। হামিদের কথা শেষ হইতেই রশিদ বলিল: ব্রেভো! হামিদ তুমি ফতেপুরের পীরের মতোই কথা বললা। পীরগিরির বিরুদ্ধে তুমি না বিদ্রোহ করছিল? চাচাজানের এন্তেকালের সাথেই বুঝি তোমার সে বিদ্রোহ শেষ? এবার পীরগিরি ধরাই ঠিক করছ বুঝি। খুব বুদ্ধিমানের কাজ করছ। পীরালির আয় যে অনেক বিলাত-ফেরতা ডাক্তারের চেয়ে বেশি, আমি তা স্বীকার করি। এতক্ষণে বুঝলাম, তুমি আমার ইগাঙ্কির এডভাইসার কেন হৈতে চাও না।

রশিদের বিদ্রুপের ভাবটা হামিদ অগ্রাহ্য করিল। বলিল: আপনি নাহক চইটা গেছেন রশিদ ভাই। আমি পীরগিরির কথা কখন কইলাম?

রশিদ কিছুমাত্র না দমিয়া সমান জোরে বলিল: সোজাসুজি কও নাই। ইনডাইরেক্টলি অনেক কৈছ। নইলে চিকিৎসার মধ্যে তুমি আত্মা সোল স্পিরিট এসব কথা টাইনা আন কেন?

হামিদ গম্ভীরভাবে বলিল: দরকার বৈলাই আনছি। স্পিরিট প্রাণ অন্তর আত্মা যে নামেই ডাকেন না কেন সমস্ত জীবনের ক্ষেত্রেই ওটাই বড় কথা, এমন কি আসল কথা। বিপুল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অসীম সৌরজগতের তুলনায় মানুষ একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু বই ত নয়। এনাটমি-ফিজিওলজি পৈড়া নিশ্চয় আপনে বুঝছেন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণুও একটি গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। উভয়েই একই নিয়মে চলে। বিজ্ঞানে নিশ্চয় আপনি পড়ছেন মেটার এনার্জি ও কনশাসনেস, জড় শক্তি ও চৈতন্য নিয়াই জগৎ। বিজ্ঞানীরা আমরা মেটার এবং এনার্জির মধ্যেই আমার সাধনা সীমাবদ্ধ রাখছি। চৈতন্যের সাধনা আমরা করি নাই। ওটাকে আধ্যাত্মিক বৈলা আমরা একঘরে কৈরা রাখছি নিজের বিজ্ঞানী বুদ্ধির অক্ষমতা গোপন করবার জন্য।

রশিদ বিদূপের হাসি হাসিয়া বলিল: বিজ্ঞানীরারে মন্দ কৈয়া যদি আনন্দ পাও, খুব কও। থাক তুমি তোমার বিশ্ব-জগৎ লৈয়া। তোমার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মানে ত ইউনিভার্স? মানে এক জগৎ? বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে ইউনিভার্স ডিংগাইয়া মাল্টিভার্সে চৈলা গেছে। বিশ্ব-জগৎ এখন আর একটা না অগণিত।

রশিদের বিদূপটা অগ্রাহ্য করিয়া হামিদ মিষ্টি হাসি হাসিয়া বলিল: সেই জন্যই ত কনশাসনেস ও এনার্জির মূল্য আরও বেশি। কনশাসনেস এলা যাই হোক, এনার্জিরে ত আমরা পাশ কাটাইয়া যাইতে পারি না। অথচ এলোপ্যাথি তাই কৈতেছে।

রশিদ: এলোপ্যাথি ত এনার্জি বাদ দিতে বলে নাই।

হামিদ: মুখে বলে নাই। কাজে করছে। হোমিওপ্যাথি এনার্জির উপর প্রতিষ্ঠিত বৈলাই তার অত নিন্দা করা হৈতেছে। এলোপ্যাথির বুন্যাদ স্থূল জড় পদার্থ। হোমিওপ্যাথির বুন্যাদ সেই স্থূল জড়ের শক্তিকৃত এনার্জি। স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মের শক্তি কত বেশি তার প্রমাণ এটম ও হাইড্রোজেন বোমা।

রশিদ: কিন্তু তাও ত বিজ্ঞানেরই অবদান। ওতে আধ্যাত্মিকতা আসে কই থনে?

হামিদ: আসে আসে রশিদ ভাই। বিজ্ঞানই নিজ প্রয়োজনে আধ্যাত্মিকতা ডাইকা আনে। নিজেই তার প্রমাণ দেয়। একটা দৃষ্টান্ত দেই। ঔষধিদ্রব্য যখন ডাইলিউশন সাকাশন বা ট্রাইটুরেশনে উচ্চ শক্তিকৃত হয়, তখন তার রাসায়নিক পরিবর্তনশীলতা লোপ পায়। হাজার বা তার চেয়ে উচ্চ শক্তির একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আপনে যতদিন-ইচ্ছা যেখানে-ইচ্ছা ফেইলা রাখুন তার নিরাময়-শক্তি নষ্ট হবে না।

রশিদ সত্যি-সত্যি বিস্মিত হইল। বলিল: তাই নাকি? এটা সত্য?

হামিদ: জ্বি হাঁ সত্য। এটা যেন প্রাণের জৈব দেহ ত্যাগ কৈরা অবিনশ্বর জীবনে বিবর্তন লাভ। ধর্মের ভাষায় এটাই আত্মার পরমাত্মায় নীল হওয়া, নির্বান লাভ করা, ফানাফিল্লা হওয়া।

রশিদ দুই হাত উঁচা করিয়া কাকুতির ভংগিতে বলিয়া উঠিল: দোহাই আল্লাহর। থাম তুমি থাম। আর না। ওরে বাবা! এসব কি শুনলাম? তুমি আমারে কোথায় নিয়া যাইতে চাও হামিদ?

হামিদ রশিদের ব্যবহারে হাসিল। বলিল: চুপ কৈরা শুনে রশিদ ভাই, আমার কথা এখনো শেষ হয় নাই।

রশিদ এবার সত্য-সত্যই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। হাত জোড় করিয়া বলিল: আর এক লফফও না। এতেই আমার কলব ফাটে-ফাটে অবস্থা। পীর-মুর্শেদের নূরের তেজ কত আজ বুঝলাম। মানে তারার কথার নূরের তেজ।

রশিদ সত্য-সত্যই নিজের বুকে ফুঁ দিতে লাগিল।

রশিদ তার এই ব্যবহারকে নিছক রসিকতা ও বিদূষ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেও হামিদ বুঝিল, এর সবটুকু বিদূষ-রসিকতা নয়। তাই ওর কতটুকু অভিনয় আর কতটুকু সত্যিকার চিন্তা-চাঞ্চল্য, তা বুঝিবার জন্য হামিদ তার বিশাল আয়ত জ্যোতির্ময় চোখ দুইটা দ্বিগুণ প্রসারিত করিয়া রশিদের মুখ-ভাব পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে কিছু বলিবার আগেই রশিদ পুনরায় চেয়ারে বসিয়া গলায় প্রচুর আগ্রহ ও দরদ আনিয়া বলিল: হামিদ ধনের ভাইটি আমার, তোমার হাত ধৈরা কইতেছি, পায় ধৈরাও কইতে পারি, তুমি এই সুফী-দরবেশির লাগি এত বড় প্র্যাকটিসটা ছাইড় না। তুমি জান না তোমার হাতযশ কত! যার গায় হাত দেও সেই ভাল হৈয়া যায়। এ সব কথা আমার না। দুনিয়ার মানুষের। তোমার সাথে আমি দেখা করি কম। কিন্তু খবর নেই সব সময়। আর খবরও আমার নিতে হয় না। যার সাথে দেখা হয়, যার সাথে কথা কই, সেই তোমার তারিফ করে। শ্রমিক শ্রেণী ত তোমার নামে জড়ান। শুধু আমার কারখানার শ্রমিকরা না। নারায়ণগঞ্জ সোনাকান্দা আদমজীনগর ডেমরা সকল এলাকার শ্রমিকরা তোমারে শুধু তারার চিকিৎসক মনে করে না, পীর-মুর্শে মনে করে। ওরার মুখের দিকে চাইয়াও তোমার এ চিকিৎসার লাইন ছাড়া উচিত নয়।

হামিদ: আপনি কি মনে করছেন এলোপ্যাথি ছাইড়া দিলেই তারারে আমি ছাইড়া দিমু?

রশিদ: তুমি না ছাড়লেও তারা ত ছাড়তে পারে? হোমিওপ্যাথির উপর তারার বিশ্বাস নাও থাকতে পারে।

হামিদ: আমার উপর যারার বিশ্বাস আছে, আমার অমুখের উপরও তারার বিশ্বাস থাকবই। আপনাই ত বলছেন, হোমিওপ্যাথি আসলে ফেইথ কিওর। সে অবস্থায় চিকিৎসা না জানলেও ঐ অন্ধ বিশ্বাসই হবে আমার সম্বল। আসলে অন্তত: তারার জন্যই আমার হোমিওপ্যাথি ধরতে হবে। ঐ গরিবরা এলোপ্যাথির অত দামী অমুখ কিনতে পারে না।

রশিদ বিব্রত বোধ করিল। সে মনে করিল ফেইথ কিওরের কথাটা বলা ঠিক হয় নাই। সে হামিদের চিকিৎসা-জ্ঞানে অসৎ ইংগিত করিয়াছে বলিয়া হামিদের ধারণা হইয়াছে। তাই এইভাবে বক্তোক্তিতে তার জবাব দিল। হামিদের ভুল ধারণা দূর করিবার আশায় সে একটু ঘুরাইয়া বলিল: শুধু লেবার ক্লাসের কথা কইছি বৈলা তুমি মনে কৈর না বড় লোকেরা তোমার তারিফ করে না। বড় লোকেরা এমন কি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তাররাও বলে মতবাদের দিক দিয়া তুমি যতই পাগলামি কর না কেন,

ডায়গনসিস্ ও প্রেসক্রিপশন করবার সময় তোমার কখনও ভুল হয় না। সবাই এ কথা স্বীকার করে। এই আজও কয়জনের সাথেই কথা হৈল। তাঁরার মধ্যে ডাক্তারও ছিলেন। সবাই বললেন ডা. হামিদের ভুল হৈতে তাঁরা দেখেন নাই। তাই কই ভাইটি আমার তুমি এ লাইন ছাইড়া হোমিওপ্যাথির দিকে যাইয়ো না। তুমি মনে কৈর না, আমার ব্যবসার স্বার্থের দিক চাইয়া আমি একথা কইতেছি।

হামিদ হাসিয়া বলিল: এতক্ষণ তা মনে হয় নাই। এখন হৈল। তা যাই হোক আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না। কারণ আপনি মুখে বলেন যাইয়ো না, কাজে বলেন জলদি যাও।

রশিদ: তোমার এ হেয়ালি বুঝতে পারলাম না।

হামিদ: হেয়ালি মোটেই না। এক্কেবারে সরল কথা। হোমিওপ্যাথিক অশুধের কারখানা দেশে একটা আশু দরকার। অবিলম্বে এটা খুলতেই হবে। আপনি সেটা না খুললে আর কারো খুলতে হবে। এই ‘আর কেউ’ আমি ছাড়া কাউরে ত দেখতেছি না। কাজেই আমারই এটা খুলতে হবে। আমার ত আপনার মতো ক্যাপিটাল নাই। সেটা আমার যোগাড় করতে হবে। নিজে এলোপ্যাথিক প্র্যাকটিস কৈরা হোমিওপ্যাথির জন্য টাকা চাইলে কেউ দিব না।

রশিদ ভুরু কুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল: একটা হোমিওপ্যাথিক লেবরেটরির লাগি তুমি এত বড় স্যাক্রিফাইসটা করব?

হামিদ: এতে স্যাক্রিফাইসটা কোথায় দেখলেন?

রশিদ: স্যাক্রিফাইসটা তোমার নিজের জন্যও, দেশের জন্যও। তোমার এই পড়াশোনা, এত গবেষণা, দেশী-বিদেশী এতগুলি ডিগ্রি-ডিপ্লোমা শেষ পর্যন্ত কোনও কাজে লাগব না। তোমার নিজেরও না, দেশেরও না। এটা স্যাক্রিফাইস নয়ত কি?

হামিদ: এলোপ্যাথি ছাইড়া হোমিওপ্যাথি খুললেই আমার সব লেখাপড়া ডিগ্রি-ডিপ্লোমা অকাজে গেল মনে করতেছেন কেন? হোমিওপ্যাথিতে বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার নাই নাকি?

রশিদ: তা ত আমি বলি নাই। আমি বলতে চাই হোমিওপ্যাথি করতে গেলে হোমিওপ্যাথিই পড়া উচিত। এলোপ্যাথি পড়লে এলোপ্যাথিই প্র্যাকটিস করা উচিত। এলোপ্যাথিতে লেখাপড়া ও জ্ঞান-চর্চা কৈরা মাঝ পথে লাইন বদলান আমি উচিত মনে করি না।

হামিদ: রশিদভাই আমি কোন্ হার? দুনিয়ার সব বড়-বড় হোমিওপ্যাথি গোড়ায় নামকরা যশস্বী এলোপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। স্বয়ং হানিম্যানই বা কি?

রশিদের ভুরু আবার কুঞ্চিত হইল। হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়াই যেন সে বলিল: আচ্ছা হামিদ, আমি হোমিওপ্যাথিক লেবরেটরি খুললে তুমি লাইন বদলাবা না ত? আমার কোম্পানির এডভাইসার হৈতে তখন তোমার আর কোনও আপত্তি থাকব না ত?

হামিদ: আপাতত: আপত্তির কোনও কারণ দেখি না।

‘দেন ইট্‌স্ এ ডিল্। কথা পাক্কা হৈয়া গেল।’ রশিদ হামিদের হাত চাপিয়া ধরিল।

৪

সেই দিনই হামিদের বরাতে আরেকটি সুখবর ছিল। রশিদকে বিদায় দিয়া সেদিনের ডাকে হাত দিল। কয়েকখানা পত্রের পরেই যে সবুজ ইন্ডেলাপটি তার হাতে পড়িল তার বাম দিকের নিচের কোণে জাহানারা নামটি দেখিয়া তার হাত ও বুক উত্তেজনা-উদ্বেগে কাঁপিয়া উঠিল। সে কাঁপা হাতে চিঠিটা খুলিল। ইন্ডেলাপ হইলেও চিঠিটা ছোট। মাত্র একপৃষ্ঠা। চিঠিটার উপর দিয়া হামিদ চোখ দুইটাকে ঘোড় দৌড় করাইল। উত্তর দিতে বিলম্ব হওয়ার জন্য মাফ চাওয়া ছাড়া ঐ পত্রে আর যে একটা মাত্র কথা আছে তারই দাম হাজার লম্বা চিঠির চেয়েও বেশি। সেটি এই যে জাহানারা অমুক তারিখে ফলানা গাড়িতে নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছিবেন। সাক্ষাতে সব কথা হইবে বলিয়া পত্রে আর কিছু লেখা হইল না। ক্রটিমার্জনীয়। পত্রের শুরুতে সম্বোধনে শুধু হামিদ ভাই লেখা হইলেও নিচে লেখা হইয়াছে: 'একান্তভাবে তোমারই জাহানারা'।

পত্রটি হামিদ উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দুই-তিন বার পড়িল। জাহানারার হাতের লেখাটিও সুন্দর। লিখিয়াছেও খুব পরিচ্ছন্নভাবে। তার আসার কথাটা সুখবর। পত্রের কথাগুলিও বেশ লাগিল। শেষের 'একান্তভাবেই তোমার' কথাটিতে শিউলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হামিদের বুকে পুলক বাজিল। সে একটু হাসিল।

হিসাব করিয়া দেখিল পরের দিন সকাল নটার ট্রেনে জাহানারা আসিতেছে। বিনা-দ্বিধায় সে স্থির করিয়া ফেলিল, সে স্টেশনে যাইবে। এটা ঠিক করিয়া হামিদ আরও দুই-একবার চিঠিটা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিল। চিঠিটা দুইদিন আগের লেখা। ডাকে দিয়াছে মাত্র গতকাল। ঠিকানাও ঠিকই আছে। অর্থাৎ হামিদের প্রায় একমাস-আগের-লেখা চিঠিটার জবাব দিয়াছে মাত্র পরশু। এত বিলম্বের কোনও হেতু থাকিলে তা না লিখিবার মানুষ ত জানু নয়। ব্যাপার কি? হামিদের চিঠি পাইয়া সে এতদিন চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে, হামিদ কোনওদিন তা বিশ্বাস করিতে পারিত না। যাক দেখা হইলেই সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

পরদিন সাজিয়া-গুজিয়া স্টেশনে যাইবার জন্য রেডি হইয়াই সে ক্লিনিকে গেল। ট্রেন আসার শব্দ পাইয়াই স্টেশনে যাইবে। রেল লাইনও তার ক্লিনিক হইতে বেশি দূরে নয়। তার আশঙ্কা ছিল কাজের চাপে পাছে ট্রেনের আওয়াজও তার কানে না ঢুকে। শেষ পর্যন্ত ভুলিয়া না যায়। কিন্তু ভুলিবে কি? আধ ঘন্টা আগে হইতেই সে ট্রেন ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারে না।

অগত্যা সাড়ে আটটায় স্টেশনে ফোন করিল: চাট্‌গাঁ মেইল ঠিক শিডিউল মতো আসিতেছে কি না। সোবহান-আল্লাহ! মেইল চার ঘন্টা লেট! চার ঘন্টা পর অর্থাৎ বারটা-একটার দিকে আরেকবার হামিদ যেন ফোন করিয়া খবর নেয় আরও বেশি দেরি হইবে কি না।

হামিদের মনে হইল যেন কতবড় একটা শুভ কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছাইয়া গেল। এরপর কাজে মন বসাইতে তার বেশ খানিকক্ষণ লাগিয়াছিল।

স্টেশন হইতে হামিদকে বলা হইয়াছিল আরেকবার ফোন করিতে। হামিদ করিল তিন বার। বারটার বদলে সে এক বার করে এগারটায়। তখন বলা হয় পাঁচ ঘন্টা লেট। বারটার সময় ফোন করে। তখন বলা হয় ছয় ঘন্টা লেট। হামিদ এক ঘন্টা পর-পর ফোন করে বলিয়া কি বেটারা এক-এক ঘন্টা বেশি লেট করাইতেছে? এবার করে আধ ঘন্টা পর সাড়ে বারটায়। দরকারও হইয়া পড়ে। রোজ একটার সময় সে দুপুরের খানা খাইতে বাসায় যায়। ঘাড়ের উপর টেন লইয়া ত সে খানা খাইতে যাইতে পারে না। তাই নিশ্চিত হইবার জন্যই ফোন করে। হাঁ, এবার নিশ্চিত খবর পাওয়া গেল। চাটগাঁ মেইল টংগি ছাড়িয়াছে। ঘন্টা তিনিকের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিবে আশা করা যায়। তা হইলে তিনটার দিকে আসিবে। হামিদ নিশ্চিত মনে খানা খাইতে যাইতে পারে। তাই সে গেল।

বিকাল তিনটায় রেল স্টেশনে হামিদ জাহানারাকে রিসিভ করিল। এতদিন পরে দেখা। তবু অত মেয়েলোকের ভিড়ের মধ্যেও জাহানারাকে চিনিতে হামিদের কোনও অসুবিধা হইল না। এই পাঁচ বছরে জাহানারার চেহারার কোনও পরিবর্তন হয় নাই। আগের মতোই চঞ্চল চপল চটুল প্রগল্ভ লাস্যময়ীই আছে। বরঞ্চ নারীদেহের যেখানে-যেখানে চর্বি বাড়িলে তারা আরও আকর্ষণীয়-লোভনীয় হয়, জাহানারার তাই হইয়াছে। আগে জাহানারা ছিল তনু। সারা দেহে মুখখানা ও গায়ের রংটাই ছিল দেখিবার জিনিস। এখন ও দুইটির সাথে যোগ দিয়াছে সামনে-পিছনে ফাটিয়া পড়া কম্পমান যৌবন। শাড়ি-ব্লাউজে আর সে যৌবন ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। রাজিয়ার অংগ-সৌষ্ঠবের অনেকখানি পাইয়াছে জাহানারা, হামিদ মনে-মনে তা স্তুতি করিল।

কি মুশকিলেই ফেলিয়াছিল জাহানারা হামিদকে। দেখা হইতে 'হামিদভাই' বলিয়া চিৎকার করিয়া এক দৌড়ে হামিদের সামনে আসে। হাতের ছোট সুটকেসটা ধপ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া হামিদের গলা জড়াইয়া একরূপ লটকিয়া পড়ে। কি লজ্জা! লোকজন সব শত চোখে চাহিয়া আছে। হামিদকেই নিশ্চয় হামিদকে চিনে। এই বিব্রতভাবের আকস্মিকতা কাটিতে-না-কাটিতেই সব পরিষ্কার করিয়া দিল স্বয়ং জাহানারা। সে হামিদের গলা ছাড়িয়া চট করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল এবং বেশ লম্বা করিয়া হামিদের কদম-বুসি করিল। একজন সুন্দরী যুবতী প্ল্যাটফর্মের অত লোকের সামনে শহরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার হামিদ সাহেবকে অমন করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে দেখিয়া যে চলমান জনতা বিশ্বয়ে লজ্জায় থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবার তাদের লজ্জা-বিশ্বয় কাটিয়া গেল। তারা আবার চলিতে শুরু করিল। বোধ হয় গোড়ার 'হামিদভাই' সম্বোধনের তাৎপর্য এবার তাদের হৃদয়ংগম হইল।

হামিদের ঘাম দিয়া জুর ছাড়িতে বেশ একটু সময় লাগিল। কিন্তু তখন জাহানারা হামিদের পায়ের কাছে বসিয়া আছে। এবার সে জ্যেষ্ঠ সহোদর মুরুব্বির ভংগিতে জাহানারার মাথায় হাত বুলাইয়া দুই হাতে তার দুই বাহু ধরিয়া টানিয়া খাড়া করিল। স্তম্ভিত দর্শকের যারা জাহানারার কদমবুসি দেখিয়া আড় চোখে চাহিয়া-চাহিয়া আস্তে আস্তে পথ চলিতে শুরু করিয়াছিল হামিদের মুরুব্বিয়ানা দেখিয়া তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইয়া গতি দ্রুততর করিল। হামিদ এ সবই লক্ষ্য করিল। জাহানারার প্রত্যাশাপূর্ণমতিতে সে পুলকিত হইল। কিন্তু সে পুলক কাটিবার পর তার মনে রাগ হইল। কেন সে অমন বিব্রতকর কাজ করিতে গিয়াছিল?

গাড়িতে জাহানারা ড্রাইভার্স সিটের পাশেই বসিল। গাড়ি চলিতেই হামিদ মনের রাগ ঢালিয়া বলিল: কেন তুমি অমন প্রকাশ্যভাবে আমারে জড়াইয়া ধরছিলি?

চটুল চাহনির তীর সহ মিষ্টি হাসির ফুলের তোড়া হামিদের চোখে-মুখে ছুড়িয়া মারিয়া জাহানারা বলিল: কিন্তু পরক্ষণেই কি তোফা অ্যাক্টিংটা করলাম! কই আমার তারিফ করলা না ত?

সে চাহনির তীরে বিদ্ধ ও ফুলের তোড়ায় আহত হইয়া হামিদও হাসিয়া ফেলিল। বলিল: আমিও যে বড়ভাই মরুন্দির পাট্টা অমন নিখুঁতভাবে করলাম, তার জন্য তুমিও ত আমার তারিফ করলা না।

জাহানারা তেমনি খিলখিল হাসিয়া বলিল: নেও এখন করলাম। আর আমার পাওনাটা?

হামিদও তেমনি হাসিয়া বলিল: এই নেও শোধ করলাম।

উভয়েই কোরাসে হাসিল।

গাড়ি আসিয়া হামিদের ক্লিনিকের সামনে থামিল। ইউনিফর্ম-পরা দারোয়ান আসিয়া সালাম দিয়া গাড়ির কাছে দাঁড়াইল।

যথাস্থানে গাড়ি পার্ক করিতে-করিতে হামিদ বলিল: স্টেশন থনে আমাকে ক্লিনিক খুব কাছে।

জাহানারা: জানি।

ক্লিনিকের দিকে হাত ইশারা করিয়া হামিদ বলিল: ঐ যে আমার ক্লিনিক।

জাহানারা: তাও জানি।

হামিদ বিশ্বয়ে বলিল: তুমি ত দেখি সবই জান। তবে জান না কোনটা?

ধনুর মতো বাঁকা ভুরু নাচাইয়া জাহানারা বলিল: সব বলব। বলার জন্যই ত আসলাম।

গাড়ি পার্ক করিয়া হামিদ পিছনের সিট হইতে জাহানারার সুটকেসটা বাহির করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান দারোয়ানের হাতে দিল। তারপর ঘুরিয়া আসিয়া জাহানারার দিককার দরজাটা খুলিয়া বলিল: আস।

জাহানারা নামিবার জন্য পা বাড়াইল। তাতে শাড়িটা পেটিকোটসহ প্রায় হাটুর কাছে উঠিয়া পড়িল। হামিদ এক ঝলক দেখিয়া লইল। জাহানারার কি সুন্দর পা! বেলনের মতো সুডৌল আর তাজা মুলার মতো সাদা! দেখিতে পাইল এক ঝলকের অনেক বেশি। হামিদের মনে হইল জাহানারার খাড়া হইতে একটু সময় লাগিল। তবে না শাড়িতে টাংনা ঢাকিল।

জাহানারাকে সামনে লইয়া হামিদ ক্লিনিকে ঢুকিল। সহকারী ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডাররা সবাই যার-তার সিটে দাঁড়াইয়া মনিবকে সুতরাং তার সংগিনীকেও আদাব জানাইল। নীরবে হাসিমুখে তাদের আদাব গ্রহণ করিয়া হামিদ জাহানারা সহ নিজের কামরায় প্রবেশ করিল। জাহানারাকে একটি আসনে বসিবার হাতের ইশারা করিয়া হামিদ নিজের চেয়ারে বসিল। কলিং বেল টিপিল। জাহানারার দিকে চাহিয়া বলিল: কও কি খাবা?

জাহানারা দুষ্টামিপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল: আগে তোমার প্রশ্নের জবাব না দিয়া আমি কিচ্ছু খামু না।

স্টেশনে প্রথম সাক্ষাতেই দূর হইতে হামিদ প্রশ্ন করিয়াছিল: এতদিন আমার চিঠির জবাব দেও নাই কেন?

জাহানারা সে কথার জবাব না দিয়া ঐভাবে জড়াইয়া ধরার বিচ্ছিরি ব্যাপারটা ঘটায়। তাতে ভেবাচেকা খাইয়া যাওয়ায় সে কথার জবাবের জন্য হামিদ তাকিদও করে নাই। খাট রাস্তার মোটর ভ্রমণ ত গেল ঐ জড়াজড়ি কদম-বুসির উপর রসিকতাতেই। এইভাবে হামিদের প্রশ্নটা এখনও জবাবের অপেক্ষায় আছে। হামিদের কিচ্ছু খাবার জিগ্গাসার উত্তরে জাহানারা সে কথাই বলিল।

হামিদ হাসিয়া বলিল: এতক্ষণ যখন ঐ প্রশ্নের জবাবটা তোমার পেটে বদহযমি ঘটায় নাই, তখন আর কয়েক মিনিটে উদগার হৈয়া যাব না। বিশেষত: উত্তরের জন্য আমি এখন খুব ব্যস্ত নই।

জাহানারা: তুমি নিবার জন্য ব্যস্ত না হৈলেও আমি দিবার জন্য খুব ব্যস্ত।

হামিদ: তোমার এ ব্যস্ততার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার নিশ্চয় খুব ভূক্ লাগছে। ট্রেনে নিশ্চয়ই কিছু খাইতে পার নাই। এখন আগে কও, কি খাবা অর্ডারটা দিয়া লই। তারপর তোমার উত্তরটা খাতিরজমা হৈয়া বলাও যাব শোনাও।

জাহানারা: আমার মোটেই ভূক্ লাগে নাই। ট্রেনটা ছিল বুফে স্টেটও ছিল পাঁচ-ছয় ঘন্টা। কাজেই একবার না, দুইবার খাইছি। পেট ভরাই আছে। তবে এক কাপ চা খাইতে পারি।

ঘন্টা গুনিয়া বয় আগেই উঁকি দিয়াছিল। হামিদ হাতের ইশারায় তাকে বাহিরে যাইতে বলিয়াছিল। আবার ঘন্টা টিপিতেই সে আসিল। হামিদ তাকে শুধু দুই কাপ চার হুকুম দিয়া বিদায় করিল।

বয় বিদায় হইলে হামিদ আবার বলিল: আলাপ শুরু করার আগে আরও একটা বিষয় ঠিক হওয়ার দরকার। তুমি থাকবা কয়দিন? আর থাকার ব্যবস্থা করুম কোথায়?

জাহানারা এক গাল হাসিয়া বলিল: থাকুম তোমার বাসায় আর কোথায়?

হামিদ চমকিয়া উঠিল। বেকায়দায় পড়ার ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টায় বলিল: আমার বাসায়? আমি বাসা করছি, তোমারে একথা কইল কেটা?

জাহানারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল: কইব আর কে? আমি নিজেই জানি। নিজের চোখেই দেখছি। বাসাটা আমার খুবই পছন্দ হৈছে। আমরা আসছেন তাও জানি। আমরা একটা সালাম করার আর তাঁর হাতের-ছোঁওয়া সালুন খাওয়ার আমার ভারি শখ হৈছে।

কথা শেষ হইল। কিন্তু জাহানারার হাসি শেষ হইল না।

হামিদ তার বড়-বড় চোখ দুইটি বিস্ময়ে আরও বড় করিয়া বলিল: তুমি এসব কথা জানলা কেমনে?

জাহানারা: ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। পড় নাই বাল্যশিক্ষায়?

হামিদের বিস্ময়ের সাথে যোগ দিল অদম্য কৌতূহল। সে প্রায় কাকুতির ভাষায় বলিল: না তুমি রসিকতা রাখ। কও এসব তুমি পাইলা কই?

জাহানারা: রাজধানী ঢাকায় সবাই আসে। আমিও আসি। ডা. হামিদের খবর দুনিয়ার লোকে রাখে। আমিও রাখি। ঢাকা আসলে নারায়ণগঞ্জে আসা কঠিন কিছু নয়। প্রাণের টান থাকলে আসতেই হয়।

হামিদের আছে অনেক কথা জানিবার। আসল কথা এখনও উঠেই নাই। কাজেই এ ধরনের হাস্য-রসিকতায় সময় নষ্ট করা চলে না। তবু বাধাও দেওয়া যায় না। জাহানারাকে তার ভাল লাগে। দেখাও অনেক দিন পরে। তবু একটু চঞ্চল উষ্ণতার ভাব সে গোপন রাখিতে পারিল না। বলিল: আমার সম্বন্ধে এত খোঁজ-খবর নিবার সময় পাইলা, অথচ পত্রটার জবাব দিবার সময় হৈল না।?

জাহানারা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল: এটাই হৈল তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব।

হামিদ: কেমনে?

জাহানারা: ইচ্ছা কৈরাই তোমার চিঠির জবাব দেৱিতে দিছি।

হামিদ: কেন?

জাহানারা: তোমার পত্র পাইয়াই তোমার মতলবখানা বুঝতে পারছিলাম।

হামিদ: আমার মতলবটা কি ছিল?

জাহানারা: আমি কইতে যাব কেন? তোমার মতলব ত তুমি জানই।

হামিদ: মতলবটা আবিষ্কার করলা তুমি। আর সেটা কইতে মোক্ষ আরেক জনে? তোমার বলতে আপত্তি কি?

জাহানারা: আবিষ্কার করলেই এক জনের জিনিস আরেক জনের হৈয়া যায় না। তোমার মতলবটাও আমার হৈয়া যায় নাই। তাছাড়া আবিষ্কারটা খুব কঠিন ছিল না। তখন তোমার চিঠির ভাষায় তা যেমন স্পষ্ট ছিল, এখনও তোমার চোখে-মুখে তা তেমনি সুস্পষ্ট।

গলায় আবেগ আনিয়া বলিল: খামখা লুকাও কেন হামিদভাই? শুধু আমার জন্য ত আমাৱে ডাক নাই।

হামিদ আত্মৱক্ষার সাবধানতা লইয়া বলিল: কেন? তোমার জন্য তোমাৱে আমি ডাকতে পাৱি না? অত-অত দিন পরে তোমাৱে দেখতে, তোমার সাথে কথা কইতে আমার ইচ্ছা হৈতে পাৱে না?

জাহানারা এবাৱ অভিমাৱে ফাটিয়া পড়িল। বলিল: ও-সব স্তোক আৱ দিও না হামিদভাই। সেটা দেখা গেছে ঐ কনফারেন্সেৱ দিনেই। এত আগ্রহে ছুইটা গেলাম তোমার কাছে। একটা কথা বলার ফুৱসৎ হৈল না তোমাৱ! বললা: ‘প্রবন্ধ পড়া নিয়া ব্যস্ত আছি।’ তুমি যে ভাল প্রবন্ধ লেখতে পাৱ, সুন্দর কৈৱা পড়তে পাৱ, সেটা ত সবাই জানে। তার জন্য আবার ব্যস্ততাটা কি? শুধু আমাৱে অভয়েড করার ছল ছিল না ওটা?

জাহানারাৱ ব্যথার গভীৱতা হামিদ আজই প্রথম বুঝিল। কিন্তু জাহানারাৱ কথা হইতে পথের দিশাও পাইল। বলিল: এইবাৱ জানু বুৱ, ঠিক জায়গায় টোকা দিছি। তোমার কাছে আমার পত্র লেখবাৱ আসল মতলবটা ধরতে পাৱছি। সত্যই সেদিনকাৱ তোমার সাথে ঐ ব্যবহাৱেৱ জন্য নিজেৱে আমি কোনও দিন ক্ষমা করতে পাৱি নাই।

কি অনুশোচনায় দিনগুলি আমার কাটছে? তুমি আমারে মাফ না করা পর্যন্ত আমি নিজেরে মাফ করতে পারব না। এ জ্ঞানটা হয় কিন্তু আমার প্রবন্ধ পড়ার শেষে। তখনও বোধহয় হৈত না। দু’একজন সহকর্মী বলল: ‘ঐ মহিলার প্রতি তোমার ব্যবহারটা বড় কার্ট হৈছে।’ বলা মাত্র সেই যে আমার মনটা অনুতাপে পুড়তে শুরু করল সেটা আজো ঠাণ্ডা হয় নাই। বলতে কি সেইদিন থেনেই তোমার খোঁজ করতে শুরু করি। তারপর এতদিনে তোমার ঠিকানা যোগাড় কৈরাই তোমার কাছে পত্র লিখি।

জাহানারা হামিদের এই অতিরিক্ত লম্বা কৈফিয়ৎ শুনিতেছিল আর মুচকি-মুচকি হাসিতেছিল। মিছা-কথায়-অনভ্যস্ত হামিদ নিজেও বুঝিতেছিল, বিশ্বাসযোগ্য করিয়া কথাটা সে বলিতে পারিতেছে না। যতই সে কথা তার মনে হইতেছিল, কথা তার ততই লম্বা হইতেছিল। কথা যতই লম্বা হইতেছিল ততই তা আরও অবিশ্বাসযোগ্য হইয়া পড়িতেছিল। অগত্যা শেষ পর্যন্ত সে কৈফিয়তের আতঙ্ক উপসংহার করিল।

এবার জাহানারার পালা। সে আবেগ-ভরা গলায় বলিল: দেখ হামিদভাই, তুমি কোনোদিন কোনও কারণেই মিছা কথা কও না এটাই আমার অহংকার। আজ নাইক মিছা কথা কইয়া নিজের এতদিনের সুনামটা নষ্ট করতেছ কেন?

এমন হাতে-নাতে ধরা পড়িবে তা হামিদ আগেই বুঝিয়াছিল। তাই অনভ্যস্ত মিথ্যাবাদীর চির-প্রচলিত প্রতিবাদটাই করিল। বলিল: কোনটা মিছা কথা কইলাম?

জাহানারা: কনফারেন্সে রুঢ় ব্যবহারের জন্য অনুশোচনা হওয়ার দরুন এই পত্র লেখাটি। ঐ উদ্দেশ্যে পত্র লেখলে তার মধ্যে তোমার ঐ অনুশোচনার একটি কথাও কি থাকত না? আফসোস করত না? মাফ চাইত না? তা হৈলে কি ঐ দুই লাইনের পত্র লেখত?

হামিদ এতক্ষণে মিছা কথা বলিবার কায়দা ধরিয়া ফেলিয়াছে। সে অবোধে মিছা কথা বলিল: সত্য কথা জানু এই যে ঐ মর্মেই তোমার কাছে একটা লম্বা চিঠি লেখছিলাম। অনেক চিন্তা কৈরা শেষে লম্বা চিঠিটা ছিঁইড়া ঐ ছোট চিঠিটা লেখছি।

জাহানারার মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল। সে বলিল: কেন?

হামিদ : ঐ লম্বা চিঠি পাইলে তুমি অবশ্য আমারে মাফ কৈরা দিতা। ঐ অভদ্র ব্যবহারে তুমি কিছু মনে কর নাই বৈলা ভদ্র ভাষায় একটা জবাবও দিতা। কিন্তু আমার সাথে দেখা করতে তুমি আসত না। অথচ তোমার সাথে সামনাসামনি দেখা করার ইচ্ছা আমার প্রবল। তাই ঐ সংক্ষিপ্ত পত্র। ঐ সংক্ষিপ্ত পত্র পাইয়া তুমি রাগ কৈরা যদি আমারে গাল দিতেও আসত, তাতেও আমার এই লাভটা হৈত। এখন বুঝলা আমার পত্রের মতলবটা?

জাহানারার মুখে বিশ্বাসের ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। হামিদ এটা আগেই আশা করিয়াছিল। কারণ বিস্ময়ই বিশ্বাসের পূর্বলক্ষণ। হামিদ নিজের বুদ্ধির তারিফ করিল। মিছা কথার উপকারিতা বুঝিল। গোছাইয়া বলিতে পারিলে মিথ্যা কথার মতো খাঁটি সত্য আর নাই। হামিদ বুঝিল এবং মনে-মনে স্বীকার করিল, গুরুতর ব্যাপারে নয় শুধু বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে, এমন ছোট-খাট মিছা ঠিকমতো ও জায়গামতো বলিতে পারিলে কত উপকার হয়। হে মিথ্যা তুমি বাঁচিয়া থাক।

হামিদ এসব কথা ভাবিয়া সারিতে-না-সারিতেই জাহানারা টেবিলের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া হামিদের যে হাতটা কাছে পাইল, তাই চাপিয়া ধরিল। বলিল: তা হৈলে হামিদভাই শুধু আমারে দেখবার লাগিই আমারে আসতে কইছ?

হামিদ: ঠিক তাই।

জাহানারার হাতের পিঠে নিজের অপর হাতটা রাখিয়া আদর করিল।

জাহানারা আবেগ-কম্পিত গলায় বলিল: তা হৈলে সোনাভাই আমার, এতদিনের আশা আমার পূরণ হবে?

হামিদ বেকায়দায় পড়িল। মিথ্যার নিরংকুশ উপকারিতা সম্বন্ধে তার মনে আবার সন্দেহ জাগিল। জাহানারার প্রশ্নের তাৎপর্য সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। কিন্তু এর সদুত্তর তার মুখে যোগাইল না। একটু ইতস্তত: করিয়া আবার অনভ্যস্ত মিথ্যাবাদীর মতো বলিল: তোমার কথাটা বুঝতে পারলাম না। তোমার কোন আশাটার কথা বলতেছ?

জাহানারা হঠাৎ তেলে-বেগুনে জুলিয়া উঠিল। বলিল: হয় নিষ্ঠুর, তুমি আমার আশার খবরই রাখ না? এখন সব বুঝলাম। কেন তবে আমার সাথে এতক্ষণ এই ভগ্নমিটা করলা? তুমি কার খবরের লাগি আমারে ডাইকা আনছ তা কি আমি বুঝি না মনে করছ? যে কথাটা তোমার চোঁটের কাছে ঘুরাফেরা করতেছে, যার নাম তোমার চোখে ভাসতেছে, বৈলাই ফেল না সে নামটা। লজ্জা কি?

হামিদ সাবধানে বলিল: আমার চোখে-মুখে চোঁটে তুমি কার নাম দেখতেছ? তুমিই কও না।

জাহানারা যুদ্ধংদেহিতাবে বলিল: তুমি রাযু আপার খবরের জন্যই আমারে ডাইকা আন নাই?

হামিদ ধীরভাবে বলিল: তোমার সাথে আলাপ হৈলে রাযিয়ার কথা উঠবই সেটা নিশ্চয় আশা করছিলাম। তাতে দোষ কি? রাযিয়ার সাথে দেখা হৈলেও তোমার কথা উঠত নিশ্চয়ই। ঠিক না?

হামিদ আবার নিজেকে ধন্যবাদ দিল। কি চমৎকার করিয়াই না কথাটা সে বলিল। অথচ কথাটা সত্য।

জাহানারা বলিতে বাধ্য হইল: তা ঠিক।

কিন্তু পরক্ষণেই উত্তেজিত হইয়া বলিল: কিন্তু ও-ভাবে আসল কথা চাপা দিতে আমি দিমা না। আমি আজ তোমার মুখে শেষ কথা শুনতে চাই। সেই জন্যই আমার আসা। পাঁচ-পাঁচটা বছর আমি তোমার মুখ পানে চাইয়া আছি। সারা অন্তর দিয়া তোমাতে ভালবাইসা আসছি। রাতদিন তোমারই ধ্যান করতেছি। আর তুমি কিনা আমার ভালবাসা পায়ে ঠেইলা রাযুআপার দিকে চাইয়া আছ? রাযুআপা পরের স্ত্রী জাইনাও তারে ভাল বাসতেছ। তুমি না ধার্মিক? তুমি না ফতেপুরের পীর সাব? পরের বিবাহিতা স্ত্রীতে ভাসবাসা যে গোনা তা কি তুমি ভুইলা গেছ?

একটু দম নিয়া জাহানারা বলিতে লাগে: আমার কাছ থনে তুমি জাইনা নেও, রাযুআপা আর তোমাতে ভালবাসে না। একথা তোমাতে কইবার লাগি রাযুআপা আমারে অথরাইয় করছে। তোমার-আমার বিয়ায় তার কোনও আপত্তি নাই, সে কথাও সে কইয়া দিছে। তুমি যদি চাও এই মর্মে তাঁর পত্রও আনতে পারি।

হামিদ মনের আগ্রহ মুখে গোপন করিতে পারিল না। বলিল: তা হৈলে রাখিয়ার সাথে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়?

জাহানারা সগর্বে বলিল: নিশ্চয় হয়। তার সাথে দেখা কৈরাই ত তোমার কাছে আসলাম।

হামিদের আগ্রহ ফাটিয়া পড়িল। বলিল: সে কোথায় আছে? কি করে এখন?

জাহানারা: সে কথা তোমারে কইতে যামু কেন? আমার বধুয়ারে আন বাড়ি যাবার রাস্তাটা দেখাইয়া দিমু না কি? অত আহাম্মক পাও নাই আমারে।

হামিদকে নিরাশ করিতে পারিয়া জাহানারা খুব খুশী হইল। অন্তত হামিদের মনে হইল তাই। কিন্তু সে আশা ছাড়িল না। বলিল: তুমি তার সাথে দেখা করলা কবে?

জাহানারা: দেখা ত করছি অনেক বারই। শেষবার দেখা করছি তোমার পত্রটি পাইয়া। তোমার পত্রটা রায়ুআপারে দেখাইছি। তোমার পত্রের আসল মতলব সম্বন্ধে আমরা দুইজনই একমত। তাই নিয়াই আমার আলোচনা। তাতেই সে আমারে অথরাইয় করছে তোমারে কইতে: তারে তুমি আল্লার ওয়াস্তে ভুইলা যাও। সে আল্লার ওয়াস্তে তোমারে ভুইলা গেছে।

কথাগুলি বলিয়া জাহানারা হামিদের মুখ-ভাব লক্ষ্য করিবার জন্য একটু দূরে দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তার বাঞ্ছিত পরিবর্তন হামিদের মুখে দেখা গেল না। হামিদ বরঞ্চ স্থির-ধীর ভাবে বলিল: জানু, প্রিয় বোনটি আমার, তোমার ভালবাসার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমিও তোমারে কম ভালবাসি না। কিন্তু রায়ুর ব্যাপারটা আলাদা। তার নিজ-মুখে না শুইনা আমি ওর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারি না। তোমার উচিত আমার মধ্যে একটা দেখা-সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দেওয়া। অথচ তুমি করতেছ তার উল্টা।

একটু থামিয়া আবার বলিল: আর তুমি স্বপ্নের বিবাহিত স্ত্রীকে ভালবাসার যে কথাটা বললা, ওটার জবাব তুমিও জান। রায়ুর আগের বিয়াটা আমি বিয়া বৈলা স্বীকারই করি না।

এতক্ষণ জাহানারা টেবিলের উপরে হামিদের হাতটা ধরিয়াই রাখিয়াছিল। হামিদও সেটা টানিয়া ছাড়ায় নাই। এবার জাহানারা নিজের হাতটা সরাইয়া নিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল। বলিল: বিয়াই যখন স্বীকার কর না, তখন আশরাফ ভাইর সাথে রায়ুআপার সম্পর্কটাও নিশ্চয়ই স্বীকার কর না। আশরাফ ভাইর সাথে ঐ ঘটনার পরে তুমিই না কইছিল। ওতে গোটা নারী জাতির উপরই তোমার ঘৃণা পয়দা হৈছে?

হামিদ এবার কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া জবাব দিল: হৈছিল ঠিকই। তাতে তুমিও বাদ যাও নাই। কিন্তু নারী জাতিরে এখন আমি মাফ কৈরা দিছি। তার বেনিফিট রাখিয়াও পাইছে।

এবার হামিদ খোলা মনেই হাসিল। বলিয়া চলিল: শোন জানু, নারী জাতির উপর এখন আমার ঘৃণা নাই। তার বদলে আসছে শ্রদ্ধা। রায়ু-আশরাফের ব্যাপারটা এখন আমার বিচারে নিতান্তই তুচ্ছ। মানুষের জীবনের সামগ্রিক বিচারে ওটা নিতান্তই নগণ্য। নিজের এই পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝতে পারছি, পশ্চিমী সভ্য জাতির

ধুমকেতু

জীবনে আমি নিজের চোখেই তা দেখছিও, মানুষের জীবনের তেমন বিচারের মাপকাঠিটা তারার খুব উন্নত, কারণ তার উদ্দেশ্যটাও খুব মহৎ।

জাহানারা: আমি তো পঁচ বছর আগে এই কথাটাই কইছিলাম। তখন ত সে কথা মান নাই।

হামিদ: তখন মানি নাই। কিন্তু এখন মানি।

জাহানারা: তার মানে-----। জাহানারা কথাটা শেষ করিল না। মাঝপথে থামিয়া গেল।

হামিদ: তার মানে কি? থাইমা গেলা কেন? কও।

জাহানারা: না, কিছু না।

সে চুপ করিল। কি যেন সে ভাবিতেছিল। নিজের সুন্দর ঠোঁট দুইটি সে ঘন-ঘন কামড়াইতেছিল। চোখ-মুখের ভাবের মুহূর্তে-মুহূর্তে পরিবর্তন হইতেছিল।

হামিদ হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল: এখন আমার বৈকালিক চা খাওয়ার সময়। কও তুমি চার সাথে কি খাবা?

হামিদ ঘন্টা টিপিল। বেয়ারা ঢুকিয়া সালাম করিল। হামিদ বলিল: দুই জনের চা আন। বরাবরের আইটেম ছাড়াও দুইটা কাটলেট। আর বাসায় একজনকে পাঠাইয়া খবর দেও আজকার চা এখানেই খাইলাম।

জাহানারার দিকে চাহিয়া বলিল: বাসায় ছাই আজো টেলিফোনটা পাই নাই। হবে হবে কৈতেছে আজ কয়েক মাস।

কিন্তু জাহানারা হামিদের টেলিফোনের গল্পে মন না দিয়ে বেয়ারাকে হাতের ইশারায় যাইতে বারণ করিল। হামিদকে বলিল: বরাবর সিঁড়ির চাটা বাসায়ই খাও?

হামিদ: হাঁ। এই যাই আর আধ ঘন্টায় ফিইরা আসি।

জাহানারা বেয়ারাকে বলিল: এবার যাও। নশাও আনতে হবে না। বাসায়ও খবর দিতে হবে না। আমরা বাসায় গিয়াই নশতা খামু।

হামিদের দিকে ফিরিয়া বলিল: বাসায় না গেলে আশ্রা নাহক চিন্তা করবেন।

বেয়ারা জাহানারার হুকুমে বাহির হইয়া যায় নাই। সে খোদ মনিবের হুকুমের অপেক্ষা করিতেছিল। কাজেই জাহানারা তার কথায় যোগ করিল: বেয়ারারে যাবার কও। বৈলা দেও নশতার এখানে দরকার নাই।

হামিদ মাথার ইশারায় সম্মতি জানাইল। বেয়ারা বাহির হইয়া গেল। চিন্তাযুক্ত মুখে নীরস সুরে হামিদ বলিল: এ ধরনের জিদ কর কেন তুমি?

জাহানারা: জিদ দেখলা কই? আশ্রারে দেখতে যামু, তাঁরে একটা সালাম করুম, তাঁর হাতের ছোঁওয়া একটু সালুন খামু একথা শুরুতেই ত কইছি আমি!

হামিদ: তা কইছ। খাবাও নিশ্চয়ই বাসাতেই। কিন্তু রাতে থাকার ব্যবস্থাটা আগে করা দরকার। আমি সে কথাই ভাবতেছি।

জাহানারা তার স্বাভাবিক দুষ্টামিপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল: সেজন্য তোমার কিছু ভাবতে হবে না। আমি তোমার বাসায়ই থাকুম। গেস্ট রুম আছে। তাতে এটাচ্ড় বাথরুম আছে। আমার কোনও অসুবিধা হবে না।

হামিদ অসহায়ের মুখের ভাব লইয়া বলিল: লোকে কি বলব? আমরা কি মনে করবেন? তার চেয়ে খুব ভাল একটা হোটেলে একটা সিংগল-সিটেড রুম ভাড়া করি? কি বল?

হামিদ টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াইতেছে মনে করিয়া জাহানারা নিজের হাত বাড়াইয়া হামিদকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল। বলিল: তোমার কোনও চিন্তা নাই। আমরা খুশীই হবেন। লোকেও কিছু বলব না। আর বললেই কি? তুমি লোক-নিন্দারে ভয় কর কবে থনে?

হামিদের আর কোনও উপায় থাকিল না। নাশতা-চা খাইতে জাহানারাকে লইয়াই বাসায় গেল। আমাদের সাথে তার পরিচয় করাইয়া দিল। জাহানারা লম্বা প্রাণ-ঢালা কদম-বুসি করিল। জাহানারা যেন প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। তখন হইতেই সে যে আমাদের আঁচল ধরিল, আর ছাড়িল না। নাশতা-চা তৈয়ারিতে আমাদের সাথে-সাথে থাকিল। নাশতা-চা খাওয়ার পরও সে হামিদের সাথে আসিল না। আমরাও জাহানারার ব্যবহারে এত খুশী হইলেন যে হামিদের সাথে এই বেগানা পরমা সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া বিস্মিত হইবার বা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ফুরসৎই পাইলেন না। হামিদ গেষ্ট রুম ঠিক-ঠাক করিতে নির্দেশ দিয়া ক্লিনিকে চলিয়া আসিল।

রাত্রে বাসায় ফিরিয়া হামিদ দেখিতে পায় জাহানারা একদম বাড়ির গিন্নী বনিয়া গিয়াছে। রান্না-বান্নায় বাবুর্চিকে সাহায্য করা ও উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের ছাড়াইয়া গিয়াছে। তারপর পরিবেশনে যে ভাবটা সে করিল, তাতে মনে হইল হামিদই মেহমান, আর জাহানারাই মেঘবান। খানা-পিনার পরেও অধিক রাত-তক জাহানারা আমাদের সাথেই কাটাইল। হামিদ তার দেখা পাইল খুব কমই।

পরের দিন খুব সকালে নাশতা করিয়াই জাহানারা ঘুম ধরিল। গাড়িতে স্টেশনে দিয়া আসার সময় ছাড়া হামিদ তার সাথে কথা বলিবারই ফুরসৎ পাইল না। বিদায়ের সময় আমাদের কদম-বুসি করিতে গিয়া সে এমন ভাব করিল যেন নিজের মাকে বহুদিনের জন্য ছাড়িয়া বিদেশে যাইতেছে। আমরাও যেন তাতে চোখের পানি ঠেকাইতে পারিলেন না।

দুপুরে খানা খাইবার সময়েই হামিদের সাথে আমরা প্রথম কথা হয়। তিনি দরদী মিষ্টি হাসিতে বলেন: আমি খুব খুশী হৈছি বাপজান। তোমার নজর খুব ভাল। খুব মানাইব।

হামিদ এটাই আশঙ্কা করিতেছিল। কাজেই মোটেই বিস্মিত হইল না। তবু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিল: কিসে আপনে খুশী হৈছেন? কি মানাইব?

আমরা অগ্রহ-ভরা খুশিতে বলিলেন: বউ খুব ভাল। হৈব। বড় ভাল। মেয়ে। ভাল। খান্দানের লোক। হাড্ডি ভাল। না হৈলে অমন মেয়ে হয় না।

হামিদ হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল: আপনে জানুর কথা কইতেছেন আমরা? তারেই বউ করিবেন ভাবতেছেন? তা হয় না আমরা। ওর সাথে আমি ভাই-বোন পাতছি। তাই সে আপনরে আমরা মানছে।

আমরা ফুটা বেলুনের মতো মুহূর্তে চুপসিয়া গেলেন। তাঁর চোখ-মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। ঠোঁটের কোণে নৈরাশ্য দেখা দিল।

হামিদের এটা সহ্য না হওয়ায় কাজের ছুতায় তাড়াতাড়ি খানা খাইয়া বাহির হইয়া গেল। বরাবরের মতো আশ্রমের কদমবুসিতে বেশি সময় কাটাইতে পারিল না। আশ্রমের সুন্দর পা দুটিও যেন তাঁর মুখের মতোই বিমণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

আস্তে-আস্তে গাড়ি চালাইয়া বাঁকা রাস্তায় ঘুরিয়া অনেকক্ষণে সে ক্লিনিকে পৌঁছিল। সারা রাস্তায় সে জাহানারার কথাই চিন্তা করিল। হতভাগী হামিদকে একি বিপদে ফেলিল? এই জন্যই কি সে আসিয়াছিল? হামিদের ডাকে যে সে আসে নাই, সে কথা ত জাহানারা স্পষ্টই বলিয়া গেল। আর হামিদই বা কি বুদ্ধিমানের কাজটা করিল? বিশ-বিশটা ঘন্টা সে হামিদের সাথে কাটাইয়া গেল। অথচ হামিদ জাহানারার মুখ হইতে রাখিয়ার ঠিকানাটা বাহির করিতে পারিল না। সে ভাল রূপ চেষ্টা করিলে জেরাটেরা করিয়া, না হয় কথাবার্তায় কৌশলে, নিশ্চয় রাখিয়ার খবরটা এমন কি তার বর্তমান ঠিকানাটাও জাহানারার মুখ হইতে বাহির করিতে পারিত। কিন্তু হামিদ তা পারেন নাই। পারে নাই মানে তেমন চেষ্টাই সে সিরিয়াসলি করে নাই। কেন করে নাই? হামিদকে নিশ্চয় জাহানারা ভেড়া বানাইয়াছিল। আর হামিদও গলা বাড়াইয়া ভেড়া বানিতে গিয়াছিল। জাহানারা একটা মায়াবিনী। সে হামিদকে যাদু করিয়াছিল। ট্রেন হইতে নামিয়া এক লাফে হামিদকে জড়াইয়া ধরিয়া বিভিন্ন কৌশলে বিভিন্ন সময়ে হামিদকে নিজের লোভনীয় অংগ দেখাইয়া জাহানারা তাকে আগ্রহপোড়া একটা বুদ্ধি বানাইয়া রাখিয়াছিল। তাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া আশ্রমের জয় করিয়া সে কেমন বাতাসের আগে মিলাইয়া গিয়াছে। হামিদ জাহানারার কাছে একটা কথাও জানিতে পারিল না।

হামিদ যতই ভাবিল ততই দেখিল, জাহানারা হামিদের জীবনাকাশে একটা কুগ্রহ। রাখিয়াকে পাওয়ার পথে এই হতভাগীই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। একদিকে জাহানারার অসামান্য রূপ-লাবণ্য চটুল-চপলতা, অপরদিকে রাখিয়ার দুর্লভতা ও নিখর নীরবতা এমনিতেই হামিদের কাজটা দুঃসাধ্য ও জাহানারাকে দুর্নিবার করিয়া তুলিয়াছে। তার উপর আশ্রমের হৃদয় জয় করিয়া সে হামিদের কর্তব্য প্রায় অসাধ্য করিয়া ফেলিয়াছে। অত সুন্দরী, অত দরদী, অত প্রেমময়ী এমন মিঠা নারীও কি কারও কুগ্রহ হইতে পারে? কে জানে? রায় যদি সত্যিই দুর্লভ হয়, তবে জাহানারা ত হামিদের জীবনের সাহায্য হইতে পারে। তবে ত জাহানারা দুষ্ট গ্রহ না হইয়া ধ্রুবতারাও হইতে পারে। কে জানে? কে জানে?

সোলেমানী আংটি

১

ডা. হামিদের টেবিলের ফোনটা ট্রিং-ট্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল।

হামিদ: হ্যালো। কে? রশিদভাই? কি খবর?

-সরি। আমি ত বাইরের কলে যাই না আপনে জানেন। আর কিছু না। আমার ত গরিব রোগী নিয়া কারবার। বাড়িতে ডাক্তার ডাকবার তারার পয়সা কই?

-আপনের রোগী যখন তখন পয়সা নিশ্চয় আছে। সেটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি যামু না। এক কেসে গেলে সব কেসেই যাওয়া লাগব। তখন গরিব রোগীরা আমার দেখাই পাব না।

-আপনে আসতে চাইলে আমি মানা করতে পারি? কিন্তু বললাম ত কোনও ফল হবে না।

-আচ্ছা তবে আসুন।

হামিদ রিসিভার রাখিয়া দিয়া নিজের কাজে মন দিল।

দশ-পনের মিনিটের মধ্যে রশিদ 'আসতে পারি?' বলিয়া জবাবের অপেক্ষা না করিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

রশিদ বড় লোক। তাকে এবং তার মার্সেডিস বেনুয় গাড়িটা হামিদের লোকেরা সবাই চিনে। তার জন্য এখানে কোনও ফর্মালিটির দরকার নাই।

রশিদের আসার উদ্দেশ্য হামিদের জানা। হামিদের উত্তরও রশিদের জানা। তবু রশিদ আসিয়াছে। হামিদকে নিবার জন্যই। হামিদও রশিদকে দেখিয়া মনে-মনে আরও জিদ করিল সে যাইবেই না।

কাজেই গুরু হইতেই দুই বন্ধুতে গরম তর্ক আরম্ভ হইল। রশিদ রিপট করিল তার নিজের রোগী। সে কথা দিয়াছে হামিদকে নিবেই। হামিদ না গেলে রশিদের ব্যক্তিগত প্রেস্টিজ হানি হয়।

হামিদ জবাব দেয়: এটা তার নিয়মের কথা। সে নিয়ম এতদিনে প্রিন্সিপলের স্তরে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। একবার নিয়ম ভাঙিলে সীমা নির্দেশ করা যাইবে না। পাবলিকের নজরে হামিদ ছোট হইয়া যাইবে। অতএব এটা হামিদেরও ব্যক্তিগত প্রেস্টিজ ও রিপুটেশনের কথা।

রশিদ চটিয়া গেল। বলিল: দেখ হামিদ, তুমি মুখে-মুখে যতই আধুনিকতার বড়াই কর না কেন, পীরালা ভড়ংটা আজও ছাড়তে পার নাই। এ ধরনের ভড়ংকে আমি সোজা ভগ্নামি মনে করি। ঘৃণা করি।

আগে-আগে হামিদ চটার জবাবে বেশি চটিত। রাগের উত্তরে অধিকতর ত্রুদ্ধ হইত। উত্তেজনার জবাব উত্তেজনা দিয়া দিত। কিন্তু ইদানিং হামিদের মধ্যে বিরাট

পরিবর্তন হইয়াছে। তর্কে বিপক্ষ চটিলে হামিদ সেই অনুপাতে নরম হয়। বিপক্ষ কড়ুয়া হইলে হামিদ মিঠা হয়। এটাই আজকাল তার তর্কের ধারা।

কাজেই রশিদের কটুক্তিতে না চটিয়া হামিদ হাসিয়া বলিল: এটারে আপনি ভড়ং ভগামি মনে করেন কেন?

রশিদ: ভড়ং এই জন্য যে এটা মোটা ফিস আদায়ের একটা কৌশল মাত্র। এটা ভগামি এই জন্য যে মুখে গরিবের কথা কও, কিন্তু অন্তরে পাকা ব্যবসাদারি। যারে কয় মুহূমে শেখ ফরিদ বগল্‌মে ইট।

হামিদ হাসিয়া কুটি-কুটি হইল। বলিল: আপনি একটা জিনিয়াস রশিদভাই। আপনি ফকিরির মধ্যেও ব্যবসাদারি আবিষ্কার করতে পারেন।

রশিদ সমান জোরে বলিল: এ আবিষ্কার আসলে আমার না তোমার। তোমার কাছ থেকেই এটা আমি শিখি। তোমার মুখেই আমি প্রথম শুনি যে পীর সাহেবরার তর্কে-দুনিয়া আসলে দুনিয়াদারির সবচেয়ে কুশলী পন্থা। টাকা-পয়সা চাই না বল্‌লেই আহাম্মকেরা বেশি টাকা দেয়।

হামিদ যেন এবার একটু আহত হইল। তার হাস্য-রসিকতায় মেঘের ছায়া দেখা দিল। সে বলিল: তার মানে আপনি বলতে চান আমি কলে যাই না শুধু ফিস বাড়াইবার উদ্দেশ্যে?

রশিদ হামিদের সুরে অভিমান ও ব্যথার সুরটা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল: শুধু বলতে চাই না, বিশ্বাসও করি।

হামিদ হাসিয়া বলিল: এসব কথা বৈলা আমারে রাগাইতে পারবেন না রশিদভাই। আমি হাজার রাগ করলেও বড় লোকরার চিকিৎসা ধরুম না। কারণ এ বিষয়ে আমার এক বিন্দু সন্দেহ নাই যে একবার বড়রোক রোগীর কাছে পড়লে আমি আর গরিবের চিকিৎসা করতে পারুম না। তার সময়ই পাম না টাকা দিয়াই বড় লোকেরা আমার সবটুকু সময় এবং শেষ পর্যন্ত আমার মাথা কিইনা নিব।

রশিদ: এটা তুমি চিকিৎসকের যোগ্য কথা কইলা না। রোগের আবার বড়লোক ছোটলোক কি? রোগ রোগই। আর চিকিৎসক চিকিৎসকই।

হামিদ মাথা নাড়িয়া বলিল: না রশিদভাই, আপনার কথা ঠিক না। রোগেরও বড়লোক-ছোটলোক শ্রেণী-ভেদ আছে। ধনী লোকের একটু সর্দি-জ্বর হৈলেও বিলাত-ফেরৎ এম. আর. সি. পি. ডাক্তার না হৈলে চিকিৎসা হয় না। গরিবের টাইফয়েড হৈলেও এল. এম. এফের চিকিৎসা পায় না। কারণ ওরার টাকা আছে, এরার টাকা নাই।

রশিদ: এই যুক্তিতে কল পাইয়াও তুমি বড়লোকের চিকিৎসা করবা না? এটা অন্যায় কথা। মেডিক্যাল এথিক্সের খেলাফ কথা এটা।

হামিদ প্রতি কথায় জোর দিয়া বলিল: মূল এথিক্স মানলে ত মেডিক্যাল এথিক্সের কথা উঠে? বড় লোকেরা বহুদিন আগে থেকেই এথিক্স বিসর্জন দিছে। আপনিই কন রশিদভাই, এথিক্স যদি ওরা মানতই তবে সমাজের উপরের তলার মুষ্টিমেয় ঐ বিত্তবান লোক জীবনের সবটুকু সর, সবটুকু মধু, নিজেরার জন্যই অমন একচেটিয়া কৈরা নিত না। শিক্ষা-সভ্যতা কৃষ্টি-শিল্পে সাহিত্য সবই ত বড়

লোকেরারই। ও-সব ত তারার জন্যও। শিক্ষিত সভ্য কৃষ্টিবান বলতে ত আমরা সমাজের উপরের স্তরের মুষ্টিমেয় লোকেই বুঝি। ভাল খায় ভাল পরেও তারা। শুদ্ধ মার্জিত ভাষায় কথাও কয় ত তারাই। দুনিয়ার ভাল-মন্দ বলতে আমরা বুঝি ত তারারই ভাল-মন্দ। কিন্তু রশিদভাই, ওরা ত আসলে সমাজের ফেনা মাত্র। উপরে ভাইসা থাকাই ওরার একমাত্র গুণ। আসল দুনিয়া সত্যিকার মানব-জাতি যে ঐ ফেনার নিচে চাপা পৈড়া আছে, সে কথা আমরা এই শিক্ষিত কৃষ্টিবানরা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবি? রোগ-যন্ত্রণার আসল ভিক্টিম যে ঐ নিচের মানুষগুলি, উপরের তলার ঐ সুখী বিত্তবানরা যে রোগ-যন্ত্রণার নাগালের বাইরে, সে কথা কি আমরা এই তথাকথিত চিকিৎসকরা মনে রাখি? রাখি না। রাখি না বৈলাই আমরা ডাক্তাররাও গরিবের রোগকে রোগ মনে করি না। গরিবের রোগ কিছু না। কারণ তারার প্রাণের কোনও দাম নাই। নাই কেন? কারণ তারা ডাক্তারের ফিস আর অষুধের দাম দিতে পারে না। কেন পারে না? ডাক্তারের ফিস মোটা, আর অষুধের দাম বেশি। ডাক্তারের ফিস আর অষুধের দাম বাড়াইল কে? ধনী ভদ্র বিত্তবানেরা। ঐ তথাকথিত সভ্য বিদ্বান ও কৃষ্টিবানেরা। টাকার জোরে তারা জীবনের আর সবটুকু সুখ-সুবিধা লুইটা নিচ্ছে। তবু তারার তলাহীন পেট ভরে নাই। সেই টাকার জোরেই অসুস্থ গরিবের মুখের অষুধটাও তারা লুইটা নিতেছে। এর পরেও বলতে চান রশিদ ভাই, এরা এথিক্স মানে? এথিক্সের দোহাই দিতে চান আপনে এরার পক্ষে?

রশিদ মনের চাপ্খল্য গোপন করিল খুব জোরে হাসিয়া। বলিল—ব্র্যাভো হামিদ। বড় জোরদার বক্তৃতাটা করল। পল্টনে দাঁড়াইয়া এমন বক্তৃতা করলে ইলেকশনে জিতা তোমার অবধারিত।

হামিদ বিষণ্ণ মুখে বলিল: আপনে ঠাট্টা করতেছেন রশিদভাই।

রশিদ গলা লম্বা করিয়া বলিল: করুম না? মেডিক্যাল সায়েন্সের কথার মধ্যে তুমি রাজনীতি অর্থনীতির লেকচার দিবা, আর আমি চেষ্টা বন্ধ কৈরা তাই গিলতে থাকুম?

হামিদ এবার মুখ উজ্জ্বল করিয়া হাসি মুখে বলিল: আপনে চান আর না চান গিলতে আপনার হবেই। কারণ আমি লেকচার দিতেছি না, সত্য কথাই কইতেছি। আপনে নিজের কারখানা থনে গুরু কৈরা নারায়ণগঞ্জ ডেমরা ঢাকা টংগির লক্ষ-লক্ষ শিল্প-ময়দুরের কথা কল্পনা কৈরা দেখেন। আর কল্পনারে আরেকটু কুশাদা কৈরা শীতলক্ষ্যা-মেঘনা যমুনার ওপারের কোটি-কোটি কৃষি-মজুরের কথাও একটু ভাইবা দেখন ত। ঐ কোটি-কোটি মানুষের আসলে মানুষ রাখছি আমরা? ওরার ঐ শীর্ণ দেহে কি আমরা প্রাণ অবশিষ্ট রাখছি? অথচ এরার শ্রমের উপরই আমরা খাইয়া-পৈরা বাঁইচা আছি। এরা আমাদের মতোই আদম-সন্তান না? মুখে-মুখে ভাই বৈলা থাকি না এরারে? কে করছে এরার এই অবস্থা? বড় লোকেরাই ত? না আর কেউ? না রশিদভাই, আমরা মাফ করবেন। আমি এরার চিকিৎসা করতে পারুম না। ওরার উপর রাগ কৈরা না। আমার রাগে ওরার কি আসে যায়? ওরার টাকা আছে। আমার চেয়ে ভাল-ভাল ডাক্তার গণ্ডায়-গণ্ডায় তারা কিন্তে পারে টাকার জোরে। আমি ওরার চিকিৎসা করুম না; কারণ আমি গরিবের জন্য রিজার্ভ থাকতে চাই।

রশিদ: তা তুমি গরিবের জন্যই রিয়ার্ড থাক; আমার তাতে কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু ধনীর চিকিৎসা করবা না বৈলা তুমি ঐ যুক্তিতে তোমার আত্মীয়-বন্ধুর চিকিৎসাও

করবা না? এই ধর আমার কথাটাই। আমি বড়লোক বৈলা আমার অসুখেও কি তোমার চিকিৎসা পামু না?

হামিদের একরোখা চিন্তা যেন হঠাৎ দেওয়ালে ঠেকিল। সে থমকিয়া গেল। ঈষৎ চিন্তা করিয়া হাসিয়া বলিল: আপনার কথা অবশ্য আলাদা।

রশিদ: আলাদা হৈতে যাব কেন? তুমি আমার কোম্পানির চিফ মেডিক্যাল এডভাইসার। সে হিসাবেও আমার প্রতি তোমার একটা মেডিক্যাল কর্তব্য আছে ত?

হামিদ হাসিয়া বলিল: কিন্তু সেটা ত হোমিওপ্যাথিক এডভাইসারি। আপনি যদি অসুস্থ হন, আর হোমিওপ্যাথিক অশুধ খাইতে রাজি হন, তবে আমাকে নিতেই হবে আপনার চিকিৎসার ভার।

রশিদও এবার হাসিল। বলিল: চিকিৎসা করবা তুমি। কি অশুধ খাওয়াবা রোগীকে সেটাও নিশ্চয়ই ঠিক করবা তুমিই।

হামিদ এবার খুশী হইল। তার মনে হইল রশিদের এই স্বীকৃতিতে এবার তার পরাজয় অবধারিত। বলিল: কিন্তু আপনি নিজে ত আর রোগী নন। কাজেই সে কথা উঠে না।

রশিদ: উঠে এই জন্য যে রোগী আমি নিজে না হৈলেও আমারই নিজের লোক। আমার ফ্যাক্টরির ম্যানেজার।

হামিদ: তা হৈলে ত আপনার কোম্পানির নিজস্ব ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা করতেই আছেন। তবে হঠাৎ ডাক্তার বদলাইবার কি দরকার পড়ল? তাঁদেরও ত মত থাকা দরকার। সেটা কি লইছেন?

রশিদ: তার দরকারই হয় নাই। কোম্পানির ডাক্তাররা কেউ এখনো তাঁকে দেখেনই নাই। কারণ ম্যানেজার সাব এখানে ছিলেনই না। তিনি ছিলেন এত দিন কলিকাতায়। মাত্র গত রাতে তিনি এখানে আসছেন মানে আসা হচ্ছে। স্ট্রচারে কৈরা।

কলিকাতার নাম শুনিয়াই হামিদ চমকিয়া উঠে। চিন্তার ঘোড়া তার মন-পবনের পিঠে চড়িয়া শূন্যে উড়ে। কলিকাতার রোগী? এখানে আসিয়াছে? দিন সাতেক আগের রাতের ঘটনা তার মনে পড়ে। ঘটনা মানে স্বপ্নই হইবে। কলিকাতার রোগী আসিয়াছে নারায়ণগঞ্জে? হামিদ তার চিকিৎসা করিবে? এর সাথে হামিদের স্বপ্নের, মোরাকেবাই হইবে, কোনও সম্পর্ক নাই ত? কৌতূহল হয় তার দুর্নিবার। অগ্রহ তার ঠোঁটের ধারে আসিয়া পড়িতে চায়। মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টায় শুধু কথা বলিবার উদ্দেশ্যেই কথা বলিল: কলিকাতায় অত-অত বড়-বড় ডাক্তার থাকতে তিনি এখানে আসলেন কেন? আপনারাই বা তাঁকে আসতে দিলেন কেন? সেখানেই ত ভাল চিকিৎসা হৈত।

রশিদ: আমরাও তাই মনে করতাম। আমরাও সকলের ইচ্ছাও ছিল ঐ রকমই। কোম্পানির তরফ থনে জানাইছিলামও সে কথা তাঁকে। কিন্তু রোগী নিজে বিশেষ কৈরা তাঁর স্ত্রী কিছুতেই আর এক মুহূর্ত থাকতে চাইলেন না। সত্য কথা বলতে কি তাঁরা আমরাও না জানাইয়াই গতকাল আইসা পড়ছেন। এয়ারপোর্ট থনে ফোন কৈরা গাড়ি নেওয়াইছেন।

হামিদের কৌতূহল এবার ফাটিয়া পড়িবার মতো হইল। মোরাকেবায় দেখা বিবরণের সাথে মিলাইবার জন্য ঐ ধরনের প্রশ্ন তার ঠোঁটের আগায় আসিয়া পড়িল।

অন্য কথা দিয়া সেগুলি চাপা দিবার মতলবেই সে প্রশ্ন করিল: তিনি বুঝি চিকিৎসার জন্যই সস্ত্রীক কলিকাতা গেছিলেন?

রশিদ: কলিকাতা তাঁরা যান নাই। বরাবর সেখানেই তাঁরা থাকতেন। ব্যাপার এই যে তিনি অনেক দিন যাবৎই আমার কলিকাতা ফার্মের ম্যানেজার আছেন। ওটা ছিল বিলাতের হলবেরি ডেভিড-এণ্ড-জোসেফের সাথে আমার জয়েন্ট বিজনেস। বর্তমানে এইচ. ডি. জের এক পার্টনার জোসেফরা কলিকাতার এক শিল্পপতির সাথে শ্যামবাজারে এক ল্যাবরেটরি খুলছেন। অপর পার্টনার হলবেরিরা আমার সাথে এই খানপুরের ল্যাবরেটরি খুলছেন। কলিকাতার জয়েন্ট বিজনেস কাজেই বন্ধ কৈরা দেওয়া হৈছে। হিসাব-পত্র ও জায়দাদ মিটাবার জন্যই ম্যানেজার সাব অল্ল কয়জন কর্মচারি নিয়া কলিকাতায় ছিলেন। সবই প্রায় শেষ হৈয়া আসছিল। এমন সময় ম্যানেজার সাব হঠাৎ অসুস্থ হৈয়া পড়েন। সামান্য হাতের কাজটুকু শেষ করবার জিদেই বোধহয় তিনি অতিরিক্ত রকম খাটছিলেন। অন্তত তাঁর স্ত্রীর মত তাই। ফলে অসুখ গুরুতর হয়। তাই তাঁরা গত রাত্রে এখানে চৈলা আসছেন।

অত কথা জানিবার দরকার ছিল না হামিদের। রোগী কলিকাতার। তাঁর স্ত্রী আছেন। সেই স্ত্রীই তাঁকে সংগে নিয়া এখানে আসিয়াছেন। আর রশিদভাই তাঁরই চিকিৎসার জন্য হামিদকে ধরিয়াছেন। এর সাথে হামিদের মোরাকেবায়-বায়ানান্নাসের সম্পর্ক থাকিবার কথা। নইলে এমন ধরনের মিলই বা হইবে কেন? অতসঙ্গে আচিনীয় যোগাযোগই বা হইবে কেন? যদি মোরাকেবার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নাও থাকিয়া থাকে, তবু এর মধ্যে একটা অদৃশ্য হাতের খেলা আছে, হামিদের মনে সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। দেখাই যাক না কি আছে। হামিদ সেই মুহূর্তেই ঠিক করিয়া ফেলিল এই রোগীর চিকিৎসা সে করিবে। তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিবার ইচ্ছাও তার হইয়াছিল। সে ইচ্ছা দমন ও মনের আগ্রহ গোপন করিয়াই রশিদের এই বিস্তৃত বিবরণ শুনিতেছিল। শুনিতেছিল মানে শুনিবার ভান করিতেছিল। আর ঐ সংগে মনে-মনে ঐ কলিকাতার রোগী ও তার স্ত্রীর চেহারা কল্পনায় ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল।

রশিদের কথা শেষ হইলে হামিদ নিজের কথা বলিল। কিন্তু ঠিকমতো কথাটা বলার প্রস্তুতি স্বরূপ একটু বানাওট হাসি হাসিল। তারপর চোখে মুখে সে হাসির ভাব যথেষ্ট ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল: মুশ্কিলে ফেললেন রশিদভাই। কলিকাতা-ফেরৎ রোগী। চিকিৎসা করবার খুব লোভ হৈতেছে। অন্য কোনও ডাক্তারও দেখান নাই। সেদিকেও কোনও জটিলতা নাই। আপনি ভরসাও দিলেন আমি আমার ইচ্ছা-মতো যে কোন প্রণালীতে চিকিৎসা করতে পারুম। এ অবস্থায় আমি না বলি কেমন কৈরা? এক দিকে আমার গরিব রোগীর স্বার্থে যে নিয়ম করছি তা ভাঙতে হয়, আরেক দিকে আপনি এখন আমার বস্। আপনার কথা না রাখলে আপনি যদি হোমিওপ্যাথিক ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার ওয়াদা না রাখেন। এমন হর্নস্-অব-ডায়লেমায় পড়লে মুরুব্বির কাছে সারেগার করাই আমার রীতি। আমি তাই আপনার কাছেই সারেগার করলাম। আপনি যা বলেন।

রশিদ হামিদের ভিতরের চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার খবর রাখিত না কাজেই হামিদের এত সব অতি-ভাষণ যে সেই চাঞ্চল্য-উত্তেজনা গোপনের চেষ্টায় বাচালতা মাত্র, রশিদের মনে ঘূর্ণাক্ষরেও তেমন কোন সন্দেহ হইল না। সে হামিদের এসব কথাতে তার আন্তরিক দ্বিধা-সংকোচ মনে করিয়া খুশী হইয়াই বলিল: সারেগার করবার পাত্র

তুমি নও। আর আমি তোমার বস বা মুরুবিও নই। কিন্তু তুমি আমার অনুরোধ রাখবা কৈয়া আমার ইযৎটা বাঁচাইলা ভাই। কারণ আমি মানেজার সাব ও তাঁর স্ত্রীর কাছে তোমার বহুং তারিফ ইতিমধ্যেই কৈরা ফেলছি। তোমারে দিয়াই তাঁর চিকিৎসা করামু, তেমন কথাও দিছি। এখন বুঝলা আমি কি বেকায়দায় পড়ছিলাম? আর তুমি শেষ পর্যন্ত রাজি হৈয়া কেমনে আমার মুখ রক্ষা করলা?

হামিদ মনের গূঢ় পুলকটাকে অন্য খাতে চলাইবার আশায় বলিল: আপনে আমার কথায় হোমিওপ্যাথিক ল্যাবরেটরি করতে রাজি হৈছেন, আর আমি আপনার একটা অনুরোধ রাখুম না? এটা কি একটা কথা হৈল?

ম্যানেজারের কোয়ার্টার চিনায় হামিদের অসুবিধা হইতে পারে। তাই স্থির হইল হামিদের-দেওয়া সময়-মতো রশিদের গাড়ি আসিয়া হামিদকে নিয়া যাইবে।

২

খানপুরের বিরাট এলাকা জুড়িয়া ইস্ট বেংগল ল্যাবরেটরি। অর্ধচন্দ্রাকারে বিরাট সাইনবোর্ড সদর দরজায়। বাংলা হরফে লেখা। এটাই রশিদদের ঔষধ তৈয়ারির কারখানা। এর সামনে দিয়া হামিদ কতবার যাতায়াত করিয়াছে নিজের গাড়িতে চড়িয়া। কিন্তু কোনদিন ভিতরে ঢুকে নাই। অবসরই পায় নাই। রশিদদের কত অনুরোধ-উপরোধ ফেলিয়াছে শুধু সময়ের অভাবে। রোগী ফেলিয়া হামিদ বাহিরে যাইতে পারে না। বাহিরে যাইবার কারণ ঘটে খুব কমই। কারণ হামিদ রোগী দেখিতেও কারও বাড়ি যায় না। আশ্মা আসিয়াছেন অবধি রাতের জেলা সে ক্লাবে-সিনেমায় যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে।

ফলে রশিদদের ল্যাবরেটরির জেনারেল ম্যানেজারের কোয়ার্টারটা হামিদ আজই প্রথম দেখিল। রশিদদের গাড়ি হামিদকে লইয়া গাড়ি-বারান্দায় ঢুকিতেই একজন থাকী উর্দি-পরা দারওয়ান ছুটিয়া আসিল। গাড়ির দরজা খুলিয়া সেলিউট-সালাম করিল। দরজায় হাত রাখিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। হামিদ তার মেডিক্যাল ব্যাগ হাতে লইয়া গাড়ি হইতে নামা মাত্র দারওয়ান ব্যাগটা নিজের হাতে নিল। পরক্ষণেই সাদা উর্দি-পরা একজন আদালি আসিয়া হামিদকে নুইয়া সালাম করিল। দারওয়ানের হাত হইতে ব্যাগটা লইয়া হামিদকে বলিল: চলেন স্যার। দু'তলায়।

বারান্দায় সিঁড়ির পরেই কলাপসিবল গেট। গেট পার হইয়াই লাউঞ্জ। লাউঞ্জের বাঁ দিকে পাটের গালিচা-মোড়া দুতালার সিঁড়ি। আদালি হাতের ইশারায় সিঁড়ি দেখাইল। হামিদ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল। আদালি ব্যাগ হাতে তার পিছে-পিছে। পাটের গালিচা হইলেও বেশ নরম। একদম পশমী কার্পেটের মতো। রং ও ডিজাইনটাও খুব চমৎকার। হামিদের খুব পছন্দ হইল।

সিঁড়িটা তিন চক্করের। দ্বিতীয় চক্করের মাঝখানে গিয়াই তৃতীয় চক্করের উপর দিয়া দুতলার বারান্দায় হামিদের নজর পড়িল। সত্যিই একটি মহিলা দাঁড়াইয়া আছে সিঁড়ির মুখে। মোরাকেবায়ে-বায়নান্নাসে যেমনটি দেখিয়াছিল ঠিক তেমনটি। একে দেখিবার জন্যই এতক্ষণ হামিদের বুক দুড়দুড় করিতেছিল। দেখিলও সে ঠিক তেমনি অবস্থায়।

মোরাকেবার মহিলার মতোই এই মহিলার মুখে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা। হামিদকে দেখামাত্র তার মুখ আশা ও প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যেমনটি হইয়াছিল মোরাকেবায়। তেমনিভাবে হাসিমুখে সে হামিদকে আদাব জানাইল। হামিদের অসাধারণ চোখ তার সবটুকু প্রখরতা লইয়া মহিলার চোখে-মুখে টর্চলাইটের মতো ঝাপাইয়া পড়িল।

হামিদ নিরাশ হইল। না এ মুখ ত সে মুখ না। সে মুখ ত হামিদের মনের পটে ফটোগ্রাফের মতোই স্পষ্ট। রশিদের মুখে কলিকাতার রোগী ও তার স্ত্রীর কথা শুনিয়াছে অবধি হামিদ ত কেবল তাদের কথাই ভাবিতেছে। স্বপ্নে-দেখা, থুড়ি মোরাকেবায় দেখা, (স্বপ্নে দেখাটা হামিদ আজ আর স্বীকারই করে না) মহিলা ও তার স্বামীর চোহারা সম্বন্ধে হামিদের এমন ভুল হইতে পারে না। হামিদের-দেখা সে মুখের সাথে এ মুখের কোনও মিল নাই, না রং এ না কাটে। না, তা হইলে এ রোগী সে রোগী নয়। এ চিকিৎসার জন্য হামিদ আর তেমন উৎসাহ বোধ করিল না। সম্ভব হইলে সে ফিরিয়াই যাইত। কিন্তু এখন তার আর উপায় নাই। হামিদ কোনও ভাবস্তর না দেখাইয়া মহিলার আদাবের উত্তরে নীরবে সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দেওয়া মাত্র মহিলা হামিদের দিকে মুসাফেহার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। হামিদ মহিলার হাত ধরিল। চোখ-মুখের চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা মহিলার হাতের তলায়ও যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। হামিদের মুঠির মধ্যে মহিলার হাত কাঁপিতেছিল। উত্তেজনা-জড়িত কণ্ঠে বলিল: আপনি এসেছেন দেখে আমি বড্ড খুশী হয়েছি। আসুন।

হামিদ ভদ্রতার হাসি হাসিয়া জানাইল সেও খুশী হইয়াছে। মনে-মনে বলিল: আপনারে দেখবার আগে আমিও খুশীই ছিলাম।

মহিলা পথ দেখাইয়া হামিদকে একটা কামরার দিকে লইয়া গেল ঠিক মোরাকেবার মহিলার মতোই কোমর দুলাইয়া। হামিদ এবার বিস্মিত হইল। পিছন হইতে মহিলাকে দেখিতে ঠিক মোরাকেবার মহিলার মতো। হামিদ স্পষ্ট দেখিল মোরাকেবার মহিলার মতোই এরও প্রতি পদক্ষেপে সরু কোমরের নিচে সুডৌল নিতম্ব কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে। শাড়ির আঁচলের কোনও অংশই তার নিতম্ব ঢাকিয়া রাখিতেছে না। মহিলার সেদিকে খেয়ালই নাই। না কি খুব খেয়াল আছে?

মোরাকেবার মহিলার মতোই এ মহিলাও একটি কামরার বন্ধ দরজার সামনে আসিল। দরজার হাতল ধরিয়া তেমনি নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। হামিদের দিকে মিষ্টি চাহনি চাহিয়া বলিল: আসুন। রোগী এই ঘরে।

রোগীর বিছানার শিয়রের দিকে একখানা চেয়ার পাতাই ছিল। কামরায় ঢুকিয়া মহিলার ইশারায় হামিদ তাতে বসিল। রোগীর দিকে নজর করিল। রোগী চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। কোমা বা তন্দ্রা। ঘুম নয়। হামিদের নজর আরো একটু প্রখর হইল। হাঁ, রোগীকে ত মোরাকেবার রোগীর মতোই মনে হয়। মহিলা বিছানার উপর ঝুঁকিয়া রোগীর কপালে হাত দিয়া একটু মলিল এবং খুব মিঠা মোলায়েম সুরে ডাকিল: ডাক্তার সাব এসছেন।

রোগী চোখ মেলিল। হামিদ এবার তাকে ভাল রূপ দেখিতে পাইল। একদম চিনিয়া ফেলিল। হাঁ, নিশ্চয় এ মোরাকেবার রোগী। পুলকে হামিদের সারা গা শিহরিয়া

উঠিল। নিজের উত্তেজনা গোপন করিবার উদ্দেশ্যে হামিদ বেশ খানকটা হেলিয়া হাত বাড়াইয়া রোগীর ডান হাতটা নিজের হাতে তুলিয়া নিল। নাড়ির গতি দেখিবার ভাব করিল। কিন্তু নজরটা থাকিল রোগীর চোখে-মুখে। না, আর কোনও সন্দেহ নাই হামিদের মনে।

রোগীর হাতটি আলগোছে বিছানার উপর রাখিয়া হামিদ চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল এবং ডাইনে-পিছনে একটু ঘাড় ফিরাইয়া বলিল: আমার ব্যাগটা?

ব্যাগ-হাতে আদালি কামরার এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিল। সে এক হাতে ব্যাগ ও আরেক হাতে একটা টিপয় লইয়া আসিল। হামিদের বাম পাশে টিপয়ের উপর ব্যাগটা রাখিয়া আবার পিছাইয়া গেল।

হামিদ এক-এক করিয়া ও জোড়ায়-জোড়ায় স্টেথসকোপ, থার্মোমিটার ফিগ্‌মোমেনোমিটার লাগাইয়া রোগীর তাপ ব্লাড প্রেশার চেষ্ট হাটবিট সব পরীক্ষা করিল। জিভ-চোখ দেখিল। বুকে টোকা দিয়া, পেট টিপিয়া পরীক্ষা করিল। এমনি করিয়া নীরবে নিঃশব্দে সে প্রায়-সাত মিনিট ধরিয়া রোগী পরীক্ষা করিল। তার মুখ গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইতে থাকিল।

কিন্তু আশ্চর্য! এই পাঁচ-সাত মিনিট রুগ্ণস্বামী ও ব্যাকুল স্ত্রীর মধ্যে চোখে-চোখে অনেক আলাপ হইয়া গেল। ডাক্তারকে প্রথমবার দেখিয়াই রোগীর চোখ-মুখে যে উজ্জ্বলতা দেখা দিয়াছিল, স্ত্রীর সাথে দৃষ্টি বিনিময়ে সে উজ্জ্বলতা প্রফুল্লতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। স্বামী-স্ত্রী একমত হইয়াছে। এই সেই ডাক্তার যার হাতে রোগী ভাল হইবে। এই আস্থা ও বিশ্বাস লইয়াই তারা ডাক্তারের মুখাবয়ব তার হস্তচালনা তার যন্ত্র-পাতির ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। ডাক্তারের প্রতি কাজ ও মুখ-ভাব রোগী ও তার স্ত্রীর নজরে কল্যাণ ও মংগলের তাৎপর্যের ইংগিত বহন করিতেছিল। হামিদের মুখের গাভীর্য তাদের মনে অমংগলের কোনও অশুভ ইংগিত বুঝাইতেছিল না।

এদিকে হামিদ দেখিল রোগীর অবস্থা সংকটজনক। রোগ সম্বন্ধে সে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া ফেলিয়াছে। রোগটা মূলত: হিপোটাইটিস। লিভারে অতিশয় রক্ত সঞ্চার হইতেছে। অংশতঃ অসাড় হইয়া গিয়াছে। রোগীর কাধ ও পেট যেরূপ স্পর্শ-কাতর, এর গায়ের চামড়া ও চোখ যেরূপ হলুদবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাতে সিরোসিসের আশঙ্কা ষোল আনা। এ রোগীকে হামিদ বাঁচাইতে পারিবে? অতিরিক্ত মদ্য পানই যে এ রোগের মূল কারণ তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন যে সে স্তর পার হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার অত বড়-বড় অভিজ্ঞ প্রবীণ ডাক্তাররা যার রোগ সারাইতে পারিলেন না, হামিদ কোন্ ভরসায় সে রোগীর দায়িত্ব নিবে? অথচ এ রোগী যে মোরাকেবায়-দেখা রোগী তাতেও ত সন্দেহ নাই। কেন এ রোগী তার বরাতে আসিল? রোগী ত আসে নাই। আসলে সেই ত রোগীকে একরূপ ডাকিয়া আনিয়াছে। হাঁ, সে ত মোরাকেবায় রোগীকে এবং তার স্ত্রীকেও এমনি ধরনের কি যেন বলিয়াছিল। কেন এমন হইল? এর ভেদ কি? সে ত এখন আর আগের মতো রুহানী ব্যাপারকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। কি করা এখন?

এত দুশ্চিন্তাতেও হামিদ ডাক্তারের কর্তব্য ভুলিল না। রোগীর সামনে ডাক্তারের এমন ভাড়ি-মুখ করিয়া থাকা কিছুতেই উচিত হইতেছে না, চট করিয়া সে কথা

হামিদের মনে পড়িল। সে জোর করিয়া শ্রফুল হইবার চেষ্টা করিল। মুখে কৃত্রিম হাসি আনিয়া প্রথমে রোগীর ও পরে তার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল।

কি আশ্চর্য! কারও মুখে কোন দুশ্চিন্তা নাই। রোগের জটিলতা সম্পর্কে ডাক্তারের পরীক্ষার ফলাফল জানিবার আগ্রহ-ব্যাকুলতা নাই। তার বদলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মুখে আশার ও আস্থার উজ্জ্বলতা। আহা! বেচারারা অজ্ঞানের স্বর্গে বাস করিতেছে। রোগ যে কত সিরিয়াস বেচারারা কিছু জানেন না। কেন জানে না? কলিকাতার ডাক্তাররা কি কিছু বলেন নাই? তাঁর রোগটাই ধরিতে পারেন নাই, এটা হইতে পারে না। লক্ষণাদি ত দেখা দিয়াছে বেশ কিছুদিন আগে হইতেই। না, অমন হইতেই পারে না।

হামিদ মহিলার দিকে চাহিয়া বলিল: কলিকাতার প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট ও প্রেসক্রিপশনগুলি সব আনছেন ত?

মহিলা হাসিমুখেই বলিল: জি, হাঁ সব এনেছি, দেখবেন?

হামিদ মহিলার এই অসাময়িক অজ্ঞ বেমত্বকা হাসিটা পছন্দ করিতেছিল না। তার উপর এমন প্রশ্নটা তার বিরক্তি উৎপাদন করিল। সাধ্যমতো তা গোপন করিয়া বিদূপের সুরে বলিল: জি হাঁ, দেখবার লাগিই পুছ করলাম।

হামিদের প্রচ্ছন্ন বিদূপটা গায় না মাখিয়া মহিলা প্রজাপতির মতো হাওয়ায় উড়িয়া পাশের কামরায় চলিয়া গেল। হামিদ রোগীর দিকে চাহিল। দেখিল রোগীর মুখে দুইটা চলমান বরষা উড্ডীয়মান স্ত্রীর অনুসরণ করিতেছে। যতক্ষণ চোখ ঘুরাইয়া দেখা গেল, ততক্ষণ তাই দেখিল। যখন চোখ ঘুরাইয়া দেখা অসম্ভব হইল তখন ঘাড় ফিরাইবার চেষ্টা করিল। হামিদ বলিতে বাধ্য হইল: আপনে ঘাড়ের উপর হস্ত দিবেন না।

ডাক্তার সাহেব তার দিকে চাহিয়া আছে জানিতে পারিয়া রোগী ঘাড় সোজা করিল। শীর্ণ মুখে অতি কষ্টে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল: আপনে আমার স্ত্রীরে ভুল বুঝবেন না, ডাক্তার সাব। কলিকাতার ডাক্তারদের কাগজ-পত্র আপনেরে দেখাইতে সে উৎসাহ পায় নাই। তাই তার ঐ দ্বিধা। আমিও তার দ্বিধার সাথে একমত। আমি আর আমার স্ত্রী উভয়েই বিশ্বাস করি, আপনার চিকিৎসায়ই আমি ভাল হইয়া যাব। কলিকাতার ডাক্তারদের কাগজ-পত্র দেখবার আপনার কোনও দরকার নাই। ও-গুলি আমরা এখন স্বচ্ছন্দে ফেইলাও দিতে পারি।

হামিদ বিস্মিত হইল। বলিল: আমার প্রতি আপনার এমন আস্থা হবার কারণ কি? আপনার এম. ডি.র কথায় বুঝি? তিনি আমার তারিফে যদি কিছু কৈয়া থাকেন তবে আপনার ও-সব ভুলিলা যান। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। বড় ভাইও বলতে পারেন। আমার ব্যাপারে তাঁর তারিফের কোনও দাম নাই।

মহিলা ক্লিপ-চাপা এক গোছা কাগজ হাতে ঘরে ঢুকিল। রোগী হামিদের জবাবে কি বলিতে যাইতেছিল, সেটা না বলিয়া স্ত্রীকে বলিল: শুনছ যরি, ডাক্তার সাব মনে করেন, এম. ডি. আমাদের কাছে তাঁর খুব তারিফ করছেন বৈলাই নাকি তাঁর উপর আমাদের এত আস্থা। বৈলা দেও যরি, ডাক্তার সাবের উপর আমাদের আস্থার কারণটা। না, আমিই বলব?

যরি অর্থাৎ যরিপোশ মহিলার নাম। সে হাতের ইশারায় স্বামীকে নিরস্ত করিয়া বলিল: বেশি কথা বলা তোমার উচিত নয়। আমিই বলব। তুমি চুপটি করে শোন। আমি ভুল করলে শুধুরে দিও। নইলে কথা বল না।

কাগজের গোছাটা হাতে লইয়াই মহিলা হামিদের সামনে রোগীর বিছানায় বসিল। বলিল: কোলকাতার কাগজ-পত্র সম্পর্কে আমার স্বামী আপনাকে যা-যা বলেছেন, সবই আমি পাশের কামরা থেকে শুনেছি। তিনি আমার মনের কথাই বলেছেন। আমিও মনে করি, এসব কাগজ দেখবার আপনার কোনও দরকার হবে না। আমার স্বামীর চিকিৎসার জন্যে হুয়ুর-পাকই মেহেরবানি করে আপনাকে পাঠিয়েছেন এতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

হামিদ কৌতূহলে বলিল: কে পাঠাইছেন কৈলেন?

যরি: হুয়ুর-পাক।

হামিদ: আপনার হুয়ুর-পাক কে?

যরি বেগম জবাব দিবার আগেই রোগী মাথাটা ঈষৎ উঁচা করিয়া বলিল: যরি, তোমার ভুল হৈতেছে। আগেই তোমার হুয়ুর-পাকের কথা আন কেন? যিনি স্বয়ং আমাদের বাসায় গেছিলেন, তাঁর কথা আগে বল।

যরি বেগম হাসিমুখে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল: থ্যাংক ইউ ফর দি কারেকশন।

হামিদের দিকে চাহিয়া বলিল: আজ থেকে পনের দিন আগে স্বামীর দিকে চাহিয়া: পনের ঠিক আছে ত?

স্বামী: চৌদ্দ দিন।

যরি: হাঁ, আজ থেকে চৌদ্দ দিন আগে রাত তিনটার সময় আমি বাথরুমে যাই। বাথরুম থেকেই আমি শুনেতে পাই আমার স্বামী যেন কার সাথে কথা বলছেন। আমি কান পেতে শুনি। চাকর-বাকর কারো গলা নয়। অত রাতে কে এল, কি করে এল, চিন্তা করতে করতে আমি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। দরজা খুলতে-খুলতে আমার কানে এল একজন অচেনা লোক বলছেন: 'আপনার চিকিৎসা এখানে হবে না; আপনি হয় হাসপাতালে ভর্তি হন, নইলে নারায়ণগঞ্জে আমার কাছে চলে আসুন।' দরজা খোলার শব্দ পেয়ে লোকটি আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং চোখের নিমিষে গায়েব হয়ে গেলেন।

হামিদ বিস্ময়ে যরি বেগমের কথা শুনিতেছিল। বেগম একটু দম নিতেই বলিল: তারপর?

যরি: লোকটি চলে গেলেন বটে, কিন্তু অই এক পলক দেখাতেই তাঁর চেহারা আমার মনে একদম আঁকা হয়ে গেল। আশ্চর্য এই যে আমাদের বেডরুমে যিরো পাওয়ারের একটা গ্রিন ডিম লাইট জ্বলছিল। কিন্তু যখন লোকটি আমার চোখে পড়েন তখন সারা রুম যেন হানড্রেড পাওয়ারের লাইটে আলোকিত ছিল। যেই লোকটি গায়েব হলেন অমনি রুমের আলো যেমন- তেমনি ডিম্ হয়ে গেল।

উত্তেজনা ও কৌতূহলে হামিদের দম আটকিয়া যাইবার মতো হইল। সে যন্ত্র চালিতের মতো প্রশ্ন করিল: কি আশ্চর্য! তার পর?

যরি: আমি ঝটপট আমার স্বামীর পাশে এলাম। তার মাথায় কপালে ও গালে হাত বুলিয়ে ডাকলাম: 'তুমি জেগে আছ?' জবাবে আমার স্বামী একটু চমকে উঠলেন। বললেন: 'আহা! তুমি আমার কি ভাল ঘুমটা ভেংগে দিলে।' আমি বললাম: 'তুমি কি ঘুমুচ্ছিলে?' স্বামী বললেন: হাঁ ঘুমুচ্ছিলাম। আর স্বপ্ন দেখছিলাম। জান যরি, স্বপ্নে এক

ডাক্তার আমাকে দেখতে এসেছিলেন। তিনি আমায় থরো এক্যামিন করলেন। আমার কষ্ট কি জিগগেস করলেন। আমি সব তাঁকে বললুম। সব শুনে ডাক্তার বললেন: আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনি ভাল হয়ে যাবেন। সত্যি বলছি যরি, ডাক্তার আমার গায় হাত দেওয়া-মাত্র আমার ব্যথা-বেদনা অর্ধেক হয়ে গেল। আমি তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে বললুম: ‘আপনি আমার চিকিৎসার ভার নিন।’ তাতে ডাক্তার বললেন: এখানে আপনার চিকিৎসা হবে না। আপনি হয় হাসপাতালে ভর্তি হোন, নইলে নারায়ণগঞ্জে আমার কাছে চলে আসুন। এর পরেই তুমি আমার ঘুমটা ভেংগে দিলে।’ আমি তখন তাঁকে বললুম ওটা তার স্বপ্ন ছিল না। কারণ আমিও ঐ ভদ্রলোককে নিজ চোখে দেখেছি। আমার স্বামী তখন খুবই অবাক হলেন। এটার কি অর্থ হতে পারে আমায় জিগগেস করলেন। আমিও আমার স্বামীকে জিগগেস করলুম ভদ্রলোক যে ডাক্তার তিনি তা কি করে বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন ওর গলায় স্টেথস্কোপ ও হাতে মেডিক্যাল ব্যাগ ছিল। তার ভেতর থেকে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি বের করে তাঁকে একজামিন করেছেন। স্বামীর একথা শুনবার পর আমারও মনে পড়ল আমিও ঐ ব্যক্তির হাতে একটা ব্যাগ দেখেছিলুম।

হামিদ পুলক-আনন্দে হা করিয়া মহিলার কথা শুনিতেছিল। তার বুকটা সশব্দে ধড়ফড় করিতেছিল। মহিলা কথা শেষ করিবার আগেই প্রবল আগ্রহে তার দৃষ্টি হইতে বাহির হইয়া পড়িল: তারপর আপনারা কি করলেন?

যরি: পরদিন আমি আমার হুয়ুর-পাকের কাছে গেলাম।

হামিদ তার পূর্ব প্রশ্নটা দুহরাইয়া বলিল: আপনার হুয়ুর-পাক কে?

যরি: খানকা শরিফের পীর সাব-কেবলা।

হামিদ: তা হুয়ুর-পাক কি কইলেন?

যরি: হুয়ুর-পাককে সেদিন পেলাম না। তিনি দশদিনে কোথাও গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন প্রায় দশ দিন বাদে। তিনি ফিরে এলে আমি তাঁর কাছে সব বললুম। তাঁকে আমাদের বাসায় আমার স্বামীর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি আমাদের সব কথা শুনে এখানে আসবার হুকুম দিলেন। আমরা তাই চলে এলাম।

যরি বেগম স্বামীর দিকে চাহিয়া হাসি-মুখে বলিল: কি, ঠিক মতো বলতে পেরেছি সব? কোনও ভুল হয় নি ত?

রোগী খুশী হইয়া বলিল: সবই ঠিকমতো কইছ যরি। কিন্তু আসল কথাই বলা হয় নাই।

যরিপোশ ও হামিদ উভয়েই কৌতূহলে রোগীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিল। যরিপোশই প্রশ্ন করিল: কোন কথাটা?

রোগী: যাঁরে আমরা দেখলাম, তাঁর চেহারাটা?

যরিপোশ: ঠিক বলেছ। থ্যাংক ইউ। শুনুন ডাক্তার সাব, সত্যি আমাদের আসল কথাটাই বলা হয় নি। কোলকাতা থাকতেই আমরা একমত হয়েছিলাম যে আমরা দুজনাই একই ব্যক্তিকে দেখেছিলাম। দুজনাই বর্ণনা একদম মিলে গিয়েছিল।

গাল-ভরা হাসিতে সে যোগ করিল: তারপর এখানে এসে আমরা উভয়ে একমত হয়েছি, আপনিই সে ব্যক্তি। এতে আমাদের আর কোনও সন্দেহ নেই।

হামিদের দেহ-মন যেন অসাড় হইয়া গেল। তার রুহ যেন তাকে লইয়া হাওয়ায় উড়িয়া কোন নিরুদ্দেশ যাত্রায় যাইতে লাগিল। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। মোরাকেবা তার সফল হইয়াছে। কিন্তু বায়নান্নাস সফল হয় নাই। রুহ তার কার কাছে যাইতে গিয়া কার কাছে গিয়াছিল?

হঠাৎ হামিদের চমক ভাংগিল। রোগী তার হাত ধরিয়া চাপিতেছে। আর বলিতেছে: আপনেই আমারে বাঁচাইতে পারেন। আমরা বুঝতে পারছি, এটা কুদরতী নিশানা। বলেন ডাক্তার সাব আপনে আমার রোগ সারাইয়া দিবেন?

হামিদের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। সে গাম্ভীর্য যথাসম্ভব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া মুখে হাসি আনিয়া রোগীর হাতের পিঠে নিজের হাত মলিতে-মলিতে বলিল: আপনে সাইরা উঠবেন। কোনও চিন্তা করবেন না। বেগম সাব, চলেন অন্য কামরায়। রোগীর সামনে রোগের আলোচনা করতে নাই।

পাশেই ড্রয়িং রুম। যরিপোশ হামিদকে লইয়া সেখানে যাইবার জন্য উঠিল।

রোগী বাধা দিল। বলিল: না ডাক্তার সাব, আমার আর কোনও ভয় নাই। আমার সামনেই আলোচনা করেন। আমার কোনও ক্ষতি হবে না। বরঞ্চ লাভই হবে।

হামিদ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অগত্যা আবার বসিল। বলিল: কলিকাতার ডাক্তাররা আপনার স্বামীর রোগের কি ডায়গনসিস করেছেন? না, থাক। আপনার আর বলা দরকার নাই। ঐ কাগজগুলি আমার হাতে দেন।

ক্লিপ-আটা কাগজগুলি তখনও যরিপোশের হাতেই ছিল। সে গোছটা হামিদের দিকে বাড়াইয়া দিল।

হামিদ ক্লিপ টিপিয়া সবগুলি কাগজ আলাদা করিল এবং একটার পর একটা দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ দেখিল। একবার এ-রিপোর্ট হইতে ও-রিপোর্টে এ-প্রেসক্রিপশন হইতে ও-প্রেসক্রিপশনে চোখ ফিরাইতে লাগিল। হাঁ, ডায়গনসিস ত মোটামুটি ঠিকই হইয়াছে। প্রেসক্রিপশনও ত ভুল হইয়াছে বলা যায় না। তবে আজকালকার প্রায় সব এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারই ঐ করিয়া থাকেন, এঁরাও তাই করিয়াছেন। এক ধার-সে বাজারের সব প্যাটেস্ট এন্টিবায়টিক, এন্টি-পাইরেটিক, এন্টি-এলার্জিক ক্যাপসুল ট্যাবলেট ইনজেকশন দিয়া গেছেন। এ যেন গ্যামব্লিং। দান ধরিতে-ধরিতে একটা লাগিয়া যাইবেই। রোগীর সিস্টেমে এ সবের কি--

হঠাৎ হামিদের নজর একটা বিষয়ের উপর পড়ায় সে তাড়াতাড়ি কয়টা কাগজ মিলাইয়া কি যেন তুলনা করিল। সে মাথা তুলিয়া রোগীর দিকে চাহিল।

অনেকক্ষণ কথা বলিয়া রোগী বোধ হয় একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে চোখ বুজিয়া আছে।

হামিদ ঘাড় ফিরাইয়া যরিপোশের দিকে চাহিয়া বলিল: আচ্ছা বেগম সাব-আপনেরা এম. ডি. বলছেন আপনার স্বামীর নাম মি. আলী। কিন্তু সবগুলি রিপোর্ট ও প্রেসক্রিপশনে দেখতেছি: মি. ওয়ালে। আপনে আমারে ঠিক কাগজই দিচ্ছেন ত? আপনার ভুল হয় নাই ত?

হামিদ কাগজের পুরা গোছটাই যরিপোশ বেগমের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল: দেখুন।

বেগম হাত ও মাথা নাড়িয়া বলিল: আমার দেখতে হবে না। সবই ঠিক আছে। আমার স্বামীর নাম মি. আলী ঠিকই। বিলিতি ফ্যাশানে তিনি আলী স্পেল করেন এ.

ডবল এল. ই. ওয়াই দিয়ে। সাইন করেন ডব্লিও আলী। টানা সিগনেচারে প্রথমে ফুলস্টপ মার্কটা চাপা পড়ে। শেষ পর্যন্ত বাদ পড়ে। ফলে আমার স্বামী লেখাপড়ায় মি. ওয়ালে হয়ে যান। তারপর নামে-ডাকেও তাই। এখন মি. আলী বা মি. ডব্লিও আলী বললে কোলকাতার কেউই চিনবেই না তাঁকে। অথচ মি ওয়ালে বললে সবাই চিনে এক ডাকে।

স্বামীর দিকে নজর বুলাইয়া হামিদের দিকে এক ঝলক হাসি ছুড়িয়া মারিয়া যরিপোশ বেগম বলিয়া চলেন: আমাদের কায়-কারবার ত ইউরোপীয় সাহেব-সুবা অথবা হিন্দুদের সাথে? কাজেই বুঝতেই পারছেন ‘আলী’ রেস্তোর করবার কোনও চেষ্টাই আমার সাহেব করেন নি। কারণ ঐ ভুলে তাঁর কায়-কারবারের লাভই হত।

হামিদের মন ছিল অন্য দিকে। মিসেস আলীর কথা শেষ হওয়ার আগেই সে প্রশ্ন করিয়া বসিল: ডব্লিও আলী মানে কি? মানে আপনার সাহেবের পুরা নামটা কি?

মিসেস: ওয়াজেদ আলী। ওটাই ওঁর পুরো নাম।

স্ত্রীর মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হওয়ায় রোগী এবার চোখ মেলিল। বলিল: আমারে ডাকছিল যরি?

মিসেস: না। ডাক্তার সাবের কাছে তোমার পুরো নামটা বলছিলাম।

হামিদ: মিসেস আলী, আপনার দেশ কোথায়? মিসেস আলী: কুগলি জিলার কাসিমপুরে।

হামিদ: আর আপনার স্বামীর দেশ? মানে তিনি কি সিলেট জিলার লোক?

হামিদের চোখে-মুখে ও সুরে ব্যাকুল আগ্রহ ফাটিয়া পড়িল। স্বামী-স্ত্রী কারও চোখ এড়াইল না সেটা। তারা কিন্তু হামিদের মুখ-ভাবের অর্থ করিল। তারা প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল: আপনি তা জানলেন কি করে?

হামিদ প্রায় বেশামাল হইয়া পড়িয়াছিল। অর্ধেকটা কষ্টে সে নিজেকে সংযত করিল। সে ব্যস্ততার সাথে বলিল: না, না, এমনি আন্দাজে কইলাম আর কি?

হামিদের এই ব্যস্ততারও তারা অন্য অর্থ করিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মুখ ভক্তি ও আস্থায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্বামী-স্ত্রীতে দৃষ্টি-বিনিময় হইল।

মি. আলী বলিল: ডাক্তার সাব, আপনার হাতটা একটু বাড়ান। আপনার হাত ধইরা আমি তওবা করতে চাই। এম.ডি. আমাদের আগেই কইছেন আপনে ফতেপুর শরিফের পীরজাদা। আমরা তখন তাতে গুরুত্ব দেই নাই। এখন বুঝলাম। দেন আপনার হাত। আমার হাত ধরেন আমাকে তওবা করান।

হামিদের মাথায় তখন আগুন জ্বলিতেছে। রোগীর চিকিৎসা সে করিতে পারিবে না। করিবেও না। কিন্তু সে কথা বলে কি করিয়া? এ ধরনের রোগীর নিরাময়ের জন্য ফেইথ অত্যাবশ্যক। সেটা নষ্ট করিয়া হামিদ মেডিক্যাল এথিক্স-বিরোধী কাজ করতে পারে না। এই উভয় সংকটে পড়িয়া হামিদ রোগীর হাতের পিঠে নিজের হাতে মৃদু থাপ্পড় দিতে-দিতে উঠিয়া পড়িল। বলিল: আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনে শিগগির সাইরা উঠবেন।

মিসেস আলীর দিকে চাহিয়া বলিল: আপনার সাথে গোপনে কথা আছে। ড্রয়িং রুমে চলেন।



বেডরুম হইতে ড্রয়িংরুমে যাইতে-যাইতে হামিদের মনের উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গেল। এ সেই ওয়াজেদ। সেই নিষ্ঠুর জানোয়ার যে তার কলিজার টুকরা রাযিয়াকে চিরকালের জন্য বন্দী করিয়াছে। এই জানোয়ারকে হাতের কাছে পাইলে হামিদ তার গলা টিপিয়া মারিবে, কতদিন সে তেমন হলফ করিয়াছে আজ সেই হৃদয়হীন বর্বরটা নিজেই মৃত্যুর দরজায় উপস্থিত। কলিকাতার বড়-বড় ডাক্তাররা তাকে জবাব দিয়াছে। হামিদের কাজটা আজ আযরাইল ফেরেশতা নিজের হাতে নিয়াছেন। কেন যাইবে হামিদ তার জান বাঁচাইতে? ওয়াজেদ মরিলে হামিদ তিন মাস ইন্দতের পরেই রাযিয়াকে বিয়া করিয়া জীবনের স্বপ্ন-সাধ মিটাইবে। ওয়াজেদের মৃত্যু রাযিয়ার মুক্তি। সেই ওয়াজেদের মৃত্যু ঠেকাইয়া রাযিয়ার বন্দী-জীবনের মেয়াদ বাড়াইবে হামিদ? কিছুতেই না।

প্রতিহিংসা-বৃত্তি হামিদের বুকে যিকির দিয়া উঠিল। এইটাই সুযোগ! দিক না হামিদ চিকিৎসার নামে ওয়াজেদকে মৃত্যুর পথে দ্রুত আগাইয়া। মাত্র একটা ইনজেকশন। কেউ বুঝিতে পারিবে না। রাযিয়ার নাথে এক দিকে, ওয়াজেদের সাথে আরেক দিকে, হামিদের সম্পর্কের কথা এরা কেউ জানে না। চুপে-সারেই সব হইয়া যাইবে। রাযিয়ার মুক্তি! হামিদ-রাযিয়ার মিলন! কি সুখ!

কিন্তু ড্রয়িংরুমে বসিতে-বসিতে হামিদের চিরন্তন সাধু মনে আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। নিজে একটা সোফায় বসিয়াই মিসেস আলীকে বলিল: আপনে বসেন।

মিসেস আলী তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সম্পন্ন নারী। ডাক্তার সাহেবের সুরে হঠাৎ একটা বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। পরিবর্তনটা কঠোরতার দিকের কতকটা বিষ্ময়ে কতকটা আশঙ্কায় সে ডাক্তার সাহেবের একই সোফায় পায়ের উপর বসিল এবং জিগগাসু নয়নে তার দিকে চাহিল।

হামিদ অতি কষ্টে নিজের উদগত কঠোরতায় মিষ্টতার প্রলেপ দিয়া বলিল: অত্যন্ত দুঃখের সাথে এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাকে বলতে হৈতেছে মিসেস আলী, আপনার স্বামীর চিকিৎসা আমি

মিসেস আলীর চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া হামিদ মাঝ পথে থামিতে বাধ্য হইল। মিসেস আলী ফাটা বেলুনের মতো হঠাৎ চুপসিয়াই শুধু গেল না। সে মূর্ছা যাইবার উপক্রম হইল।

হামিদ দুই হাতে তার দুই বাজু ধরিয়া বলিল: না, না, আপনে যা ভয় করছেন, তা নয়। আপনার স্বামীর রোগ সম্বন্ধে কিছু কৈতেছি না। সেটা অন্য কথা। আপনার স্বামী সত্যি ভাল হইয়া উঠবেন।

মিসেস আলী যেন সত্য-সত্যি সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল। সে হাসিয়া বলিল: আপনি যেভাবে কথাটা বলছিলেন, তাতে আমি সত্যি প্রায় সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম। আপনি শক্ত হাতে না ধরলে আমি পড়েই যেতাম। আপনাকে ধন্যবাদ। এইবার বলুন, কি কথাটা আপনি বলতে চেয়েছিলেন।

এই সুন্দরী নারীর পাল্লায় পড়িয়া হামিদ দুর্বল হইয়া না পড়ে, সেজন্য হামিদ এবার ভূমিকা না করিয়া সোজাসুজি কথাটা বলিয়া ফেলিল: আমি আপনার স্বামীর চিকিৎসা করতে পারকুম না। আপনে অন্য ব্যবস্থা করেন।

মিসেস আলী আগের বারের মতো না হইলেও বেশ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে দুইহাতে হামিদের কাছে-পাওয়া হাতটা জড়াইয়া ধরিল। বলিল: ডাক্তার সাব, আপনি আমায় ফাঁকি দেবেন না। আমার স্বামীর রোগ যতই কঠিন হোক, আপনি সে কথা ভাববেন না। আপনার হাতে আমার স্বামী ভাল হবেই। তবু যদি কিছু হয়, তবে সেটা হবে আমার তকদির আর আলীর হায়াত। সে জন্যে আমি প্রস্তুত। আপনি ওসব চিন্তা করবেন না।

মিসেস আলী কথার শেষে হামিদের হাতটা আরও জোরে সাপটিয়া ধরিল।

হামিদ এই লাস্যময়ী রূপসীর আকর্ষণ হইতে নিজেকে সজোরে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টায় কঠোর হইয়া বলিল: আমি কইলাম ত আপনার স্বামীর রোগের জটিলতার সাথে আমার এ কথার কোনও সম্পর্ক নাই। আমি অন্য কারণে এঁর চিকিৎসা করতে পারকুম না, মানে করকুম না।

মিসেস আলীর ভীতির স্থান দখল করিল বিষ্ময়। সে চোখ বড় করিয়া বলিল: কেন?

হামিদ গম্ভীর সুরে বলিল: আপনার ও আমার দুপক্ষেই ভালই জন্ম।

মিসেস আলীর বিষ্ময় আরও বাড়িল। বলিল: আপনার কথা শুনে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, ডাক্তার সাব।

হামিদ এবার মিসেস আলীর চোখে-মুখে নিজের জন্মের সময় বড়-বড় চোখ দুইটার সার্চলাইট ফেলিয়া মহিলার চোখ ঝলসাইয়া দিল। বলিল: আপনার স্বামীর জীবন আমার হাতে নিরাপদ না।

-নিরাপদ নয় কি বলছেন? আপনি রোগ ধরতে পারেন নি? আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।

-সে কারণে নয়। আপনার স্বামীকে আমি হত্যা করতে পারি। আমি তার জানী দুষ্মন।

-আপনি এসব কি বলছেন ডাক্তার সাব? আমার সাথে মশ্করা করছেন না ত?

-মশ্করা করার মতো মনের গতিক আমার নয়, মিসেস আলী। আমি খুবই উত্তেজিত, আমি আপনার স্বামীকে সত্যিই খুন করতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে খুন করতে তাকে আমি উদ্যতই হইছিলাম দেখেন নাই আপনে ইন্জেকশনের সিরিঞ্জ বার করছিলাম আমি?

মিসেস আলীর এবার মনে পড়িল রোগীর পাশ হইতে উঠিবার আগে সত্যি ডাক্তার সাহেব তাঁর ব্যাগ হইতে একটা সিরিঞ্জ বাহির করিয়াছিলেন। তার কৌতূহল-ভয়-বিষ্ময়কে ছাপাইয়া উঠিল। সে আবার হামিদের হাত সাপটিয়া ধরিয়া বলিল: বলতেই হবে ডাক্তার সাব ব্যাপার কি? না বললে আপনাকে আমি ছাড়ব না। কারণ আপনিই আমার স্বামীর একমাত্র আরোগ্য-দাতা।

হামিদ জোরে-জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল: আপনি আমারে আর কিছু জিগ্গাস করবেন না। আমি বলতে পারব না। আপনার বরাত ভাল আপনার স্বামীকে আমি এখনও খুন করি নাই। না, আমি আর এক মুহূর্ত এখানে দেরি করতে পারব না। যদি করি, তাতে আপনারই ক্ষতি হবে। আমি চললাম।

ড্রয়িং রুমে আসিবার সময় হামিদ নিজের ব্যাগটা এবার হাতে করিয়াই নিয়া আসিয়াছিল। সেটা তার পাশেই রাখা ছিল। ওটা হাতে নিয়া হামিদ উঠিবার উপক্রম করিল।

মিসেস আলী হামিদের হাত ছাড়িয়া দুই হাতে তার দুই হাটু জড়াইয়া ধরিল। বলিল: আপনার পায় পড়ি ডাক্তার সাব। কেন আমার স্বামীর উপর আপনার এত রাগ আমাকে তা বলতেই হবে। আমার জান দিয়ে হলেও আমি তার প্রতিকার করব। কারণ আপনাকে আমি ছাড়তে পারি না। আপনাকে যেতে দেয়া মানেই আমার স্বামীর আশা ছেড়ে দেয়া। আপনি একটা নারীর দুঃখ বুঝবেন না? আপনি এত নিষ্ঠুর হতে পারবেন।

হামিদ বিরক্ত হইল। বলিল: নিষ্ঠুর হৈতে পারলাম না বৈলাই ত হাতে পাইয়াও আপনার স্বামীকে জিন্দা রাইখা গেলাম। এ কথা জানবার পরেও আমারে আপনি নিষ্ঠুর কইতেছেন?

হামিদের দিকে আরও হেলিয়া পড়িয়া হামিদের হাটু আরও শক্ত হইতে ধরিয়া মিসেস আলী বলিল: আমার অপরাধ হয়েছে। আমায় মাফ করুন। কিন্তু আমার মনের অবস্থার দিকেও আপনি চেয়ে দেখুন। আপনি ছাড়া আমার স্বামীর আর কোনও চিকিৎসক নেই, তা আপনিও জানেন, আমরাও জানি। এটা বুদ্ধিমানী ইশারা। হুয়ুর-পাকের নির্দেশ। তার পরেও আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি? আপনি যদি এতেও দয়া না করেন, তবে আমি সত্য-সত্যই উঠে এসে আপনার পা জড়িয়ে ধরব। চিৎকার করে লোক জড় করব।

হামিদ দেখিল সে আচ্ছা মেয়েলোকের পল্লব পড়িয়াছে। সে শান্ত হইবার চেষ্টা করিল। হাতের ব্যাগটা আবার পাশে নামাইয়া রাখিল। ভাবিল, সে কি পাগলামি করিতেছে না? পাগলামি নয় ত কি? সে যে নিজের মোরাকেবার সাধনার বিরোধী কাজ করিতে যাইতেছে। সেই ত মোরাকেবায়ে-বায়নান্নাস করিয়া ওয়াজেদকে বিদেশ হইতে নিজের কাছে আনিয়াছে। ওয়াজেদ আসিয়াছে এবং তার দয়া ভিক্ষা করিতেছে। অবশ্য ওয়াজেদ নিজে করিতেছে না। করিতেছে তার স্ত্রী। তা একই কথা হইল। সে কি এ অবস্থার সদ্যবহার করিতে পারে না?

চট করিয়া তার মনে একটা কথা পড়িয়া গেল। এলো... এই সোজা কথাটাই তার মনে পড়ে নাই? কি আশ্চর্য! অনেকটা শান্ত হইয়া সে মিসেস আলীর দিকে চাহিল। তার হাত ধরিয়া নিজের হাটু হইতে হাত দুইটি সযত্নে সরাইল। বলিল: শুনতেই যখন চান, তবে বলি। আপনার স্বামীকে খুন করবার জন্যে আজ পাঁচ বছর ধৈর্য্য তারে তালাশ করিতেছি। যত দিন গেছে আমার প্রতিহিংসা তত বাড়ছে, কমে নাই। অবশেষে নিতান্ত ঘটনা চক্রে এবং কল্পনাভীত সুযোগমতোই তারে আজ হাতে পাইছি। কাজেই আমার মনের গতিকটা আপনে বুঝতেই পারতেছেন।

বিনয়-ভক্তিতে গলিয়া গিয়া মিসেস আলী বলিল: আপনি ফতেপুরের বিখ্যাত পীর সাব-কেবলার মতো অলিআল্লার সাহেবদাদা। আপনার অন্তর নিশ্চয়ই তেমনি মহৎ।

আপনার দিলে প্রতিহিংসা থাকতেই পারে না। যদি কোনও কারণে তা থাকেও, তবে সেটা খুব বড় কারণ নিশ্চয়ই। আমি শুনতে পারি না?

হামিদ মিসেস আলীর চোখে-মুখে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল: আপনার স্বামীকে আপনি নিশ্চয় খুব ভালবাসেন?

-জি হাঁ। কেন একথা জিজ্ঞেস কচ্ছেন?

-আপনের স্বামীও নিশ্চয়ই আপনাকে খুব ভালবাসে?

-জি হাঁ, খুবই ভালবাসেন।

-আমি যদি আপনার স্বামীকে খুন করি, তবে আমার প্রতি আপনার মনের অবস্থা কি হবে?

মিসেস আলী মিঠা হাসিয়া বলিল: আপনি কাউকে খুন করতে পারেন না।

হামিদ অনিচ্ছায় সে হাসিতে যোগ দিল। আবার গম্ভীর হইয়া বলিল: ধরেন আমি যদি-না আমি না, যদি কেউ এমন কাজ করে যাতে আপনার স্বামীর ও আপনার মধ্যে চিরকালের জন্য ছড়াছাড়ি হইয়া যায়, তবে আপনার স্বামী তার ক্ষমা করব?

মিসেস আলী: না। ক্ষমা করবেন না। কিন্তু এসব কথা বলছেন কেন আপনি?

হামিদ: এসব কথা কইতেছি এই জন্য যে আপনার স্বামী ঠিক এই কাজটিই করছে। আমি যারে প্রাণ দিয়া ভালবাসি, সেই নারীকেই সে চিরকালের জন্য বন্দী কৈরা রাখছে?

মিসেস আলী: বন্দী করে রেখেছে? কোথায়? কিভাবে? এটা কি সম্ভব?

মুখ বিকৃত করিয়া হামিদ বলে: সম্ভব বৈলাই ত রাখছে।

মিসেস আলী: আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, তাই বলছি। আরেকটু খোলসা করে বলুন।

হামিদ: আপনাকে রাখিয়া নামে কাউকে চিনেন?

-ও-নামের কত মেয়েকেই ত চিনি। কার কথা আপনি বলছেন?

-আপনের স্বামীর ঐ নামে কেউ-কোনও আত্মীয় আছে শুনছেন কখনো?

-জি না।

-আপনাকে বিয়া করবার আগে সে আরেকটা বিয়া করছিল সেটা আপনি জানেন? না, তাও গোপন করছিল?

অন্য কেউ বা অন্য সময় হইলে স্বামীর প্রতি এই ঠেসে মিসেস আলী আপত্তি করিত। কিন্তু আজ হামিদের কোনও কথায়ই আপত্তি চলে না। তাই সহজ সুরে জবাব দিল: না, গোপন করবার কি আছে? সে শাদি ছেলেবেলায় বাপ-মার ইচ্ছেয় হয়েছিল, তা সুখের হয় নি। সে কথা খুলেই বলেছিলেন।

হামিদ বিদ্রূপ করিয়া বলিল: খুইলা বলছেন ঠিকই। কিন্তু এটাও কি খুইলা বলছেন, সে স্ত্রী এখনও বাঁচা আছে?

মিসেস আলী ভেবাচেকা খাইয়া বলিলেন: মেয়েটা বেঁচে থাকতেও পারে, আমি জানি না। কিন্তু আমার স্বামীর স্ত্রী বেঁচে আছে এ কথা বলছেন কেন?

হামিদ কথায় তিক্ততা মিশাইয়া বলিল: বলছি এই জন্য যে সে স্ত্রীকে আপনার স্বামী আজো তালাক দেয় নাই।

মিসেস আলী আশা না ছাড়িয়া বলিল: তালাক দেয় নাই, তা কি করে জানলেন আপনি?

হামিদ কঠোর ভাবে বলিল: জানলাম অতি সহজে। প্রথম স্ত্রী কোর্টে ডাইভোর্সের মামলা করছিল। আপনার স্বামী কন্টেন্ট করছে। মামলায় আপনার স্বামীর জিত হৈছে। হাইকোর্ট পর্যন্ত। আপনাকে এসব কিছু কয় নাই?

স্বামীর দোষ ঢাকিবার আশায় মিসেস আলী বলিল: বলে থাকবেন আমার বাবাকে। এসব ঘটেছে নিশ্চয় আমাদের বিয়ের আগে। তাই বোধ হয় আমাকে বলেন নি। কিন্তু আপনি এতে ইন্টারেস্টেড কি ভাবে? মেয়েটা আপনার কে হয়?

হামিদ তিতা হাসিয়া বলিল: এখনও বুঝেন নাই? সে আমার মাশুকা। আমি তার জন্যে জান দিতে পারি।

একটু থামিয়া যোগ করিল: জান নিতেও পারি। বুঝলেন?

মিসেস আলীর দ্রুত ভাবান্তর হইতেছিল, তার চোখে-মুখে হামিদ স্পষ্ট সে আভাস পাইল। অবশেষে ধরা গলায় বলিল: আমি এসব কিছু জানতাম না, বিশ্বাস করুন ডাক্তার সাব।

হামিদ: আপনাকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু জানলেই বা কি করতেন? এখন জাইনাই বা কি করতে পারেন? কিছু করতে পারেন না। আমিও আপনার স্বামীর চিকিৎসা করতে পারি না। আপনাকে আমার বিশ্বাস করলে কি হবে? আমিই আমার নিজেরে করতে পারি না। নইলে আমি আপত্তি করতাম না। আমি ডাক্তার। আমি জানি, ডাক্তারের দায়িত্ব অতি পবিত্র। এখানে শত্রু-মিত্র নাই। রোগী পাইলে চিকিৎসা করতে আমরা বাধ্য। কিন্তু বললাম ত আপনার স্বামীকে আমি তা পারি না। নিজেরই উপর আমার আস্থা নাই। আমারে আপনি মাফ করবেন।

মিসেস আলী এবার সত্য-সত্যই আসন ছাড়িয়া উঠিল। হামিদের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল: আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পাচ্ছি। আমার সারা অন্তর দিয়ে সহানুভূতি জানাচ্ছি। আমার নিজের পক্ষ ও আমার স্বামীর পক্ষ থেকে আপনার কাছে এবং আপনার মাশুকার কাছে মাফ চাইছি। আমি বুঝতে পেরেছি আমার স্বামীর অপরাধ গুরুতর। কিন্তু তার অসুখটাও গুরুতর। আপনি মহৎ লোক। আপনি তাকেও মাফ করতে পারবেন। আমি হলফ করে বলছি, আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে তালাকনামা নিয়ে দেব। আপনার বিশ্বাস না হয়, আগেই নিয়েদেব। আজই।

আহলাদে হামিদের মন নাচিয়া উঠিল। তার বুকে খুশির শব্দ সে নিজের কানে শুনিতে পাইল। প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছিল, 'হাঁ, তবে এখনি তালাকনামা আদায় কৈরা দেন, তারপর আমি চিকিৎসা শুরু করব', কিন্তু শরাফতের দরুন কথাটা তার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

তার বদলে নিজের অজ্ঞাতেই সে বলিয়া ফেলিল: না, না, আগে নিবার দরকার নাই, আপনার হলফই যথেষ্ট। আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি।

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া মিসেস আলী বলিল: আমার প্রতি এই বিশ্বাসের জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু তালাকটা ত আমি দিব না দিবে আমার স্বামী। মানুষের

মর্জি-মেযাজ কখন কেমন থাকে, বলা ত যায় না কাজেই তালাকটা আগেই নিয়ে রাখা ভাল। আজকাল কাউকে বিশ্বাস নেই।

হামিদ: এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস না কৈরা উপায়ও নাই। চিকিৎসার আগে তালাকনামা আদায় করা তালাকের বৈধতা ও চিকিৎসার সাফল্য উভয় দিক খনেই দোষের হবে।

মিসেস আলী: চিকিৎসা সাফল্যে বিশ্বাস হবে কেন?

হামিদ: এ চিকিৎসার ফিস নেওয়ার কথা নয়, অগ্রিম ত নয়ই। আগে তালাকনামা নিলে সেটা হবে অগ্রিম ফিস আদায়।

মিসেস আলী: আর তালাকটা অবৈধ হবে কেন?

হামিদ: আগে তালাকনামা আদায় কৈরা পরে চিকিৎসা করলে সেটা হবে জবরদস্তি। জোর কৈরা তালাক আদায় করলে আইনের নজরে সেটা টিকব না।

মিসেস আলী: আইন করতে যাবে কে?

হামিদ: ধরুন আপনার স্বামী ভাল হৈয়া উইঠা বললেন, তাঁর অসুখের সময় জোর কৈরা প্রাণের ভয় দেখাইয়া বা ফাঁকি দিয়া তালাকের কাগজে দস্তখত নেওয়া হৈছে। স্বেচ্ছায় দিলে ত তিনি কাযীর অফিসে গিয়া অথবা বাড়িতে কাযী আনাইয়াই তালাক দিতে পারতেন?

মিসেস আলী এক মুহূর্তে অনেক-কিছু ভাবিয়া ও বুঝিয়া ফেলিল। বলিল: তা হলে ত দেখা যাচ্ছে আপনার মতই ঠিক। আচ্ছা তাই হোক।

৪

ডা. হামিদ এই প্রথম বারের মতো বাহিরে গিয়া রোগী দেখিতে কাহিয়াছে। অনেকের কাছেই তাকে এর কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। তার উপর রোজই একবার এই রোগীর বাড়ি যায়।

লোকে ইতিমধ্যে বলাবলি শুরু করিয়াছে: যাইবে না? কত রোগী! কত মোটা ফিস! খানপুরের ঐ বিশাল ঔষধের কারখানাটার চিফ ম্যানেজার, কলিকাতা-ফেল করা রোগী। দৈনিক হাজার টাকা ভিজিট। আফসোস শেষ পর্যন্ত ফতেপুরের পীরজাদার মতো লোকও টাকার লোভে পড়িলেন? গরিবের অল্প খািকল কে? কাউকে বিশ্বাস নাই। মনে-মনে সব বেটাই স্বার্থপর। কাপড়ের নিম্নে সব বেটাই ন্যাংটা।

কিছু-কিছু কথা হামিদের কানেও আসে। সে হাসে। কিছু মনে করে না। কারণ গরিব রোগীদের অসুবিধা না করিয়াই সে মি. আলীর চিকিৎসা করিতেছে। কিন্তু আসল কথা নয়। শুধু পপুলারিটি হারাইবার দিক দিয়ে। তার চেয়ে বড় তার চেয়ে কঠিন জীবন-মরণ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সে নিয়াছে। সুযোগও সে পাইয়াছে। এর সদ্ব্যবহার তাকে করিতেই হইবে। নাউ অর নেভার।

কাজেই হামিদ মি. আলীর চিকিৎসা শুরু করিল অসাধারণ গভীর মনোযোগে। সনাতন পন্থার চিকিৎসা সে করিল না। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তাররা ও-পন্থার শেষ দেখিয়াছেন। ওদিকে হামিদের কিছু করণীয় নাই। সব ভাবিয়া-চিন্তিয়াই সে অভিনব পন্থা ধরিল। হামিদ খান্দানী পীরের ছেলে। পীরগিরি ছাড়িয়াছে ঠিক। কিন্তু নসল ত ছাড়িতে পারে নাই। মানুষ অতীত ঠেলিতে পারে, কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা ভুলিতে পারে না। হামিদও পারিল না। বরঞ্চ এই অল্প বয়সেই, এই কিছু দিনের চিকিৎসা-

ব্যবসায়েই, সে দেখিয়াছে মানুষ আজো বুয়ুর্গিতে বিশ্বাস করে। আশ্চর্য এই যে সে নিজেও করে। মানুষের এই আদি মনটি আগে যেখানে ছিল, আজও সেখানেই আছে। অতএব ক্ষতি কি এক-আধটু হার্মলেস বুয়ুর্গি দেখাইতে? কাকেও প্রবঞ্চিত না করিয়া শুধু কথার দ্বারা যদি মানুষের একটু উপকার করা যায়, তাতে দোষ কি?

তাই আলীর চিকিৎসায় হামিদ খাঁটি চিকিৎসার সাথে একটু বুয়ুর্গির ময়ান দিল। ভড়ং করিল এলোপ্যাথিক, অমুখ খাওয়াইল হোমিওপ্যাথিক, প্রলেপ দিল হাকিমী, পথ্য খাওয়াইল কবিরাজী। প্যাথলজির টেস্ট চলিল সর্বাঙ্গীণ। নিজের পোর্টেবল ই.সি.জি. মেশিনটা আলীর বেড রুমে নিয়া হার্টের পরীক্ষা করিল। আলীদের যে পরিমাণ আস্থা হামিদের উপর হইয়াছে, তাতে মি. আলীর মতো সাহেব-মানুষকে গোবর খাইতে বলিলেও খাইত। কিন্তু সত্য-সত্যই তাকে গোবর খাওয়াইল না। তার বদলে গোচোনা তার বুকে লাগাইল। হামিদ ছেলেবেলা দেখিয়াছে গরম গো-চোনার সেক দিয়া পীর সাহেব অনেক কঠিন-কঠিন লিভারের রোগী ভাল করিয়াছেন। গো-চোনা মানে দুধের বাছুরের সকাল বেলার মুৎ। হামিদ এই দুর্লভ চিজ যোগাড় করাইল। মিসেস আলীর মতো মেম সাহেবকে দিয়া নিজ হাতে তা হিটারে গরম করাইল। আলীর মতো পাক্কা সাহেবের বুক লিভারের উপরে সেক দেওয়াইল। এর পরেও রোগী ভাল না হইয়া যায়? হামিদ হাসিল। উচ্চ শক্তির এক-একফোটা অমুখ দিতে লাগিল তিন দিন ধরে-পরে। কিন্তু সুগার-অব-মিস্কের বড়ি খাওয়াইল মুঠা-মুঠা।

আলীদের জন্য এত ভড়ং এর দরকার ছিল না। কারণ তারা এখন হামিদকে সত্য-সত্যই স্বপ্নে-পাওয়া কুদরতী চিকিৎসক মনে করে। দরকার শুধু তাদের এম. ডি. মি. রশিদের জন্য। রশিদ আগে মাঝে-মাঝে খবর লইত। ইদানিং ঘন-ঘন নেয়। খুশী হইয়াই নেয়। কারণ তার মতে রোগী আশাতীত রূপে আরোগ্য লাভ করিতেছে। আলীরা নাকি হামিদের তারিফে পঞ্চ-মুখ। রশিদ নিজেও

হামিদও জানে রোগী আরোগ্যর পথে চিহ্ন দিনের দিন হইতেই এটা বুঝা যাইতেছে। সত্যই হামিদ সাহেব একটা অসাধারণ ডাক্তার! সবাই বলে।

কিন্তু আসল চিকিৎসার কথা কেউ জানে না। হামিদ ইচ্ছা করিয়াই এটা গোপন রাখিয়াছে। রশিদের কাছে গোপন রাখিয়াছে, সে বিশ্বাস করিত না বলিয়া। আলীদের কাছে গোপন রাখিয়াছে, তারা জানিলে সে চিকিৎসায় ফল হইত না বলিয়া।

তার মানে হামিদ মি. আলীর বাইরের চিকিৎসার সাথে-সাথে তার সাইকোথেরাপিউটিক চিকিৎসা শুরু করিয়াছে। হামিদ জানে এটা তার এক্সপেরিমেণ্ট মাত্র। জানিয়া-বুঝিয়াই সে এই এক্সপেরিমেণ্টে হাত দিয়াছে। আলীর মতোই হামিদেরও এটা জীবন লইয়া খেলা। এই চিকিৎসার সাফল্যের উপর হামিদের সারা জীবনের স্বপ্ন নির্ভর করিতেছে। রোগীকে ভাল না করা পর্যন্ত সে রাযিয়ার তালাকনামা দাবি করতে পারে না। তালাক না পাইলে হামিদ রাযিয়াকে পায় না। রাযিয়াকে না পাইলে হামিদের স্বপ্নের কিল্লা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। হামিদের চিকিৎসার দোষে রোগী যদি মারাও যায়, তবু অবশ্য রাযিয়ার মুক্তি ঘটে। কিন্তু হামিদ সেটা কামনা করিতে পারে না। আর অমনভাবে রাযিয়াকে পাইলে তাতে হামিদের বাঞ্ছিত রাযিয়াকে পাওয়া হয় না। হামিদ আজ আর রাযিয়াকে শুধুমাত্র একটি নারী-সংগী হিসাবে পাইতে চায় না, আবে-হায়াতের মিডিয়ম রূপেই পাইতে চায়।

কাজেই মি. আলীকে তার ভাল করিতেই হইবে। তাই সে এই অসাধারণ পন্থা ধরিয়াছে।

এ চিকিৎসা করে সে টেলিপ্যাথির সাহায্যে। টেলিপ্যাথি চালাইতেছে সে নেসবতে-বায়নান্নাসের সাধনায়। কলিকাতাবাসী ওয়াজেদের উপর নেসবতে-বায়নান্নাস সফল হইয়াছে। এখন একদম বাড়ির কাছের ওয়াজেদের উপর তা সফল না হইবার কোনও কারণ নাই।

প্রথম প্রয়াসের সাফল্যে হামিদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়াছে। নানাজীও বলিয়াছেন, কিতাবেও সে পড়িয়াছে, আত্ম-বিশ্বাসই এ সাধনায় সবচেয়ে বড় দরকারী গুণ। এ ব্যাপারে অধিকতর কাবেলিয়াত ও কামালিয়াত হাসিল করিবার জন্য সে ফতেপুর হইতে আনা আরবী-ফারসী কিতাবগুলি আরও মন দিয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে সর্বাধুনিক পশ্চিমা চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য নিউ মেথড-অব-সাইকোথেরাপিউটিক্স সম্বন্ধে কয়েকখানা ইংরাজি বইও কিনিয়া পড়িয়াছে।

হামিদ রোগীর রাত্রের ঘুমের খবর রাখে ঘন্টা-মিনিট ধরিয়া। মি. আলীর ঘুমন্ত অবস্থায় তার রুহের উপর নিজের রুহকে প্রজেক্ট করে। মি. আলীর ঘুমের নির্ধারিত সময়ের বেশ পরে সে নিজে শুইতে যায়। শুইবার আগে সে মোরাকেবায় বসে। নিজের উইল ফোর্সকে রোগীর উইল ফোর্সে প্রজেক্ট করিবার জন্য ধ্যানস্থ হয়। রোগীর অবচেতন মনে চিকিৎসকের এই ইচ্ছা-শক্তি, মানে ভাল হইবার আশা, সৃষ্টি হইয়া গেলেই রোগীর নিরাময় শুরু হইবে, এটাই সাইকোথেরাপিউটিক্সের মূল কথা। আবশ্যিক পরিমাণে এই ইচ্ছা-শক্তির সৃষ্টি দ্বারা দেহের যে কোনও রোগ সারা যায়। কারণ দেহের সব রোগই গোড়ায় মনের রোগ। হামিদের জন্য এটা প্রথম পরীক্ষা। কাজেই সে প্রথম-প্রথম রোজই মোরাকেবায়-বায়নান্নাসে বসিত। প্রতি রাত্রে টেলিপ্যাথিতে নিজের রুহকে আলীর রুহে প্রজেক্ট করিবার তরকিব করিত। দুই-এক দিনের মধ্যেই রোগীর মধ্যে সুস্পষ্ট আরোগ্যের লক্ষণ দেখিয়া এখন সে মাঝে-মাঝে মোরাকেবায় বসে। আলীরা ও রশিদ জানে হামিদের ঔষধেই রোগ সারিতেছে। সারিবে না? কি সব ঔষধ পড়িতেছে? আর পথ্য? তারও ত লাগাড় মরে না। দশ বছরের পুরান চাউলের জাউ ভাত কাঁচা পটল পাতা ও শুকনা নালিতা পাতার সুরুয়া, হরিতকি ও ছাগলের দুধ। ভাল হইবে না আবার!

কিন্তু আশ্চর্য এই যে রোগীর আরোগ্যের সাথে-সাথে ডাক্তারের স্বাস্থ্যেরও বিস্ময়কর উন্নতি হইতেছে। এটা কি? সবাই এ কথা বলে।

কিন্তু হামিদ নিজে তা লক্ষ্যও করে নাই। বিশ্বাসও করে না। হামিদ জানে আলীর চিকিৎসায় তার সাফল্যের অগ্রগতি এবং তার ফলে রাযিয়া লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনাটাই হামিদের চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেটাকেই লোকেরা তার স্বাস্থ্যোন্নতি মনে করিতেছে। হামিদের আবার স্বাস্থ্য ভাল হইবে কি? তার স্বাস্থ্য ত সম্পূর্ণ ভাল আছেই। তার কোনও রোগ নাই। কোনও প্রকারের শেকায়েতই ত নাই তার। ওটা কিছু না।

আম্মা নিজেই যেদিন খুশিতে আটখানা হইয়া হামিদের কথা বলিলেন, সেদিন হামিদ আর কথাটায় উপেক্ষা করিতে পারে না। প্রথমে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে বসিয়া চোখ-মুখ টিপিয়া-টিপিয়া দেখিল। অবশেষে গোসলের সময় বাথরুমের

লম্বা আয়নার সামনে নিজের নগ্ন দেহের আগা-গোড়া একাধিকবার ডাক্তারী নজর বুলাইল। সর্বাংগের পেশী-স্নায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিল। হাসিল। হাঁ, সত্যই উন্নতি হইয়াছে। পরে প্যাথলজিক্যাল টেস্টেও সেটা প্রমাণিত হইল। হামিদ বিশ্বাস করিল। খুশী হইল। কিন্তু কারণ বুঝিল না।

এমন সময় একদিন বই পড়িতে-পড়িতে দেখিল এক জায়গায় লেখা আছে রুহানী চিকিৎসায় রোগীর সাথে-সাথে ডাক্তারেরও স্বাস্থ্যের উপকার হয়। এটা রুহানী কুওতেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই জ্ঞান লাভ করিয়া হামিদ খুশী হইল খুব। বিস্মিত হইল আরও বেশি।

বার দিনের মাথায় এটা জানাজানি হইয়া গিয়াছে যে মি. আলী এখন সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে। এতদিনের দুর্বলতা কাটিতে যা সময়ের দরকার। সবাই খুশী। এম. ডি. মি. রশিদ ও কোম্পানির বড়-বড় অফিসার এমন কি ডাক্তাররা পর্যন্ত হামিদকে কংগ্রেচুলেট করিয়াছেন। কেউ টেলিফোনে। অনেকেই দেখা করিয়া। মি. আলী এখন স্বাভাবিক পথ্যাদি ধরিয়াছে। সকালে-বিকালে বারান্দায় বসিয়া হাওয়া খায়। বই ও খবরের কাগজ পড়ে। মিসেস আলী ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবীর সাথে আলাপও করে। আগে ধরিয়া বারান্দায় আনা-নেওয়া করা হইত। এখন আস্তে-আস্তে নিজেই যাওয়া-আসা করিতে পারে।

হামিদ সেদিন শেষ দিনের মতো আসিয়াছে। বলিয়াছে, তার আর আসার দরকার নাই। কাল হইতে সে আর আসিবে না। মিসেস আলী নিজ হাতে তাঁ বানাইয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইয়াছে। স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে। মিসেস আলী সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিয়াছে। গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ান হামিদের বাড়ি পর্যন্ত আসিয়াছে। কৃতজ্ঞতার কথা বারে-বারে উচ্চারণ করিয়াছে। পিঠের চামড়া দিয়া জুতা বানাইয়া দিলেও হামিদের কাছে তাদের দেনা শোধ হইবে না ইত্যাদি কত কথা কত রকমে বলিয়াছে।

কিন্তু হামিদ সর্বক্ষণ যে কথাটা শুনিবার জন্য উৎকর্ষ হইয়া আছে, সে কথাটা মিসেস আলীর মুখ দিয়া একবারও বাহির হয় নাই। সেটা মিসেস আলীর হলফ-করা ওয়াদার কথা। রাযিয়ার তালাকনামাটার কথা। মিসেস আলী সে কথা বলে না কেন?

বস্তুত: শুধু আজই নয়। এই কথাটা শুনিবার জন্য হামিদ গত চার-পাঁচ দিনই উৎকর্ষ হইয়া আছে। কারণ চার-পাঁচদিন আগেই সকলে নিশ্চিত জানিয়াছে, রশিদ সাহেব বলিয়াছে, হামিদ স্বীকার করিয়াছে মি. আলী রোগ-মুক্ত হইয়াছে। আর-আর দিন বলে নাই কেন? বুঝিলাম শেষ দিনের জন্য রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ? আজ কেন বলে না? মিসেস আলীকে কৌশলে স্বরণ করাইবার মতলবে হামিদ তিন-তিনবার রিপট করিয়াছে আজই তার শেষ আসা, তার আসার আর দরকার নাই, কাল আর সে আসিবে না। গাড়িতে উঠার আগে পর্যন্ত হামিদ প্রতি সেকেণ্ডে আশা করিয়াছে এই বুঝি মিসেস আলী কথাটা বলিল। কিন্তু বলে নাই। গাড়িতে বসিয়া স্টিয়ারিং হুইলে হাত দিবার পরেও হামিদ আশা করিতেছিল এই বুঝি মিসেস আলী বলে: 'ওহো, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।' হামিদ মিসেস আলীর দিকে চাহিয়া থাকিল। কিন্তু মিসেস আলী কিছুই বলিল না। অবশেষে হামিদ যখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়া ডান হাত খানালার বাহিরে নিয়া বলিল: 'আচ্ছা, আসি তবে খোদা হাফেয' তখনও মিসেস আলী

মিষ্টি হাসিতে হামিদকে কৃতার্থ করিয়া বলিল: খোদা হাফেয। আর কিছু বলিল না। শুধু হাত নাড়িয়া নাড়িয়া হামিদকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল।

গাড়ি চালাইতে হামিদ অনেক কথা ভাবিল। মিসেস আলী ব্যাপারটা এমন ভুলিয়া গেল কেমন করিয়া? মিসেস আলী ত ভুলার মেয়ে নয়। না ভুলিয়া থাকিলে আর দুইটা সম্ভাবনা আছে। এক. মিসেস আলী নিজেই ফাঁকি দিয়াছে। দুই. মি. আলীর নিকট হইতে সে তালাকনামা আদায় করিতে পারে নাই। ফাঁকির কথাটাকে হামিদ আমল দিল না। মিসেস আলীকে ফাঁকিবাজ মেয়ে মনে হয় না। ফাঁকি দিবার মধ্যে তার কোনও স্বার্থ নাই। বরঞ্চ তালাক আদায়ের মধ্যেই তার নারীর স্বাভাবিক স্বার্থ আছে। তা'ছাড়া বিনা কারণে কেউ কাউকে ফাঁকি দিতে পারে, হামিদ এটা বিশ্বাস করে না। তা হইলে তালাকনামাটা সে আদায় করিতে পারে নাই। এইটাই সম্ভব। কিন্তু সে কথা মিসেস আলী হামিদকে বলিবে না কেন? কারণ এই হইতে পারে যে স্বামীর কাছে সে হারিয়া গিয়াছে নিজের এই দুর্বলতাটা প্রকাশ করিতে চায় না। কোনও নারীই বোধ হয় চায় না।

কিন্তু মি. আলীই অসম্মত হোক, আর মিসেস আলীই ফাঁকি দেউক, ফল হামিদের বরাতে একই। হামিদের এতদিনের বেহেশতী স্বপ্ন আল নাস্কারের কিন্নায় পর্যবসিত হইল। এতদিন সে কি তবে হাওয়ায় বালাখানা নির্মাণ করিতেছিল? সে কি সেটাই এত নির্বোধ? মিসেস আলীকে বিশ্বাস করিয়া, না না, মিসেস আলীর কথা না রাখিয়া, সে কি ভুল করিয়াছে? সে ভুলের পরিণাম কি সাংঘাতিক! হামিদের যথায় এটা আসমান ভাংগিয়া পড়া। চোখের সামনে এতদিনের নির্মিত প্রাসাদ ধূসর পড়া। এত কালের সাজানো বাগিচা জুলিয়া থাক হইয়া যাওয়া। অতএব আজ হামিদের জন্য চরম বিপর্যয় পরাজয় ও নৈরাশ্যের দিন।

বিপদ যত বড় হয় হামিদের জিদ ততো বেড়ে। এটা হামিদের সাম্প্রতিক মনোভাব। আগেও হামিদ বিপদে ঘাবড়াইত না, ভয় পাইত না। শুধু স্বেচ্ছায় স্থানু হইয়া পড়িত। কিন্তু এখন স্থানু হয় না। বরঞ্চ গতিশীল হয়। আজও হইল। না, এলাইয়া পড়িলে চলিবে না। বীরত্বের সংগে এর মোকাবিলা করিতে হইবে।

হামিদের গাড়ি ক্লিনিকের সামনে থামিল। সহকারী ও রোগীদের সামনে নিজের পরাজয় গোপন করিবার চেষ্টায় প্রয়োজনাতিরিক্ত হাসিমুখে ক্লিনিকে ঢুকিল এবং বিলম্ব না করিয়া রোগী দেখায় লাগিয়া গেল। কাজের মধ্যে ডুবিয়া ব্যাপারটা তাকে ভুলিতেই হইবে।

মাত্র গোটা দুই রোগী দেখা শেষ হইয়াছে, এমন সময় চাপরাশীর বদলে কম্পাউণ্ডার হামিদের চেম্বারে মাথা ঢুকাইয়া বলিল: এক লেডি স্যারের সাথে দেখা করতে আসছেন।

চাপরাশীর বদলে কম্পাউণ্ডারের আসা ভিজিটরের উচ্চতার প্রমাণ। কাজেই হামিদ বলিল: নিয়া আস লেডিকে।

ঢুকিল মিসেস আলী। একা। যে নির্বুদ্ধিতা ও পরাজয়ের গ্লানিটা ভুলিবার এত চেষ্টা হামিদ করিতেছে, সেটাই স্মরণ করাইয়া দেয় এই মহিলা। তাই হামিদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল রাগ। কিন্তু সে রাগকে ঠেলিয়া পিছনে ফেলিল বিষ্ময়।

হামিদ বিশ্বয়ে তার দিকে চাহিল। কিন্তু তার মনের কোণ হইতে কুহকিনী আশা বিশ্বয় ছাপাইয়া উঠিল। অব্যক্ত পুলকে হামিদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মিসেস আলী হামিদের এই মুহূর্মুহ মনোভাব পরিবর্তন উপেক্ষা করিয়া বিনয়-নম্রতার প্রাণহরা হাসি হাসিয়া বলিল: আপনার কাছে অতিগোপনীয় দুটো কথা বলতে এসেছি। এর চেয়ে গোপনীয় জায়গা আছে?

হামিদ দুড়দুড়া বুকে মিসেস আলীকে লইয়া ভিতরের বারান্দা কোঠায় গেল। মিসেস আলী ডাইনে-বাঁয়ে চাহিয়া বলিল: হাঁ, এটা বেশ জায়গা।

উভয়ে বসিল। মিসেস আলী বিনা-বাক্যে ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে একটি লম্বা খাম বাহির করিল। হাসি-মুখে হামিদের দিকে খামটি বাড়াইয়া বলিল: এটি আপনার বাড়ি বয়ে দিয়ে যাবার আশায়ই তখন দেই নি। দিলে এখনকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম। সেটা বেআদবিও হত।

এতক্ষণ অসহ্য উদ্বেগে লটকাইয়া রাখার দরুন হামিদের রাগ হইল খুবই। কিন্তু যে বস্তুর জন্য তার এত কালের সাধনা তা দেখিবার কৌতূহলাগ্রহ হইল তার চেয়ে বেশি। তাই মুখে কিছু না বলিয়া উত্তেজনা-কম্পিত হাতে খামটা লুফিয়া লইল। মিসেস আলীর সামনে উত্তেজনা গোপনের চেষ্টা না করিয়া তেমনি কাঁপা-হাতে খামটি খুলিল। একটি বড় কাগজ বাহির হইল। সেটির আগাগোড়া উপর-নিচ আইনে বাঁয়ে চোখ বুলাইল।

এ ধরনের কাগজ হামিদ জীবনে আর দেখে নাই। তবে হ্যাঁ, সত্যিই তালাকনামা বটে। কাযীর আফিসের ছাপা ফর্ম। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সিলমারা সই-করা। এক কলামে ওয়াজেদ আলীর নাম মৃত পিতার নাম ঠিকানা আরেক কলামে রাখিয়া খাতুনের নাম মৃত পিতার নাম ঠিকানা লেখা রহিয়াছে। ওয়াজেদ আলী বিবি ময়কুরার অমতে দ্বিতীয় বিবাহ করায় উভয়ের অবগৎ হওয়াতে সে স্বৈচ্ছায় সজ্ঞানে বিবি মওসুফাকে তিন তালাক বায়েন দিয়াছে। আজ হইতে বিবি ময়কুরা ওয়াজেদের যওজিয়ত হইতে সম্পূর্ণ আযাদ হইলেন। তাঁর অন্যত্র বিবাহ-শাদি করিয়া পুত্রকণ্যসহ সুখে দিন গুয়রান করিতে ওয়াজেদ কোনও আপত্তি করিতে পারিবে না। করিলে আইনে অগ্রাহ্য।

শেষ কথা কয়টি পড়িতে-পড়িতে হামিদের ঠোঁটের কোণে হাসি আসিল। কয়েকবার পড়িল। ওয়াজেদ আলী সই করিয়াছে। ওয়াজেদ আলীর হাতের লেখা হামিদ চিনে না। তবু নিশ্চয়ই এটা ওয়াজেদেরই সই।

এদিককার চিন্তায় হামিদ এতক্ষণে সম্পূর্ণ শান্ত। এইবার সে মুখ তুলিয়া মিসেস আলীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল: এটা কখন করলেন? কেমন করলেন?

মিসেস আলী: ওতে ত তারিখ আছে। তা দেখেন নি?

যে উত্তেজিত ব্যস্ততার মধ্যে হামিদ ওটা পড়িয়াছে, তারিখ দেখিবার কি তার সময় ছিল? এবার দলিলটার দিকে ভালরূপ নজর করিয়া দেখিল। সত্যিই ত দুইবারে দুই জায়গায় তারিখ দেওয়া। একবার ওয়াজেদ আলীর দস্তখতের নিচে। আরেকবার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দস্তখতের নিচে। এ ত আজকার তারিখ নয়। বেশ কিছুদিন আগের। হামিদ মনে-মনে হিসাব করিয়া দেখিল চিকিৎসা শুরু করিবার চতুর্থ দিনে।

কি আশ্চর্য! বিশ্বয়-কৌতূহল হামিদের পুলকানন্দকে অধিকতর মুখর করিয়া তুলিল। প্রশংসমান দৃষ্টিতে মিসেস আলীর দিকে চাহিতেই মিসেস আলী বলিল: আমায় মাফ করবেন ডা. হামিদ, আমি আপনার আদেশ মানতে পারিনি। আলী অসুখ সারা-তক অপেক্ষা করার সাহস আমি পেলাম না। আমার স্বামীকে আমি চিনি। আমি তার নিন্দে করছি না। সাবধান হয়েছি মাত্র।

হামিদের বিশ্বয় তখনও কাটে নাই। সে বলিল: কিন্তু ম্যারেজ রেজিস্ট্রার দিয়া ফর্মাল ডকুমেন্ট করবার বুদ্ধি আপনারে কে দিল?

মিসেস আলী সগর্বে হাসিমুখে বলিল: কেউ দেয় নি। আমি নিজেই ও-বুদ্ধি করেছি। আপনার মনে আছে? আপনি বলেছিলেন রোগীর ঐ অবস্থায় কোনও তালকের কাগযে সই নিলে ভাল হয়ে সে তা অস্বীকার করতে পারত। বলতে পারত স্বৈচ্ছায় দিলে ত কাযী ডাকিয়েই তা করতে পারত। ঐ কথা থেকেই আমি পথের সন্ধান পেলাম। যেদিন বুঝতে পারলাম আলীর অবস্থা আরোগ্যের দিকে, সেদিন আর দেরি করলাম না। রোগীর শিয়রে কালামুল্লা পড়াবার ছুতা করে কাযী সায়েবকে আনালাম। তাঁকে মনের কথা বললাম। ভাল নয়রানা দিয়ে তাঁকে রাযী করলাম। খাতা-পত্র আনবার জন্য গাড়ি করে তাঁকে ফের বাসায় পাঠালাম। তারপর যা হল, তা ত দেখতেই পাচ্ছেন।

হামিদের চোখে-মুখে মিসেস আলীর তারিফ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। পুলক-গদগদ গলায় বলিল: ওদিককার কথা ত বুঝলাম। কিন্তু আপনার স্বামীকে রাজি করলেন কেমনে? তা ত কইলেন না।

মিসেস আলী হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল: ও-কথা শুধু জিগ্গেস করবেন না। ওটা আমাদের ট্রেড সিক্রেট। আমাদের মানে নারীজাতির। কোন স্বামীকে কি মন্ত্র দিয়ে বাধ্য করতে হয়, তা না জানলে আমাদের চলত না। সব নারীই তা জানে। রাযিয়া বেগমও জানেন। খোদা-খোদা করে আপনার চার হাত এক হোক, তার পর টের পাবেন।

হামিদের রোমাঞ্চ হইল। বলিল: তা আপনার ট্রেড সিক্রেট নাই বললেন। কিন্তু এত সব হে-হাংগামা? এসবের কোনও দরকার ছিল না। তবু আমার জন্য অতটা করলেন। সেজন্য আপনার আন্তরিক ধন্যবাদ।

মিসেস আলী হাতের ধাক্কায় হামিদের ধন্যবাদটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল: ওটা আপনার ভুল ডা. হামিদ। ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য নয় আপনার প্রাপ্য। কারণ কাজটা করেছি আপনার কথাতেই, কিন্তু আপনার জন্যে করিনি। করেছি সম্পূর্ণ নিজের জন্য। আমরা নারীরাও স্বামীতে শরিক বরদাশত করতে পারি না। যেদিন আপনার মুখে জানতে পারলাম আমার স্বামীর আরেক স্ত্রী আছে, সেদিন থেকেই আমার নারী-মন যে ক্ষেপে গিয়েছিল, তালাকনামা না পাওয়া পর্যন্ত আমার মন শান্ত হয়নি। চোখে ঘুম হয় নি। আমি জানতাম, আমার স্বামী আমাকেই ভালবাসে, রাযিয়া বেগমকে নয়। তবু আমার মন বুঝ মানেনি। কেন মানেনি জানেন? ইচ্ছে করে তাকে তালাক যখন দেয় না, তখন রাযিয়া বেগম ওর মগজে নিশ্চয় একটা বাসা বেঁধেছে, তা দুষ্ট রূপেই হোক আর দুষ্মন রূপেই হোক। ওটা শয়তানের বাসা। ও-বাসা না ভাংগা পর্যন্ত আমাদের

দাম্পত্য জীবন নিরাপদ ছিল না। কাজেই বুঝলেন আপনার জন্যে ও-কাজ করিনি? করেছি নিজের স্বার্থে। আর এই খবরটা আপনি না দিলে আমি গুনতাম না কোনোদিন। সেজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন।

হামিদ মহিলার সরলতায় খুশী হইল। বলিল: আর সেই ধন্যবাদটা দিলেন কিনা আমারে এতক্ষণ ধৈর্য উদ্বেগে লটকাইয়া রাইখা। ওঃ এই সময়টা আমার যে কিভাবে কাটছে! আপনার সম্বন্ধে কত কুখ্যাতি যে ভাবছি! হাতে-হাতে দিবার জন্য না হয় এখানেই আসতেন। কিন্তু কানে-কানে একটু বৈলা দিলেই ত পারতেন?

মিসেস আলী দুষ্টামিপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল: তা করলে আপনি এত সুখ পেতেন না। আমরা নারীরা পুরুষকে এমন করেই বিলম্বিত আনন্দ দিয়ে থাকি। বুঝলেন কিছু?

সোনার রিস্টওয়াচটার দিকে চাহিয়া ব্যস্ততা দেখাইয়া বলিল: হ্যাঁ, এইবার উঠি। অনেকক্ষণ ধরে আপনার অনেক রোগী বসিয়ে রেখেছি। আর লম্বা পরে দেখা হবে। খোদা হাফেয।

হামিদকে আর কোনও কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া মহিলা হামিদের চেম্বার-অফিসের অলি-গলি নিতান্ত চিনা মানুষের মতোই সহজে পার হইয়া হন-হন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে হামিদ হাতের কাগজটির দিকে আবার চাহিল। কাগজটির সব লেখা সোনার হরফে তার চোখে ভাসিতে লাগিল।

হাঁ, এই কাগজটি সত্য-সত্যই রাযিয়ার আযাদি-নামা। এটা শুধু রাযিয়াকেই বন্ধন-মুক্ত করে নাই। হামিদকেও আবে-হায়াতের ফুয়ারার দেশে উড়াইয়া নিতেছে। হাঁ, এটা হামিদের হাতে সোলেমানী আংটি।

কাগজটিকে বুকে-চোখে ও ঠোঁটে লাগাইয়া চুমা দিল। তারপর সযত্নে খামে ভরিয়া আরেকটা চুমা দিয়া সাবধানে পকেটে পুরিল।

অনির্বাক শিখা

১

সোলেমানী আংটি হাতে পাইয়া হামিদ সত্যই হাওয়ায় উড়িতে লাগিল। কিন্তু মাত্র একদিন। তার পরেই সে বাস্তবের জমিনে পড়িয়া গেল। আবে-হায়াতের ফোয়ারার দেশে পৌছিল না। রাযিয়া কোথায় আছে, তাই ত সে জানিতে পারিল না।

অথও মনোযোগে আবার মোরাকেবায় বসিয়া হামিদ দুই-দুইটা রাত কাটাইল। আশ্চর্য! অপরের ধ্যান আসে। কিন্তু হামিদের আত্মার আত্মা যে রাযিয়া তার ধ্যানটা আসে না।

সে কিতাব লইয়া বসিল। এই ত কেতাবেই ত লেখা আছে: আশেকে-মাশুকে নেসবতে-বায়নান্নাস হয় না। রুহ যাদের পৃথক টেলিপ্যাথি হইতে পারে শুধু তাদের মধ্যে। খাঁটি আশেক-মাশুকের রুহ ত আসলে এক। এক রুহের মধ্যে টেলিপ্যাথি হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

তবেই একমাত্র উপায় জাহানারা। সত্য বটে রাযিয়া-হামিদের প্রেমের আকাশে জাহানারা একটা দুষ্ট গ্রহ, একটা শনি। তাদের এশকের মধ্যে জাহানারা এক দলা বিষ। তবু হামিদের এই শনিরই পূজা করিতে হইবে। বিষ দিয়াই বিষের চিকিৎসা করিতে হইবে। বিষস্য বিষমৌষধম্; সিমিলিয়া সিমিলিয়াস কিউরেন্টুর। ধন্য হোমিওপ্যাথি!

জাহানারাকে টেলিফোনে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিল। ব্যর্থ হইয়া টেলি করিল। জবাব না পাইয়া এক্সপ্রেস চিঠি লিখিল। জাহানারা আসিল না। তার বদলে আসিল রশিদ। ঝড়ের বেগে। এর মধ্যে রশিদ আরও কয়বার আসিয়াছে। কিন্তু আজকার মতো আর আসে নাই। আর-আর বার আসিয়াছে মি. আলীর চিকিৎসার জন্য হামিদকে ধন্যবাদ দিতে। ফিস অফার করিতে। হোমিও লেবরেটরির কন্সট্রাকশন দেখিবার অনুরোধ করিতে। কিন্তু আজ আসিয়াছে যেন ঝগড়া করিতে।

চেয়ারে ঢুকিয়াই সশব্দে পিছনে দরজাটা বন্ধ করিয়া বসিতে-বসিতে বলিল: এসব কি গুনলাম?

হামিদ হাসিমুখে বলিল: আপনি কোথায় কি গুনলেন, তার আমি কি জানি?

রশিদ: এই যে মি. আলীর চিকিৎসার ব্যাপারটা?

হামিদ: কেন, মি. আলীর কি হৈছে? রিলাপস্ করছে নাকি?

রশিদ: দেখ হামিদ, না বুঝবার ভান কৈর না। তাঁরা সব কথা আমাদের কৈয়া দিছেন।

হামিদ: কি কইছেন?

রশিদ: তুমি যা-যা করছ সব কৈয়া দিছেন।

হামিদ: আপনি না কৈলে আমি বুঝুম কেমনে, তাঁরা কৈছেনই বা কি, আর আমি করছিই বা কি?

রশিদ: তুমি পীরগিরি করছ। খাবে তুমি তাঁরারে দেখা দিছ। মেডিক্যাল ব্যাগ হাতে নিয়া তাঁরার কলিকাতার বাসায় গেছ। মি. আলীরে একযামিন করছ। তারপর কইছ: তাঁর চিকিৎসা ওখানে চলব না। এখানে আসতে হৈব।

হামিদ: তাঁরা এসব খাবে দেখছেন কইলেন?

রশিদ: আরে না না তাঁরা কি তাই কয়? আমি কত কইলাম: ওটা খাব। তাঁরা কয় তুমি সশরীরে গেছিলা। রাত তিনটায় গেছিলা তাও কয়। একজন কয়, আরেকজন সমর্থন করে। খাব হৈলে দু'জন এক সংগে একই খাব দেখে কেমনে?

ব্যাকুল দুষ্টিভ্রায় হামিদের বুক কাঁপিতে থাকে। প্রশ্ন করে: আর কিছু কইলেন?

রশিদ: অনেক কথা কইলেন। ওটা যে খাব না, খানকা শরিফের হুয়ুর-পাকও তাই কইছেন। তাই তাড়াহুড়া কৈরা তাঁরা চৈলা আসছেন।

হামিদের দুষ্টিভ্রা তখনও দূর হয় নাই। তাই জিগাইল: তার পর?

রশিদ: তারপর এখানে আইসা হাতে-হাতে প্রমাণ পাইলেন। তোমার তাঁরা চিনতেনও না। কলও দেন নাই। অথচ তুমিই গেলা চিকিৎসা করত। দেখামাত্র দুজনেই চিইনা ফেললেন। সেই চোহারা। সেই ব্যাগ। সবই হুবহু মিলে। তাঁরপর কি কি অদ্ভুত ধরনের অমুখ-পত্র দিলা বা না দিলা, রোগী পুনর দিনে খাড়া হৈয়া অফিসে জয়েন করলেন।

হামিদ বিস্মিত হইয়া বলিল: কি বললেন? মি. আলী অফিসে জয়েন করছেন? কবে থনে? আমাদের কিছু কন নাই ত। কি অন্যায়।

রশিদ: আজ থনেই। আমিও কম বকি সাই। আজ বিকালে তোমার কাছে আসবেন। তোমারে দাওয়াৎ করতে। তখন তোমার উপদেশটি তারেই দিও। আমার কিন্তু মনে হয় সত্যই সাইরা গেছেন। শুধু সারেন নাই, আগের চেয়ে যেন বেশি স্বাস্থ্যবান হৈছেন। আশ্চর্য।

হামিদ: আমরা দাওয়াত করবার বুদ্ধিটা বুঝি আপনেই তাঁর মাথায় ঢুকাইছেন?

রশিদ: আমার বলা লাগে নাই। এটা তারারই বুদ্ধি। চারটা ডালভাত দিয়া তোমার দস্ত-মোবারক না ধোওয়াইলে নাকি তারার আখের বান্ধা থাকব। তোমারে তাঁরা কামেল পীর মাইনা নিছেন।

হামিদ: তারার আর দোষ কি? আপনেই ত কইলেন আমি পীরগিরি ধরছি।

রশিদ: তুমিই কও এটা পীরালি বুয়ুর্গি ছাড়া কি?

হামিদ: আমি এটায়ে চিকিৎসাই কই। এর নাম সাইকোথিরাপিউটিক্‌স্। এতে যে রোগ সারে, তা ত আপনে নিজেই কইলেন।

রশিদ এবার রাগিয়া গেল। বলিল: কত তুচ্-তাকেই ত কত রোগ সারে। তাই বৈলা তুমি একটা বিলাত-ফেরতা ডাক্তার চিকিৎসা থুইয়া তুচ্-তাক্ বরবা?

হামিদ: সাইকোথিরাপিউটিক্‌স্‌রে যদি আপনে তুচ্-তাক্ কন, তবে ত হোমিওপ্যাথিরেও তা কৈতে পারেন।

রশিদ: হোমিওপ্যাথি একটা রিকগনাইজড সিস্টেম। আমি তার কথা কই নাই। আমি কইতেছি তোমার ঐ পলিপ্যাথিক চিকিৎসার কথা।

হামিদ বিশ্বয়ে বলিল: কি কইলেন? পলিপ্যাথিক? ওটা আবার কি?

রশিদ: তুমি মি. আলীরে যে চিকিৎসাটা করলা ঐটা। পলিপ্যাথি মানে বহুপ্যাথি। এই ধর এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, সাইকোপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, হাকিমীপ্যাথি, কবিরাজীপ্যাথি, সিমপ্যাথি ও এন্টিপ্যাথি, সব গুলিরে এক পীরালির খলে পিইষা তুমি যে অপূর্ব খিচুড়িপ্যাথি ট্রিটমেন্টটা করলা। তাও আমি বরদশত করছি। কারণ রোগী তুমি ভাল করছ। সে প্রশ্নও আমি করি নাই। আমি জানতে চাই তুমি চিকিৎসার আগে ঐ যে ব্যুর্গিটা করলা, কলিকাতার বাসায় গিয়া স্বামী-স্ত্রীরে যে একই স্বপ্নটা দেখাইলা, ওটা তোমার কোন্ প্যাথি?

হামিদ হাসিয়া বলিল: আপনার অনুমান ঠিক। ওটা টেলিপ্যাথি।

রশিদ: টেলিপ্যাথিটা আবার কি?

হামিদ: নেস্বতে-বায়নান্নাস। আসলে ওটা নেস্বতে-বায়নাল আরওয়া। রুহের সাথে রুহের বাত-চিৎ আর কি?

রশিদ: তার মানেই ওটা মারফতী। পীরালি ব্যাপার। আমি ঠিক ধরি নাই?

হামিদ: জ্বি না। ওটা পীরালি না, বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। রুহ মানুষের সার্ভজেকটিভ মাইণ্ড; অবচেতন ভাবুক মন। বিষয়ী মন, অব্জেকটিভ মাইণ্ড, থনে ওটা সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।

ডান হাতটা উঁচা করিয়া রশিদ বলিল: দোহাই আমার তুমি থাম। ও সব জটিল কথায় আমার মাথাটা গুলাইয়া দিও না। তোমার মনোভা তেজী মাথা থাকলে ত ডাক্তারিটাই পাশ কৈরা ফেলতাম।

হামিদ হাসিয়া বলিল: আপনি ডাক্তারি পাশ করলে এত-এত পাশকরা ডাক্তারেরে চাকরি দিত কে?

রশিদ: এটা ত হৈছে শুধু বরাত গুণে। আমার এতে কৃতিত্বটা কি? চাচাজীর একটা ছেলে থাকলে আমার কপালে ভাতই জুটত না।

হামিদ: কেন? আপনার বাবার না এতে আট আনা অংশ ছিল? সেটা ত আপনি পাইতেনই।

রশিদ হাসিয়া বলিল: তোমারে ত কইছি আমার বাবা মারা যান আমারে শিশু থুইয়া। চাচাজীই আমারে পালছেন। লেখাপড়াও শিখাইছেন তিনিই। ব্যবসাও চালাইছেন তিনিই। তাঁর একটি ছেলে থাকলে এর এক-আধলাও আমি পাইতাম না, ইটা তুমি বুঝ না?

হামিদ: চাচাজীর কি কোনও মেয়ে ছিল না তবে?

রশিদ আবার হাসিল। বলিল: হাঁ মেয়ে ছিল একটা। আমার কারবার বংশের বাইরে চৈলা না যায়, সেই উদ্দেশ্যে চাচাজী তার বিয়া দেন আমার মেয়ের বয় তখন সাত। আমার তখন ষোল।

হামিদ বিশ্বয়-আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বলিল: ও তা হৈলে আপনি বিবাহিত রশিদভাই? ভাবী সাব কই?

রশিদ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ডান হাতের শাহাদৎ আংগুলটায় উপরের দিকে ইশারা করিয়া বলিল: ঐ খানে।

হামিদের মুখে বিষাদ দেখা গেল। রশিদ তা লক্ষ্য করিয়া বলিল: তোমার দুঃখ করবার কিছু নাই। বিয়া করছিলাম বটে, কিন্তু বিবাহজীবন বলতে আমার কিছু ছিল না। সে ছিল আধ-পাগলা মৃগী রোগী।

হামিদের মুখে বিশ্বয়-বিরক্তি দেখা গেল। বলিল: চাচাজী এমন কাজটা করলেন?

রশিদ: তাঁর দোষ নাই। যখন বিয়া দেন, তখন ঐ রোগ বুঝা যায় নাই। পরে মেয়ের চিকিৎসায় তিনি অনেক টাকা খরচ করেছেন। কিছুতেই যখন ভাল হৈল না, তখন তিনি আমার আরেকটা বিয়ার চেঁটাও অনেক করেছেন। আমিই রাজি হই নাই। আমার মধ্যে তত দিনে ঐ পরিবর্তন আইসা পড়ছিল যা তোমরা কলেজে দেখছ।

হামিদ: আচ্ছা রশিদ ভাই, আপনি বিয়া করেন না কেন?

রশিদ হাসিতে ছাত ফাটাইয়া বলিল: দরকার কি? নারী সম্পর্কে সেই মত আমার আজো আছে। আমার বিবেচনায় নারী রসাল ভোগের বস্তু। আকর্ষণ সে রস ত পান করতেই আছি।

হামিদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া মরুন্ধির মতো ভাব দেখাইয়া বলিল: কিন্তু তাতে কি এ কথাটাও বলা হইয়া গেল না যে আপনিও নারীর ভোগের বস্তু মাত্র?

রশিদ একটু ভাবিয়া বলিল: তাও বটে। তবে তাতে আপত্তি কি?

হামিদ: আপনার একটা ব্যক্তিত্ব, একটা পার্সোনালিটি আছে, এটা আপনি বিশ্বাস করেন?

রশিদ: হয় ত আছে।

হামিদ: যদি থাকে তবে সেটা আপনার সম্ভানে বিকশিত প্রসারিত হোক, এটা আপনার মন চায় না? আমি জানতে চাই, সম্ভানের মধ্যে বাঁইচা থাকবার একটা বাসনা আপনার আছে কি না?

রশিদ একটু ভাবিয়া বলিল: আগে ছিল না। এখন মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমার পরে আমার এসব ধন-দওলত খাব কেটা?

হামিদ: আমি ধন-দওলতের কথা বলতেছি না। সমাজতন্ত্রী দেশে প্রাইভেট প্রপাটি নাই। সেখানকার মানুষেরও এই সম্ভানের মধ্যে বাঁইচা থাকবার বাসনা নাই আপনি মনে করেন?

রশিদ: সেটা আমি বলতে পারি না।

হামিদ প্রতি কথায় জোর দিয়া বলিল: আমি পারি। আমার বিশ্বাস সম্ভানের মধ্যে বাঁইচা থাকার কামনাটা মানুষের আদিম জীবন-ক্ষুধা। এ ক্ষুধা প্রকৃতির দেওয়া। এটা সচেতন সৃষ্টি-বাসনা। সৃষ্টি-কর্তার খলিফা হিসাবে মানুষ নিজেই স্রষ্টা। সৃষ্টি আর্ট। অন্যান্য আর্টের মধ্যে শিল্পী যেমন নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রজেক্ট ও পার্শ্চুয়েট করতে চায়, সম্ভানের মধ্যেও তাই চায়। আমার মতে সম্ভান সৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ আর্ট। ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও প্রসারের এটাই শ্রেষ্ঠ মিডিয়ম। একমাত্র মিডিয়মও বলতে পারেন।

রশিদ: এদিক থানে ব্যাপারটা আমি চিন্তা কৈরা দেখি নাই। তুমি আমার সামনে আজ চিন্তার একটা নতুন দরজা খুইলা দিলা।

হামিদ: আমি জানি আপনার মধ্যে সে বাসনা আছে। সচেতন সৃষ্টি-বাসনাই মনুষ্যত্ব। আপনে নানা রকমের ইনহিবিশনে সে বাসনাটা চাপা দিয়া রাখছেন। নর-নারী পরস্পরের দৈহিক ভোগের বস্তু মাত্র এই মনোভাব আপনে ত্যাগ করেন। একটি বিয়া করেন।

রশিদ: তুমি আমার মনে একটা নতুন লালসা সৃষ্টি করলা হামিদ। আমি ভাইবা দেখুম। আজ উঠি। কিন্তু যে কথা বলার জন্যে আজ আসা সেটাই এখনও বলা হয় নাই।

হামিদ: সেটা কি?

রশিদ: হোমিও লেবরেটরির এড্‌জাংষ্ট্ররুপে তুমি যে একটা হোমিও হাসপাতাল খুলবার সুপারিশ করছিলি, লগুন থানে সেটার এপ্রভাল আসছে। এই প্রস্তাবের জন্যে আমার বিলাতী পার্টনাররা তোমারে কংগ্রেচুলেট করছেন। এখন দুই এক দিনের মধ্যেই তোমার একবার সাইটে আসতে হয়। লেবরেটরি দেখার ব্যাপারে তুমি এতদিন যে উদাসীনতা দেখাইছ, এ ব্যাপারে তা করলে চলবে না। কারণ আইডিয়াটা তোমার নিজস্ব। তুমি জায়গা ও এরিয়া দেখাইয়া দিলে পরে অ্যাকিটেস্ট-ডিজাইনারের কাজ শুরু হবে। বুঝলা ত ব্যাপারের গুরুত্বটা?

হামিদ হাসিয়া জবাব দিল: বুঝলাম কথা দিলাম যামু। কিন্তু তারিখ দিতে পারলাম না। যখনই যাই ফোন কৈরাই যামু।

রশিদ: দুই-তিন দিনের মধ্যেই আসা চাই।

২

আলী বিকালে ঠিকই আসিল।

হামিদ তাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিল: মি. আলীরে আমি চা-কফি-সিগারেট কিচ্ছু খাইতে দিমু না। মিসেস আলীর জন্যে কি অর্ডার দিতে পারি?

মিসেস: কিচ্ছু না। থ্যাংক ইউ। আমি চা-নাশতা করেই এসেছি।

হামিদ অফিসের দিককার দরজাটা বন্ধ করিতে-করিতে জোরে বলিল: এই দরজা বন্ধ কৈরা দিলাম। কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে।

সে ঘুরিয়া নিজের চেয়ারে আসিয়া বসিল। আলীদের দিকে হাসি-মুখে নজর বুলাইল। ভাবটা এই: কি বলতে আসছেন, এইবার বলেন।

মি. আলী কথা বলিবার উপক্রম করিতেই মিসেস বলিল: তুমি না আমি। আমি বলে যাব, তুমি শুধু সাপোর্ট করে যাবে।

হামিদ হাসিয়া বলিল: সবই সাপোর্ট করতে হবে? ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য সবই?

সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। মি. আলী বলিল: আমিও ঠিক ঐ কথাটাই বলতে চাইছিলাম।

মিসেস আলী: আমি যা বলব, তা সত্য হবে। সত্য ছাড়া মিথ্যে বলব না।

মিসেস আলী অবিকল আদালতের হলফটা বলিতে পারায় আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে হামিদ বলিল: হলফ ত হৈল। এবার জবানবন্দি শুরু হোক।

মিসেস আলী সুন্দর হাসিতে চেম্বারটা গুলয়ার করিয়া বলিল: জবানবন্দি নয়। ইওর লর্ডশিপের কোর্টে একটা পিটিশন মুভ করব।

আবার হাসির হুল্লোড়। হাসিতে হাসিতে মি. আলী বলিল: দেখলেন ত? আমার বেগমের হাইকোর্টেও যাতায়াত আছে। থাকবে না? উকিলের মেয়ে ত?

হামিদ সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিল: তা হৈলে মিসেস আলী আপনার পিটিশন মুভ করেন। এদিকে লর্ডশিপও অল্‌ এটেনশন।

মিসেস আলী: আপনি আমাদের গরিব-খানায় পায়ে ধুলো দেবেন। আমরা আপনার হাত ধোয়াতে চাই। নিজ হাতে রান্না করে চারটে ডাল-ভাত খাওয়াতে চাই।

হামিদ: কি দরকার এসব ফর্মালিটির? আপনার বাড়িতে কতই ত খাইছি।

মিসেস: যা খেয়েছেন সে সবই চা-নাশ্তা। এবার এক মুঠো ডালভাত খাওয়াতে চাই।

মি. আলী: তাছাড়া সে সব খাইছেন আমার অসুখের সময়। আমি তার একটাতেও শরিক হৈতে পারি নাই।

হামিদ: এটা কি আপনারা কোনও বড় ফাংশান করতে চান?

মিসেস: জ্বি না। একেবারে প্রাইভেট। ফ্যামিলি ডিনারে শুধু আপনি। আর আপনি যদি কোনো বন্ধু-বান্ধবী নিতে চান। আর থাকবেন আমাদের এম. ডি।

হামিদ: বেশ আমি আপনার দাওয়াত নিলাম। কিন্তু আমার জানা দরকার কবে কখন?

মিসেস: আপনি যেদিন যে সময়ের কথা বলবেন সেইটেই আমরা মেনে নব।

হামিদ: বেশ। আমি ডায়রি দেইখা এক্ষুনি দিন-তারিখ দেই। কিন্তু তার আগে আপনার প্রাপ্য ধন্যবাদটা দিয়া নেই।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিস্মিত হইল। একরূপ সমস্বরেই বলিল: আমরা পাব ধন্যবাদ আপনার কাছে? কোন্ বিষয়ে?

হামিদ: রশিদভাইর কাছে চিকিৎসার কথাটা সবই বৈলা দিছেন?

উভয়ে: জ্বি হাঁ।

হামিদ: তালাকের কথাটাও?

মিসেস আলী জিভে কামড় দিল। মি. আলী ব্যস্ততার সংগে বলিল: না না। এখনও বলি নাই। কিন্তু বলবার জন্য আপনার অনুমতি চাইতে আসছি।

মিসেস আলী স্বামীর সমর্থন করিয়া বলিল: আপনাকে দাওয়াত করা ছাড়া আপনার পারমিশন চাওয়াটাও আজকের এই আসার একটা উদ্দেশ্য। আমাদের ফ্যামিলি ডিনারে এম. ডি. কে ও-কথা বলবই, যদি আগে বলতে না পারি।

হামিদ: ও-কথাটা বলবার জন্য আপনারা অত ব্যস্ত কেন? আমি ত কথাটা গোপনই রাখতে চাই।

মিসেস আলী কি বলিতে যাইতেছিল। তাকে হাতের ইশারায় বাধা দিয়া মি. আলী বলিল: আপনি কথাটা গোপন রাখতে চান। আমার ইচ্ছার দিকে চাইয়া। এমন ইচ্ছাতে আমার কোনও অধিকার নাই। আমি কথাটা প্রচার করতে চাই। নিজের চৌদ্দ বছরের কবির গোনার কাফ্ফারা হিসাবে। আর সে সংগে চাই একটি দুর্লভ মহত্বকে দুনিয়ার সামনে তুলিয়া ধরতে। এ দুইটাই আমার জন্য ফরজ।

হামিদ দরদ-ভরা গম্ভীর গলায় বলিল: রাযিয়ার উপর অবিচারের জন্য আপনার মনে অনুশোচনা হৈছে এটাই বড় কথা। তাতেই আমি খুশী। আপনার মনে এ বিষয়ে আর কোনও গ্লানি থাকা উচিত না। আমি ত আপনাকে মাফ কৈরা দিছি, রাযিয়াও আপনাকে মাফ করব, আমি তা জানি। আর আমার মহত্বের কথা যা বললেন ওটা আপনার অন্তঃকৃতজ্ঞ মনের উচ্ছ্বাস। আমি ধন্যবাদের সাথে তা গ্রহণ করলাম। প্রচারের আর দরকার নাই।

আলী: এটাও আপনার মহত্বেরই আরেকটি নিদর্শন। কিন্তু আপনার আমাকে মাফ করলেই আমার কাফ্ফারা আদায় হবে না। কর্তব্যও করা হবে না। আমি যে কত নীচ নরাদম ছিলাম, আমাকে সে নীচতার নর্দমা খেতে টাইনা তুলতে আপনার কতবড় মহত্বের দরকার হৈছিল, এটা শুধু আমরা জানলেই হবে না। দুনিয়াকে জানতে দিতে হবে। সেই মহত্ব ও নীচতাকে পাশাপাশি তুলিয়া ধরতে হবে আমার নিজ হাতে। অপরে ধরলে চলবে না। খোদা আমাকে মাফ করবেন না। আমি নিজেই নিজের ক্ষমা করতে পারব না।

সাইকোথেরাপিউটিক চিকিৎসার ফলে মি. আলীর অস্থিরতা অনেক উন্নতি হইয়াছে। এটা ধরিয়া নিয়াও তার মুখে এই কথাগুলি অতিরিক্ত অতিভাষণ বলিয়া হামিদের মনে হইতেছিল। বোধ হয় তার মুখ-ভাবে তা প্রস্তুতিও হইয়া পড়িয়াছিল। সেটা লক্ষ্য করিয়াই আলী আবার বলিল: আমাকে বিশ্বাস করেন ডা. হামিদ, আমি আর আগের ওয়াজেদ নাই। সে ওয়াজেদ মারা গেছে। এ ওয়াজেদ নতুন মানুষ। আপনাকে এ ওয়াজেদের জীবন-দাতা। নিশ্চয়ই আমার মধ্যে আপনার ছোঁয়াচ লাগছে। তার ফলে আমি মহৎ না হইয়া থাকতে পারি! কিন্তু মহত্ব বুঝবার মতো আক্কেল আমার হৈছে। এই কথাটাই আমি প্রচার করতে চাই।

মিসেস আলী স্বামীর মুখ হইতে কথা টানিয়া নিয়া বলিল: ভাল ডাক্তার চিকিৎসা করেছেন তাই কঠিন রোগী সেরে উঠেছে। লোকে মনে করবে, এটা এমনি একটা মামুলি ব্যাপার। এটা যে অমন মামুলি ব্যাপার নয়, সে কথা আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। আমরা না বললে কেউ জানবেও না। এমন মহত্বের কথা গোপন রাখা হবে মহা পাপ। এ পাপ করতে আমাদের বাধ্য করবেন না ডাক্তার সাব।

স্ত্রীর মুখ হইতে কথা টানিয়া নিয়া বলিল: বিনাফিসে শুধু মানবতার খাতিরেই আপনি আমার চিকিৎসা করছেন, লোকে এটা জানলেও হবে না। দুদিন পরে লোকে রাযিয়ার তালকের কথা জানবই। তখন তারা মনে করবে ফিসের বদলে আপনি তালকনামা আদায় করছেন। এটা যে মিথ্যা, সেটা জানি শুধু আমরাই। আমরা যদি

এখনই সে কথা প্রচার না করি, তবে পরে আমাদের কথাও লোকে বিশ্বাস করব না। সেটা হবে আপনার উপর ঘোরতর অবিচার। আমরা যদি সে অবিচার হৈতে দেই, তবে তা হবে উপকারীর মাথায় লাঠি। না ডাক্তার সাব, আমরা জীবন থাকতে এ মিথ্যা তহমত প্রচার হৈতে দিব না।

স্বামীর সমর্থনে মিসেস আলী বলিল: আলী যে স্বেচ্ছায় তালাক দিয়েছে, তার উপর জবরদস্তি করা হয় নি, সে কথা আগে থেকে বলতে হবে আমাদেরই।

হাতের ধাক্কায় স্ত্রীর কথাটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া মি. আলী বলিল: তোমারও কথা ঠিক নয়, যরি। আমার উপর জবরদস্তি হয় নাই সত্য কিন্তু আমি তালাক দিছিলাম ভয়ে। আমার ভয় ছিল, রাযিয়াকে তালাক না দিলে ডাক্তার সাব আমার চিকিৎসা করবেন না।

মিসেস আলী স্বামীকে বাধা দিয়া বলিল: কিন্তু আমি ত তোমাকে বলেছিলাম ডাক্তার সাব তালাকনামা চান নি।

মি. আলী: হাঁ, তুমি কইছিল ও-কথা ঠিকই। তুমি আরও কইছিল ডাক্তার সাব তালাকনামার কথা জানেনই না। কিন্তু আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি নাই।

মিসেস: আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর নি?

মি. আলী: না। আমি ধৈরা নিছিলাম, তুমি আমার কাছ থেকে তালাকনামা আদায়ের ওয়াদা কৈরাই ডাক্তার সায়েবের আমার চিকিৎসায় রাজি করিয়া আমার মনে কষ্ট হবে ভয়েই তুমি তা আমার কাছে গোপন করতছ। সেই জন্যই নিতান্ত তোমার ওয়াদা রক্ষার খাতিরে তালাক দিতে রাজি হৈছিলাম।

মিসেস: বল কি?

মি. আলী: হাঁ। ঠিকই কইছি। তারপর তুমি যেদিন বাসায় কাযী নিয়া আসলা, সেদিন আমি বুঝলাম, ঐটাই তোমার ওয়াদা পূরণের শেষ দিন। তাই আমি কাযীর সামনে বিনা-আপত্তিতে তিন-তালাক উচ্চারণ করি, আর চোখ বুইজা তালাকনামায় দস্তখত দেই।

মিসেস: কি আশ্চর্য! তুমি আমার কাছে মনের এ ভাবটা এতকাল গোপন রেখেছিলে? তারপর তোমার সন্দেহ ঘুচল কবে?

মি. আলী: তালাকের বেশ-কয়দিন পরেও যখন দেখলাম তালাকনামাটা তোমার ভ্যানিটি ব্যাগেই পৈড়া আছে, তখন আমার চৈতন্য হৈল। সেইদিন বুঝলাম, সত্য কথাই তুমি কইছিল। আর সেইদিনই প্রথম আমার মনে পড়ল, কত বড় মহৎ ফেরেশতাকেই আমি ছোট নজরে দেখতেছিলাম। তখন থেকেই আমার মন অনুশোচনার আগুনে জ্বলতে লাগল। তারই জন্য ত আমি তোমারে তাগাদা শুরু করি তালাকনামাটা ডাক্তার সাবের হাওলা কৈরা দিবার।

মিসেস: হাঁ। আমার এখন সব কথা মনে পড়ছে।

হামিদ নীরবে মিয়া-বিবির এই বাদানুবাদ শুনিতেছিল। তাদের কথায় তার বিশ্বাস হইল। মিসেস আলীকে সে আগে হইতেই বিশ্বাস করে। মি. আলীর কথায়ও আন্তরিকতার সুর ফুটিয়া উঠিল। ওদের মুখে শোনার পর এখন তারও মনে পড়িল ঐ সময়কার ব্যবহারটা তার সত্যই মহৎ হইয়াছিল। তখন কিন্তু সে ওটাকে মহৎ মনে

করে নাই। অদ্রলোকের কর্তব্য হিসাবেই করিয়াছিল। সংগে-সংগে এখন তার মনে হইল, তেমন না হইয়া অন্য রূপ হইলে ব্যাপারটা এমন সুন্দর হইত না।

হামিদকে নীরব দেখিয়া মি. আলী আবার বলিল: কাজেই দেখতেছেন ডা. সাব, আমার প্রতি আপনার মহত্ত্ব আর রাযিয়ার প্রতি আমার অমানুষিকতা এ দুইটার প্রকাশ্য স্বীকৃতির জন্যই আমার নিজের এটা প্রচার করতে হয়। শুধু মুখে না আমার ইচ্ছা হয়, পিঠে ঢোল বাইস্কা সারা দুনিয়ায় এটা প্রচার-করতে বাকি জীবন কাটাই। এখন আমার ইচ্ছামতো প্রতিকার করবার অনুমতি যদি আপনে না দেন, তবে হয়ত শেষ পর্যন্ত পিঠে ঢোল আমার বানতেই হবে।

মি. আলীর কল্পনার উদ্ভটতার মধ্যেও তার আন্তরিকতার গভীরতা ফুটিয়া উঠায় হামিদ খুশী হইল। উজ্জ্বল চোখে-মুখে হাসি ফুটাইয়া সে বলিল: আপনার সব কথাই আমি মানলাম। তবু কিছুদিন কথাটা গোপনই থাক না?

মিসেস আলী কথায় মধু ছড়াইয়া বলিল: আপনি আমাদের উপকারী। আপনার অসুবিধে ঘটিয়ে বা আপনাকে অসন্তুষ্ট করে আমরা কিছু করব না। আপনি শুধু বলুন এটা প্রচারে আপনার কি অসুবিধে হবে?

আসলে হামিদের কোন অসুবিধা নাই। শুধু রাযিয়াকে একটা সারপ্রাইজ উপহার দিয়া তাকে চমকাইয়া দিবার মতলবেই সে এ কথাটা সম্বন্ধে গোপন রাখিতে চাই। কিন্তু আলীদের বিপুল প্রয়োজনের কাছে হামিদের ঐ খেয়ালটা আর কতটুকু? তাই হামিদ সে কথা বলিতে পারে না। শুধু মুচকি-মুচকি হাসিতে থাকে।

মিসেস আলী সে হাসির অর্থ বুঝে এবং তাতেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু মি. আলী হয় না। সে জিদের সুরে বলে: তা হৈলে আমার পাপের প্রতিকার নিজ হাতে করবার অনুমতি আমারে দিবেন না?

হামিদ দরদী মুরুব্বির সুরে বলিল: তালুকদার সম্পাদন কৈরা আপনার কর্তব্য ত করছেনই! আর কি করতে চান?

মি. আলী: প্রথমে বন্ধু-বান্ধবের কাছে কথাটা প্রকাশ করার পারমিশন চাই। তারপর বড় ভাই হিসাবে রাযিয়ার প্রতি দায়িত্ব পালনের যে অধিকার আমি নিজের পাপে ফরফিট করছি, আপনাদের হাতেই তার রেটোরেশন চাই। তবেই বুঝব আপনারা আমাকে মাফ করছেন। আপনার ও রাযিয়ার বিয়ার আয়োজন আমি নিজ হাতে করতে চাই। এটাই হবে আমার গোনার কাফফারা। আমার আত্মার শান্তির জন্য এটা অত্যাবশ্যক, আশা করি তা আপনে স্বীকার করবেন। মনে রাখবেন, আমিই রাযিয়ার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়। আপনার পারমিশন আমি পাবই, এ বিশ্বাস আমার আছে। রাযিয়ার পারমিশনের জন্য প্রয়োজন হয় আমি তার হাত-পা ধৈরা মাফ চাব। কি বল যরি, ঠিক কই নাই?

মিসেস আলী প্রবলভাবে মাথা ঝুকাইয়া বলিল: ঠিক বলেছ।

মি. আলীর অন্তরে হামিদের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে বলিয়া সে যে দাবি করিয়াছে সেটা তবে মিথ্যা নয়। হামিদের বিশ্বাস হইল। সে বলিল: সবই হৈব আপনার ইচ্ছামতো। তবে আপনার অপেক্ষা করতে হবে। সময় হৈলেই আমি সিগন্যাল দিব।

আলীরা খুশী হইয়া বিদায় হইল।

৩

দেখা-সাক্ষাতেই দিনের অনেকটা সময় নষ্ট হওয়ায় সেদিন হামিদ সন্ধ্যার অনেক পরেও রোগী দেখায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ বিনা-খবরে হাসিতে হাসিতে জাহানারা চেম্বারে ঢুকিয়া পড়িল।

কি আশ্চর্য! জাহানারা এ সময় কোথা হইতে আসিল? এখন ত চাটগাঁর কোনও ট্রেন নাই।

জাহানারা ট্রেনে আসে নাই। এক বন্ধু নিজের গাড়িতে বাইরোড ঢাকা আসিতেছিল। জাহানারা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছে। বন্ধু তাকে নারায়ণগঞ্জে নামাইয়া দিয়া গিয়াছে।

কিন্তু জাহানারা একদম খালি-হাতে যে? তার সুটকেস লাগেজাদি কোথায়? কিছু আনে নাই না কি?

জাহানারা হাসিয়াই খুন। সেজন্য হামিদভাইর কোন চিন্তা করিতে হইবে না। সে অনিয়াছে সবই। সব নিয়া সে উঠিয়াছে হামিদের বাসায়। আমরা খুব খুশি-খুশি করিয়াছেন। চাকরকে দিয়া লাগেজাদি গেস্ট রুমে তুলিয়াছেন। জাহানারা একদম নিজের বাড়ি মনে করিয়া গোসলাদি সারিয়া কাপড় বদলাইয়া ফ্রেশ হইয়াছে। তারপর আমার হাতে চা-নাশ্তা করিয়া সোজা ক্লিনিকে চলিয়া আসিয়াছে। চাকরই তাকে দিয়া গিয়াছে। আমরা হামিদকে ডাকাইতে চাহিয়াছিলেন। জাহানারাই আসে নাই। বলিয়াছে সে নিজেই ক্লিনিকে আসিবে।

জাহানারা যত সহজে কথাগুলি বলিয়া গেল, হামিদ তত সহজে ওগুলি শুনিতে পারিল না। জাহানারা আসায় হামিদ খুশী হইয়াছে। হাতে আসমান নাগাল পাইয়াছে ঠিকই। কিন্তু ঐ যে নিতান্ত আপন আপন ভাবটা দেখাইয়াছে ওটা ত বিপদের কথা। আমরা না জানি কিভাবে নিয়াছেন। সেই বা আমাদের কি না জানি বলিয়াছে। জাহানারাটার মুখে ত লাগাম নাই। হামিদ চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিজের চাঞ্চল্য গোপন করিতে এবং জাহানারাকে বুঝিতে সে প্রশ্ন করিল: তুমি আমার চিঠি-টেলি পাও নাই?

-পাই নাই তবে আসলাম কেমনে?

-জবাব-টবাব ত কিছু দিলা না।

-মনে করছিলাম ট্রেনের টিকিটটা কৈরায় তার করুম। গাড়িটা পাওয়ায় তার সময়ই পাইলাম না। দরকারও হৈল না।

সহজ স্বাভাবিক উত্তর। হামিদের বিশ্বাস করিতে হইল।

এখন জাহানারার পাল্টা প্রশ্নের পালা। সে বলিল: তুমি কেন আমারে এত জরুরী তলব করছ? পরের চাকরি করি মনে থাকে না? মন ঠিক কৈরায় ডাকছ ত?

হামিদ কৌতূহলে বলিল: কোন বিষয়?

-আমরার বিয়ার ব্যাপার। কোন্ বিষয় আর?

-তুমি ত আছ কেবল বিয়ার তালে। আর কোনও দরকার নাই বুঝি?

-থাকুম না বিয়ার তালে? আমার যৌবন কি বাড়তেছে?

কান পর্যন্ত গাল পাশ করিয়া হামিদ বলিল: সত্যই জানু তোমার যৌবন শুধু বাড়তেছে না। হু হু কৈরা বাড়তেছে।

গাল পাশ করার প্রতিযোগিতায় হামিদকে হারাইবার চেষ্টায় জাহানারা বলিল: আমার না। বাড়তেছে তোমার। চেহারাখানা কেমন চকচকা হৈছে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া একবার দেখ নাই? বাসায় আমার মুখেও তোমার স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার কথাটা শুনছিলাম। তখন মনে করছিলাম মায়ের চোখে ছেলের চেহারা অমন ভাল হৈয়াই থাকে। এখানে আইসা নিজের চোখে দেইখা বিশ্বাস হৈল। সত্যই হামিদ ভাই তোমারে বড় সুন্দর লাগতেছে।

হামিদ ভুরু নাচাইয়া বলিল: তুমি নিজে আরও সুন্দরী হৈছ কিনা, তাই সবাইরে সুন্দর দেখ।

-ঠাট্টা কৈর না হামিদভাই। এবার কিছু বিয়া না কৈরা চাটগাঁ ফিরুম না।

হামিদ দুষ্টামিপূর্ণ মুচকি হাসিয়া বলিল: বরাতে থাকলে হৈয়াও যাইতে পারে।

প্রবল উত্তেজনায় জাহানারা টেবিলের উপর দিয়া হামিদের হাত জড়াইয়া ধরিল। বলিল: সত্য হামিদভাই?

হামিদ মিষ্টি হাসিয়া বলিল: আমি তোমার সাথে কোনও দিন মিছা কথা কইছি দেখছ?

জাহানারা উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িল। বলিল: কবে হবে?

সুন্দর দাঁতের পাটি দেখাইয়া হামিদ বলিল: বর পাওয়া গেলৈ।

ফাটা বেলুনের মতো চ্যাপটা হইয়া গেল জাহানারা। বলিল: না হামিদ ভাই, আমারে নিয়া তুমি আর কৌতুক কৈর ন। আমি আর সহ্য করুম না।

মিঠা হাসিতে দরদী গলায় হামিদ বলিল: কথাটা না বুইঝাই তুমি যদি চইটা যাও, তবে আমার মধ্যে মিল হবে কেমনে?

জাহানারা উপলব্ধি করিল হামিদভাইর কথার মর্ম সে নাও বুঝিয়া থাকিতে পারে। জিগ্গাসা করিল: কোনটা বুঝি নাই?

হামিদ অতিশয় গম্ভীর সুরে বলিল: তোমার-আমার মধ্যে অন্তরে-অন্তরে কি সমঝোতাটা হৈছে? আমি যদি রায়ুরে না পাই, তবেই আমি তোমার, এই ত? তোমার দাবিও ত তাই?

জাহানারা খুব জোরে মাথা বুকাইয়া বলিল: ঠিক তাই। রায়ুআপার আগে আমার দাবি নাই, একথা আমি বরাবর বৈলা আসতেছি।

হামিদ: বেশ। রায়ুর ব্যাপারটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তবে তোমার বরও ঠিক নাই। তোমার বর পাওয়ার কথা বৈলা আমি এইটাই মিন্ করছি। এতক্ষণে বুঝালা?

জাহানারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল: ও : এই কথা?

জাহানারাকে খুশী দেখিয়া হামিদ আবার বলিল: দেখ জানু, তোমার প্রতি কত বড় অবিচার হৈতেছে, আর সে অবিচারটা করতেছি আমিই।

জাহানারা নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া গলা লম্বা করিয়া প্রশ্ন করিল: সেটা কি?

হামিদ: আমার একটা অলটার্ণেটিভ আছে। অথচ তোমার তা নাই।

জাহানারা ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল: কেমন?

হামিদ: রায়ুরে না পাইলে আমি তোমারে পামু। আমার কেস্টা একদম ঠিক হৈয়াই আছে। অথচ তুমি আমারে না পাইলে কারে পাব! তার কোনও ঠিক নাই।

জাহানারা লজ্জায় রাংগা হইয়া বলিল: হামিদভাইর যে কথা! প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে মানুষ অমন অলটার্ণেটিভ রাখতে পারে নাকি?

হামিদ জোরের সাথেই বলিল: নিশ্চয় পারে। নইলে নর-নারীতে কন্ট্রস্টটা হয় কত আন্থকুয়াল? এই আমার-তোমার ব্যাপারটাই ধর। ইটা তোমার জন্য কত আন্থফেয়ার! তোমার-আমার ইকুয়ালিটির অর্থ এই যে তোমার-আমার বিয়া হৈলে ত কথাই নাই। কিন্তু তা না হৈয়া আমি যদি রায়ুর হাত ধরি, তবে তুমিও যাতে তখনি, চাই কি একই বিয়ার মজলিসে, ধরবার মতো আরেকটা হাত রেডি পাও, তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তবেই না হৈল আমার মধ্যে ইকুয়ালিটি। তা না হৈয়া আমি রায়ুর হাত ধৈরা গলাগলি কৈরা বাসর ঘরে ঢুইকা পড়লাম, আর তুমি একা দাঁড়াইয়া আঁচলে চোখের পানি মুছতে থাকলা; এ কল্পনাও আমি বরদাশ্ত করতে পারি না।

জাহানারা গলিয়া গেল। হামিদভাইটা কত সুবিবেচক! কত মহৎ! অতীতটা তার কত দরদী! জাহানারার জন্য কত ভাবে! প্রাণ ভরিয়া হামিদভাইকে ধন্যবাদ দিবে, এমন সময় হঠাৎ তার ভাবান্তর হইল। চোখ বড় করিয়া ঠোট কাঁপাইয়া একটা হুম্ আওয়াজ করিয়া বলিল: ও দুষ্ট! তুমি কৌশলে জানতে চাও, আমি তোমারে ছাড়া আর কাউরে ভালবাসি কি না। আমার সাথে চালাকি নাই?

সুরে অভিমান আনিয়া বলিল: তোমারে ছাড়া আর কাউরে ভাল যদি বাসতামই তবে এই পাঁচ-পাঁচটা বছর তোমার পিছে-পিছে ঘুরি মরতাম না।

হামিদ সান্ত্বনা দিয়া বলিল: তুমি আমার পিছে ঘুরলা কই? আমিই ত ঘুরলাম রায়ুর আর তোমার পিছে-পিছে। আমিই ত আনি তোমারে খোশামুদ কৈরা। বিনা তাগাদায় আসছ আমার কাছে কোনদিন?

জাহানারা হাসিয়া বলিল: বিনা-ডাকে আসি কি কৈরা? তুমিই ত পাঁচ বছর আগে কইছিলা: সময় হৈলে মানে আবে-হায়াতের সন্ধান পাইলে তুমিই আমার খোঁজ করবা।

হামিদ সত্য-সত্যই বিস্মিত হইয়া বলিল: এতদিনের কথা তোমার মনে আছে?

জাহানারা গর্বভরে ঘাড় বেঁকাইয়া বলিল: থাকব না? আমার ভালবাসাটা ত আর ফাঁকি নয়।

হামিদ: আমি তোমারে ছাড়াও আরেক জনরে ভালবাসি। তা সত্ত্বেও তুমি আমারে ছাড়া আর কাউরে ভালবাস না। এটা তোমার মহত্ত্ব। তোমার এ মহত্ত্ব আমি এক্সপ্লয়েট করতে পারি না। আমি চাই তোমারও একটা হাতের পাঁচ থাকুক। ইন্ কেস্-যদি বুঝলা ত? তবে এটাও ঠিক, ব্যাপারটা আর ঝুলাইয়াও রাখা যায় না। তুমিও যেমন চাও, আমিও তেমনি চাই, এর একটা ফয়সালা শিগ্গির হৈয়া যাক। কিন্তু বিপদ হৈছে তোমারে নিয়া। তোমারে ত তলবমাত্র পাওয়া যায় না।

জাহানারা কৈফিয়তের সুরে বলিল: আমার দোষ কি? আমি থাকি চাটগাঁয়। চাকরি করি পরের। আর তুমি থাক এখানে। ডাক মারতেই ত আসতে পারি না।

হামিদ যেন কতই ভাবনা করিতেছে এমন ভাবে বলিল: আমিও ত সেই কথাই কই। আমি ভাবতেছি, তোমারে এখানে আনলে কেমন হয়?

জাহানারা বিজ্ঞের ভাষায় বলিল: না, তা পারবা না। আমি সে চেষ্টা কৈরা থুইছি। অনেক তদ্বির করছি। দুই-এক বছরের মধ্যে ট্রান্সফারের আশা নাই।

হামিদ: আমি ট্রান্সফারের কথা ভাবতেছি না। আমি ভাবতেছি অন্য কথা। আচ্ছা জানু, তুমি মাইনা পাও কত?

জাহানারা: মাইনা ত মাত্র চার শ। তবে কোয়ার্টার পাই। প্রাইভেট প্র্যাকটিসও এলাও করে। তাতে শ ছয়েক দাঁড়ায়।

হামিদ: অবশ্য কোয়ার্টার প্রাইভেট প্র্যাকটিস এখানেও হবে। আচ্ছা, ধর যদি এখানে সাত শ-সাড়ে সাতশ বেতনে তোমার একটা চাকরি যোগাড় করি, তা হৈলে কেমন হয়?

জাহানারা আহলাদে আটখানা হইয়া বলিল: তা হৈলে ত কথাই নাই। বে এটা সরকারী চাকরি পার্মানেন্ট। পেনশন আছে। এইটাই যা ভাববার কথা।

হামিদ হাসিয়া বলিল: আমি যে চাকরির কথা ভাবতেছি সেটা সরকারী চাকরির চেয়ে কম পার্মানেন্ট না। তাতেও প্রভিডেন্ট ফাও আছে। কোয়ার্টারও আছে। আর প্রাইভেট প্র্যাকটিসের দরকার নাও হৈতে পারে।

জাহানারা উৎসাহে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল: তবে সে চেষ্টাই কর হামিদভাই।

হামিদ: সে চেষ্টাই ত করতে চাই। আচ্ছা, ভাল শাড়ি জামা নিয়া আসছ ত?

জাহানারা সুন্দর দাঁতের পাটি বাহির করিয়া বলিল: একেবারে আমার বেস্ট পিসেয় এও জুয়েলারি বুলছি ত এবার বিয়ার সাজ-গোজ কৈরাই আসছি।

হামিদ: বেশ করছ। আমার কালই এক জায়গায় যাইতে হবে। যাঁর সাথে দেখা করুম, তাঁর সাথে এমন ব্যবহার করবা, যাতে ভদ্রলোক মজেন। বুঝল ত? চাকরি তাঁরই হাতে। বিনা-ইন্টারভিউও শুধু চোহারা দেইখাই যেন তোমারে চাকরি দেন এমন ভাব করবা। পুরুষ ভুলাইবার ফন্দিতে তোমার জুড়ি নাই, আমি জানি। সে সবই খাটাইবা।

জাহানারা: চাকরি দিবে ডাক্তারি। তার মধ্যে নায-নকড়ার দরকার হৈব কেন?

হামিদ: তুমি জান না জানু, আজকালের মনিবরা চাকরি দেয় ভিতরের গুণ দেইখা না। বাইরের চমক-চটক স্মার্টনেস দেইখা। মেয়েলোক ক্যানডিডেট হৈলে ও-সবের উপরে চাই একটু সেক্স এপিল।

জাহানারা বাঁ হাতে হাওয়ায় হামিদকে একটা মৃদু চড় মারিয়া বলিল: তুমি হামিদভাই আজকাল বড় ফাযিল হৈছ।

হামিদ দাঁত বাহির করিয়া বলিল: আমার ফাযলামিতে কোনো কাজ হৈব না। তোমার ফাযলামিটাই কাজে লাগব।

পরদিন দশটার সময় ফোন করিয়া হামিদ জাহানারাকে লইয়া রশিদের কারখানায় গেল। গাড়িতে উঠিবার সময়ই হামিদ মনে-মনে জাহানারার মোহিনী রূপের তারিফ করিল। খুশীও হইল।

রশিদ আর্কিটেক্ট-ইঞ্জিনিয়ারদেরে আগেই জমা করিয়া রাখিয়াছিল। কারখানার উচ্চপদস্থ অফিসাররাও হাজির ছিলেন। হামিদ প্রথমে রশিদ ও পরে অন্যান্য অফিসারদের সাথে জাহানারার পরিচয় করাইয়া দিয়াই কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এক চোখ রাখিল জাহানারার দিকে। লক্ষ্য করিল মোহিনী রূপের নায়ে-নকড়ায় ও বুদ্ধি-দীপ্ত আলাপে অল্পক্ষণেই সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। হামিদ আজই প্রথম লেবরেটরিতে আসিয়াছে। আসিয়াছে শুধুমাত্র একটি কাজের জন্য। তবে আসিয়াই যখন পড়িয়াছে, তখন গোটা ফ্যাকটরিটা দেখিয়া ফেলাই উচিত। তাই হইল। রশিদ তার অফিসার-ইঞ্জিনিয়ারদেরে লইয়া প্রথমে হামিদের নির্দিষ্ট বিশেষ কাজটা সারিল। তারপর দল বাঁধিয়া লেবরেটরির বিভিন্ন বিভাগ হামিদকে দেখাইল। অনেকক্ষণ লাগিল। চিফ ম্যানেজারের বেগম সহ অন্যান্য অফিসার-বেগমরাও शामिल হইয়াছিল। ক্লান্ত হইয়া শেষ দিকে তারা পিছনে পড়িল। জাহানারাও।

এই ফাঁকে রশিদ হামিদের কানে-কানে বলিল: এই মাল কই থনে যোগাড় করলা হামিদ? তোমার রুচির তারিফ করতে হয়।

হামিদ দাঁতে জিভ কাটিয়া বলিল: মাল কৈতেছেন কারে? ও যে আমার বোন।

রশিদ: চালাকি রাখ। তোমার যে ছোট বোন নাই তা আমি জানি।

হামিদ: আপন বোন না। দূর সম্পর্কের।

রশিদ: কতদূর? কয় মাইল?

হামিদ: বোন মানে এই শালী কি?

রশিদ: শালী? কার শালী?

হামিদ: কেন, আমার শালী হৈতে পারে না? আর শালী যারই হোক, আপনার পছন্দ হয়?

রশিদ: খুব।

হামিদ: বিয়ার প্রস্তাব দিতে পারি?

রশিদ: খান্দান কেমন?

হামিদ: সেই জন্যই ত শালী বললাম। ফতেপুরের আখীয় হওয়ার লায়েক। সিলেটের খুব বুনিয়াদী ঘর।

রশিদ: চাকরি ছাড়ব ত?

হামিদ: আপনার বেগম হওয়ার পরেও চাকরি করব, তেমন আহাম্মক মেয়ে জাহানারা নয়।

রশিদ: বাপ-মা আছেন? তাঁর মত লাগব না?

হামিদ: সেটার ভার আমার উপর।

রশিদ: বেশ। আমি রাজি।

হামিদ: পাক্কা কথা?

রশিদ: নিশ্চয়।

৪

ফিরিবার পথে গাড়িতেই হামিদ জাহানারাকে বলিল তার চাকরি হইয়া গিয়াছে। সে রিযিগ্নেশন পাঠাইয়া দিতে পারে।

পুলকের আতিশয্যে জাহানারা চলন্ত গাড়িতেই হামিদকে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া প্রায় এক্সিডেন্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কাজে ব্যর্থ হইয়া জাহানারা বলিল: তুমি আমার জন্য যা করলা হামিদভাই, সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই বৈলাই তোমারে জড়াইয়া ধরতে চাইছিলাম।

হামিদ: আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কিছু নাই। আমার কিছু করতে হয় নাই। সব করছে তোমার ঐ চেহারাখানা। বস্ ওতেই মইজা গেছেন একেবারে। সত্যি ওয়াগারফুল প্লে করছ জানু।

জাহানারা মাথা নাড়িয়া বলিল: তুমি না করলে এসব কিছু হৈত না।

হামিদ: তবে আর এবার জড়াজড়ি নয়। একদম কদমবুসি করতে হবে। তার কমে আমি মানুম না।

জাহানারা: কদমবুসি কদমবুসিই সই। কিন্তু চাকরিটা কি, মাইনা কত কিছুই ত এখনো কইলা না। সরকারী চাকরি ছাইড়া আসতে হৈব। একটু সুঝতে-সুঝতে হৈব না।?

জাহানারার কথার ঢংগে হামিদ চমকিয়া উঠিল। সে লক্ষ্য করিতেছিল জাহানারার কথার ও দৈহিক চাপ্বল্যের সাথে মুখ-ভাবের মিল পড়িতেছিল না। এবার কথার মধ্যেও নিরুৎসাহ দেখিয়া হামিদের সন্দেহ দৃঢ় হইল। বলিল: হঠাৎ মত পরিবর্তন করলা নাকি? বস্ পছন্দ হয় নাই?

জাহানারা চেষ্টা করিয়া গলায় উৎসাহ ফুটাইয়া বলিল: মত পরিবর্তন করুম কেন? পছন্দ না হৈবার কি কারণ আছে? তিনি ত খুব ভাল লোক। কিন্তু হামিদভাই তোমারে একটা কথা পুছ করতে পারি? তুমি হাসবা না ত?

হামিদ: কি?

জাহানারা: ভদ্রলোকেরে এর আগে কোথায় যেন দেখছি-দেখছি মনে হয়। এটা কি আমার মনের ধান্দা?

হামিদ: মনের ধান্দা হৈতে যাব কেন? নিশ্চয়ই কোথাও দেখছ। বিরাট শিল্পপতি। নারায়ণগঞ্জ ঢাকা চাটগাঁ যে কোনও খানে দেইখা থাকতে পার। কত ফাংশানেই ত উনি যান।

জাহানারা ভাবিয়া বলিল: তাও হয় ত হৈতে পারে কিন্তু আমার যেন মনে হয়, আগেও কোথাও দেখছি।

হামিদ আড়চক্ষে চাহিয়া দুষ্টামিপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল: কেন? তিনি অমন-কিছু কইলেন নাকি?

জাহানারা: না। তেমন কিছু ত কন নাই।

হামিদ এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল: তোমার কাছে কন নাই। আমার কাছে কইছেন। তিনি তোমারে চিইনা ফেলছেন।

জাহানারা: আমারে চিইনা ফেলছেন? কেমনে চিন্লেন?

হামিদ ভূ ভংগি করিয়া বলিল: তুমি যেমনে তাঁরে চিনছ, তিনিও তেমনি তোমারে চিনছেন। আর না চিনার ভান কৈর না জানু। তোমার চোখ-মুখ সাক্ষী দিতেছে, তুমিও তাঁরে চিনছ।

জাহানারা: তবে কি তিনি মেডিক্যাল--

বাধা দিয়া কথা কাড়িয়া নিয়া হামিদ বলিল: হাঁ, ইনিই মেডিক্যাল কলেজের রশিদভাই। সেই গায়ক বাদক সেবা-পরায়ণ ছাত্র-নেতা।

জাহানারার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে পুরা মুখ হা করিয়া বলিল: আমরা সেই রশিদভাই? তিনি অত বড়লোক হৈছেন?

হামিদ উচ্চহাসিতে বলিল: হাঁ হৈছেন এবং তোমারে মোটা বেতনের একটা চাকরিও দিছেন। এইবার কও, বস্ তোমার পছন্দ হৈছে ত?

জাহানারা কি যেন ভাবিয়া বলিল: হাঁ হৈছে।

হামিদ: এমন দু'টানা কথায় চলব না। পছন্দ হৈছে ত? ঠিক?

জাহানারা: ঠিক।

হামিদ গাড়ির স্পিড আরও কমাইয়া জাহানারার মুখের কাছে মুখ নিয়া বলিল: বস্ হিসাবে রশিদভাইরে যখন পছন্দ হৈছে, তখন এইবার কও বস্ হিসাবেও তাঁরে পছন্দ কর কি না?

হাঁসের মতো গলা বেঁকাইয়া জাহানারা বলিল: যাও। তুমি বড় দুষ্ট হৈছ হামিদভাই।

কিন্তু জাহানারার কথার প্রতিবাদটা সুরে ফুটিল না। তার সুর যেন বলিল: আবার কও শুনি।

সে ভাব লক্ষ্য করিয়া হামিদ বলিল: বস্‌রে রূপে মজাইলা তুমি, আর দুষ্ট হৈলাম আমি? ধানাই-পানাই না কৈরা সোজা উত্তর দেও। বর হিসাবে রশিদভাইরে পছন্দ হয়?

জাহানারা আরেক দিকে চাহিয়া বলিল: আমার পছন্দেই ত হৈব না। তিনি অত বড় লোক। একটা চাকরিজীবী ডাক্তারনীরে তিনি বিয়া করতে রাজি হবেন কেন?

হামিদ: তিনি বিয়া করলে ত তুমি আর চাকরিজীবী ডাক্তারনী থাকবা না। তুমি হৈবা তখন ইস্ট বেংগল লেবরেটরিজের ম্যানেজিং পার্টনার মি. রশিদের স্ত্রী, বেগম জাহানারা রশিদ।

জাহানারার সুস্পষ্ট রোমাঞ্চ হইল। কিন্তু মুখে বলিল: তুমি আমারে নিয়া ঠাট্টা-মযাক করতেছ হামিদভাই।

হামিদ জাহানারার রোমাঞ্চ লক্ষ্য করিয়া কৃত্রিম গাষ্ঠীর্ষ আনিয়া বলিল: এমন সিরিয়াস ব্যাপার নিয়া তোমার সাথে ঠাট্টা-মযাক করতে পারি?

জাহানারার এতক্ষণের গোমড়াভাব কাটিয়া গেল। মুখের উজ্জ্বলতায় মনের পুলক ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। তবু বলিল: আমার লাগি তুমি তবে সত্য-সত্যই আরেকটা বর ঠিক করতেছ হামিদভাই? আমারে ফাইন্যালী বাদ দিলা তুমি?

হাজার চেষ্টা করিয়াও জাহানারা গলায় বিষাদের সুর ফুটাইতে পারিল না। হামিদ মনে-মনে বলিল: রশিদ ভাই জাহানারার রূপে যেমন মজিয়াছে, জাহানারাও রশিদভাইর রূপেয়ায় তেমনি মজিয়াছে, ভালই হইল। মুখে সে বলিল: আহা! ভুল বুঝতেছ কেন? বর ঠিক করলাম কোথায়? তোমার জন্য আমার অলটারনেটিভ ঠিক করলাম মাত্র। তুমি-আমি এখন ইকুয়াল ফুটিং এ আসলাম। এটারেই তুমি ফাইন্যাল বলতেছ কেন?

জাহানারা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল: আমার মন কইতেছে এটাই ফাইন্যাল।

হামিদ: হৈলেই বা কি? রশিদভাইর মতো বর কয়টা আছে?

জাহানারা: তোমার সাথে কারো তুলনা হয় না।

হামিদ ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরিয়া বাম হাতের শাহাদৎ আংগুলটা জাহানারার ঠোঁটের সামনে ধরিয়া বলিল: সাবধান! অল্টারনেটিভের একটিরে আরেকটির চেয়ে ভাল বলতে নাই। পরে আফসোস করতে হয়।

জাহানারা হাসিল। বলিল: এখন আমার কি করতে হবে?

হামিদ: রায়ুরে এখানে আনতে হবে।

জাহানারা আড়চোখে হামিদের মুখ-ভাব অধ্যয়ন করিবীর চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া বলিল: কেন?

হামিদ: ব্যাপার অতি সোজা। সলিউশনের কাছাকাছি আইসা পড়ছি আমরা, তাই রায়ুর দরকার।

জাহানারা মনের হাসি মুখে গোপন করিয়া বলিল: কেমনে?

হামিদ: লোক আমরা চার জন। দুই জন নর দুই জন নারী। কেউ যাতে বাদ না পড়ে তা ত দেখতে হবে? তা করতে গেলে বিয়া হৈতে হয় দুইটা। কাজেই জোড়া মিলটা চার জনের সাক্ষাতেই হওয়া দরকার। এখন বুঝলা?

জাহানারা নিজের বুঝ বুঝিল। মুখে হামিদের কথায় সায় দিল: বুঝলাম। তারপর?

হামিদ যেন কত সহজ কথাটাই বলিতেছে এমনি ভাবে বলিল: তারপর আর কি? আজই রাত সাতটায় সুরমা মেইলে চইড়া বস। চল রিয়ার্ভেশনটা কৈরাই যাই।

হামিদ স্টেশনের দিকে গাড়ি ঘুরাইল। গাড়ি সোজা রাস্তায় পড়িলে হামিদ বলিল: কইলা না ত কিছু? সুরমা মেইল ঠিক আছে?

জাহানারা হাসিয়া বলিল: ঠিক আছে।

হামিদ: রায়ু কোথায় কি করে তা ত কইলা না। এখনও আপত্তি আছে?

জাহানারা: আপত্তি কোনও দিনই ছিল না। তুমি জিগগাসই কর নাই। কর নাই বোধ হয় এই জন্য যে রায়ুআপারে ডাকবার সময়ই হয় নাই। এখন সময় হৈছে নিশ্চয়ই। নইলে ডাকবা কেন?

জাহানারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হামিদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে জাহানারার কথার অর্থ পরিষ্কার করিতে চাহিল তার মুখে।

কিন্তু পরক্ষণেই জাহানারার প্রশ্নে তার সন্দেহ দূর হইল। জাহানারা বলিল: আচ্ছা হামিদ ভাই, তোমার প্রেমে এখন আর দাহিকা-শক্তি নাই?

বিস্ময়ে হামিদ তার বড়-বড় চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া বলিল: তুমি এমন একটা বেমওকা প্রশ্ন করলা যে?

জাহানারা: বেমওকা কোথায়? এইটাই ত মওকা। তুমিই একদিন কইছিলো যে প্রেমের দাহিকা-শক্তি নিবাইয়া তুমি তারে সুরজের কিরণের মতো অনির্বাণ শিখা বানাইবা। এখন তাতে সফল হৈছ নিশ্চয়ই। না হৈলে রায়ু আপারে ডাকতা না। হামিদ মনে-মনে জাহানারার স্বরণ-শক্তির তারিফ করিয়া মুখে গাষ্টীর্থ আনিয়া বলিল: হৈছি বলা যায় না। হওয়ার পথে। তবে আমার মতও একটু বদলাইছি। জাহানারা: সে কি?

হামিদ: প্রেমের দাহিকা-শক্তিও থাকব, আগুনও নিভব না। কারণ প্রেম অনির্বাণ শিখা। আসলে জীবনটাই অনির্বাণ। সৃষ্টিই এই জীবনের সার কথা। সে সৃষ্টি অনন্ত। সৃষ্টির মূলে প্রেম। তাই প্রেম একটা ইটার্নেল ফ্লেইম। বুঝলা?

জাহানারা আর কি বুঝবে? সে বুঝিল হামিদভাই তার সাধনায় সফল হইয়াছে। তাতে সে আহলাদে আটখানা। কিন্তু সে সাকসেসের সিক্রেটটা এখন কারও কাছে বলিতে চায় না। কি চাপা লোকটা! আচ্ছা দেখাই যাক। মুখে বলি, খুব বুঝছি।

হামিদ খুশী হইয়া বলিল: যদি বুইঝা থাক, তবে এইবার কিছু রায়ু কোথায় কাছে? কি করে?

জাহানারা: রায়ুআপা সিলেট ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর মেডিক্যাল এডভাইসার।

হামিদ: ফ্যামিলি প্ল্যানিং! ফ্যামিলি প্ল্যানিং! সে জানে কি?

জাহানারা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল: জানে এইটুকু যে তার একদিন ফ্যামিলি গঠন করতে হবেই। তাই টেনিংটা নিয়া রাখল আর কি?

উভয়ে একযোগে হাসিল।

গাড়ি স্টেশনের সামনে থামিল।

৫

জাহানারাকে সিলেট পাঠাইয়া হামিদের সময় আর কাটে না। দুই-দুইটা দিন চলিয়া গিয়াছে। এই দুই দিনে হামিদ কত কাজ করিয়াছে। আলীদের ফ্যামিলি ডিনার খাইয়াছে। সেখানে রশিদ ও আলীদের সাথে পৃথক ও সমবেত কত আলাপ হইয়াছে।

পরদিন মার্কেটিং করিতে রশিদ ঢাকা গিয়াছে। সংগে গিয়াছে হামিদ। অন্যান্য জিনিসের সাথে আশ্রমের জন্য দামী শাড়ি-জামা-জুতা কিনিয়াছে।

ওগুলি আশ্রমের হাতে দিবার সময় আশ্রম অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিয়াছেন: এসব কেন বাপজান?

হামিদ জবাব দিয়াছে: অমনি কিন্লাম। আপনেন্নে এক জোড়া ভাল-জামা কাপড় দেওয়ার নিয়ত কৈরা থুইছি অনেকদনি আগে। কিন্তু সময় কৈরা উঠতে পারি নাই এতদিন।

আম্মা মুচকি হাসিয়া বলিয়াছেন: এ সবেৰ কোন দরকার ছিল না। এই বলিয়া ও-সব বাক্সবন্দী করিয়াছেন।

পরদিন হামিদ একটু দেরিতে দুপুরের খানা খাইতে গিয়া দেখে বেণুমার রাজ-যোগালিয়া বাড়ি হোয়াইটওয়াশ করার কাজে লাগিয়াছে। বাড়ির মালিকের অজ্ঞতা ঢাকিতে গিয়া হামিদ তাদেরে কিছু বলে নাই। বাড়ির ভিতরে গিয়া আম্মাকে পুছ করে: রাজ-যোগাইলা কি আপনে লাগাইছেন আম্মা?

আম্মা স্থিত হাস্যে বলিয়াছেন: হাঁ, বাবা আমিই লাগাইছি। বাড়িটা বড় নোংরা হৈয়া আছে। অনেকদিন থনেই চুনকামটা করাইয়া ফেলুম ভাবতেছি। মনে করছিলাম বাড়িওয়ালারে দিয়াই করাই। কিন্তু চিন্তা কৈরা দেখলাম, ঐ কয়টা টাকার লাগি কে যায় বাড়িওয়ালার সাথে দেন-দরবার করতে? বাপজানের সে ফুরসৎ কই? তাই নিজেই কাজটা করাইয়া ফেললাম।

হামিদ আড়চোখে আমার মনের কথা বুঝিবার চেষ্টা করে। আমরা জানে না কি? এটা কি শাড়ি-জামার কৈফিয়তের জবাব? জাহানারা সব বলিয়া দেয় নাই? জানুর অসাধ্য কিছু নাই। আসুক আগে সে।

কিন্তু জাহানারা আসে না। ফোনও করে না। ঢাকা হইতে ফোন করিবার কথা। কথা হইয়াছে, রাখিয়াকে লইয়া জানু ঢাকায় তার মামুর বাসায় উঠিবে। নারায়ণগঞ্জে রাখিয়াকে তুলিবার জায়গা নাই। হামিদের বাসায় তুলিবার কথা উঠিতেই পারে না। হামিদ-জানু দুই জনেই একমত, হামিদই তাকে আনাইতেছে রাখিয়া একথা জানিতে পারিলে সে মোটেই আসিবে না। জানু তাকে আশ্রয়স্থানে ঢাকা আনিবে। তুলিবে মামার বাসায়। কিন্তু রাখুকে আশ্রয় দেখা উচিত এই বিষয়েও হামিদ-জানু একমত। সে ব্যবস্থা জানু করিতে পারিবে। জানুটা বড়ই ফন্দিবাজ। রাখিয়াকে বলিবে খালাকে দেখিতে যাইতেছে। নিয়া আসিবে হামিদের বাসায়। রাখিয়া জানিবে আশ্রয়স্থান জানুর খালা তার জন্য হামিদের কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। ঢাকা হইতে জাহানারার ফোন পাইয়া মামার বাসায় একটা গাড়ি পাঠাইলেই চলিবে। বাকি যা করার জাহানারাই করিবে।

এত সব খাঁটি-খাঁটি কথা হামিদ রশিদকে বলিয়া কোম্পানির একটা ভাল গাড়িও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। এদিকে সবই ঠিক। অথচ জানু হতভাগীর কোন উদ্দেশ্য নাই।

অবশেষে তিন দিনের দিন সন্ধ্যার সময় জাহানারার ফোন আসিল। রাযিয়াকে লইয়া সহি-সালামতেই জাহানারা মামার বাসায় পৌঁছিয়াছে। তারা গোসল চা-নাশত করিয়া রেডি। এখন হামিদ গাড়ি পাঠাইলেই হয়। রাযিয়াকে লইয়া সে আশ্রমের কাছে যাইবে। সাবধান! সে সময় যেন হামিদ বাসায় আসিয়া না পড়ে। হামিদ যেন জাহানারার আরেকটা ফোন পাওয়ার আগে বাসায়ই না যায়। হামিদ জানুর কথামতো কাজ করিবে আশ্বাস দিয়া ফোন ছাড়িল। রশিদের ওখানে ফোন করিয়া তৎক্ষণাৎ নির্দিষ্ট ঠিকানায় গাড়ি পাঠাইল।

গাড়ি পাঠাইয়া আধ ঘন্টা খানেক হামিদ নিরুদ্বেগে রোগী দেখিতে পারিল। তারপর আর পারিল না। প্রতি পাঁচ মিনিট পর-পর ঘড়ি দেখিতে লাগিল। এত দেরি হইবার ত কোনও কারণ নাই। যাইতে পনের মিনিট, আসতে পনের মিনিট। গাড়িতে উঠিতে ওদের বড় জোর দশ মিনিট। রাস্তায় যান-বাহনের ভিড়ের জন্য না হয় আরও পাঁচ-দশ মিনিট দেওয়া গেল। তাতেও ত পঞ্চাশ মিনিটের এক সেকেণ্ড বেশি লাগিবার কথা না। তারপর একটা ঘন্টা যখন পূরা হইয়া গেল, তখন হামিদ জাহানারার মামুর বাড়ি তালাশ করিয়া বাহির করিতে ড্রাইভারকে আরও দশ মিনিট সময় দিল। তাতেও ত এক ঘন্টার বেশি কিছুতেই লাগিতে পারে না।

এবার সত্যিই তার অসহ্য হইল। সে ক্লিনিকের এক চাপরাশীকে বাসায় পাঠাইল। সে বাড়িতে ঢুকিবে না। শুধু বাহির হইতে দেখিয়া আসিবে কোনও গাড়ি আসিয়াছে কি না।

দশ মিনিট পরে চাপরাশী ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল। না, গাড়িবারান্দায় বা আশে-পাশে কোনও গাড়ি নাই। পাঁচ মিনিট ঘড়ির দিকে চাহিয়া থাকিয়া হামিদ আবার তারে বাসায় পাঠাইল। সে এবার ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল। মনিবের উদ্বেগটা তার মধ্যেও সংক্রমিত হইয়াছে। হাঁ, একটা বড় গাড়ি এইমাত্র গাড়িবারান্দার নিচে থামিল। দুইজন লেডি গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিল।

হামিদের রোমাঞ্চ হইল। রাযিয়া আসিয়াছে। হামিদেরই বাড়িতে আসিয়াছে। কিন্তু বেচারী তা জানে না। হামিদের ঠোঁটের কোণে হাসি আসিল। জানুটা কত ফন্দিবায়! সে কল্পনায় দেখিল জানু আশ্রমের সাথে রাযিয়ার পরিচয় করাইয়া দিতেছে: ইনি আমার খালাআশ্রম। আশ্রম কি করিলেন, হামিদ অনুমতি করিতে পারিল না। জাহানারা আশ্রমকে আগেই বলিয়া রাখিয়াছে নিশ্চয়। জাহানারার বড় ফন্দিবায়।

হামিদ ঘড়ি দেখিল। ইস্, সাড়ে সাতটা! ছয়টায় গাড়ি পাঠাইয়াছিল। দেড়টা ঘন্টা লাগাইয়াছে নারায়ণগঞ্জে আসিতে? তা লাগুক! সাহিসালামতে পৌঁছিয়াছে ত! হামিদ কত কুখ্যাতি ভাবিতেছিল। আজকাল রাস্তায় যেরূপ ঘন-ঘন মোটর এক্সিডেন্ট হয়! তাতে হামিদের চিন্তারই বা দোষ কি?

পৌণে আটটায় একবার, আটটায় আরেক বার, চাপরাশী পাঠাইল হামিদ। হাঁ, ঠিক গাড়িটা এখনও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। কি করে ওরা এতক্ষণ? আশ্রম নিশ্চয় ওদের চা-টা খাওয়াইতেছেন। রাযিয়া নতুন ত। আশ্রম কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না। আশ্রম প্রতি কৃতজ্ঞতায় হামিদের বুক ভরিয়া উঠিল। আর অল্পক্ষণ পরেই জানু ফোন করিবে। হামিদ হাতের কয়টা রোগী শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় বয় খবর দিল এক জোড়া সাহেব-মেম হামিদের সাথে দেখা করিতে চায়। হামিদ বিরক্ত হইল। এমন সময়ে সে আর নতুন রোগী হাতে নিবে না। বলিয়া দাও এখনই ডাক্তার সাব উঠিয়া পড়িবেন।

বয় ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সাহেব-মেম বড় জিদ করিতেছেন। বড় জরুরী। পাঁচ মিনিটেই তাদের কাজ হইয়া যাইবে।

গরিব লোক হইলে হামিদের বিশেষ বিবেচনা পাইতে পারিত। কিন্তু সাহেব-মেমকে সে খাতির করবে? হামিদ উষ্ণ বলিল: কেমন সাহেব-মেম? পোশাক-পাতি কেমন?

বয়: সাহেবের পরনে কোট-প্যান্ট। মাথায় হ্যাট। মেম সাবের--

বাধা দিয়া ব্যস্ত হামিদ বলিল: গাড়িটা দেখতে কেমন?

বয়: গাড়ি না সার রিক্শায় আসছে।

ও তা হইলে গরিব সাহেব-মেম? আজকাল অনেকে পেটে ভাত দিতে পারে না, তবু সেকেণ্ড হ্যাণ্ড দোকান হইতে কোট-প্যান্ট কিনিয়া সাহেবী ঢং করে। এমন সাহেব না হইলে ত হামিদের কাছে আসিতই না। আচ্ছা, তবে হামিদ দিতে পারে পাঁচ মিনিট।

বলিল: আচ্ছা বোলাও।

কোথায় রোগী? যারা ঘরে ঢুকিল তাদের একজনকে হামিদ অবশ্য চিনিতে পারিল না। কিন্তু অপর জনকে দেখিয়া সে হতভম্ব হইয়া গেল। সাহেবটির পরনে দামী কোট-প্যান্ট, মাথায় ফেল্টের হ্যাট। সুন্দর যুবক। কিন্তু মেম সাহেবটি ত রাখিয়া! এটা কেমন করিয়া হইতে পারে? রাখিয়াই বা এই বিদেশী যুবকের সাথে জুটিবে কেমনে? আর দুই জনের চেহারায়ই এমন অদ্ভুত মিল হইতে পারে কিরূপে?

হতভম্ব হামিদের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। আগন্তুকদেরে বসিতে বলিল না। তারা বসিলও না বরঞ্চ হামিদই নিজের অজ্ঞাতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মুখ হইতে বাহির হইল: আপনেদেরে আমি ঠিক চিনতে-

বাধা দিয়া সাহেবটি বলিল: চিনতে পারেন নাই? তা চিনবার কিছুও না। আমার নাম মি. আশরাফ। আর ইনি মিস্ রাখিয়া বেগম। আমরা দুজনই ক্রনিক লাভ ডিযিযের রোগী। আপনার কাছে আসছি ট্রিটমেন্টের জন্য।

উভয়ে এক যোগে হাসিয়া উঠিল? যুবক মাথা হইতে হ্যাটটি খুলিয়া ফেলিল। লম্বা চুল পিঠে ছড়াইয়া পড়িল। জাহানারা!

হামিদ এক লাফে টেবিলের পাশ ঘুরিয়া স্ত্রীকে জড়াইয়া ধরিল। অনেকক্ষণ ছাড়িল না। পাশে দাঁড়াইয়া জাহানারা হাসিতে থাকিল।

তারপর পুলক-কম্পিত কণ্ঠে চিল্লাইয়া বয়কে এক কেটলি কফির হুকুম দিয়া হামিদ দুই জনকে দুইহাতে জড়াইয়া বারান্দার কামরায় ঢুকিল। একটি টিপয়ের তিন পাশে ঘন হইয়া বসিল। তিন বন্ধুতে আলাপ জুড়িল। খিলখিল হো হো হাসিল। আলাপও শেষ হয় না। হাসিও থামে না।

বেশি কথা বলিল অবশ্য জাহানারাই। কেমনে সে সিলেট গেল। কি সব ফন্দি করিয়া রাযুআপাকে ঢাকা আনিল। মামুর বাসায় উঠিল। মামাত ভাই আলতাফের সুট-হ্যাট বাছাই করিল। তারপর হামিদের পাঠানো গাড়ি চড়িয়া খালাকে দেখিবার বাহানা করিয়া রাযুআপাকে আশ্রমের কাছে আনিল। আশ্রমের কাছে রাযুআপার মিথ্যা পরিচয় দিল। আশ্রম কিরূপ খাতির-যত্ন করিলেন। তারপর নাশতা-চা খাইয়া সাহেব-মেম সাজিয়া গাড়ি বিদায় দিয়া রিক্শা করিয়া ক্রনিকে আসিল। এসব কথার সত্য-মিথ্যা বর্ণনা দিল জাহানারা। রাখিয়া মাঝে-মাঝে রং চড়াইয়া সে সব বর্ণনা রসাল করিল।

ইতিমধ্যে কফি আসিল। হামিদ বানাইতে চাহিলে রাখিয়া কাড়িয়া নিল। রাখিয়ার হাত হইতে ছিনাইয়া নিল জাহানারা। শেষ পর্যন্ত জাহানারার তৈয়ারি কফি খাওয়া শেষ হইল।

তখন হামিদ গম্ভীরভাবে নিজের বুক পকেট হইতে তালুকনামার খামটি বাহির করিল। খুলিয়া দুই জনের মাঝখানে টিপয়ের উপর রাখিল। সমবেত মহিলাদ্বয়ের দিকে বিজয়-গর্বে তাকাইল। এটি হামিদের সোলেমানী আংটি। রায়ুকে এটা তার সারপ্রাইজ উপহার। জানু-রায়ুর মাথায় এটা বিশ্বয়ের বস্মশেল। গর্বিত হইবে না? এইটি পকেটে লইয়া ঘুরিয়াছে সে সারাদিন। জানুর দ্বিতীয় ফোন পাইয়াই সে ছুটিয়া যাইবে রাখিয়ার কাছে। প্রয়োজন হয় ঢাকায়। বরাত গুণে তারাই আসিয়াছে হামিদের ক্লিনিকে।

এমন বস্তুটি রায়ু-জানুর সামনে রাখিয়া বেচারীদের ফাটিয়া-পড়া বিশ্বয় উপভোগ করিবার আশায় ব্যাকুল ব্যগ্রতায় বসিয়া রহিল হামিদ। ক্রিয়াও শুরু হইল। এক সংগে মাথা ঠুকঠুকি করিয়া কাগজটির উপর ঝুকিয়া পড়িল তারা।

কিন্তু ও খোদা! বিশ্বয়ে ফাটিল না কেউ। তার বদলে হো হো করিয়া হাসিতে-হাসিতে জাহানারা বলিল: তুমি হইরা গেলা হামিদভাই। আমরা মোটেই সারপ্রাইজ হইলাম না। আমরা এটা আগেই জানতাম।

অবিশ্বাসের অর্ধহাসি হাসিয়া হামিদ বলিল: জানতা? কি জানতা?

জাহানারা তেমনি হাসিতে-হাসিতে জবাব দিল: মিসেস আলী গুপ্ত কথাটা বৈলা দিছিলেন আমার কানে-কানে।

হামিদ বিশ্বয়ে বলিল: তার সাথে কথা হৈল তোমার কখন?

জাহানারা: তুমি যখন এম.ডি.র সাথে কানাকানিতে মগ্ন তখন মিসেস আলীর সাথে আমিও পৃথক দরবার বসাইছিলাম। তাঁর কাছেই আমি তালকের কথাটা জানতে পারি। আমি স্বীকার করি, তোমারে হারাইলাম বৈলা আমার স্বার্থপর নীচ মনটা খরাপ হৈছিল। মনেও করছিলাম, তবে আর চাকরি বদলাইয়া এখানে আসবার দরকার কি? ফ্যাক্টরি থনে ফিরবার পথে তুমি আমার মধ্যে যে ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল, সেটা ছিল এই কারণে। তারপর যখন তুমি এম.ডি.র সাথে আমার বিয়ার কথাটা কৈলা, তখন আমি আশ্বস্ত হৈছিলাম।

হামিদের সে কথা মনে পড়িল। হাসিয়া বলিল: আশ্বস্ত হৈছিল? না পুলকে নাইচা উঠছিল? আমি লক্ষ্য করি নাই মনে করছ? কিন্তু কি চাপা মেয়ে তুমি। তুমি যে তালকের কথাটা শুনছ, আভাস ইংগিতেও আমারে তা বুঝতে দেও নাই।

জাহানারা সমান তেজে বলিল: আর তুমি? তুমিই কি কম চাপা? রায়ুআপারে আনতে পাঠাইবা আমারে, অথচ আসল কথাটাই কৈবা না। মিসেস আলীর মুখে খবরটা না পাইলে আমি রায়ুআপারে আনতে যাবার সাহস পাইতাম? আর রায়ু আপা ওটা না শুনলে আমার কথায় ছুইটা আসত এখানে? রায়ুআপা অমন মেয়েই না। কি কও রায়ুআপা?

রাখিয়া জোরে-জোরে মাথা নাড়িয়া জাহানারাকে সমর্থন করিল। হামিদ বোকা বনিয়া শুধু বলিল: কি আশ্চর্য!

জাহানারা: কিছু আশ্চর্য না। তোমার মতো স্বার্থপর আমি না। আমরাও আমি আমার সিলেট যাওয়ার মতলবের কথা কৈয়া দিছিলাম। তিনি খুব খুশী হৈছিলেন। তাঁর বাড়ি হোয়াইটওয়াশ করান এবং আমার লাগি তোমার শাড়ি-জামা কিনা নিয়া কি কি কথা হৈছে তা নিয়াও আমরা হাসাহাসি করছি। রায়ুআপারে দেইখা আমরা খুব খুশী হৈছেন। খুব পছন্দ করছেন।

হামিদ বিশ্বয়-পুলকে বলিল: বল কি?

জাহানারা: সব কথা বলি নাই এখনও। আমরা রাযুআপারে 'বউমা' ডাকছেন। তার কপালে চুমা খাইছেন। আর আংটিও উপহার দিছেন। কই রাযুআপা দেখাও না ওটা হামিদভাইরে।

রাযিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। জাহানারার কথার শেষ হইতে -না-হইতেই রাযিয়া সগর্বে তার বাঁ হাতটি টিপয়ের উপর রাখিয়া দিল।

হামিদ সম্মুখে রাযিয়ার হাতটি তুলিয়া লইল। অনামিকায় সুন্দর দামী পাথর-বসানো আংটি। মুখে বলিল: চমৎকার। আমরা এ আংটি পাইলেন কই? আমি ত কিইনা দেই নাই।

জাহানারা গাল পাশ করিয়া বলিল: সিলেট যাওয়ার দিনই আমরা দাম দিয়া দিছিলেন। রাযুআপার পছন্দ-মতো ঢাকা খেনেই কিইনা আনছি।

কে কারে বেশি ঠকাইল, এ নিয়া হাসাহাসি চলিল অনেকক্ষণ।

হাসি থামিলে হামিদ বলিল: কিন্তু তুমিও জাইনা রাখ জানু, তোমার ঐ সুট-পরা অভিনয়টা আমার কাছে সারপ্রাইযও ছিল না, অত কষ্ট করার তোমার দরকারও ছিল না।

জাহানারা তাজ্জব হইয়া বলিল: সারপ্রাইয নয় কেন?

হামিদ: তুমি এটা করবা আমি আগেই তা জানতাম। রশিদভাইরে পছন্দ করার পর খেনেই তুমি চাইতে শুরু কর রাযুরে যেন আমি বিয়া করি। রাযু-আশরাফের ব্যাপারটা মিথ্যা-অভিনয় প্রমাণের চেষ্টা তুমি করবা, এটাও আমি বুঝতে পারি। সুট ও ফেক্টের হ্যাট যোগাড় করবা, তাও আমি অনুমান করি। কাজেই তোমরা যখন আমার চেয়ারে ঢুকলা, তখন আমি মোটেই সারপ্রাইযড্ হই নাই।

অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়া জানু বলিল: তবে যে অমন হতভম্ব হইয়া গেছিলো?

হামিদ: ওটা ছিল আমার অভিনয়। তোমরার অভিনয়ের জবাবে আমিও একটু অভিনয় করলাম। ঐটুকু না করলে তোমার অতবড় ছদ্মবেশটা ব্যর্থ হৈল বৈলা তুমি নিরাশ হৈতা না?

জাহানারা: বিশ্বাস করলাম না। কিন্তু তর্ক স্থলে মাইনা নিলাম। ওটা দরকার ছিল না বললা কেন?

হামিদ রাযিয়ার দিকে প্রেম-স্নিগ্ধ নজরে চাহিয়া বলিল: রাযু-হামিদ প্রেমটা এমন অতল মহাসাগর যে অমন দু'চার কনা কাদামাটি সে সাগরের পানি ঘোলা করতে পারে না।

একটু থামিয়া আবার বলিল: এখন দুজনেই তোমরা শোন, আমরা বিয়ার দিন-তারিখ ঠিক হইয়া গেছে। শাহবাগে একই মজলিসে দুই বিয়া হবে। তারও আয়োজন সব ঠিক।

এই ঘোষণায় ঐ ক্ষুদ্র সভাতেই পুলকের তুফান বহিল। সে তুফানে আসিল চায়ের কাপ। চা শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া রুম্মালে মুখ মুছিতে মুছিতে রাযিয়া বলিল: প্রেম যে অনির্বাণ শিখা, তোমার এই সাম্প্রতিক মতের কথা জানু আমাকে টেনেই কইছিল।

অনির্বাণ শিখা

৩০৯

কিন্তু এটাও আমার কাছে মোটেই সারপ্রাইয ছিল না। জানুর মুখে শুনবার অনেক আগেই আমি তা জানতাম।

হামিদ বিস্ময়ে বলিল: কেমনে জানলা?

রাযিয়া: অনির্বাণ না হৈলে নৈরাশ্যের অমন ঘুঁট-ঘুঁটা অন্ধকারেও তুমি পাঁচ-পাঁচটা বছর আমার আশায় থাকতে পারত না। জানুও পারত না।

একটু থামিয়া আবার বলিল: কিন্তু তার পরেও আমার একটা জিগগাসা আছে।

কৌতূহলে হামিদ বলিল: কি?

রাযিয়া মুচকি মিষ্টি হাসিতে হামিদকে মাতাইয়া বলিল: তোমার আবে-হায়াতের কি হৈল?

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে-উঠিতে হামিদ বলিল: আবে-হায়াতের সন্ধান ঠিকই পাইছি। শুধু একটি পেয়ালার অভাবে এতদিন পান করতে পারি নাই। আজ সে পেয়ালা পাইলাম। এই আমার সেই পেয়ালা।

রাযিয়াকে সবলে বুকে জড়াইয়া তার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চাপিয়া ধরিল।
